



অ্যাডলফ
হিটলার
মাইন ক্যাফ



মাইন ক্যান্স

[আমার সংগ্রাম]

মূল :

অ্যাডলফ হিটলার

অনুবাদ :

মোহাম্মদ বিল্লাল হসাইন

আকন বই বিজ ;
নতুন পুরাতন গল্প উপর্যাপ্তি সেবা শৃঙ্খলা
ও বাংলা সাহিত্যের বই পাওয়া যাব।
ইসলামিয়া মার্কেট, নীলকঞ্চ, ঢাকা-১২০০
০১৭২০১৭২০০০

নীলকঞ্চেত বুক সোসাইটি

মাইন ক্যাম্প
অ্যাডলফ হিটলার

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১১

প্রকাশনায়
নীলক্ষেত্র বুক সোসাইটি
ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত্র
ঢাকা-১২০৫

বৃত্ত
প্রকাশক
প্রচন্দ
মোহাম্মদ আমির হ্সাইন

কম্পিউটার কম্পোজ
এস এস কম্পিউটার

মুদ্রণ
মুজাহিদা প্রিন্টার্স
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

মূল্য : দুইশত বিশ টাকা মাত্র

পরিবেশনায় :
বুমা বুক সেন্টার, নীলক্ষেত্র

উৎসর্গ

১৯২৩ সালের ৯ নভেম্বর সাড়ে বারটার সময় ফেন্ট হেরেনহালের সামনে গণ-আদালতে
মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত এবং মিউকিনের সামরিক বাহিনী কর্তৃক তৎকালীন জনগণের উক্তারকার্যে
প্রতী হওয়ার দোষে যারা নিহত হয়েছেন :

অ্যালফার্থ ফেলিঙ্গ, ব্যবসায়ী, জন্ম ৫ জুলাই, ১৯০১ সালে।

বাউলিঙ্গাল অ্যানড্রেস, টুপী প্রস্তুতকারক, জন্ম ৪ মে, ১৮৮৯ সাল।

ক্যাসেলা থিয়োডর, ব্যাঙ্ক কর্মচারি, জন্ম ৮ আগস্ট, ১৯৯০ সাল।

অ্যারলিক উইলহেম, ব্যাঙ্ক কর্মচারি, জন্ম ১৯ আগস্ট, ১৮৯৪ সাল।

ফাউল্ট মার্টিন, ব্যাঙ্ক কর্মচারি, জন্ম ২৭ জানুয়ারি, ১৯০১ সাল।

হেথেনবার্গার আত্ম, তালা প্রস্তুতকারক, জন্ম ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০২ সাল।

কর্ণে অঙ্কার, ব্যবসায়ী, জন্ম ৪ জানুয়ারি, ১৮৭৫ সালে।

কুন কাইল, মুখ্য পরিচালক, জন্ম ২৬ জুলাই, ১৮৯৭ সাল।

লাফোর্স কার্ল, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র, জন্ম ২৮ অক্টোবর, ১৯০৪ সাল।

নই বাউয়ারে ফুর্ট, পরিচালক, জন্ম ১৬ আগস্ট, ১৯০৪ সাল।

ফোর্ডটেন থিয়োডর ভন্ডার, উচ্চ প্রাদেশিক কোর্টের কাউন্সিলার, জন্ম ১৪ মে, ১৮৮৪
সাল।

রিক্ষাস জো, অবসরপ্রাপ্ত অশ্ববাহিনীর অধিনায়ক, জন্ম ৭ মে, ১৮৮৪ সাল।

সাউবনার রিখ্তার মান্দ আরভিন ভন্ড, ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার, জন্ম ৯ জানুয়ারি, ১৮৮৪ সাল।

স্ট্রান্স্কি লৱেন্স রিটার্ন ভন্ড, ইঞ্জিনিয়ার, জন্ম ১৪ মার্চ, ১৮৯৯ সাল।

উলফ উইলহেলম ব্যবসায়ী, জন্ম ১৯ অক্টোবর, ১৮৯৮ সাল।

তথাকথিত জাতীয়তাবাদী অফিসারবৃন্দ এ মৃত নায়কদের এক জায়গায় কবর দেওয়ার
সুযোগটুকু পর্যন্ত দিতে অঙ্গীকার করে। সে কারণে আমি আমার লেখা এ বইটির প্রথম
অংশ তাদের শৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম; যাতে সেসব শহীদ শৃতির চিরায়ত শক্তি
আমাদের সংগ্রামী সৈনিকদের আলো দেখাতে পারে।

ত্যাগলুক হিটলার
দি ফোর্টেন্
লেখ নদীর তীর, ল্যাভস্বার্গ
১৬ অক্টোবর, ১৯২৪ সাল।

Europe showing extent of German Occupation by December 1941

Neutral Countries SPAIN

Limit of German advance
December 1941

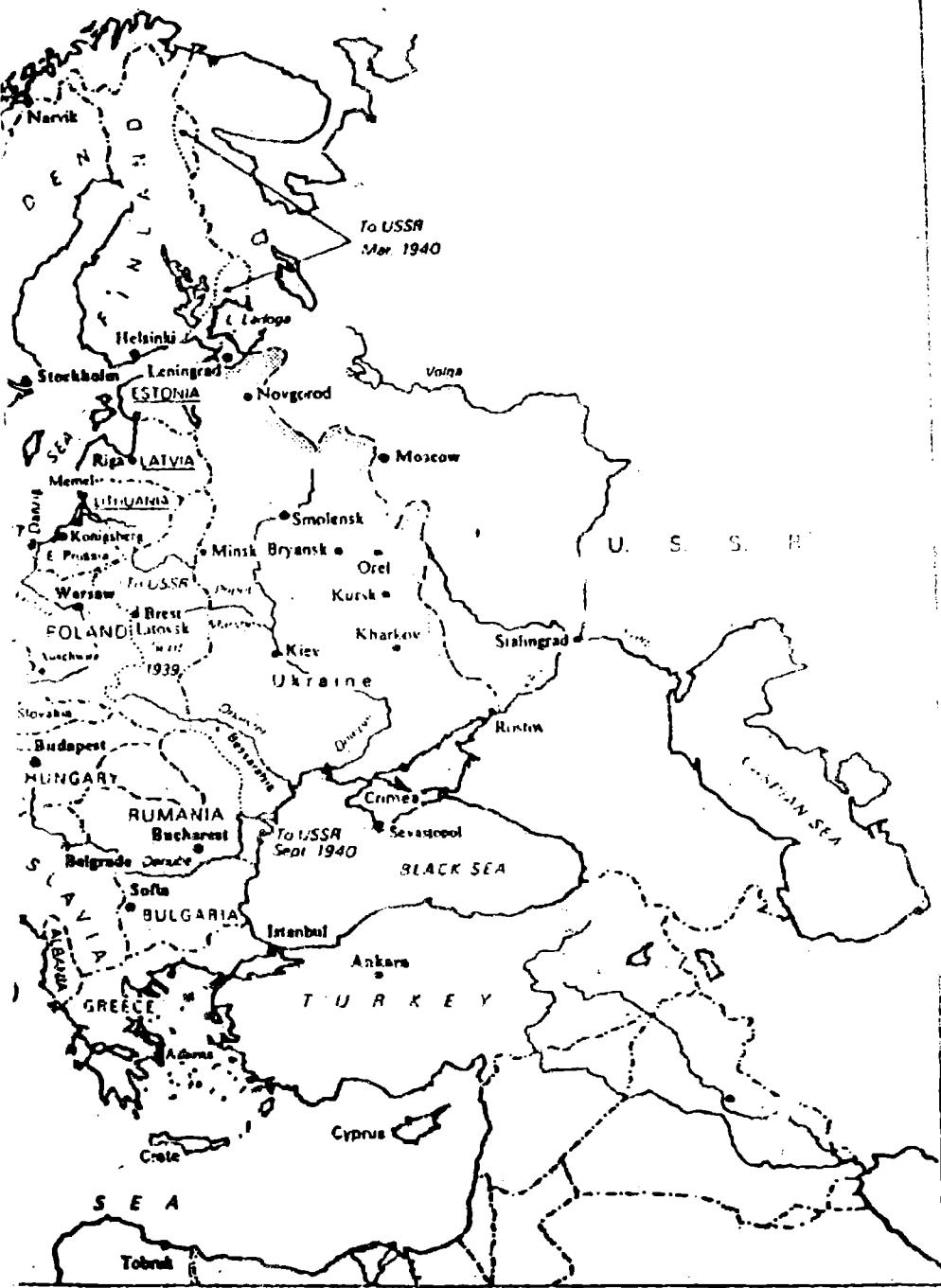
To USSR Sept. 1940 ESTONIA

0 200 400 miles
0 300 600 km



ATLANTIC OCEAN





ଲେଖକେର କଥା

୧୯୨୪ ସାଲେର ୧ ଏପ୍ରିଲ, ହିଉନିକ ଗଣ-ଆଦାଲତର ବିଚାରେ ଲେଖ ନଦୀର ତୀରେ ଲ୍ୟାନ୍ଡସ୍‌ବାର୍ଗେର ଦୁର୍ଗେ ଆମାର କାରାବାସେର ଦିମଶ୍ଲୋ ଶୁରୁ ହୁଏ ।

ଗତ କହେକ ବହରେ ଅବିଶ୍ଵାସ ପରିଶ୍ରମେର ପର ଏକଟା କାଜ କରାର ଯତ ସମୟ ଏ ପ୍ରଥମ ଆମାର ଭାଗ୍ୟ ଜୋଟି; ଅନେକେଇ ଆଗେ ଆମାକେ ଅନୁରୋଧ କରେଛେ ଏବଂ ଆମି ନିଜେଓ ଜେବେହି ଯେ ଆମାଦେର ସଂଘାମେର ପକ୍ଷେ ଏଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ୍ୟବାନ । ସୁତରାଂ ଏ ଭେବେଇ ଆମି ଏ ବହିଟା ଶେଷ୍ଠା ଶୁରୁ କରି, ଯାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମଟାକେଇ ଏଗିଯେ ନିଯେ ଯାଓଯା ନନ୍ଦ, ତାକେ ଉନ୍ନତ କରାଓ । ତାହିଁ ଏ ବହି ଥେକେ ଏହନ ଅନେକ କିଛୁ ଶେଷ୍ଠାର ଆଛେ ଯା ତୃକାଳୀନ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ଲେଖା ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥେକେ ପାଓଯା ସମ୍ଭବ ନନ୍ଦ ।

ଆମି କିଭାବେ ଉନ୍ନତିର ଶୋପାନ ବେଯେ ଓପରେ ଉଠେଛି, ଏ ବହିଯେର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦିତୀୟ ଅଂଶେ ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛି : ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନନ୍ଦ; ଆମାର ମ୍ପର୍କେ ଇହନୀ ସାଂବାଦିକରା ଯେ କଞ୍ଚିତ ଅପଗ୍ରହାର କରେଛେ, ସେଟୋ ଧର୍ମ କରାର ସୁଯୋଗେ ଏ ବହିଯେ ମାଧ୍ୟମେଇ ଆମି ପୋଯେଛି ।

ଏ ବହି ଆମାକେ ଦୂରେ ସରିଯେ ରାଖିବେ ନା, ବରଂ ସଂଘାମ ଯାଦେର ଜ୍ଞାନ୍ୟେର ଦାବି ତାଦେର କାହାକାହି ଆମାକେ ପୌଛେ ଦେବେ, ତାଦେର ଜ୍ଞାନ ବାଡ଼ାତେ ସାହାଯ୍ୟ କରାନ୍ତେ । ଆମି ଜାନି ଯତ ଲୋକକେ ମୁଖେର କଥାଯ କାଜ କରାନ୍ତେ ଯାଏ, ଲେଖାର ଦ୍ୱାରା ତା ସମ୍ଭବ ନନ୍ଦ । ପ୍ରତିଟି ସଂ ଏବଂ ମହା ସଂଘାମ ପୃଥିବୀତେ ଯା ସଂଗ୍ରହିତ ହେଯେଛେ, ତା ଜନ୍ମ ନିଯେଛେ ମହା ବକ୍ତାର ବକ୍ତ୍ତା ଥେକେ, କୋନ ବଡ଼ ଲେଖକେର ଲେଖା ଥେକେ ନନ୍ଦ ।

ଯାହୋକ, ଭଣିତାର ବିରକ୍ତେ ସଂଘାମେର ଦୃଢ଼ ହାତିଯାର ହିସେବେଓ ଲେଖାଟା ପ୍ରୟୋଜନ । ସୁତରାଂ ଏ ବହିଟି ତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରତର ।

ତ୍ୟାତମକ ହିଟିଲାର
ଦି ଫୋଟେସ୍
ଲ୍ୟାନ୍ଡସ୍‌ବାର୍ଗ ଲେଖ ନଦୀର ତୀରେ

ପୁନାର୍ ଅତୀତ ମୀ ବାବାର ମୁଲ୍ଲ

ଇନ୍ ନଦୀର ତୀରେ କ୍ରନ୍ତୀ ଶାମେ ଜନୋଛିଲାମ ବଲେ ଆଜ ନିଜକେ ତାଗ୍ୟବାନ ବଲେ ମନେ କରି । କ୍ରନ୍ତୀ ଛୋଟ ଗଞ୍ଜଶହ୍ର; ସାଦାମାଠା ହଲେଓ ଜାଯଗା ହିସେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଠିକ ଦୁଟୋ ପ୍ରଦେଶେର ମାଝେ । ଏ ଦୁଇ ପ୍ରଦେଶର ଏକାତ୍ମିକରଣେର ଜନ୍ୟ ଯେ କୋନ ଉପାଯେଇ ଆମାଦେର ସାରାଟା ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରା ଉଚିତ ।

ଜାର୍ମାନ ଏବଂ ଅନ୍ତିଯାକେ ଏକଇ ପତାକାତଳେ ନିଯେ ଆସନ୍ତେ ହବେ । ହ୍ୟା, ତା ଛଲେ-ବଲେ ଅଥବା ଯେ କୋନ ରକମେର କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ । ଯଦିଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିକ୍ ଥେକେ ବିଚାର କରଲେ ଅନ୍ତିଯାକେ ଜାର୍ମାନିର ପତାକାତଳେ ନା ଆନାଟାଇ ଉଚିତ । ହୟତେ ବା ଚରମ ବୋକାଯି । କାରଣ ସେଦିକ ଥେକେ ଉଭୟେଇ ଚରମ ଅସ୍ଵିଧାୟ ପଡ଼ିବେ । ତବୁ ଏକତ୍ରିକରଣ କରା ଚାହିଁ, ଯେ କୋନ ମୂଲ୍ୟେ; ଏବଂ ଉପାୟେ । ଦୁଦେଶେର ଲୋକେର ଧରନୀତେ ସଖନ ଏକଇ ରଙ୍ଗ ପ୍ରବାହିତ, ତଥବ ତାଦେର ସବାଇକେ ଏନେ ଜାର୍ମାନିର ପତାକାତଳେ ଦାଢ଼ କରାତେ ହବେ । ନିଜେଦେର ସନ୍ତାନେରା ଯଦି ଏକଠେ ପାଶାପାଶି ଦାଢ଼ାତେଇ ନା ପାରେ ତବେ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୟେର ଚିଞ୍ଚାଟା ନିହିକ ବାତୁଲତା । ସଖନ ଜାର୍ମାନରା ନିଜେଦେର ରାଷ୍ଟ୍ରେର ଫସଲେ ନିଜେଦେର ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତେ ପାରବେ ନା, ତଥନେଇ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରେର ଦିକ୍ ହାତ ବାଡ଼ାନୋ ଉଚିତ । ଅବଶ୍ୟ ଲାଙ୍ଗଲଟାକେ ଉଲ୍ଲୋ କରେ ତଥବ ତରବାରୀ ହିସେବେ ତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ ହବେ । ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ସ୍ଵଜନ ହାରାନୋର ଚୋଖେର ଜଳେ ଉତ୍ସରକାଳେର ଜାର୍ମାନଦେର ଜନ୍ୟ ସୃଦ୍ଧି କରବେ ଦୈନିନ୍ଦନ ବେଁଚେ ଥାକର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ରସଦ— ଝୁଟି ।

ସୁତରାଂ କ୍ରନ୍ତୀ ଛୋଟ ଗଞ୍ଜ ଶହ୍ର ହଲେଓ ଆମାର କାହେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନେକ ବେଶି । ତାହାଡ଼ା ଓହି ଗଞ୍ଜଶହ୍ରଟାର ଐତିହାସିକ ଏକଟା ମୂଲ୍ୟ ଆହେ । ସଖନ ଆମାର ପିତୃଭୂମି ଜାର୍ମାନି ବିଦେଶୀଦେର ହାତେ ଲାଭିତ, ଚରମ ଅବମାନନ୍ୟ ନିଯମିତ୍ତ, ତଥବ ସେଇ ଦୂର୍ଘୋଗେର ଦିନେ ଜୋହାନସ୍ ପାମ, ଏକଜନ ବୈ ବିକ୍ରେତା ଦେଶପ୍ରେମିକକେ ଏ କ୍ରନ୍ତୀଯେର ମାଟିତେ ବୃକ୍ଷମ୍ବତାବେ ହତ୍ୟା କରା ହୟ । ତାର ଦୋଷ; ମେ ତାର ପିତୃଭୂମିକେ ଭାଲବେଶେଛିଲ । ତବୁ ମୃତ୍ୟୁର ମୁହଁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋହାନସ୍ ପାମ ତାର ସଙ୍ଗୀ ସାଥୀଦେର ନାମ ବରେଲିନ । ଫରାସୀଦେର ନିଟ୍ଟର ଅତ୍ୟାଚାର ସନ୍ତୋଷ । ଏଇ ଠିକ ଆଗେ ଏ ଏକଇ କାରଣେ ଫରାସୀରୀ ହତ୍ୟା କରେଛେ ଲିଓ ଶ୍ଲାପୋଟୋରକେ ।

[୧୯୭୨ ଥେକେ ୧୮୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାର୍ମାନି ଫରାସୀଦେର ପଦାନତ ଛିଲ । ୧୮୦୦ ଖ୍ରିସ୍ଟାବେ ହୋଯେନଲିଙ୍ଗେନେ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତିଯାକେ ପରାଜିତ କରେ ଫରାସୀରୀ ବ୍ୟାଭେରିଯା ପ୍ରଦେଶେର ରାଜ୍ୟଧାନୀ ମିଉନିକ ଶହ୍ର ଅଧିକାର କରେ । ୧୮୦୫ ସାଲେ ନେପୋଲିଯାନ ବ୍ୟାଭେରିଯାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିକେ ରାଜା କରେ ଏକଟା ସର୍ତ୍ତେ । ପ୍ରତିଟି ଯୁଦ୍ଧ ତିରିଶ ହାଜାର ସୈନ୍ୟ ଦିଯେ ଫରାସୀଦେର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ହବେ । ବ୍ୟାଭେରିଯାକେ ଏତାବେ ଫରାସୀରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଜା କରେ ଫେଲେ । ୧୮୦୬ ଖ୍ରିସ୍ଟାବେ ଏ ଘଟନାକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ଏକଟା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜନସାଧାରଣେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଚାର କରା ହୟ । ନାମ— ଚରମ ଅବମାନନ୍ୟ

জার্মানি। যারা এ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে সাহায্য করেছিল, নুরেমবার্গের পুন্তক বিক্রেতা জোহানস্ ফিলিপ তার মধ্যে অন্যতম। ব্যাডেরিয়ার পুলিশের এক গুপ্তচর ফরাসীদের থবথটা দেওয়ায় ফরাসীরা পামকে ঘেঁষার করে। বীভৎস অত্যাচার করেও জোহানসের কাছ থেকে বিজ্ঞপ্তির প্রকাশক এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের নাম জানতে না পেবে, লোক দেখানো বিচারের পর নেপোলিয়নের আদেশে ক্রুনাউয়ের মাটিতে শুলি করে তাকে হত্যা করা হয় ২৬ আগস্ট ১৮০৩ সালে। সেই জায়গাতে স্থাপিত জোহানসের ট্যাচুটা হিটলারকে খুব ছেলেবেলা থেকেই আকর্ষণ করত।

লিও শ্যাগেটারের ব্যাপারটাও অনেকটা জোহানস্ পামের মত। শ্যাগেটার দর্শতত্ত্বের ছাত্র হয়েও ১৯১৪ সালে যুক্তে যোগদান করে। গোলন্দাজ বাহিনীতে কাজ করে আয়রন ক্রুশ পেয়েছিল। ১৯২৩ সালে ফরাসীরা যখন ক্রুড় অঞ্চল আক্রমণ করে, তাদের প্রতিহত করার জন্য শ্যাগেটার বদ্ধপরিকর হয়। কয়েকজন বন্দুর সঙ্গে মিলে একটা বেল ব্রীজ উড়িয়ে দেয়; যাতে ফরাসীরা ক্রুড় অঞ্চল থেকে নিজের দেশে কয়লা সহজে না খিয়ে যেতে পারে। কিন্তু একজন জার্মান গুপ্তচর ফরাসীদের কানে পুরো ব্যাপারটা তুলে দেওয়ায় শ্যাগেটারকে ফরাসীরা ঘেঁষার করে। অনেক অত্যাচারেও শ্যাগেটার মুখ খোলে না। একটা সঙ্গীর নামও ওর মুখ থেকে বের করতে অক্ষম হওয়ায় ক্ষিণ হয়ে ওঠে ফরাসীরা। শ্যাগেটার প্রথম থেকেই পুরো দোষটা নিজের ঘাড়ে নিয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অবশ্য পবে ওর সঙ্গীসাথীরা ধরা পড়ে। বিচারে তাদের জেল হয়। ১৯২৩ সালের ২৬ মে শ্যাগেটারকে ফায়ারিং ক্ষোয়াড়ের সামনে এনে দাঁড়ি করানো হয়। এ সময়ে সভারিং জার্মানির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েও ব্যাপারটাতে হস্তক্ষেপ করতে অবিকার করে।

শ্যাগেটার ক্রুড় প্রতিরোধের প্রধানতম শহীদ আর ন্যাশানাল সোশ্যালিস্ট মুভমেন্টের অন্যতম নায়ক হিসেবে আল্পদিনের মধ্যেই খ্যাতিনাম করে। অল্প বয়স থেকেই শ্যাগেটার এর সদস্য ছিল। তার সদস্য নম্বর ছিল ৬১।

ইন্ন নদীর তীরের এ ছেটা গঞ্জশহর শহীদদের স্মৃতিতে পবিত্র। গত শতাব্দীর শেষের দিকে, আমার বাবা-মা এখানেই বসবাস করতে আসেন। বাবা পুরো দস্তুর সরকারি কর্মচারী ছিলেন। এবং তার কর্তব্যকর্ম পালনে এতটুকুও শৈখিল্য ছিল না। মা প্রাণপণে আগলে রাখতেন সংসারটাকে। ছেলেমেয়েদের সব সময় মেহমতায় ধিরে রাখতেন। কিন্তু ক্রুনাউয়ের স্মৃতি আমার মনের আয়নায় তত উজ্জ্বল নয়। কারণ কয়েক বছর পরেই বাবাকে সেই ইন্ন নদীর তীরের গঞ্জশহর ছাড়তে হয়। ইন্ন উপত্যকার আরো নিচের দিকের শহর পাসুন্তে নতুন কর্মভার নিয়ে বাবা চলে আসেন। পাসু পুরোপুরি জার্মানির মধ্যে।

তৎকালৈ অস্ত্রিয়ার সরকারি কর্মচারীদের চাকরিতে ঘনঘন বদলি করা হত। অর্থাৎ যায়াবরের মত আজ এখানে কাল সেখানে। কিন্তুদিন পরেই বাবাকে বদলী করা হয় পাসু থেকে লিনহসে। এখানেই বাবা সরকারি কর্ম থেকে অবসর নেন। পেনসনের কটা টাকার ওপর ভরসা করে জীবন পার করতে হবে। অর্থাৎ, বৃদ্ধ হলেও পরিশ্রমের হাত থেকে বেহাই নেই।

আমার বাবা ছিলেন খুবই গরীব ঘরের ছেলে। ঠাকুরদার সম্পত্তি বলতে একমাত্র ছেটা কুঠির। দায়িত্বাত্মক বোধহয় বাবাকে জন্ম থেকে চঙ্গল করে তুলেছিল। মাত্র তের বছর বয়সে একটা থলে কাঁধে ঝুলিয়ে তাই বাবা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন ভিয়েনার

উদ্দেশ্যে। তিনটে মাত্রগালডেন পকেটে সহল। সতেরো বছর বয়সে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে বাবা কারিগর হন। কিন্তু ততদিনে জলমলে শহর ভিয়েনা বাবার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়েছে। ছোটবেলায় যার একমাত্র স্বপ্ন ছিল ঘামের গীর্জার ফাদার হওয়ার, সেই সব স্বপ্ন ততদিন মুছে গেছে। কারিগর হয়ে জীবনধারণের যে গ্রানি, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাবা শুরু করেন অবিবাধ পরিশ্রম। সরকারি চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা যে করেই হোক অর্জন করতে হবে। তেইশ বছর বয়সে বাবা সেই যোগ্যতা অর্জন করে নিজের গ্রামে ফিরে আসেন। দেহমনের সমস্ত শক্তি দিয়েও বাবা নিজের জীবনের প্রতিজ্ঞা এভাবে পূরণ করেছিলেন।

জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করলেও গ্রামে বাবা তখন তো সম্পূর্ণ অপরিচিত। অতটুকু বয়সে গ্রাম তাগ করে চলে যাওয়াতে গ্রামের কেউই আর বাবাকে শ্রবণে রাখেনি; নিজের গ্রামেই বাবা যেন প্রবাসী ছিলেন।

অবশ্যে পাঁয়মতি বছর বয়সে বাবা চাকরি থেকে অবসর নেন। কিন্তু এখন কি করবেন? জীবনে একটা দিনও তার কুঁড়েমিতে কাটেনি। সত্যি বলতে কি আলস্য শব্দটাই বাবার অতিধানে ছিল না। সুতরাং অনেক চিন্তা ভাবনার পর আপার অন্তিয়ার ছোট বাণিজ্য শহর লামবাখের শহরতলীতে বাবা পুরনো একটা ফার্ম কিনে চাষবাস শুরু করেন। অর্থাৎ এত বছর বিভিন্ন ঘাটে ঘুরে শেষমেষ পিতামহের পেশাকে বেছে নেন।

ঠিক এ সময়েই আমার জীবনের কিছুটা মোড় ঘোরে। লামবাখের উদার প্রান্তের, বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে হেঁটে ক্লুলে যাওয়া। কয়েকটা বেপরোয়া ছেলের সঙ্গেও এ সময় বন্ধুত্ব হয়। অবশ্য সেই কারণে যা কিছুটা উদ্বিগ্ন হিলেন। ছুটি কাটানো সম্পর্কে আমি ব্যাবরাই উদাসীন। অর্থাৎ সংসারের আরো দশটা ছেলের মত নিরুপদ্রবে ছুটি কাটানো আমার ধাতে, ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে তাই নিয়ে জোর বিতর্ক লেগেই থাকত, যেটা ভবিষ্যতে আমার বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাসে পরিণত করে। লামবাখে থাকাকালীন আমার আরেকটা অভ্যাস গড়ে ওঠে। নিয়মিত সেখানকার গির্জায় গিয়ে ধর্মীয় সঙ্গীত অথবা আলোচনায় অংশ নিয়ে দেখেছিলাম কী করে মানুষের অনুচ্ছিতশীল মনটাকে অনুভূতির চরমে নিয়ে যেতে হয়। অবশ্যই বাবার নিজের জীবনেও ছোটবেলায় আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজের গ্রামের চার্চের ফাদার হওয়ার। আমার জীবনে আমিও সেটাকেই জীবনের স্বচচেয়ে কাম্য বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু বাবা কিছুতেই তাতে সায় দেননি। অর্থাৎ আমার ছেলেমানুষী কল্পনাকে বাবা কোনরকম আমল দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমার জীবনের সংঘাত বোধহয় এ অধ্যায়েই শুরু হয়।

বাবার বইপত্রগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে কয়েকটা বইয়ের বিজ্ঞাপন আমার নজরে আসে। সেই বইগুলো সবই মিলিটারী বিষয় সংক্রান্ত। বিশেষ করে একটা বই তো আমাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে। বইটি জনপ্রিয় ফ্র্যাংকো-জার্মান যুদ্ধের ইতিহাস ১৮৭০-৭১। দুটো পর্বে লেখা বইটি। চিত্রিত। যুদ্ধের তথ্যপঞ্জীতে ঠাসা। এ বইটি পড়তে আমি স্বচচেয়ে বেশি আনন্দ পেতাম। আর এ বইটি পড়েই কতগুলো প্রশ্ন আমার মনে জেগে ওঠে। মনের ভেতরে প্রচণ্ড আলোড়ন এনে দেয়। যুদ্ধ সংক্রান্ত যা কিছু পেতাম, সেই বয়স থেকেই তা গোঢ়াসে গিলতে শুরু করি। কিন্তু যুদ্ধ বিষয়ক এত বই পড়া সন্ত্রেও ফ্র্যাংকো-জার্মান বইটিই আমাকে বেশি ভাবিয়ে তোলে। তার মানে যে সব জার্মান সেই ১৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল আর যারা অংশ নেয়নি, উভয়পক্ষই জার্মান হওয়া সন্ত্রেও কি তাদের মধ্যে কিছু ফারাক ছিল? আর যদি না থাকে তবে কেন তারা একই পতাকার নিচে এসে

জমায়েত হল না। অন্তিম-ই বা কেন সেই যুদ্ধে অংশ নিল না? আমার বাবাও সে যুদ্ধে যায়নি। তা হলে কি আমরা, আর অন্যান্য জার্মান যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তারা এক নয়? এসব সূচীমুখ জিজ্ঞাসাগুলো আমার ছোট মস্তিষ্কটাকে চপ্পল করে তুলল। অনেককে জিজ্ঞাসা করে বুবলাম যে সব জার্মান সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়নি, তারা বিসমার্কের সম্ভাজ্যের মধ্যে বাস করত না। অবশ্য তবু বিষয়টা ঠিক আমার স্পষ্ট হল না।

আমার ধাত দেখে বিশেষ করে মর্জিং বুকে বাবা ঠিক করলেন পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করে আমার জীবনে কিছু হবে না। আর সেই কারণেই হ্যত বা জিমনসিয়াম স্কুলে আমার বৃদ্ধিবৃত্তির সঠিক বিকাশ হচ্ছে না। বরং পেশাগত স্কুলই আমার পক্ষে সঠিক। বিশেষ করে ড্রাইংয়ের প্রতি আমার ছোটবেল। থেকে ঘোক বাবাকে তার মনস্তির করতে সাহায্য করে। অন্তিমান জিমনসিয়াম স্কুলে ড্রাইংটাকে বিশেষভাবে অবহেলা করা হয়। উপরন্তু নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা দেখেছিলেন পরবর্তী জীবনে এ পুঁথিগত বিদ্যা কোন কাজেই আসে না। সুতরাং তার কাছে স্বত্বাত্তহ এ বিদ্যার কোন দামও ছিল না। অবচেতন মনে বাবা হয়তো বা আমাকে সরকারি কর্মচারী হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন বলা বোধহয় ভুল হবে, বাবা একরকম মনস্তির করেই ফেলেছিলেন যে আমাকে যে করে হোক সরকারি কর্মচারী করবেন। আসলে যে দুঃখ কট্টের মধ্যে নিয়ে তিনি নিজেকে সরকারি চাকরির যোগ্য করে তুলেছিলেন, সেটাই বাবাকে আরও বেশি প্রত্যয় এনে দিয়েছিল যে ছেলে নিশ্চয়ই তার পথে চলবে। বরং সরকারি চাকরিতে তার থেকেও একধাপ ওপরে উঠবে।

কিন্তু বাবা স্বপ্নেও তাবৎে পারেননি যে তার প্রস্তাব আমি অগ্রহ্য করব। আসলে বাবা যেটাকে জীবনের সবকিছু প্রাণী বলে ধরে নিয়েছিলেন, আমার কাছে সেটা কিছু নাও তো হতে পারে। বাবার চিত্তাধাৰা সহজ সরল এবং স্বচ্ছ। আসলে বেঁচে থাকার জন্য যে নির্দারণ সংগ্রাম বাবাকে করতে হয়েছে, সেটাই তাকে ডিক্টেটর করে তুলেছিল। সুতরাং তার মতামতের কাছে জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এ বয়সের ছেলের মতামতের কতটুকুই বা মূল্য থাকতে পারে। বিশেষ করে আগামী ভবিষ্যতের পথ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে।

কিন্তু তবু তিনি পারলেন না। আমারও তখন জেন চেপে গেছে। এগারো বছর বয়সে জীবনে সেই প্রথম বাবার মতামতকে অগ্রহ্য করলাম। তয় অথবা সেই কিছুই আমাকে আমার সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারে না। বাবার তুলে ধরা রঙিন ছবি আকর্ষণ করা দূরে থাক, আমাকে আরও বেশি বিদ্রোহী করে তোলে। সারাজীবন টুলে বসে দরবার সাজিয়ে আলমারীতে তুলে রাখা আর যার দ্বারা হোক আমার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়।

সহজেই অনুমেয় চলতি পথে ভাল ছেলে বলতে যা বোঝায় আমি তা ছিলাম না। সুতরাং কী ধরনের চিন্তার মেঘ আমার মনের আকাশে আনাগোনা করতে পারে! স্কুলের দেওয়া 'ঢাণোনা' অতি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে আমার হাতে প্রচুর সময় থাকত। যেগুলো আমি চার দেওয়ালে বন্ধি না থেকে উদার প্রান্তরের খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়িয়ে বে-হিসেবী খরচা করতাম। আজ যখন রাজনৈতিক বিক্রিদ্বিবাদীর দল আমার ব্যক্তিগত জীবনে উকি-বুকি দিয়ে প্রশংসন করতে চেষ্টা করে যে আমার ছেলেবেলা কত রকমের চালাকির মধ্যে দিয়ে কেটেছে, আমার তখন হাসি পায়। সত্যি বলতে কি আমার ছোটবেলার সুখসূতি আজও আমাকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দেয়। বর্তমানের জটিল জগত থেকে সেন্দিনের কথা ভেবে মুহূর্তের জন্য হলেও যেন মুক্তি পাই।

পেশাগত স্কুলে ভর্তি হয়েও আমার দিনগুলোর পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু আরেক ধরনের দ্বন্দ্ব এসে মনটাকে জড়ে বসে।

যতদিন বাবা আমাকে সরকারি কর্মচারী করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, ততদিন পর্যন্ত মনের দিক থেকে দ্বন্দ্ব সোজা ছিল। অতুত আমার দিক থেকে সরকারি চাকরি করব না—এ প্রতিজ্ঞাটাই এদিক থেকে মনের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যখন স্থির করলাম যে আমি কী করতে চাই, তখনই চৰম মাননিক দ্বন্দ্ব ভূগতে শুরু করি। বিশেষ করে বাবার কাছে তা উপস্থিত করতে। তখন আমার বয়স বারো। কি করে বলতে পারব না, তবে সেই বয়সেই মনস্তির করে ফেলেছি যে আমাকে শিল্পী হতেই হবে। হতে পারে ড্রাইংয়ে আমার হাত পাকা ছিল বলেই ভেবেছিলাম শিল্পী হওয়াই আমার পক্ষে উপযুক্ত কাজ। কিন্তু বাবাকে বলি কি করে? যাহোক মনের দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে নিয়ে বাবার কাছে গিয়ে দাঢ়ালাম। বললাম সব। আমি শিল্পী হতে চাই।

—তুমি শিল্পী হতে চাও? মানে? বাবা বিষয়ে বিমৃঢ়।

বাবার তখন পর্যন্ত দৃঢ় সন্দেহ যে সত্যি আমি প্রকৃতিহৃত কিনা। বাবা তখনো ভাবছেন—আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেননি অথবা তুল শুনছেন। কিন্তু আমি যখন পুরো ব্যাপারটা বিস্তারিত খুলে বললাম, বাবা প্রথমে গভীর হয়ে গেলেন। তারপর তাঁর চরিত্র অনুসারে পুরোপুরি অগ্রহ্য করলেন। বাবার সোজাসুজি মতামত, এ হতে পারে না। হওয়া সম্ভব নয়।

—না, আমি বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না।

শ্বাভাবিকভাবে পিতার চরিত্রে কিছুটা যেমন ছেলের চরিত্রে বর্তায়, তাই তার চারিপিংক দৃঢ়তা জন্ম থেকে আমিও কিছুটা পেয়েছিলাম। আমিও প্রত্যয়ের সঙ্গে বাবার কথার প্রতিবাদ করি,—আমাকে যেমন করে হোক শিল্পী হতেই হবে।

সুতরাং পরিস্থিতিটা বেশ ঘোরালো এবং জটিল হয়ে ওঠে। বৃক্ষ জন্মলোক আমার ওপরে প্রচণ্ড রেঁগে গেলেও আমি বাবাকে ভালবাসতাম। বাবা আমাকে শিল্পী হতে যত বাধা দিতে লাগলেন, আমিও মনস্তির করলাম যে এছাড়া অন্য কোনরকম পড়াশোনা করব না। শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা স্বীকৃতিমত টানাপেড়ানের হয়ে ওঠে। আমি সীরাবে আমার পথ বেছে নিয়ে ঠিক করি যে পেশাগত স্কুলের পড়াশোনায় একেবারে মন দেব না। তাহলেই বাবাকে বাধ্য হয়ে আমার মতে মত দিতে হবে।

অবশ্য জানি না অংক ঠিক ছিল কিনা। কিন্তু আমার স্কুলের অঘনোযোগিতা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আসলে স্কুলে যে বিষয়ে আমার আকর্ষণ ছিল, অথবা ভাবতাম ভবিষ্যতে শিল্পী হতে গেলে কাজে লাগবে— সেটাই শুধু মন দিতাম। আর বাকিশুলো স্বেচ্ছ বাদ। সুতরাং স্কুলের ফলাফলও সেই ধরনের হল। একটা বিষয়ে হয়ত বা বুর ভাল নম্বর পেলাম, আরেকটাতে আবার সাধারণ মানের চেয়েও নিচে। বিশেষ করে ভুগোল আর ইতিহাসে আকর্ষণ আমার বরাবরের।

এত বছর পরেও পেছনে ফিরে তাকালে দুটো জিনিস বুঝতে পারি। প্রথমত সেই বয়সেই আমি প্রচণ্ড রকমের জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠি; দ্বিতীয়ত তখনই ইতিহাসের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হই।

পুরনো অন্তিমার অধিবাসীরা তখন মিশ্রিত জ্ঞান। বিশেষ করে ফ্রাংকো-জার্মান যুদ্ধের বিজয়ী জার্মানরা যুক্তে অংশগ্রহণ না-কারী জার্মানদের হেয় নজরে দেখত। তাবত যুদ্ধ করার

উপযুক্ত ওরা নয়। আর সেই কারণেই সীমান্তের অপর পারের জার্মানদের সঙ্গে জার্মানির অব্যতীর্ণ জার্মানরা কোনরকম যোগাযোগ রাখত না।

জার্মান রাষ্ট্রের জার্মানরা একবার ভেবেও দেখেন যে অস্ত্রিয়ার জার্মানরা যদি নিজেদের সত্ত্বিকারের জার্মান বলে না ভাবত তবে কখনই বাহান্ন মিলিয়ান জার্মান 'আমরা' বলতে পারতাম না। ব্যাপারটা এতাই স্পষ্ট যে অনেক জার্মান নাগরিক জার্মান রাষ্ট্রের ভেতরে থেকেও অস্ত্রিয়াকে জার্মানির একটা অংশ বলে ভাবত। যাহোক, পূর্ব সীমান্ত অর্থাৎ জার্মান অস্ত্রিয়ার দশ মিলিয়ান অধিবাসী নিজেদের জার্মান বলেই মনে পাণে জানত। জার্মানির অভ্যন্তরের বুব অল্প জার্মানই জানত কত কষ্টে এ দশ মিলিয়ান জার্মান তাদের নিজের জার্মান ভাষা, সংস্কৃতি, স্কুল ইত্যাদিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আজকে যখন জার্মান জাতির একটা বিবাট অংশ বিদেশী শাসকের পদান্ত হয়ে মাত্তভাষার অধিকারের জন্য মরণপণ যুদ্ধ করে চলেছে, শুধু তখনই জার্মানির ভেতরকার জার্মানরা উপলব্ধি করেছে যে সত্ত্বিকারের সংস্কৃতির জন্য, নিজেদের ভাষা রক্ষার জন্য, অস্ত্রিয়ার জার্মানরা কতখানি বন্ধপরিকর। আর বর্তমানে হয়ত তারা এ-ও বুবাতে পারছে বিদেশী পদান্ত হয়ে নিজেদের সংস্কৃতি এবং মাত্তভাষাকে বাঁচিয়ে রাখা কতখানি কষ্টকর।

সব জায়গায় এসব ব্যাপারে যা হয়ে থাকে অস্ত্রিয়তে তার ব্যতিক্রম হবে কেন। এ মাত্তভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে তিনটি দল, পুরোপুরি সক্রিয়,—একদল যারা মাত্তভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে, এগিয়ে নিয়ে যেতে, জীবনপণ করেছে; আরেকদল যারা সুবিধেবাদী; আর তৃতীয় দল হল বিশ্বাসঘাতক জুড়াস। বিশেষ করে স্কুলগুলোকে কেন্দ্র করেই ব্যাপারটা চরমে ওঠে। আসলে আজকের চারাগাছগুলোই তো সব ভবিষ্যতের মহীরহ। তাদের অপরিগত মন্তিকে যেন তেন প্রকারে জিনিসটা গেঁথে দিতে হবে। তাহলেই কেন্দ্র ফতে। সুতরাং স্কুলে স্কুলে জার্মান শিশুদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেওয়া শুরু হয়ে যায়,— জার্মান ছেলেরা তুলে যেও না যে তোমাদের ধর্মনীতে জার্মান রক্ত প্রবাহিত। জার্মান মেয়েরা ভুলে যেন না যায় ভবিষ্যতে জার্মান স্তনান তোমরা গর্তে ধারণ করবে, —ইত্যাদি।

সমস্ত ব্যাপারটাটে আচর্যজনক ফল পাওয়া যায়। জার্মান ছেলেরা অজার্মান গান গাইতে আপত্তি করে, নিষিদ্ধ জার্মান রাজের ছাপ মারা পোশাক পরতে শুরু করে দেয়। অজার্মান শিক্ষকদের কাছে পড়া পর্যন্ত বক্ত হয়ে যায়। এমন কি জল-খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে পর্যন্ত বড়দের হাতে তুলে দেয় যাতে এ সংগ্রামকে আরো বেশি জোরদার করা যায়, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এর জন্য যে কোন রকম দৈহিক শান্তি ওরা হাসিমুখেই বরণ করে নিত। এভাবে সেই যুদ্ধে অতি অল্প বয়সে আমি জড়িয়ে পড়লাম। সাউথ ফ্রন্টিয়ার লীগ অথবা স্কুল লীগের জামায়েতে আমরা গমের শিষ ছাপ মারা কালো-লাল-সোনালী রঙের জামা পরে দলে। প্রতি আমাদের বিশ্বততা দেখাতাম। আমরা পরম্পরাকে অভ্যর্থনা করতাম 'হাইল' শব্দটা উচ্চারণ করে। অস্ত্রিয়ার জাতীয় সঙ্গীতের বদলে এসব জমায়েতে আমরা জার্মান জাতীয় সঙ্গীত, ডয়েচল্যান্ড ইবার আলেয় অর্থাৎ সবার ওপরে জার্মানি— গাইতাম। এ সবের জন্য কোনরকম শান্তি বা জরিমানা আমরা গায়েই মাখতাম না। যে সময়ে একদল শিশু জাতীয়তাবাদী মন্ত্রী বীতিমত দীক্ষিত ও উৎসর্গীকৃত তখন অস্ত্রিয়ার লোকেরা নিজেদের ভাষা ছাড়া জাতীয়তাবোধ বলতে আর কিছুই বুবাত না।

এসব ঘটনাগুলো আমাকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে জাতীয়তাবাদীর দিকে টেনে নিয়ে যায়। তখন আমার দয়া পনেরো বছর। কিন্তু এ ধরনের কাজে আমার সেই সময়েই রীতিমত উৎসাহ। জীবনের দ্বাদশ দিনে গেছি। যারা সেই সময়ের পৃথিবীর ব্যবর জানে না অথবা হাবস্বুর্গ শাসক সশ্রদ্ধার স্পর্শকে অঙ্গ, তাদের পক্ষে ব্যাপারটা বোঝা সম্ভব নয়।

ইতিহাসের মধ্যে দিখ ইতিহাসটাই বিশেষভাবে অন্তিমার স্কুলে পড়ানো হত। অন্তিমার নিজস্ব ইতিহাস বুঝই সহজেন্ত; সত্যি বলতে কি অন্তিমার ভাগ্য জার্মানির উন্নতি বা অস্তিত্বের সঙ্গে একসূত্রে দাপ্ত ছিল। শুভদ্বাং অন্তিমার নিজস্ব ইতিহাস বলতে প্রায় কিছুই ছিল না।

আগেকার সমাপ্তের (যখন) দ্বিতীয় ফ্রাঙ্কিস পরিত্র রোমান সাম্রাজ্যের জার্মান অধীন্তর কাপে নেপোলিয়নের আদেশে নির্বাচিত হন, তখন তাঁর মুকুট এবং রাজদণ্ড রাজার প্রতিভূ স্বরূপ ভিয়েনায় রাখিত হয়। এ জিনিসগুলো জাতীয়তাবাদী জার্মানদের উন্মুক্ত করতে ঠিক ম্যাজিকের মত দাঙ করেছিল।

১৯১৮ সালে হাবস্বুর্গ সম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে অন্তিমার জার্মানরা অনেক চেষ্টা করে ফাদারল্যান্ড অর্থাৎ পিতৃভূমি জার্মানির সঙ্গে মিলিত হওয়ার। সেই লক্ষ লক্ষ অন্তিমার জার্মানদের নিজের পিতৃভূমিতে ফেরার জন্য যে আকুল ক্রস্ফন উঠেছিল, একমাত্র ইতিহাসের বুকে কান পেতে শোনা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। কেউ বুবাতেও পারবে না। সেইসময় অন্তিমার প্রতিটি জার্মান কী চৰম হতাশার মধ্যে দিয়ে নিজেদের দিনগুলো পাঢ়ি দিয়েছে: সে গভীর ক্ষতির দাগ এখনো পর্যন্ত অন্তিমার জার্মানদের মন থেকে মুছে যায়নি।

স্কুলে বিশ্ব ইতিহাস যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হত, তা মোটেই উপযুক্ত নয়। মুষ্টিমেয় শিক্ষকই উপলক্ষ্য করতে পারত, শুকনো কঠা দিন, তারিখ আর পঞ্জীর মধ্যে আবদ্ধ যে ইতিহাস, সেটা জাতির ইতিহাস নয়! কবে কোথায় যুদ্ধ হয়েছে, কোন্ মার্শাল কত তারিখে মারা গেছে, অথবা কোন দিনে কার মাথার কোথার রাজমুকুট চড়েছে, এসব খবরাখবর একটা জাতির ইতিহাসে কতটুকু মূল্য?

ইতিহাসের অর্থ হল কোন বিশেষ ঘটনা কেন এবং কিভাবে একটা জাতির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে ছিল সেইটাকে জানা। আর ইতিহাস পড়া উচিত— বিশেষ দরকারী জিনিসটাকে মনে রাখা, অদরকারী বিষয়টা ভুলে যাওয়া।

সম্ভব এ সময়েই আমার ভবিষ্যৎ আমি স্থির করে ফেলি। তার জন্য যার কাছে আমি সম্পূর্ণ ঝুণি তিনি হলেন আমার স্কুলের শিক্ষক, ডষ্টর লিওপোল্ড পোয়েটিস্। লিংজ্জ স্কুলের। যে গুণগুলো সমন্বয় ঘটলে সত্যিকারের ইতিহাসের শিক্ষক হওয়া যায়, তাঁর মধ্যে সেইগুলোর যেন শণিকাখন যোগ ঘটেছিল। বয়সে বৃদ্ধ, দেখলে বোঝার উপায় নেই যে এত দয়ালু হৃদয়ের মানুষ। চমৎকার বলার ক্ষমতা। কথার মধ্যে যেন হাজার বছর পেছনে আমাদের নিয়ে যেতেন। নিজের ভেতরকার উৎসাহটাকে ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করার অন্তুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। পঢ়াশোনার সময়ে বর্তমানকে ভুলিয়ে দিয়ে আমাদের নিয়ে যেতেন সুদূর এক ধূসর অতীতে। মন্ত্রের মত। সেই পুরনো দিনের ইতিহাসের ঘটনার মিছিল ওর বলার ভঙ্গিতে আমাদের চোখের সামনে ভেঙে উঠতো। তারা যেন কথা বলত। আমাদের সঙ্গে নিয়েই তিনি সেই ইতিহাসের রাজ্য বিচরণ করতেন। ইতিহাসের উপরাও ইতিহাস

থেকেই দিতেন। বর্তমান কোন ঘটনার সঙ্গে নয়। আমরা এমন তন্মুহ হয়ে যেতাম যে অনেকের পক্ষেই অক্ষ সংবরণ করা সম্ভব হত না। সত্যি বলতে কি ওর জন্যই বোধহয় ইতিহাস আমাকে এমন প্রচলিতভাবে আকর্ষণ করেছিল। ইতিহাসই আমাকে সেই বয়সে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। কেন করবে না? সেই বয়সেই বুদ্ধতে পেরেছিলাম হাবস্বুর্গের অতীত। নিজেদের স্বার্থের জন্য কিভাবে পুরো জার্মানিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। হাবস্বুর্গের শাসক সম্প্রদায় শুধু জার্মানদের দিয়ে নিজেদের স্বার্থই হাসিল করে নিয়েছে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি।

হাবস্বুর্গের অতীতের ইতিহাস আর আজকের মধ্যে এভুক্ত ও ফারাক নেই। সেই একই ধারায় শোষণের পুনরাবৃত্তি ডেক্ট লিওপোল্ড পোয়েটিস্ চোখে আঁতুল দিয়ে দেশিয়ে দেন। উত্তর ও দক্ষিণ থেকে বিদেশী রক্তের জীবগুলো, জার্মানদের নিয়ত কুরে কুরে থাচ্ছে। এমন কি ভিয়েনা পর্যন্ত অজার্মান শহর হয়ে উঠেছে। শাসক সম্প্রদায়ের প্রতিটি সুযোগ চেক্কদের প্রতি। বিশেষ করে এগুলোই অস্ত্রিয়ার অভ্যন্তরে চরম জার্মান জাগরণ টেনে আনে। আর্চ ডিউক ফ্রানজ ফার্দিনান্দ নিজের তৈরি গুলিতে নিজে প্রাণ হারায়। কারণ অস্ত্রিয়াকে পুরোপুরি শান্তদের সম্ভাজ্য করে গড়ে তুলতে তার চেষ্টার অন্ত ছিল না।

অস্ত্রিয়ার জার্মানদের এর জন্য একই রক্ত এবং অর্থ ক্ষয় করতে হয়েছিল এবং তা তারা করেছিল হাসি মুহেই। কিন্তু যখন দেখত হাবস্বুর্গ হিপোক্রাসিতে জার্মানির জার্মানরা ধরে বসে আছে যে অস্ত্রিয়া জার্মানিকে একটা প্রদেশযাত্রা, তখন অস্ত্রিয়ার জার্মানরা নিরাশ না হয়ে পারেন। অবশ্য এ নিরাশা তাদের প্রতিজ্ঞা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়নি। এবং হাবস্বুর্গ নামক সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রোহী করে তুলেছিল।

কিন্তু সবচেয়ে আচর্যের ব্যাপার, তখনকার জার্মান সম্ভাজ্যের শাসকেরা যেন ঢাক করে বসেছিল। পৃত গুরুময় মৃতের পাশে দাঁড়িয়ে স্টোকেই জীবত্তরণে কল্পনা করে আঘাতসাদ লাভ করেছিল। আর দুয়ের এ বঙ্গুত্ত্বের মাঝে বিশ্বমুক্তের বীজাণু উৎপন্ন ছিল। যার পরিণতি সত্যিকারের বিশ্বযুক্তে।

এবার সমস্যাটার বিস্তারে আসা যাক। ছোটবেলো থেকে যে ধারণা আমার মনের ভেতরে বক্রমূল হয়েছিল, দিনে দিনে স্টো আরো দৃঢ়ভাবে গাঁথতে থাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি কয়েকটা ধারণায় দৃঢ় হই। প্রথমত জার্মান সম্ভাজ্যের বুনিয়াদ শক্ত করতে হলে অস্ত্রিয়া সম্ভাজ্যের ধূংস আবশ্যক। নইলে জার্মান সম্ভাজ্যের ভিত্তি ভেঙ্গে পড়বে। দ্বিতীয়ত জাতীয়তাবাদী মানে রাজবংশীয়দের প্রতি আনুগত্য নয়। শেষে হাবস্বুর্গ প্রাসাদ জার্মানির ভাগ্যকাশে শনিধার বিশেষ। ইতিহাস পড়েই এ ধারণাগুলো আমার গড়ে উঠেছিল। কুল জীবনে ইতিহাসের প্রতি আমার যে আকর্ষণ জন্মেছিল, স্টো কোনদিনই আমাকে ছাড়েন। আর বিশ্ব ইতিহাস হল ঘটনাগুলোর তাৎপর্য বোঝার পক্ষে খনি বিশেষ। যার জন্য বাজনীতি আমাকে আর আলাদা করে পড়তে বা লিখতে হয়নি। বিশ্ব ইতিহাসই আমার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা এনে দিয়েছে। চলতি ভাষায় যাকে বলে অকাল পক্ষে বিদ্রোহী। সাহিত্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি ঠিক তাই ছিলাম। আপার অস্ত্রিয়ার শহরে ছোট একটা থিয়েটার হল ছিল। বারো বছর বয়সে প্রথম আমি থিয়েটার দেখতে যাই। স্টো ছিল উইলিয়াম টেল। জীবনে প্রথম দেখা থিয়েটার। কয়েক মাস পরেই দেখি আরেকটা অপেরা। লোহেন্টীন। জীবনে গুদিকটাকে তখনো পর্যন্ত আদান করিনি। অপেরাটি দেখে এত আনন্দ পেয়েছিলাম

যে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। পরবর্তী জীবনে যে শিল্পের বীজ আমার ভেতরে পরিণতি লাভ করেছিল, সেই বীজ সংগ্রহ করেছিলাম এ ছোট শহরের থিয়েটারের খেকে।

এন্ডলোই যেন আমাকে আমার ভবিতব্যের দিকে ঠেলে দেয় এবং বাবা তার ছেলের জন্য যে রঙিন ভবিষ্যত নিজের মনে এঁকে রেখে ছিলেন, তা থেকে আমাকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। অমে ক্রমে আমি যেন উপলক্ষ্য করতে পারি যে সঠিক পথেই আমি চলেছি। ততদিনে অর্কিটেকচার অর্থাৎ স্থাপত্য বিদ্যা বিষয়টাকে ভালবাসতে শুরু করেছি। শিল্পকর্মটা আরো বিস্তৃত পরিধি নিয়ে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। সুতরাং অন্য কিছু হওয়ার বাসনা তখন আর আমার মনের মধ্যে নেই।

আমার যথন তরো বছর বয়স, বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। যদিও সেই বয়সে তার স্বাস্থ্য রীতিমত সুগঠিত, তবু রক্তের একটু উচ্চচাপ, তাতেই সব শেষ। আমরা পিতৃহারা হলেও আমার দিক থেকে একটা লাভ হল। বাবা আমাকে ছকে আঁকা ভবিষ্যতটাকে আর বেছে নিতে পীড়াপীড়ি করবেন না। তবু বাবার দৃঢ় ইচ্ছার একটা বীজ আমাদের অবচেতন মনে উপ করে শিয়েছিলো।

শার মনে হল ছেলের ভবিষ্যত সম্পর্কে বাবার ইচ্ছেটাকে কার্যকরী করা তার কর্তব্য। আমার লেখাপড়ার প্রবাহটার গতিমুখ এমন দিকে ধুরিয়ে দিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে আমি সরকারি চাকরির উপযুক্ত হয়ে উঠি। কিন্তু ততদিনে আমি আরো বেশি দৃঢ় সংকলন নিয়েছি যে কিন্তু তেই সরকারি কর্মচারী হব না। কিন্তু সুনের শিক্ষাদৈর্ঘ্য তো একই খাতে প্রবাহিত। ছাত্রদের সরকারি চাকরির উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। কিন্তু অসুখ এসে যেন বাঁচিয়ে দিল। ডাঙ্কার আমার ফুসফুসের অবস্থা দেখে মাকে জানাল যে আমার ফুসফুসের যা অবস্থা তাতে ভবিষ্যতে চার দেওয়ালের বক্ত আবহাওয়ায় চাকরি করা উচিত নয়। বরং বছর খালেকের জন্য সুন থেকে ছুটি নেওয়া দরকার। নইলে শরীর সেরে ওঠার কোন সংজ্ঞাবনা নেই। আঃ, আমি যেন বেঁচে গেলাম। এতদিন ধরে মনেধাপে যা চাইছিলাম তা বাস্তবে ঘূর্ত হয়ে ধরা দিল। হ্যাঁ, অকল্পনায়ভাবে। ডাঙ্কারের কথাবার্তা শনে মা বাজী হল। আমি সুন ছেড়ে দিয়ে আকাদেমিতে ভর্তি হলাম।

কিন্তু সেই সুখের দিনগুলো যেন একটা দৃশ্য। দেখা দিয়েই বুদ্ধুদের মত মিলিয়ে গেল। বছর দুই বাদে মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের রঙিন দৃশ্য সৌধগুলো তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল। দীর্ঘদিন মা ডুগছিলেন। যত্রণায় অস্থির হয়ে উঠতেন। তখনই বুবেছিলাম মা আর বেশি দিন বাঁচবেন না। যদিও মার মৃত্যু যুব একটা অক্ষাং নয়, তবু জীবনে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম। বাবাকে শুন্দা করতাম, কিন্তু মা'কে ভালবাসতাম।

দায়িত্ব আর নিষ্ঠুর বাস্তব করালকৃপ ধরে আমার সামনে এসে দাঁড়ান। সংসারে সংবয় বসতে যা ছিল মার দীর্ঘ রোগভোগের সময়েই তা নিঃশেখ। অনাথ হিসেবে সরকারি তহবিল থেকে যা পেতাম তা আমার বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং ঝটিল উদ্বাদ অনুভব করলাম।

একটা ছোট চামড়ার সূটকেশে জামাকাপড় আর মনের ভেতরে অদয় ইচ্ছেটাকে পূরে নিয়ে আমি ভিত্তেনার বাত্তা ধরি। অজোনা ভবিষ্যত; যেমন আমার বাবা প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ভাগ্যকে ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়ে গায়ে হেঁচে দেলিয়ে পড়েছিলেন। তবু মনে দৃঢ়তা ছিল। জীবনে কিছু করবই— কিন্তু সরকারি চামুণ্ড হল না।

ভিয়েনায় ঘন্টাময় বছরগুলো

মার মৃত্যুর পর আমার ভাগ্য নৌকোর হাল একমুখী। মা'র অসুখের শেষের দিকে একবার ভিয়েনায় গিয়েছিলাম আকাদমি অফ ফাইন আর্টসে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। পকেটে এক গাদা ক্ষেত্র নিয়ে আমি তখন নিশ্চিত যে অতি সহজেই পরীক্ষাটায় উত্তোলো। ক্লালে ড্রাইয়ে বরাবর ভাল রেজাল্ট করেছি। ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছি। সুতরাং ড্রাইংয়ে আমার ক্ষমতা প্রশ়াস্তীত। তাই বুক ভরা গর্ব ছিল যে সেই দক্ষতার জোরে প্রবেশ পরীক্ষার সম্মত পার হওয়া আমার পক্ষে কিছুই নয়।

কিন্তু আমার ভুল ঠিক কোথায় আকাদমিতে পরীক্ষা দিতে এসে বুঝতে পারি। ড্রাইংয়ে আমার হাত পাকা হলেও অঙ্কন শিল্পে নয়। বিশেষ করে আর্কিটেক্চারাল অর্থাৎ স্থাপত্য বিদ্যার ড্রাইংয়ে। তখন স্থাপত্য বিদ্যায় আমার উৎসাহ বাড়ছে। এবং ভিয়েনায় দু'সপ্তাহ কাটিয়ে আসার পরে স্থাপত্য বিদ্যার ত্রুটি আরো বেশি তীব্র হয়ে ওঠে। তখনে আমার বয়স মোল পূর্ণ হয়নি। হোফ মিউজিয়ামে যাতায়াত শুরু করি, আর্ট গ্যালারির ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখার জন্য। কিন্তু ছবির বদলে হোফ মিউজিয়ামের বাড়িটার গঠনশৈলী আমাকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রাতায় ঘুরে ঘুরে প্রাচীন বাড়িগুলোর গঠন নৈপুণ্য লক্ষ্য করতাম। এবং প্রায় তেজে পড়া অতি পুরনো বাড়িগুলো কি এক অন্তর্ভুক্ত আকর্ষণে আমাকে টোনতো। কিছুতেই স্থির থাকতে দিত না। ঘটার পর ঘটা কাটিয়ে দিতাম অপেরা হাউস বা পার্লামেন্টের সামনে। বিশেষ করে পুরো রিং স্ট্রিটটা আমাকে যেন ভানুমতীর যাদু করেছিল। মনে হত বাড়িগুলো আরব্য রজনীর পাতা থেকে হঠাৎ উঠে আসা কোন দৃশ্যপট।

এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার আমি এ সুন্দরী নগরী ভিয়েনায় আসি; অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকি প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফলের জন্য। অবশ্য নিজের মনে নিশ্চিত যে এ পরীক্ষায় পাশ আমি করবই। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ফলাফল বেরোলে দেখি পাশ করতে পারিনি। বিশ্বাস করা কঠিন। তবু সত্যি আমি যে আমি পাশ করিনি। সুতরাং অধ্যক্ষর সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করি যে কেন আমি আকাদমীর অংকন বিভাগে সুযোগ পাব না। অধ্যক্ষ জানালেন, যে ক্ষেত্রগুলো আমি পরীক্ষার ব্যাপারে দাখিল করেছি সেগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আর্কিটেকচারে আমার দখল অনেক বেশি, অংকন শিল্পের চেয়ে। সুতরাং অংকন শিল্প বিভাগে আমাকে নেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে আকাদমির আরেক বিভাগ আর্কিটেকচারে নেওয়া যেতে পারে। মানে? আমার বিশ্বয় তখন তুঙ্গে। স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কে আমার বিশেষ কোন জ্ঞানই নেই। এমন কি কারোর থেকে আর্কিটেকচার ড্রাইং সম্পর্কে কোন শিক্ষা ও পাইনি।

শিলার প্লাটিঞ্জের হানসেন প্যালস ছেড়ে যখন বেরিয়ে আসি, তখন আমি নিরাশার গভীর সম্মুদ্রে নিমজ্জিত। এ বয়সে প্রথম যেন জীবনে নিজেকে ছোট বলে মনে হয়। যার জন্য নিজেকে উপমুক্ত বলে এতদিন ভেবে এসেছি, যথের সেই সৌধ আজ মুহূর্তে ভেঙে পড়ে।

কয়েকদিনের মধ্যে মনের জোন আবার খুঁজে পাই। আর্কিটেক্ট আমাকে হতেই হবে। যদিও জানি সে পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; বরং অনেক কঠিন। আকাদমির আর্কিটেকচার বিভাগে যোগদানের আগে আমাকে টেকনিক্যাল বিভিং ক্লালে পড়তে হবে। কিন্তু ক্লালে পড়ার অধিকার

পেতে হলে মাধ্যমিক স্কুলের শেষ পর্বীক্ষায় পাশের সার্টিফিকেট চাই, যেটা আমার পক্ষে আনন্দ সম্ভব নয়, আমার স্বপ্ন আমার ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে।

মার মৃত্যুর পর তৃতীয় বার ভিয়েনায় আসি। অবশ্য এবারে বেশ কয়েক বছরের জন্য। এতদিনে আবার আস্থাবিশ্বাসটা ফিরে এসেছে। সুতরাং লক্ষ্যের দিকে আমার দৃষ্টি নিবন্ধ। আমাকে আর্কিটেক্ট হতেই হবে। জীবনের পথে বাধা তো থাকবেই। যে করেই হোক সেগুলো ডিঙিয়ে যাব। তাছাড়া বাবার শৃঙ্খলা তো চোখের সামনে সব সময় ভাসছে। দরিদ্র চর্ষকারের সম্মান হয়েও কত সংগ্রাম করে তাঁকে সরকারি চাকুরে হতে হয়েছে। তার চেয়ে আমার জীবনের শুরু তো অনেক মসৃণ, আমার যুদ্ধের প্রতিকূলতাও বাবার পরিবেশের মত তীক্ষ্ণ নয়। তখন অবশ্য মনের দিক থেকে এমন একটা অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছি যে বারবার মনে হয় ভাগ্যদারী নিরামণ হাতে কষাঘাত করে চলেছে। আমার প্রতি বিমুখ, নির্দিষ্ট। তবু ইচ্ছা বেগবতী নদী; বাধা পেলে আরো ফুলে ফেঁপে ওঠে। শেষ পর্যন্ত আমার সেই অদম্য ইচ্ছাশক্তিটাই জয়ি হয়।

জীবনের এ অধ্যবসায়টার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কারণ জীবনের এ পর্বটাই আমাকে শক্ত আর অনন্যনীয় করে তুলেছিল। সেই কারণে খুব কাছে থেকে জীবনটাকে চিনতে পেরেছি। সত্যি বলতে কি আজকে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, এখানে আমার পক্ষে ওঠা সম্ভব হয়েছে ওধূমাত্র জীবনের এ অধ্যায়টার জন্য। এবং জীবনের এ দিনগুলোই আমাকে শূন্যতার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। শিশু মায়ের কোল থেকে ছুঁড়ে দিয়েছে ঝুঁক্ষ আরেক নতুন মায়ের হাতে। যদিও এ দুঃসময়ে চরম দারিদ্র্যতার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য নিষ্ঠুর ভাগ্যের প্রতি মাঝে মাঝে মনটা বিদ্রোহ করে উঠেছে; তবু যাদের জন্য পরবর্তী জীবনে আমি সংগ্রাম করেছি, এ পথেই আমি সেসব মানুষদের কাছে এসে দাঁড়াতে পেরেছি।

এ সময়ে আমি জাতির অস্তিত্বের পক্ষে দুটো বিপদ উপলক্ষি করতে পারি। একটা মার্কসইজম আরেকটা হল জুড়েইজম বা ইন্দী ধর্মসম্মত।

অনেকের কাছেই ভিয়েনা তখন প্রমোদ নগরী। আনন্দের মুহূর্তগুলো উপভোগের নিমিত্ত বে-হিসেবী খরচের জায়গা। কিন্তু আমার কাছে সে বছরগুলো শুধু দৃঃশ্য বিশেষ। এমন কি সেই দিনগুলোর কথা ভাবলে আজকে পর্যন্ত মনটা বিষাদে ভরে ওঠে। সেই শৃঙ্খলাচিহ্নগুলোর একটাতেও যদি এতুকু রঙের ছেঁয়া থাকত। সুনীর্ধ পাঁচ বছরের প্রতিটি দিন রাত্তিশস্ত যেন প্যাসিয়ান শহরের দিনগুলো। হোমারের শুভিসি কাব্যের ঝুপক হল প্যাসিয়ান লোকগুলো, তারা তৃমধ্যসাগরের পূর্বদিকের কোন এক অজানা দীপে বসবাস করত। কেউ কেউ বলে আজকে সেই দীপের নামকরণ হয়েছে কোরসিয়া, আধুনিক সুসজ্জিত কর্ম। তারা কাজের চেয়ে জীবনটাকে উপভোগ করতে বেশি ভালবাসত। তাই শুভিসি কাব্যে তাদের নামকরণ করা হয়েছে প্যাসিয়ান। যার অর্থ ক্রমে ক্রমে দাঁড়িয়েছে প্যারাসাইট বা সমাজের পরগাছ।

এ পাঁচ বছরে কখনো দৈনিক শ্রমিক অথবা তুচ্ছ ছবি এঁকে আমাকে রুটির জোগাড় করতে হয়েছে। তবু পেট ভরাতে পারিনি। সব সময়ই ক্ষুধা আমার পিছু পিছু তাড়া করে ফিরেছে। সেই সময় একটা বই কেনা বা একবার অপেরায় যাওয়ার মানে হল পরের কয়েকটা দিন মুখিয়ে থাকা ক্ষুধায় ফুঁ দিয়ে আগুন জালানো। তবু এদিনগুলোতেই শিখেছি আমি সবচেয়ে বেশি। আর্কিটেকচারাল স্টাডি অর্থাৎ স্থাপত্যবিদ্যার পড়াশোনার বাইরে মাঝে

ମାଧ୍ୟେ କହିଏ କଥନୋ ଅପେରାଯ ଯେତାମ । ତଥନକାର ଜୀବନେ ବିଲାସିତା ବଲତେ ଠିକ ଏଟୁକୁଇ । ଆର ବହି । ହୀଁ, ବହି-ଇ ଛିଲ କ୍ଷୁଦ୍ରା ଛାଡ଼ା ଆମାର ନିତ୍ୟସମ୍ପି ।

ତଥନ ଆମି ଖୁବ ପଡ଼ତାମ । ଏବଂ ଯା ଯା ପଡ଼ତାମ ସେଇ ବିଷୟଗୁଲୋକେ ଚଢ଼ା କରତାମ ମନ୍ତ୍ରାଣ ଦିଯେ ଅନୁଭବ କରତେ । ଯେଟୁକୁ ସମୟ ଫାଁକା ପେତାମ ପଡ଼ା-ଶୋନାର ମଧ୍ୟେ ଡୁବେ ଥାକତାମ । ସେଇ ଅଳ୍ପ କ୍ରୟେକଟା ବହରେ ବହି ପଡ଼େ ଯେ ଜୀବନ ଆମି ଅର୍ଜନ କରେଛିଲାମ, ବଲତେ ଦିଧା ନେଇ ଆଜି ଓ ତା କାଙ୍ଗେ ଲାଗଛେ । ତାର ଚେଯେଓ ବଡ଼ କଥା ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କେ ସ୍ଵର୍ଗ ଏକଟା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗ ଆର ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏକଟା ଶ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଆମାର ସେ ମମ୍ମେଇ ଗଡ଼େ ଓଠେ । ଯେଟା ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନେ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳାଯନି । ଉପରସ୍ତୁ ଆମାର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା, ଯୌବନେର ବହରଗୁଲେ ମାନୁଷକେ ଯେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବନିଯାଦ ଗଡ଼େ ଦେଇ, ଭବିଷ୍ୟତେର ଜୀବନେ ଆସାଦ ତାକେଇ ଭିତ୍ତି କରେ ଗଡ଼େ ଓଠେ । ଯୌବନେର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାଗୁଲୋଇ ଭବିଷ୍ୟତେର ରଙ୍ଗିନ ଫୁଲ । ଯଦି ଅବଶ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟେ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ବୋନା ଥାକେ । ଯୌବନେର ସୃଷ୍ଟିର ଚିତ୍ତାଧାରା ଭବିଷ୍ୟତେର ଆସାଦ ନିର୍ମାଣେର ରସଦ ।

ଆମାର ବାଲ୍ୟକାଳ ଯାଦେର ସମ୍ପେ କେଟେହେ, ତାଦେର ଜୀବନଧାରାର ସମ୍ପେ ଆମାର ଜୀବନେର କୋନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଛିଲ ନା । ଆମାର ଛୋଟବେଳା କେଟେହେ ନିଚୁକ୍ତରେର ବୁର୍ଜ୍ୟା ଅର୍ଥାଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦ ମଞ୍ଚଦାୟେର ମଧ୍ୟେ । ମୁତ୍ରାଂ ସତ୍ୟକାରେର ମେହନ୍ତି ମାନୁଷଦେର ସମ୍ପେ ଆମାର ପରିଚିତ ତଥନ ହୁଅନି । ମୁଖବିନ୍ଦ ଛିଲ ନା । ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବାଟା ଏ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ମାଝକାନେ ଛିଲ ସେଟା ମୋଟେଇ ଗଭୀର ନାୟ । ବରଂ ଅନେକ ସମୟ ମେହନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବଶ୍ୟ ଭାଲ ଛିଲ । ତବେ କେନ ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ଆସଲେ ମେହନ୍ତି ଜନଗଣେର ଏକଟା ଦଲ ଯାରା ଏକଟୁ ଉଠିଲି, ତାରା ଚାଇତ ମେହନ୍ତି ଜନଗଣେର ଓପର ମାତ୍ରବରୀ କରତେ ଅଥବା ଯେଥାନ ଥେକେ ତାରା ଉଠିଲି, ଟାଲମାଟାଲ ହୁୟେ ଆବାର ସେଥାନେଇ ପଡ଼େ ଯେତେ ପାରେ ଏ ଭୟେ ତାରା ମେହନ୍ତି ଜନଗଣେର ଥେକେ ଦୂରେ ସରେ ଥାକିବ । ଆସଲେ ପୁଣ୍ୟ ଦିନେର ଯେ ରୁକ୍ଷ ଶୃତିଟା ପେରିଯେ ଏସେ ତାରା ପିନ୍ଡିର ସବଚେଯେ ନିଚେକାର ଧାପଟା ଧବେଇ, ସେଥାନ ଥେକେ ଗଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ ଯାଓଯାର ଭୟଟାଇ ତାଦେର ସବ ସମୟ ଶକ୍ତି କରେ ବାହାର । ଯେ ଜୀବନ ଅଭିକଷ୍ଟେ ପେରିଯେ ଏସେହେ ସେଥାନେ ଗିଯେ କିଛିତେଇ ଆର ଦୀର୍ଘାତେ ଚାଇତ ନା ।

ଏ କାରଣେଇ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦ ସତ୍ୟକାରେର ଯାରା ସମାଜେର ଓପରତଳାର ବାସିନ୍ଦା, ତାରା ଯତା ଚଟ କବେ ସମାଜେର ଏକବାରେ ନିଚୁକ୍ତରେ ସମ୍ପେ ମିଶିତେ ପାରିବ, ହଠାଏ ଏ ଭୁଇଫୋଡ଼ଦେର ପକ୍ଷେ ସେଟା କିନ୍ତୁତେଇ ମଧ୍ୟ ଛିଲ ନା । ହୟତୋ ବା ଯେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟାମ କରେ ଏସବ ଭୁଇଫୋଡ଼ଦେର ଦଲ ନିଚେର ତଳାର ବାସିନ୍ଦାଦେର ଛାଡ଼ିଯେ ଉପରେ ଉଠିଲେ, ସେଇ ନିଦାରଣ ସଂଘାମେର ଜନ୍ୟ ମାନୁଷର ମନେର ମୁକୋମଳ ପ୍ରସ୍ତିଗୁଲୋଇ ମରେ ଗେଛେ । ନତ୍ରୟା ଜୀବନମୁକ୍ତେ ମୁଖାତେ ଗିଯେ ଅପରେର ଦିକେ ତାକାବାର ଆର ଫୁରମ୍ବନ ପାଯନି ।

ଏମିକ ଥେକେ ଭାଗ୍ୟ ଆମାର ଭାଲ ଛିଲ ବଲତେ ହବେ । ଅବଶ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟେ ଆମାର ହେଲେନେଲାକାର ଭୁଇଫୋଡ଼ଦେର ଯେ ଜଗତେ ବାସ, ନିଦାରଣ ଦାରିଦ୍ରତା ଆର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ୟତାର ମୁଖ୍ୟମୁଖ୍ୟ ଦୀର୍ଘିଯେ ସେଦିନକାର ବୁର୍ଜ୍ୟା ଜୀବନେର ରଙ୍ଗିନ ଛବିଟା ଟୁକରୋ ଟୁକରୋ ହୁୟେ ଭେଦେ ପଡ଼େଇଲି । ଜୀବନେ ଏ ପ୍ରଥମ ଆମି ହାମବାଢ଼ା ଆର ସତ୍ୟକାରେର ଭାଲ ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟେ ଫାଯାକ ବୁଝାଇ ଶିଖି । ମାନୁଷକେ ଚିନି ଅନେକ କାହେ ଥେକେ । ଯାଦେର ରଙ୍ଗ ଅଭିଜ୍ଞତା ନା ଥାକଲେ ଧରା ଅନୁଷ୍ଠାବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଦ ପୃଥିବୀର ଯେ କଟା ଶହର ଅପରାଧୀତେ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଛିଲ, ଭିଯେନା ତଳ୍ବନୋ ଅନ୍ୟତମ । ହଠାଏ ଫୁଲ ଫେପେ ଓଠା ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟେର ଶାଶେ ଚରମତମ ଦାରିଦ୍ରତା ପାଶାପାଶ ବିଯାଙ୍ଗନ । ବାହାମ ମିଲିଯାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ମୟୁନ୍ଦ ଏ ଶହରେର ଭେତରେ ଚୁକଲେଇ

এটা স্পষ্ট বোৰা যেত। প্ৰাসাদগুলো উপচে পড়া ঐশ্বর্যের প্ৰতীক। বিশেষ কৰে সাধাৰণকে বাঞ্ছিত কৰে এ ঐশ্বর্যের স্তুপ প্ৰাসাদে প্ৰাসাদে সবচেয়ে বেশি জমা হয় হাবসুৰ্গ শাসনকালে।

এ কেন্দ্ৰে সবকিছু জমা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল সঙ্গত পাঁচমিশেনী জনসাধাৰণেৰ জন্য। সুতৰাং শহৱেৰ কেন্দ্ৰে উচ্চপদস্থ কৰ্মচাৰী এবং রাজাৰ বসবাস গড়ে ওঠে।

কিন্তু দানুবিয়ান শাসকেৰ সময় ভিয়েনা শুধু রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান ছিল না। বাণিজ্যকেন্দ্ৰ হিসেবেও শহৱটা গড়ে উঠেছিল। তাই সামৰিক, অসামৰিক অফিসাব, বিজ্ঞানী এবং শিল্পী ছাড়া প্ৰচুৰ শ্ৰমিক শহৱেৰ অভ্যন্তৰে বসবাস কৰত। দারিদ্ৰতাৰ সঙ্গে এ অভিজাত ধনী ব্যবসায়িক সম্প্ৰদায়েৰ প্ৰায়ই মুখোযুখি সংঘৰ্ষ লেগে থাকত। হাজাৰ হাজাৰ বেকাৰ উদ্দেশ্যহীনভাৱে রিঙ্গ স্ট্ৰীটেৰ প্ৰাসাদগুলোৰ সামনে ঘুৱে বেড়াত; এবং পুৱনো অস্ত্ৰিয়াৰ ভায়া ট্ৰায়াফ ফালিসেৰ নিচে নৰক গুলজাৰ কৰত। অবশ্য তথনকাৰ প্ৰায় প্ৰতিটি জাৰ্মান শহৱই এৰকম ছিল। এ সমস্যাটা আলোচনা কৰাৰ আগে যথেষ্ট সতৰ্কতা প্ৰয়োজন। প্ৰথমত ওপৰতলা থেকে এ সমস্যাটা সম্পূৰ্ণৱৰপে বোৰা সম্ভব নয়, এ বিবাকু ভাইপাৱেৰ কৰলে যে না পড়েছে, তাৰ পক্ষে বোৰা অসম্ভব যে এৱ বিষ কত তীব্ৰ হতে পাৰে। নিজে ভুজভোগী না হলে এ সমস্যাটা শুধু আলোচনাৰ স্তৱেই থেকে যেতে বাধ্য। এৱ শিকড়ে পৌছানো আদৌ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত এটাকে এড়িয়ে যাওয়াৰ আৱেকটা পথ সমস্যাটাৰ দিকে পেছন ফিৰে থাকা, অথবা মৌখিক সহানুভূতি দেখানো। কিন্তু 'তা'তে ক্ষতি বৈ লাভ হয় না। তথন অবশ্য এৱাই আবাৰ তাৰেৰ অকৃতজ্ঞ বলে গলাগাল কৰে।

ধীৱে ধীৱে মানুষগুলো এক সময় বুৰাতে পাৰে যে এ সামাজিক পৱিবেশে সমাজ সংস্কাৱেৰ কাজ কৰে কোন লাভ নেই। কাৰণ পুৱোৱা সমাজটাৰ গঠনই এমন যে কৃতজ্ঞতা বলে জিনিসটাই সমাজেৰ বুক থেকে অনুৰ্ভৱ। সুতৰাং সমাজেৰ কাছ থেকে বিনিময়ে কিছু পাওয়াৰ আশা দুৱাশা মাত্ৰ; বৱং প্ৰাপ্য যদি কিছু হয় তা হল অন্যায় বিচাৰ। সামাজিক সমস্যাগুলো সম্পৰ্কে জননৰাব লোভ থাকলেও সেই সময়েৰ আমাৰ দারিদ্ৰ পীড়িত অবস্থাই আমাকে সেদিকে পা বাঢ়াতে দেয়নি। অবশ্য এভাৱে কোন সমস্যাই দূৰ থেকে বোৰা সম্ভব নয়, যদি না কেউ তাতে জড়িয়ে পড়ে। তাই বলা যেতে পাৰে যে, শৰক যদিও গবেষণাগারেৰ পাশ কটিয়ে এসেছে, তবু একেবাৱে তাৰ ক্ষতি হয়নি তা বলা যায় না।

যখন আমি আজ সেইদিনগুলোকে শ্বৰণে আনতে চেষ্টা কৰি, পুৱোটা কিছুতেই পাৰি না। তাই এখানে আমি সেই ঘটনাগুলোৰ কথাই বলব যেগুলো আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে আঘাত কৰে বন্ধ এক জায়গায় দাঁড় কৰিয়ে দিয়েছিল। যাৱ থেকে অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি লাভ কৰেছি।

সেই দিনগুলোতে আমাৰ পক্ষে চাকৰি জোগাড় কৰা কষ্টকৰ হলেও একেবাৱে অসংহ ছিল না। তাৰ প্ৰধান কাৰণ হল আমি কুশলী শ্ৰমিক দলে পড়তাম না। কুলি কামাৰেৰ কাজ যেগুলো অন্য কেউ কৰতে চাইত না, আমি পেটেৰ দায়ে সেগুলোই জুটিয়ে নিতাম।

অন্যান্য যাৱা নিজেদেৰ দেশ ছেড়ে প্ৰবাসী হয়ে পা থেকে ইউৱোপেৰ ধূলো বেড়ে লৌহকঠিন প্ৰতিজ্ঞা নিয়ে এ নতুন দেশে নতুন জগতে নতুন নীড় তৈৰি কৰতে আসে, আমিও সেই দলেৱই একটি নতুন মুখ। শ্ৰেণী সংস্কাৰ ইত্যাদি সমষ্টি কিছু পেছনে বেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন পৱিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়াৰ জন্য তাৰা চাকৰিক্ষেত্ৰে যে দৱজা খোলা পায় তা

দিয়েই ঢুকে পড়ে। আসলে এখানে এসে তারা উপলব্ধি করতে পারে শ্রমের মর্যাদা। কোন কাজই কাউকে ছোট করে না, যদি তা সততার সঙ্গে সম্পূর্ণ করা যায়। আর এ চিন্তাধারাই আমাকে নতুন জগতের নতুন রাস্তায় এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিয়েছিল।

অতি শীঘ্র বুঝতে পারলাম এ ধরনের কাজ যেমন সব সময় জোগাড় করা যায়, তেমনি চট করে চোখের পলকে সেই চাকরি চলেও যায়।

দৈনিক কৃটি জোগাড়ের এ অনিচ্ছ্যতাই আমার এ নতুন জগতের দিনগুলোকে বিষণ্ণ করে তুলেছিল।

যদিও শিক্ষিত শ্রমিকদের কুলি কামারদের যত যথন তখন চাকরি থেকে বরখাস্ত করে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত না, তবু তাদের চাকরির নিশ্চয়তা বলে তেমন কিছু ছিল না। তাই শিক্ষিত শ্রমিক-দলের একেবারে অনাহারের মুখোযুথি হতে না হলেও বেকারী, ধর্মঘট আর লক্ আউটের দরজন প্রতিদিনই তাদের কৃটির চিন্তায় বিপর্যস্ত থাকতে হত। এ দৈনন্দিন কৃটির অনিচ্ছ্যতা সামাজিক অর্থনীতির অন্ধকারময় দিক।

গ্রামে থেকে অনেক ছেলে শহরে সহজ কাজের লোতে চলে আসে। সহজ কাজ মানে কয়েক ঘন্টার কাজ। অবশ্য সেই সঙ্গে শহর জীবনের রহস্যময়তাও তাদের আকর্ষণ করত। গ্রামে তবু যা হোক বাঁধাধরা একটা রোজগার ছিল। কারণ চাষাবাসের কাজে লোক খুঁজে পাওয়া তখন রীতিমত কষ্টকর। অনেকেই শহরের সহজ জীবনযাত্রার হাতছানিতে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে পাড়ি দিয়েছে। তবু যারা গ্রাম ছেড়ে দিয়ে শহরে আসত তাদের অবস্থা গ্রামে থাকা লোকদের থেকে বারাপ ছিল একথা বলা যায় না। অবশ্য আমি প্রবাসী বলতে যারা আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে তাদের কথা বলছি না। যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসত তাদেরও আমি প্রবাসী বলেই মনে করি। কারণ সরল যে ছেলেটা বেশি রোজগারের আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে, শহর জীবনে সে তো সম্পূর্ণ বিদেশী। অবশ্য অনিচ্ছিত জীবনের ঝুঁকি নিয়েই সে শহরে এসেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পকেটে গোনাণুগতি পয়সা নিয়ে আসা ছেলেগুলোর ভাগ্য খুব খারাপ না থাকলে প্রথম কিছুদিন মন্দ কাটত না। কিন্তু চাকরি পেয়ে অল্পদিনের মধ্যে হারালেই, যা অহরহ ঘটত, অবস্থা তাদের শোচনীয় হয়ে উঠত। বিশেষ করে শীতের সময় তো অসুব। অবশ্য চাকরি যাওয়ার পরের কয়েকটা সঙ্গাহ ততবেশি দুঃসহ ছিল না। পকেটে তখন শেষ মাইনের রেস্ত কিছুটা অবশিষ্ট। ট্রেড ইউনিয়ন থেকে তখন পর্যন্ত পাওয়া বেকার ভাতার টাকায় দিনগুলো চলে যেত। কিন্তু একসময়ে শেষ মাইনের টাকাটা আর দীর্ঘ বেকারত্বের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের বেকার ভাতাও বক্ষ হয়ে যেত। তখনই পড়তে হত অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে। পেটের জ্বালায় রাস্তায় রাস্তায় মূরে বেড়ানো ছাড়া উপায় কি? উপায় বলতে অবশিষ্ট যা কিছু তা বক্ষক দেওয়া বা বিক্রি করা। কিন্তু সে পয়সায় আর কতদিন চলে। জামাকাপড় ততদিনে নোংরা আর শতচিন্ন। বাইরের অবয়বেও দারিদ্র্যার ছাপ ফুটে উঠেছে। বাধ্য হয়ে সমাজের নিম্নস্তরের লোকগুলোর সঙ্গে মেলামেশা করতে হত, যাদের চিন্তাধারায় মন যায় বিষয়ে। তদুপরি শারীরিক দুর্দশা তো আছেই। উপরন্তু যাথা গৌজার ঠাই কোথায় পাবে? শীতের দিন হলে তো দুর্দশার একশেষ। শেষমেষ যদি আবার প্রাপ্ত চেষ্টাতে একটা চাকরি যোগাড় করতে পারে; কিন্তু সেটা তো আবার আগেকার ব্যাপারটাই পুনরাবৃত্তি। ত্বকীয় বারেও সেই একই নাটক। অর্থাৎ দিনে দিনে সে আরও বেশি হতাশা আর অনিচ্ছ্যতার সমন্বে নিমজ্জনান। ধীরে ধীরে পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে একটা অভ্যাস হয়ে

দাঁড়ায়। এভাবে কঠোর পরিশ্রমে একটা লোক তার জীবনের প্রতি উদাসীন আর অমনযোগী হয়ে ওঠে। এবং একসময় কতগুলো ঠগ জোকের হাতের প্তুল হয়ে পড়ে, যারা তাদের নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করে। এত বেশি বেকারত্বের বোৱা বইতে স্ট্রাইক, দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি, নিজের ভবিষ্যত অনিশ্চিতার ব্যাপারগুলো সবকে পুরোপুরি উদাসীন হয়ে পড়ে। যদিও সে মনেপ্রাণে স্ট্রাইক ইত্যাদি ব্যাপারগুলো চায় না; তবু মনের সব অনুভূতি হারিয়ে ফেলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ধর্মঘটাদের দলে ভিড়ে যায়।

এরকম বহু উদাহরণ আমি দিনের পর দিন দেখিছি। যতদিন গেছে, এ দানব শহরটা যেভাবে পাগলের মত লোকগুলোকে আকর্ষণ করে তা দেখে দেখে শহরটার প্রতি মনের মধ্যে একটা তিক্ততা জন্মে গেছে। প্রথম যখন তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে, কিছুদিন পর্যন্ত সেই গ্রাম্য জীবনের সংগে তাদের একটা যোগাযোগ বজায় থাকে, তারপর, একদিন তাদের অলেক্ষ্যে ছিড়ে যায়।

আমি সেই শহর জীবনের আবর্তে পড়ে বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার ভাগ্যও সেই লোকগুলোর মত; এবং আমার ওপরেও শহরে জীবন তার থাবা নিয়ত বসিয়ে চলেছে। এ অর্থনৈতিক ওঠা নামায় স্বত্বাবতই তার খরচ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। যখন পকেটে পয়সা থাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খায়; বাকি সময় অনাহারে কাটায়। এটা শারীরিক একটা চক্রের আবর্ত। ক্ষুধার্ত অবস্থায় দীর্ঘদিন কাটানোর সময় যে স্বপ্ন দেখে খাওয়ার দিনগুলোর। এবং এ স্বপ্নগুলো তার মানসিক অবস্থাকে এমন এক জায়গায় পৌছে দেয় যে সে এ খরচ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মানসিক ভারসাম্য একেবারে হারিয়ে ফেলে। তাই আবার যখন সে চাকরি পায়, মাইনের দিনগুলোর আগামীদিনের কথা মনে না রেখে পুরোটাই খরচ করে বসে। এটা যে শুধু তার ব্যক্তিগত জীবনের অভাব ডেকে আনে তা নয়, তার এ স্বল্প সঙ্গাহিক বেতনে গ্রহের প্রয়োজনীয় খরচের হিসেবও রাখতে পারে না। ব্যাপারটা এরকম; প্রথম দিকে তার সঙ্গাহিক রোজগারে পাঁচদিন কোন রকমে চলে যায়; তারপরে অভ্যাসটা বাড়তে বাড়তে সেই একই রোজগারে তিনদিন পার হওয়া মুক্তি হয়ে পড়ে। শেষে সেটা শিয়ে দাঁড়ায় একদিনে। অবশ্যে এক উৎসবের রাত্রেই পুরো সঙ্গাহিক মাইনে সে ফুঁকে দেয়। এগুলোর একমাত্র কারণ হল তার নিজের রোজগারে খরচ করার বাজেট তৈরি করার অক্ষমতা।

অনেক সময়েই তাদের ঘরে স্ত্রী পুত্র থাকে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার এ অভ্যাস ওদের মধ্যেও সংক্রান্ত হয়; বিশেষ করে স্বামী যদি তার পরিবারকে নিজের ধরনে ভালবাসে আর সেই পরিবারকে জড়িয়ে ধরে দিনগুলোকে পাড়ী দিতে চায়; সেই ক্ষেত্রে পুরো সঙ্গাহের বোজগারে পরিবারটির তিন চাব দিনের ভরণপোষণ কোনক্ষেত্রে চলে। যতদিন টাকা থাবে সবাই মিলে খাদ্য আর পানীয়ের মহাফিল জুড়ে দেয়, সঙ্গাহের বাকি দিনগুলো তারপর ওদের কাটে অনাহারে। তখন তার স্ত্রী প্রতিবেশীদের থেকে গোপনে ধার করে আর পাড়া দোকানদারদের কাছে সামান্য জিনিসের জন্য হাত পেতে দুঃখের দিনগুলো পাড়ি দিতে চায় পুরো পরিবারটা শূন্য খাবার টেবিলে বসে মনে কল্পনা করে আগামী সঙ্গাহে এ অভাবের আর যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। আর সেই ক্ষুধার দিনগুলোয় স্বপ্ন দেখে প্রাচুর্যের দিনে পেট ভরে খাওয়ার। এবং শিশুকাল থেকেই এ দৃঢ়ের দিনগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওরা এ জীবনে অভ্যন্ত হয়ে পড়ে।

এ অভাবরূপী শয়তান পুরষটাকে সন্তাহের প্রথম দিকে তাড়া করে ফেরে। স্ত্রী ও ভাবতই ছেলে মেয়েদের মুখ চেয়ে সংসারের দাবি আদায়ের জন্য সচেষ্ট হয়। ক্রমে সেটা কৃপ নেয় কদর্য কৃৎসিত ঝগড়ায়। স্বামী আর কোন পথ ঝুঁজে না পেয়ে মদ থেতে আরঙ্গ করে। দিনে দিনে পরশ্পর পরস্পরের কাছ থেকে মনের দিক থেকে অনেক দূরে সরে যায়। তারপর মাঝুটার উরু হয় প্রতি শনিবারে মদ খাওয়া; স্ত্রী তার এবং সত্তানদের অস্তিত্ব রাখার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রামে নামতে বাধ্য হয়। কারখানার রাস্তা থেকে নোংরা শুড়িখানা পর্যন্ত কয়েকটা পয়সার জন্য মাইনের দিনে স্বামীকে ধাওয়া করে। সব পয়সা বুইয়ে রোববার বা সোমবার যখন সে বাড়ি ফেরে তখন সম্পূর্ণ নিঃশ্ব। আবার অভাব অনটন, ঝগড়াঝাঁটি, শেষে ভগবানের দাহাই পেড়ে চিকিরার আর কান্নাকাটিতে ভরা প্রহরণলো কাটে।

এরকম শয়ে শয়ে ঘটনা আমার চোখের ওপর দেখেছি। প্রথমে বিরক্ত হলেও পরে পুরো ব্যাপারটার মধ্যে ট্রাঙ্গেডি এবং দুর্ভাগ্য কোথায় বুঝতে অসুবিধে হয়নি। ওরা হল শয়তান সমজ ব্যবস্থার শিকারমাত্র।

তখনকার পারিবারিক অবস্থা থায় সব পরিবারেই এক। বিশেষ করে ভিয়েনার শ্রমিকেরা চারিদিকে দুঃখ-দুর্দশার দেওয়ালের মধ্যে দিন যাপন করত। এখনো যখন সেই দুঃখের দিনগুলো আমার শৃতির সামনে ভেসে ওঠে, সারা শরীরটা ভয়ে কাঁপতে থাকে। গভীর নিমুম রাত্রে বস্তি থেকে ভেসে আসা মাতাল স্বামীর সঙ্গে তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের ঝগড়া আর নিষ্ঠুর মারামারি। ক্রেতাঙ্ক পরিবেশে ওদের জীবনযাত্রা মানুষকে এক একটা পুরো শয়তান বানিয়ে ছাড়ে।

সেদিন কি হবে— যেদিন মানুষগুলো নিজেদের অবস্থা বুঝতে পেরে যারা তাদের এ অবস্থায় এনে ফেলেছে তাদের তাড়া করবে? কিন্তু আশ্চর্যের কথা সে জগতের বাসিন্দারা এ জগতের সোকদের কোন খৌজ খবরই রাখে না। কিন্তু একদিন আসবে যখন পুরো ঘটনাটা তার আপন গতিপথে মোড় নেবে, যদি না সময় মত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

আজ এতদিন পরে আমি আমার ভাগ্যকে ধ্যন্যাদ জানাই এজন্য যে নিয়তি আমাকে এমন একটা বিদ্যালয়ে ঘটনাক্রমে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল, ইচ্ছে না থাকলেও সেই পরিবেশে বাধ্য হয়েছি ঘটনাগুলোর প্রতি মন সংযোগ করতে। এ ক্ষুলই আমাকে জীবনের এক শক্ত বুনিয়াদের ওপর এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

পুরাপুরি নিজেকে হতাশার সমন্বয়ে নিমজ্জিত না করার জন্য আমি তৎকালীন পরিবেশটাকে দুঃভাগে ভাগ করি। এক, বাইরের চেহারা অনুযায়ী; দুই যে যে কারণে তারা এরকম পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। এ একমাত্র পথ যার দ্বারা নিজেকে হতাশা সমন্বয়ে পুরোপুরি ডোবার হাত থেকে বাঁচতে পেরেছি। তারা এ দুঃখ দুর্দশায় এবং দুর্ভাগ্যের সমন্বয়ে ভুবে নিজেদের এ নোংরা পরিবেশ এবং নিচুতে নামাতে বাধ্য হয়েছে। তাদের অবস্থা সতাই শোচনীয়। আমার জীবনেও এ একই ধরনের দুর্দশা আমাকে মানুষগুলোর প্রতি ভাবালু হতে দেয়নি। না, ভাবালু হয়ে পড়লে কোন কিছুরই সঠিক মৃত্যুযণ সম্ভব নয়।

সে দিনগুলোতে আমি বুঝতে পারতাম যে একমাত্র এ অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য দুটো পথ খোলা আছে। এক সামাজিক অবস্থার পুরো একটা পরিবর্তন এনে নিচেকার লোকদের সমাজের প্রতি কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। দুই, এ কর্তব্য এবং দায়িত্ব বোধের সমর্থন সাধন করে নিষ্ঠুর হাতে সমাজের অপ্রয়োজনীয় অনুশাসন

তথা শুকনো ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে— যেগুলো এ সমাজটাকে সুস্থভাবে বাড়তে দিচ্ছে না।

প্রকৃতি যেমন স্থিতাবস্থায় থাকে না, তেমনি মানুষের জীবনেও যাত্রিক উপায়ে উন্নতি সাধন করা অসম্ভব। জন্মের পর থেকেই তার ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য একটা সুনির্দিষ্ট এবং পাকা রাস্তা চাই,—যেটা ধরে সে তরতুর করে এগিয়ে যেতে পারে।

ভিয়েনাতে আমার সংগ্রামের দিনগুলোতে আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে শুধু ভাবাবেগ দিয়ে সামাজিক এ অস্তুত সমস্যার সমাধান করা যাবে না। বরং তা ভাবতে গেলে পুরো ব্যাপারটাই হাস্যাপ্রদ এবং অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। তার চেয়ে এমন একটা পথ আবিক্ষা করতে হবে যা আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক এ ক্ষয়িয়ত দিকের ক্ষয় রোধ করে ওপরে টেনে তুলতে পারে। সমাজের এ ক্ষয়িয়ত দিকটাই একটা মানুষকে তার নিজের সিংহাসন থেকে ঠেলে নিচে নামিয়ে দিয়েছে বা দিতে সাহায্য করেছে। এবং বেকারতুই হল তার একটি সর্বপ্রধান কারণ; যেটা মানুষকে প্রতিনিয়ত এক চরম অনিচ্ছাতার পথে এগিয়ে দিয়েছে। আর এ প্রতিনিয়ত অনিচ্ছাতাই তাকে নিচের দিকে আকর্ষণ করেছে; গভীর বা সুনির্দিষ্ট জীবনের ধারা গ্রহণ করতে দিচ্ছে না। তাদের কাপূরুষ আর জীবন সম্পর্কে উদাসীন বা অমনোযোগী করে তুলছে। এবং এ মনোভাব তাকে আত্মবিশ্বাসে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। যখন এ আত্মপীড়ন থেকে লোকে মুক্তি পাবে, তখনই তার অন্তর্শক্তি এবং বহিঃশক্তি দুটো শিলিয়ে সে সমাজের এবং নিজের উন্নতির চেষ্টা করবে। হ্যা, পঙ্খ ডালপালা এবং অপ্রয়োজনীয় শিকড়ের ডাল থেকে বেরিয়ে আসার এ একমাত্র পথ।

কিন্তু অস্ত্রিয়ার শাসককুলের সামাজিক দাবি দাওয়া সম্বন্ধে কোন ধ্যান ধারণা বা সামাজিক সঠিক অনুশাসনের অভাবই সমাজের এ দৃষ্ট ক্ষতগুলোকে সারতে দেয়নি।

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি সঠিক কোন জিনিসটা আমাকে বেশি আচ্ছন্ন করেছিল? দারিদ্র্যা, যেটা আমার সেদিনের সর্বক্ষণের সঙ্গী অথবা আমাকে ঘিরে থাকা লোকগুলোর বৃদ্ধিমত্তা এবং সাংস্কৃতির অভাব।

সবচেয়ে অবাক ব্যাপার আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা কত তাড়াতড়ি ত্রুট হয়ে ওঠে যখন এসব ব্যাপার তারা পদদলিত কোন বক্তৃর কাছ থেকে শোনে। তারা জার্মান হোক, বা না হোক। এ অবস্থার বিরক্তে তীব্র ক্ষেত্রে তারা ফেটে পড়ে, কিন্তু তাদের সেই মৃণা মিশ্রিত ক্ষেত্রের বেশির ভাগটাই তাৎক্ষণ্যে ভরা ফানুস মাত্র।

কিন্তু ক'জন সত্যিকারের আত্মবিশ্বাস করে? অবশ্য ভাবালুতার বাপে তা সম্ভবও নয়। ক'জন বুঝতে চেষ্টা করে যে পিতৃভূমির যে অংশটার তারা অংশীদার, তার সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক সম্মতির দিকটাকে। আমাদের মধ্যবিত্ত সম্পন্নায় কি একবারও ভাবে যে পিতৃভূমির সমাজের এমন একটা উজ্জ্বল দিক থাকা উচিত যা নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে।

একথা অঙ্গীকার করার উপায় নেই, যে অন্যান্য দেশের শ্রমিক শ্রেণীও কম দেশপ্রেমিক নয়। যদি সেটা স্থীকার করে নেওয়া যায় তবু আমাদের অবহেলাকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু ব্যাপারটা এ রকম নয়। আমরা যেটাকে বলি অক্ষ জাতীয়তাবাদী, ফ্রাসের মহত্ত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে সেটাই তাদের সভ্যতা। শুধু সামনে একটা আদর্শ বা লক্ষ্যকে দাঁড় করিয়ে রেখে ফরাসী ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয় না। শিক্ষা বলতে তাদের দেশের বিস্তারিত সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক পটভূমিকা শেখা, এবং তা শেখানো হয় অতি বিস্তারিতভাবে।

এ ধরনের শিক্ষার পটভূমি বিরাট হওয়া উচিত এবং বারবার শিখিয়ে মনের গভীরে তার অনুপ্রবেশ ঘটানো চাই ।

আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যে শিক্ষার সেই দিকটাকে উপেক্ষা করে চলেছি শুধু তাই নয়, যারা ভাগ্যবলে স্কুলের দৌলতে একটু আধুনিক শিক্ষা পাচ্ছে তাদের মনটাও সম্পূর্ণ বিকৃত করে দেওয়া হচ্ছে । বিষাক্ত ইন্দুর প্রতিনিয়ত আমাদের রাজনৈতিক দেহে বিষ ছড়িয়ে চলেছে । হৃদয় এবং সেই শৃঙ্খলাজীকে সেই বিষে আচ্ছন্ন করে দিয়ে এ বিশাল জনতাকে দুঃখ দুর্দশার চরমে নামিয়ে দিচ্ছে ।

পাঠকগণকে নিচের একটা দৃশ্য কল্পনা করতে অনুরোধ করি ।

মাটির নিচের আর্দ্র দুটো ঘরে একজন শ্রমিক তার পরিবার নিয়ে বাস করে, সর্বসাকুল্যে তারা সাতজন । ধরে নেওয়া যাক পরিবারের একজন হল তিনি বছরের একটা ছেলে । এ বয়সে বাচ্চারা যা দেখে এবং শোনে, তাদের মনে তা গভীরভাবে দাগ কেটে বসে । প্রতিভাশালী লোকের ক্ষেত্রে এ বয়সের ঘটনা এমনভাবে মনের মধ্যে রেখাপাত করে যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা তাদের শ্বরণে থাকে । সূতরাং এ জীবনের সংকীর্ণতা এবং এতটুকু পরিবেশে অতো লোকের ভিড় তার মনে নিশ্চয়ই কোন সুখসূত্র ছবি আঁকে না । এ পরিবেশে তাই ঝগড়া আর পরস্পরের বোঝাপড়ার অধিল তো থাকবেই । এতটুকু জায়গায় যেখানে পাশাপাশি শোওয়াও অসম্ভব; ওপর নিচে শোওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই । ছোট ছোট অমিলগুলো, যেগুলো ঘরে বেশি জায়গা থাকলে পরস্পরের কাছ থেকে একটু দূরে সরে বসতে পারলে সহজেই মিটে যায়; এখানে সেগুলোই পুরনো রোগের মত দেখা দেয় । ছোটদের ক্ষেত্রে তারা পরস্পর ঝগড়া করলেও ঝগড়া সহজে মিটে যায় । এবং অন্তর্ক্ষণের মধ্যে তা ভুলেও যায় । কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটাই অন্যরকম হয়ে দেখা দেয় । প্রাত্যহিক ঝগড়াতে যে নির্দেশনা থাকে, সেটাই সংসারের সব শান্তি ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয় । এগুলো ছেলেপেলেদের জীবনে প্রতিক্রিয়াও করে না । কারোর যদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকে, তার পক্ষে ব্যাপারটা বোঝা সম্ভব । যখন মনুমাতাল অবস্থায় ঘরে ফিরে স্থামী স্ত্রীকে দৈহিক নির্যাতন করে, সমস্ত পারিবারিক প্রতিক্রিয়া ব্যাপারটাতে যা হয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া বোঝা এটা সম্ভব নয় । বছর ছয়েক বয়স হলে বাচ্চারা তো দূরের কথা, এসব ঘটনাতে বড়রাও স্থির থাকতে পারে না । বিষাক্ত তর্বে জারিত, পেট ভরে থেতে না পা ওয়ায় অপূর্ণ শরীর আর মস্তিষ্ক ভরা কীট নিয়ে তারা ঢোকে গিয়ে প্রাইমারী স্কুলে । এরাই দেশের ভবিষ্যত নাগরিক । অতিক্ষেত্রে স্থানেই তারা যতটুকু পারে পড়াশোনা করে । বাড়িতে তো পড়াশোনা করার না আছে জায়গা, না পরিবেশ । উপরত্ব বাবা মা সর্বক্ষণ স্কুলের শিক্ষকদের সমালোচনায় মুখ্য । বিশেষ করে এ পরিবেশে যেসব সমালোচনা হয়, তার আওতা থেকে কিছুই বাদ পড়ে না । স্কুল থেকে শুরু করে গভর্নমেন্ট পর্যন্ত । ধর্ম, আদর্শ, বাণ্টি কোন কিছু সম্পর্কেই এখানে গঠনধর্মী কোন আলোচনা হয় না । যখন চৌদ্দ বছর বয়সে সে স্কুল ছেড়ে বেরয়, তখন সুশিক্ষার বদলে এ জিনিসগুলোই নড়াচড়া করে বেশি ।

জীবনের এ সক্রিয়ে মহৎ আদর্শের প্রতি মন ধ্বনিত না হয়ে মানব জীবনের অঙ্ককার দিকটার প্রতিই মন আকৃষ্ট হয় বেশি । পনেরো বছর বয়সে সেই তিনি বছরের ছেলেটা সব কিছুর বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করে । জীবনের নোংরা এবং কদর্যময় দিকটার প্রতি-ই তার আকর্ষণ গড়ে উঠে; চিন্তাধারার উচ্চ দিকটার প্রতি তখন তার চরম অনীহা । মানসিক ঠিক এ অবস্থাতে সে স্কুলে গিয়ে প্রবেশ করে ।

তার জীবনের ছেটবেলায় দেখা পিতার দৈনন্দিন খাত ধরেই বয়ে চলে। তবস্যুরে হয়ে সারাটা দিন রাস্তায় রাস্তায় কাটিয়ে ঘরে ফেরে। আর সেই অর্ধমৃত জন্মাতার উদ্দেশ্যে গালাগাল হোড়ে। শুধু তাই নয় অভিশাপ দেয় ঈশ্বর এবং এ পৃথিবীটাকেও; শেষমেষ গিয়ে তোকে অল্প বয়স্ক ছেলেদের শুদ্ধিকরণের জন্য তৈরি জেলখানায়। বাকি যেটুকু ছিল তা ওখানেই পূর্ণতা পায়। এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ওদের ভেতরে দেশপ্রেমের অভাব দেখে সমালোচনায় মুখ্য হয়ে ওঠে।

দিনের পর দিন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দেখে আসছে থিয়েটার, সিনেমা; নোংরা সাংবাদিকতা এবং কদর্য বইপ্রকাশনি জন্তার মধ্যে বিষ ছড়িয়ে চলেছে। তবু ওরা আশ্চর্য হয় যখন দেখে যুবক সম্প্রদায়ের আদর্শ এত নিচু বা দেশপ্রেম বলতে কিছু নেই। আসলে ছেটবেলা থেকে যে মানসিকতা নিয়ে এ ছেলেগুলো বেড়ে ওঠে, বড় হয়ে সিনেমা, থিয়েটার এবং সাংবাদিকতায় তারই প্রতি লুন দেখতে পায়। এ যেন আঙমের সঙ্গে ঝড়ের হাওয়া এসে ফুঁ দেওয়ার মত অবস্থা।

আমি কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিলাম। যেটা আগে আমার ধারণায় ছিল না, সেই ব্যাপারটা এরকম;

উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন মানুষের ভেতরে দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদী আদর্শ জাগরিত করা। যা ছাড়া সমাজকে কিছুতেই ওপরে টেনে তোলা যাবে না। কিন্তু সেটা করতে প্রথমেই শিক্ষা এবং পারিবারিক পরিবেশের আনুল পরিবর্তন দরকার। প্রত্যেকের সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সচেতনতারও প্রয়োজন; সর্বোপরি দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকাও মহৎ হওয়া চাই— একমাত্র তাহলেই সে দেশের নাগরিক হিসেবে গর্ব অনুভব করা যাবে। মানুষ যাকে ভালবাসে, তারই জন্য যে সংগ্রাম করতে পারে; আর যেটাকে সে শুন্দি করে, তাকেই সে ভালবাসতে পারে। আর শুন্দি করার জন্য সেই বিষয়টা সম্পর্কে পুরো না হলেও কিছুটা জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

যেইমাত্র সামাজিক সমস্যায় আমার উৎসাহ আসে, সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তি সম্পর্কে বিচার বিবেচনা শুরু করি। নতুন আর একটা অনাবিস্তৃত জগতের পর্দা চোখের সামনে থেকে সরে যায়।

১৯০৯-১০ সালে আমার অবস্থা অনেকটা ভাল অর্থাৎ কায়িক শ্রমের কাজ করে আর আমাকে পেট ভরাতে হয় না। আমি তখন স্বাধীনভাবে ড্রাফটস্ম্যান এবং জল রঙ্গের অংকন শিল্পী হিসেবে যা রোজগার করি তাতে পেটে ভরবার মত ঝটি কেনার সামর্থ্য হয়েছে। এবং সেই রোজগারে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। যদিও যথেষ্ট রোজগার নয়, তবুও পেশাটাকে আমি ভালবাসি। আমাকে ভবিষ্যত উৎসাহ দেয়। তদুপরি সঙ্ক্ষেপেলায় যখন আমি ঘরে ফিরে আসি, আগেকার মত অতো পরিশৃঙ্খল হই না। আগে যখন আমি বাড়ি ফিরতাম তখন পড়াশোনা করার মত অবস্থা আর থাকত না। শরীরটাকে কোনরকমে বিছানায় ছুঁড়ে দিতে পারলে বেঁচে যেতাম। আমার বর্তমান কাজকর্ম ভবিষ্যতের পেশাভিত্তিক। সর্বোপরি আমি আমার কর্মসময়ের নির্ধারক, এবং নিজের মত অনুযায়ী সেই কার্যসূচি পরিবর্তন বা সময় ভাগ করাও আমার হাতে। আমি ছবি আঁকতাম পেট ভরাবার জন্য, এবং পড়াশোনা করতে ভালবাসতাম বলে।

এভাবে সামাজিক সমস্যাগুলোর পুঁতিগত দিকটা বুঝতে পারি, যাকে সাহায্য করে দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। যে সমস্ত বইপত্র এ বিষয়ে নিয়ে লেখা, আয় সবই আমি জোগাড় করে নিয়ে পড়তাম। শুধু পড়া নয়; বীতিমত চিন্তাও করতাম সেগুলো নিয়ে। সেজনই লোকে আমাকে খামখেয়ালী বলে ভাবত।

সমাজ সংস্কার ছাড়া আমি সাধ্বে আর্কিটেকচার বিষয়ে পড়াশোনায় ঝাপিয়ে পড়ি। পাশাপাশি মনোনিবেশ করি সংগৃহীত চৰ্চায়। যেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করতাম আর্টের রানী। আর সবচেয়ে বড় কথা এ ব্যাপারে আমার যেমন উৎসাহ ছিল, আনন্দও পেতাম প্রচুর। আমি সারাবাবত ধরে এমন কি ভোর হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে চৰ্চা বা পড়াশোনা করতাম। এবং দিনে দিনে আমার আত্মবিশ্বাসও দৃঢ় হয়। সময়ে আমার স্বপ্ন সফল হবে; হয়তো বা তারজন্য আমাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে। আমি এখন সুনিশ্চিত যে একদিন বড় স্থপতি শিল্পী হব।

আমার পেশাগত পড়াশোনার পাশে পাশে রাজনীতি সম্পর্কেও পড়াশোনা করতে শুরু করি। 'কিন্তু রাজনীতি বিষয়টাই' আমার মনে তেমন একটা গুরুত্ব পায় না। বরং ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার তখনকার ধারণা যে প্রতিটি চিন্তাশীল লোকের রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রাথমিক কর্তব্য। যাদের পারিপর্যাক জগত্তার রাজনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান নেই, তাদের আলোচনা বা সমালোচনার কোন অধিকারই নেই। রাজনীতি সম্পর্কে আমি যথেষ্ট পড়াশোনা করি, এবং বলতে দ্বিধা নেই পড়াশোনা বলতে তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা যা বোঝে, আমার কাছে তা ছিল অন্য।

আমি এমন অনেককে জানি যারা বইয়ের পর বই, পাতার পর পাতা পড়ে চলে, তবু আমি তাদের পাঠক বলি না। হয়ত বা তারা অনেক পড়ছে! এমনকি তাদের কোন স্টেট প্রয়োজনীয় আর কোনটা অপ্রয়োজনীয় সেটুকু তফাও করার মত ক্ষমতা নেই। সুতরাং তাদের অবস্থা আগেরটা পড়ে তা পরেরটা ভোলে; তারপর আবার সেটা পড়ে। আর নইলে সমস্ত ব্যাপারটাই অপ্রয়োজনীয় মাল বোঝাই জাহাজের মত মাথা ভারী করে। পড়াশোনা ব্যাপারটা শেষের জন্য নয়; বরং শেষের দিকে পা বাড়াবার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। একটা মূল উদ্দেশ্যই হল প্রত্যেকের ভেতরে যে সুগু প্রতিভা বা বিশ্বাস ঘূরিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলা। দৈনন্দিন রংগিটির রেজগার অথবা বড় কাজ করার বাসনা— একমাত্র পড়াশোনাই এর রসদ এবং উৎসাহ জোগাতে পারে। এগুলোই হল পড়াশোনা করার প্রথম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি সেটা সম্পর্কে পড়াশোনাই সম্যক জ্ঞান আমাদের দিতে পারে। উভয়ক্ষেত্রেই সমস্ত অধীত বিষয় মন্তিক্ষে জড়ো করে রাখার প্রয়োজন নেই। পড়াশোনার মাধ্যমে যে ছোট ছোট জ্ঞান আহরিত হয়, সেটা মোজাক করা মেরেতে পাথরের মত গেঁথে রাখা উচিত। যাতে ভবিষ্যতে সাধারণ জ্ঞানের পরিপূর্ণতার জন্য সঠিক সময়ে টুকরোটা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। নইলে অধীত বিষয়গুলো প্রয়োজনের সময়ে শুধু গোলমালের সৃষ্টিই করবে; এগুলো শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, প্রয়োজনের সময়ে বিপথগামীও করতে পারে। কাবণ সে তো নিজেকে সব সময় বিদ্যান বলে ভাববে; মনে করবে জীবনের অনেকটাই বুঝি সে দেখে ফেলেছে। সে তখন আত্মবিশ্বাসে ভরপূর। সে মনে করে জীবনে সত্যের দিকে এগোচ্ছে, কিন্তু সত্যি বলতে কি এগুলো তাকে সত্যিকারের জীবন থেকে দূরেই সরিয়ে দেয়। যদি না তাকে শেষজীবনে স্যানিটোরিয়াম বা রাজনীতি গ্রহণ করে পার্লামেন্টে জীবন পাঢ়ি দিতে হয়।

এসব লোকেরা জীবনে যখন সুযোগ আসে তখন তাদের বই পড়া বিদ্যা কাজে লাগাতে সক্ষম হয় না। বিশেষ করে তার মানসিক গঠনটাই তো দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তার জন্য তৈরি নয়। মাথায় হয়তো বা বোঝাই বই পড়া বিদ্যা জয়া হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু ভাগ্যক্রমে যদি একদিন হঠাতে ডাক পড়ে যে সে বিদ্যা কাজে লাগাও কোন একটা বিশেষ কাজের জন্য; কিন্তু কোন বইয়ের কোন অধীত পৃষ্ঠাটাকে ঠিক সেই সময় সেই কাজে লাগাতে হবে তা বলে না দিলে বেচারা এত পড়াশোনা করেও শুধু হাতড়ে মরবে। মনের এ উৎসেক অবস্থায় সে হয়ত মন হাতড়ে ঘটনার সাদৃশ্য কিছু খুঁজে বেড়াবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হয়ত বা দেখা যাবে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে।

এ যদি সত্যিকারের অবস্থা হয়, তবে আমাদের দেশের পার্লামেন্টের যারা তাবড় তাবড় নায়ক, তাদের কাছ থেকে রাজনীতির ব্যাপারে কতটুকু আশা করতে পারি। আসলে তারা তাদের কথার জাল বিস্তার করে, বিস্তি খেউড় করে আর ছল চাতুরীতে সবাইকে ভোলায়।

অপরদিকে পঠিত বিদ্যা যে জ্ঞান সম্যকরণে আহরণ করে, তা বই, জ্ঞানীল বা বিজ্ঞানলিপি যা থেকেই হোক প্রয়োজনে তৎক্ষণাতে তা শ্রবণ করে সেটা কাজে লাগাতে পারে। যেটা সে পড়েছে সেই বিষয়টা মনের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে যায় যে সেটা শুধু মানসিক চিন্তাধারটাকেই সঠিক পথে চালনা করে না, মনটাকেও উদার করতে সাহায্য করে—যাতে সেটা সঠিক জায়গায় ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে। হঠাতে শেন বাস্তব সমস্যার মুখোয়াখি হয়ে পড়লে শূতির পৃষ্ঠা হাতড়ে সেই বিশাল জ্ঞান সমন্ব থেকে মুক্তাটা তুলে এনে জায়গা মত বসিয়ে দিতে পারে। এ পড়াশোনার কিছু অর্থ হয় বা এর কিছু মূল্য আছে।

বক্তা— যার হাতের কাছে খবর তৈরি নেই প্রতিপক্ষের বক্তব্য খণ্ডনের মত, তার এ বিদ্যার কোন অর্থ হয় না— তা তার নিজের যুক্তি যত ধারালাই হোক না কেন? প্রত্যেক আলোচনাতেই তার শূক্তি তাকে লজ্জায় ফেলে হারিয়ে দেবে। প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে বিশ্বাস করার মত যুক্তি সে খুঁজে পায় না সে সময়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত বক্তা তার নিজের যুক্তির জাল বিস্তার করে, ব্যাপারটা তখন ঘোরালো হয় না। কিন্তু ব্যাপারটা শুরুতর হয়ে ওঠে কোন বিশেষ জনসাধারণের ব্যাপার হলে, যখন সে ভাবে সব কিছুই তার জানা, আসলে সে কিছুই জানে না।

ছোটবেলো থেকেই পড়াশোনা আমি সঠিক পথে করতাম। উপরতু আমি ভাগ্যবান যে আমার শুভিশক্তি ছিল প্রথর এবং বৃক্ষিমান ছিলাম, যা পঠিত বিষয়কে শরণে রাখতে এবং জায়গা মত ঠিক মত প্রয়োগ করতে সাহায্য করত। সেইদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার ভিয়েনার প্রবাস জীবন আমার পক্ষে শুধু প্রয়োজনীয়ই ছিল না, উপকারীও ছিল বটে। আমার দৈনন্দিন কাজই ছিল বিভিন্ন সমস্যাগুলোকে নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করা। আমি যার জন্য বাস্তব অবস্থাগুলোকে সূত্রের মাধ্যমে বা সূত্রগুলোকে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে পারতাম। সূত্ররাং প্রতি বিষয়ে একদিকে পণ্ডিতাভিমানী তত্ত্ব আর অপরদিকে বাস্তব অবস্থায় ওপরটা দেখার বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেছি।

প্রাত্যক্ষিক জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি মনস্তির করি দুটো প্রশ্নের ব্যাপারে তত্ত্বের গভীরে আমাকে প্রবেশ করতে হবে; বিশেষ করে সামাজিক সমস্যার বাইরে।

এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে সঠিক কখন আমি মার্কস্ মতবাদের চরিত্র সম্পর্কে পড়াশোনা বা বিচার বিশ্লেষণ শুরু করি; তবু এটা সত্য নয় যে এ মার্কসীয় সমস্যা নিয়ে আমাকে খুব বেশি রকম মাথা ঘামাতে হয়েছে।

আমার যৌবনকালে সামাজিক গণতন্ত্র সম্পর্কে আমার যে ধ্যান-ধারণা ছিল তা অতি সামান্য; এবং সেই সামান্য অংশের ভেতরে বেশিরভাগটাই ভুল ধারণা। সত্যি বলতে কি বিশ্বজোড়া দুঃখের এটা একটা কারণ, তবু গোপন তোটদানের পদ্ধতি আমাকে সত্ত্বস্থ করেছিল। আমার বুদ্ধি এবং বিশ্ববী শক্তি যেন আমায় তখন বুঝিয়েছিল যে এ পথই হাবুসুর্গ শাসককে দুর্বল করে দেবে; যাকে আমি মনেধারণে ঘৃণা করতাম। যদিও এ পদ্ধতিতে দানুবিয়ন রাজ্যের হয়ত বা অস্তিত্ব থাকত না। এমন কি অন্ত্রিয়ার জার্মান সাম্রাজ্যের অস্তিত্বও হয়ত বা বিপন্ন হয়ে পড়ত, কারণ শ্লাভদের রাজন্যেতিক সাংগঠনিক দক্ষতা কতদুর ছিল তা যোটেই প্রাণাত্মিত নয়। সুতরাং আমার আগ্রহ ছিল এমন সব সংগ্রাম যাতে এসব শাসককুল পুরোপুরি ধ্রংস হয়ে দশলক্ষ লোক তাদের নিজস্ব জার্মান প্রকৃতি ফিরে পায়। পার্লামেন্টে যত বেশি হট্টগোল হবে, এ ব্যবিলোনিয়ান সাম্রাজ্যের পতন তত আসন্ন হয়ে উঠবে। তার মানে অন্ত্রিয়ার জার্মানদের মুক্তি। একমাত্র তখনই তাঁরা তাদের মাত্ত্বমির সঙ্গে একত্র হতে পারবে।

সত্যিকারের সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের প্রতি আমার এতটুকু বিরাগ বা বিত্তৃষ্ণা ছিল না। কিন্তু আমার অক্ষমতার জন্য আমি বিশ্বাস করতাম যে শ্রমিক শ্রেণীকে ওপরে তোলার এটাই একমাত্র পথ; এটা একটা প্রধান কারণ যে জন্য আমি সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের স্বপক্ষেই ওকালতি করে এসেছি, বিপক্ষে নয়। সোশ্যাল ডেমোক্রেট মুভমেন্টের যে দিকটা আমার ভাল লেগেছে তা হল অন্ত্রিয়ায় বসবাসকারী জার্মানদের জন্য ওদের সংগ্রাম, তাদের শ্লাভ কর্মরেডদের প্রতি সহানুভূতি। কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারি নি, যে যতদিন পর্যন্ত তাদের দিয়ে কাজ হবে, সোশ্যাল ডেমোক্রেট ততদিন পর্যন্ত তাদের এই চোখে দেখত।

সুতরাং সতের বছর বয়সে মার্কসইজম শব্দটাই আমার কাছে খুব একটা পরিচিত ছিল না, বরং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি যাকে সোশ্যালিজমের সর্বথক বলেই ধরে নিয়েছিলাম। সেইজন্যই বোধহয় ভাগ্য আমাকে হঠাতে বজ্রমুঠাঘাতে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে এটা জনসাধারণকে ধোকা দেবার এক অতি উত্তম পদ্ধতি।

অবশ্য এ সময় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সঙ্গে আমার সংশ্লব বলতে ওদের গণ মিটিংয়ে আমি স্বেচ্ছ দর্শক ছিলাম। পার্টির নীতি এবং তাদের সামাজিক শিক্ষা সম্পর্কে পার্টি নেতৃত্বের সামান্যতম ধ্যান-ধারণাও আমার ছিল না। হঠাতে আমাকে তাদের তথাকথিত শিক্ষা বা দর্শনের মুখ্যমূল্য হতে হয়েছিল। এভাবে কয়েক দিনের মধ্যে আমি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির স্বরূপ বুঝতে পারি, স্বেচ্ছ যে পরিবেশে আমার দিনগুলো কাটত তার জন্য। অন্যথায় এ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির স্বরূপ বোঝার জন্য আমাকে হয়ত বা একটা পুরো যুগ কাটাত হত। আর সামাজিক উন্নতি এবং খেমের ছদ্মবেশে পরম্পরার এ অতি বাস্তব সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ত দেশে বিদেশে; এবং কালে এ সংক্রামক ব্যাধিকে রোধ করা না গেলে পৃথিবীর বুক থেকে মানুষ জাতিটাকেই হয়ত বা নিশ্চিহ্ন করে দিত।

বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে জড়িত থাকাকালে আমি প্রথম সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সংস্পর্শে আসি।

আমি যখন কাজ শুরু করি তখনকার অবস্থা যোটেই ভাল ছিল না। জামা-কাপড়ের অবস্থা শোচনীয়। আমি তখন অবশ্য আমার কথাবার্তায় অত্যন্ত সতর্ক এবং ব্যবহারেরও প্রচণ্ড রকমের সংযত হয়ে চলতাম। আমি তখন আমার বর্তমানের দুরবস্থা এবং ভবিষ্যতের

ভাবনা, নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে বর্তমান পরিবেশ নিয়ে মাথা ঘামানোর মত না ছিল
মানসিক অবস্থা, না ফুরসৎ। আমাকে কাজ করতে হত নেহাত-ই পেটের দায়ে এবং
পড়াশোনা করার তাগিদে। ভবিষ্যতের এগিয়ে থাকার পথ ধরে অবশ্যই এ পরিকল্পনা আমার
ধীরগতিতে ছিল; যদি আমার কাজের তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে বিশেষ ঘটনা ঘটত, তবে হয়ত
বা বস্তু-বাস্তবদের সঙ্গে খেলামেশ করতাম না। এ সময় আমার ওপরে আদেশ হয় ট্রেড
ইউনিয়নে যোগ দেবার।

তখন অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে আমার জ্ঞান বলতে কিছু ছিল না। সত্যি বলতে কি
এর প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু আমাকে যখন বলা হল যে
ট্রেড ইউনিয়নে আমাকে নাম লেখাতে হবে, আমি সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করলাম।
পত্রাখ্যানের কারণ হিসেবে আমি বললাম, যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে
নিজেকে আমি কখনই জোর করব না। সম্ভবত এ কারণটাই আমাকে আমার সত্যিকারের পথ
থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। ওরা বোধহয় ভেবেছিল কয়েকদিনের ভেতরে আমার চিত্তাধারা বদলে
আমি ওদের বাধ্য হয়ে উঠব। কিন্তু ওরা এটা ভেবে যে প্রচণ্ড রকমের ভুল করেছিল তাতে
সন্দেহ নেই। সঙ্গাহ দুয়েক পরে আমি বুঝাতে পারি, প্রথমে রাজী যদি হয়েও যেতাম, কিন্তু
এর্তমানে বাজী হওয়া অসম্ভব। এ দুই সঙ্গাহে আমি আমার সহকর্মীদের আরো ভালভাবে
প্রশংসন পারি এবং নিজের মনটাকে এমন দৃঢ়ভাবে স্থির করি যে পৃথিবীর এমন কোন শক্তি
নেই যা আমাকে ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দেওয়াতে পারে। আসলে এখন আমি আমার
অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের স্বরূপটা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছি।

বলাবাহ্ল্য আমার চাকরির প্রথম দিনেই ব্যাপারটাতে তখন আমার বিরক্তি এসে গেছে।
দুপুরবেলা আমার কয়েকজন সহকর্মী শ্রমিক কাছের শুড়িখানায় গিয়ে হাজির হত, আর
অন্যেরা সেই নির্মায়মান বাড়ির একাংশে বসে তাদের মধ্যাহ্নের খাওয়া-দাওয়া সারাত;
বেশিরভাগ খাওয়া-দাওয়া বলতে বোঝাতো শকনো এক আধ টুকরো রুটি। অবশ্য এরা
সবাই সংসারী, বিবাহিত। তাদের স্ত্রীরা ভাঙা পাত্রে দুপুরের খাওয়ার জন্য স্যুপ নিয়ে আসত।
সঙ্গাহের শেষের দিকে শুড়িখানায় খাওয়ার লোক কমতে থাকত; বেশির ভাগই দুপুরের
খাওয়ার জন্য নির্মায়মান বাড়ির একাংশে ভিড় জমাত। পরে অবশ্য এর কারণটা আমি বুঝতে
পেরেছি। তখন তারা রাজনীতি নিয়ে তর্কে-বিতর্কে মেতে থাকত।

আমি বাইরে কোথাও বসে দুর্ধরে বোতলের সঙ্গে রুটির টুকরো চিবোতাম আর যে
পরিবেশে আমি বর্তমানের দিনগুলো কাটাচ্ছি তার দুর্ভাগ্যের কথা মনে মনে চিন্তা করতাম।
গাদও আমি ওদের কথাবার্তা বেশিরভাগই শুনতে পেতাম। আমার ধারণা, দলে টানবার জন্য
গুণ ইচ্ছে করেই আমাকে শুনিয়ে আলোচনাগুলো উঁচু স্বরে করত। কিন্তু আসলে
ওদের কথাবার্তা শুনে আমার মনটা আরো বেশি বিষয়ে উঠত। সেই সমালোচনায়
সবকিছুরই নির্দা চলত— বিশেষ করে জাতির উদ্দেশ্যে; কারণ তা নাকি খালি বড়লোকদেরই
স্বার্থ দেখেছে। (এ কথাটা আমাকে যখন তখন প্রায়ই শুনতে হত।) ফাদারল্যান্ড অর্থাৎ পুরো
দেশটাই নাকি বুর্জোয়াদের হাতে এবং তারা ইচ্ছে মত শ্রমিক শ্রেণীর ওপর নিরস্কৃশ শোষণ
চালিয়ে যাচ্ছে। শাসক স্থুলের কাজই নাকি প্রলেতেরিয়াত্ গোষ্ঠীকে নিচে ঠেলে ফেলে
দেওয়া; ধর্ম তো শুধু লোকদের ফাঁকি দিয়ে প্রতারণা করার জন্য; আদর্শ-টাদর্শ কথাগুলো

দ্রেফ লোকদের বোকা বানানো আৰ মেয়েদেৱ মত জনতাকে সুবোধ রাখাৰ জন্য। এমন কিছু বিষয়বস্তু বাদ থাকত না যা তাৰা আলোচনাৰ নোংৱা কাদায় টেনে না নামাত।

প্ৰথমদিকে আমি চুপচাপ থাকতাম। কিন্তু এমনি মুখে কুলুপ এঁটে আৱ কতদিন থাকা যায়। শেষে ওদেৱ আলোচনায় অংশ নিতে উৱে কৰিব; এবং তাদেৱ বক্তব্যেৰ উত্তৰ দিতে থাকি। যদিও জানতাম এসবেৱ কোন ফলই পাওয়া যাবে না, যতক্ষণ না পৰ্যন্ত আমি ওদেৱ আলোচনাৰ বা সমালোচনাৰ সঠিক উত্তৰ দিতে পাৰছি, সুতৰাং আমি স্থিৰ কৰিব ওৱা যেখন থেকে ওদেৱ জ্ঞান বৃক্ষি আহৰণ কৰে, সেই জ্ঞানগাণনাৰ খৌজ খবৰ আমাকে রাখতে হবে। সুতৰাং আমি বই এবং পত্ৰ-পত্ৰিকাৰ সমূদ্রে ভুবে যাই।

ইতিমধ্যে সেই নিৰ্মাণীয়মান বাড়িৰ মধ্যে বসে আমাদেৱ তক্ক-বিতৰ্ক চলতেই থাকে। দিনে দিনে তাৰা যেসব বিষয়ে নিজেদেৱ বিশেষজ্ঞ বলে মনে কৰত, তাদেৱ চেয়ে সেসব বিষয়ে আমাৰ জ্ঞান অনেক বেশি বেড়ে যায়। তাৰপৰ একদিন আসে যখন আমাৰ আহৰিত জ্ঞানেৰ ধাৰালো কথাগুলোকে তাদেৱ জোৱালো যুক্তি দিয়ে খণ্ডনেৰ প্ৰয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু যুক্তি থাকলে তো খুজে পাবে। সুতৰাং শুৱু হয় আমাকে গায়েৰ জোৱে ভয় দেখালো। দলেৱ কয়েকজন নেতা আমাকে সেই চাকৰি ছেড়ে দিতে আদেশ দেয় নইলে মাৰধোৱ কৰে তাড়াবে। আমি একা হওয়াতে গায়েৰ জোৱে ওদেৱ সঙ্গে পেৱে উঠব কেমন কৰে? সুতৰাং আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ বুলিতে আৱো কিছু অভিজ্ঞতা ভৱে নিয়ে প্ৰথম সুযোগেই তাদেৱ সংশ্রে ত্যাগ কৰিব।

যদিও আমি বিৱৰিতিতে দূৰে চলে গিয়েছিলাম, তবু পুৱো ব্যাপারটা আমাৰ মনকে এত প্ৰচণ্ডভাৱে নাড়া দিয়েছিল যে কিছুতেই আমাৰ পক্ষে তাৰ দিকে পেছন ফিৰে থাকা সহজ হয়নি। পুৱো ব্যাপারটা নিজেই চিন্তা কৰতে বাধা হয়েছিঃ। বাগ পড়ে এলে আবাৰ আমাৰ মধ্যেকাৰ একগুৰুমিটা ফিৰে আসে এবং যে কোন মূল্যেৰ বিনিময়ে আমি আবাৰ বাড়ি তৈৱিৰ কাজে ফিৰে আসাৰ জন্য মনস্থিৰ কৰিব। এ চিন্তাধাৰাটা কয়েক সপ্তাহ পৱে আৱো বেশি দৃঢ় হয়, কাৰণ সংশ্লেষণ বলতে শুল্ক যে কয়েকটা টাকা ছিল, ইতিমধ্যেই তা ঘৰচ হয়ে গেছে। কৃধা তাৰ নিৰ্ময় থাবা আবাৰ হেনেছে আমাৰ ওপৰ। অন্য কোন বাস্তো আমাৰ সামনে খোলা নেই। কাজ খুজে পেলেও আমাকে আবাৰ তা ছেড়ে দিতে হয়। কাৰণ সেই আগেকাৰ অবস্থা।

তখন আমি আঘ্ৰিবিশ্বেণ শুৱ কৰিব। এ মানবগুলো কী মহৎ মানুষেৰ পৰ্যায়ে পড়ে? উত্তৱটা রীতিমত চাঞ্চল্যাকৰ। যদি উত্তৱ হয়— হ্যা, তবে এত বিপদ এবং আঘ্ৰত্যাগ নিয়ে এ ইতৱ শ্ৰেণীৰ জন্য সংগ্ৰাম কৰা অনৰ্থক। অপৰদিকে যদি উত্তৱ হয়— না, তবে এ লোকগুলোৰ জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হওয়াৰ যোগ্যতা একেবাবেই নেই। অৰ্থাৎ আমাদেৱ জাতি সত্ত্ব তা হলে গৱীব। সেই দ্বিধাপূৰ্ব মানসিক দিনগুলোয় গভীৰ মনসংযোগ দিয়ে মানস চোখে আমি যেন দেখতে পাই ক্ৰমাগত বেড়ে চলা এ লোকগুলোকে জাতিৰ উন্নতিৰ পথে হিসেবে আনা কোনৱকমই সম্ভব নয়।

কয়েকদিন পৱে আমাৰ মানসিকতা সম্পূৰ্ণ ভিন্ন পথে মোড় নেয়। বাঙা দিয়ে যেতে দেখি কিছু ভিয়েনাৰ শ্ৰমিক বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰাবে। আমি প্ৰায় ধৰ্মী দুয়েক স্থিৰ নিচিলভাৱে সেই মনুষ্যকুপী ড্ৰাগনদেৱ দেখি। যখন জায়গাটা পড়িত্যাগ কৰে আমাৰ বাড়িৰ দিকে বওলা হই, তখন মনটা হতাশায় ভৱে ওঠে। যেতে যেতে একটা তামাকেৰ দোকানে শ্ৰমিকদেৱ

সংবাদপত্র নজরে আসে। সংবাদপত্রটির নাম আরবাইটার ঝাইটুঙ্গ বা শ্রমিকদের মুখপত্র। এটাই হল পুরনো অস্ত্রিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির মুখপত্র। সে সন্তা চাষের দোকানে যেখানে সাধারণ মানুষ ভিড় করত, সেখানে মাঝে মাঝে আমিও যেতাম এ পত্রিকাটা পড়ার জন্য। দোকানদার এ একটা পত্রিকাই রাখত। কিন্তু কখনই কয়েক মিনিটের বেশি এ কদর্য সংবাদ পত্রিয়া আমি চোখ বোলাতে পারিবি; আসলে পত্রিকাটার মূল সুরটাই কেমন যেন এক বিশ্বী গন্ধে শুরু। কিন্তু সেদিনকার দেখা বিক্ষেপে আমার মনে যে হতাশার সৃষ্টি করেছিল, সেটাই যেন আমাকে বারবার পত্রিকাটা কিনে খুঁটিয়ে পড়ার তাগাদা অন্তর থেকে দিছিলো। পুজোরাগ পাঠকাটা কিনে আমি বাঢ়ি শিয়ে সমস্ত সকো ধরে পড়ি। নজর এড়ায় না যে কতগুলো মিথ্যা পত্রিকাটা সত্য বলে চালাচ্ছে।

এখন আমি অন্যান্য বইয়ের থেকে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির দৈনিক পত্রিকাগুলো কিনে পড়ে সহজেই ওদের সত্যিকারের রাজনৈতিক দর্শনের চরিত্রাত্মা অনুধাবন করতে পারি।

দুটো সত্যের মাঝখানের ফরাকটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি পত্রিকাগুলো যদিও মুখে স্বাধীনতা, শ্রমের র্যাদা এবং জীবন সম্পর্কে বড় বড় শব্দ বসিয়ে অবতারের উপস্থিতে মানুষকে আশাস দিত; কিন্তু এটা পাঠকদের ধোকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরদিকে মানুষের লোভটাই নির্দয়ভাবে প্রকট হয়ে উঠত। কোন কিছুরই সাংবাদিকারের ভিত্তি তাতে ছিল না, শুধু মানুষকে প্রতারণা করা ছাড়া। এ সাংবাদিকতা সত্য সংবাদ মোটু দিয়ে ঘূরিয়ে এমনভাবে পরিবেশন করত যাতে সত্যিকারের সংবাদ বোঝা নাগোর পক্ষে স্বত্ব ছিল না। আর এ পুঁথিগত তথ্য নিয়ে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ সম্পদায় যারা নিজেদের বুদ্ধিমান ভাবতো, তারা আঘ সন্তুষ্টিতে ভুগত। এ সংবাদপত্রগুলো জনগণের কাছে মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।

এভাবে এবং সংবাদপত্রগুলোর মাধ্যমে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির উপনে শাবলী পড়ে আমার দেশের মানুষের প্রতি আমাকে আরো বেশি আকর্ষণ করে। যেটাকে আমি প্রথমে অনিত্তিএ্য গহ্বর বলে ভেবেছিলাম, পরে সেটা অনেক বেশি স্বেহ নিয়ে সমন্বন্ধে এসে দাঁধায়।

একবার যখন বুঝতে পারি নী বিরাট পদ্ধতিতে ওরা জনগণের মনকে বিশ্বাস করে তুলেছে, তখন একমাত্র বোকারাই এর বলী হতে পারে। সেই বছরগুলোতে যখন আমি ক্রমে এমে স্বাধীন চিত্তার জগতে পা রাখতে শুরু করেছি, তখন আমি ভাল ভাবেই বুঝতে শিখেছি, কি করে ওরা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির সুসমাচারের মাধ্যমে জয় নাও করবে। এখন আমি উপলক্ষ্য করতে পারি কেন এবং কী উদ্দেশ্যে ভাল ভাল বই এবং সংবাদপত্র পড়া ওরা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বিশেষ করে যে সব বই আদৌ লাল বলে গণ্য নয়। কিন্তু লাল মিটিংয়ে যোগাদান করা নিষিদ্ধ হয়নি। পরিকার নিষ্ঠুর বাস্তবের আনন্দে আমি ভবিষ্যতকে যেন দেখতে পাই। যে ভবিষ্যত এ অসহ্য উপদেশাবলীতে কালো হয়ে গেছে।

বিরাট গনমানসকে একমাত্র তাদের দৃঢ় এবং অনমনীয় মন দ্বারাই মাপা যায়। যেমন যেয়েদের অন্তর মানস এতটা নিষ্ফল যে কোন কারণে দোলা থায় না, কিন্তু মিথ্যা আর ধাবেগে তারা তাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত করে। শক্ত মানুষের কাছে দুর্বলরা সত্ত্ব যেমন ধাথা মোওয়ায়— ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষ শক্ত শাসকের কাছে প্রার্থনা জানাতে ভালবাসে। যদিও সেই শাসক আবার তাদের উপদেশাবলীর আড়ালে মানসিক নিরাপত্তার

আশ্বাস দেয়। কারণ সাধারণ জনতার পছন্দ সম্পর্কে কোন ধ্যান-ধারণা থাকে না। এবং সবসময় তারা ভাবে যে সমাজ কর্তৃক তারা পরিত্যক্ত। বুদ্ধির দিক দিয়ে তাদের ভয় দেখালেও তারা লজ্জিত হয় না। কারণ তারা চিন্তাতেও আনতে পারে না যে মানুষ হিসেবে তাদের স্বাধীনতা নির্লজ্জের মত তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাদের সামান্যতম সন্দেহ হয় না যে তুল মতবাদটাই তারা স্বাভাবিক বলে মেনে নিচ্ছে। একমাত্র নির্দয় শক্তি এবং বীতৎসুতার কাছেই তারা মাথা নত করে।

যদি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসিকে সত্যিকারের শিক্ষা দিয়ে বিকুন্ঠতা করা যায় তবে সে সংগ্রাম হবে তিক্ততায় পরিপূর্ণ। তবু এ সত্যিকারের শিক্ষাই হবে চিরস্থায়ী অবশ্য যদি ঠিক একই রকম নির্দয়ভাবে সঙ্গে সেটাকে কাপায়িত করা সম্ভব হয়।

মাত্র দু বছরেরও কম সময়ে এ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির প্রকৃত শিক্ষা ও তাদের কলাকৌশল রঞ্জ করে ফেলি।

আমি ওদের এ কুখ্যাত কলাকৌশল যেটা দিয়ে ওরা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে ভয় পাওয়ায় সেটা সহজেই অনুধাবন করি। এ ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার জন্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কখনই মানসিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি রাখে না। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির কলাকৌশল হল আর কিছুই নয়, একরাশ প্রজ্ঞালিত মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে তাদের চোখে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ত্য পাইয়ে দেওয়া, যতক্ষণ না পর্যন্ত লোকটার মানসিক শক্তি ভেঙে পড়ে এবং তাদের কাছে আস্তসমর্পণে বাধ্য হয়। কারণ তখন লোকটার মনের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যখন সে একটু শাস্তিতে থাকতে পারলে বেঁচে যায়। কিন্তু তাদের আশা দুরাশাই হয়ে দাঁড়ায়; কখনই তাদের শাস্তিতে থাকতে দেওয়া হয় না।

ওই কলাকৌশল বাবে বাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়, যাতে লোকটা উন্নাদ কুকুরের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়, ওদের কাছে নিঃশর্তভাবে আস্তসমর্পণ করে।

যদিও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় শক্তির মূলা বুঝতে শিখেছে, সেই কারণে যখনই কোন লোকের মধ্যে ব্যক্তিত্বের গুরু পায়, যেটা অবশ্য খুবই কম, তাকেই বশে আনতে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে। অপরদিকে দুর্বল মানুষগুলো মরা ইতর প্রাণী ছাড়া আর কিছুই নয়, অত্তপক্ষে মানসিক শক্তির দিক থেকে, তাদের প্রশংসা এবং উৎসাহ দিয়ে নিজেদের দলে ভেড়ায়। যে প্রতিভাব মানুষের ইচ্ছাশক্তি থাকে না, তারাই কম ভীতিপ্রদ। যে সব বলিষ্ঠ চরিত্রের সঙ্গে বৃক্ষ ঘোগ দেয়, তারা বৃক্ষ এবং ইচ্ছাশক্তির জোরে নেতৃত্বের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটোর ভালভাবেই জানে কি করে জনগণের মনের ওপরে চাপ ফেরতে হয় যে তারাই একমাত্র শক্তির ধারক ও বাহক। এভাবে অবস্থা অন্যায়ী ধীরে ধীরে তারা তাদের জন্মের দিকে এগিয়ে চলে। একের পর এক জায়গা দখল করে। কখনো বা ভয় দেখিয়ে কখনো দিন দুপুরে ডাকাতি করে। এ শেষের পদ্ধতি ত্রুটা প্রয়োগ করে যখন জনতার আকর্ষণ অন্য কোন বিষয় বস্তুতে নিবন্ধ হয় এবং তা ফিরে না চায়। অথবা যখন সাধারণ মানুষ মনে করে নগণ্য কোন ঘটনাকে ওরা বিকৃত করে এবন্ত পক্ষের চরিত্র হনন করছে।

এ কলাকৌশলগুলো মানুষের দুর্বল দিকটাকে সাঁঠিক বিবেচনা করে অংকের মত হিসেব কাব্য তৈরি করা হয় যাতে সাফল্যে কোন সন্দেহ না থাকে, অবশ্য যদি না প্রতিপক্ষ শেখে বিষ দাম্পের বিরুদ্ধে কি করে বিষবাপ্প দিয়ে যুদ্ধ করতে হয়। দুর্বল প্রযুক্তির হোকদের

প্রতিটি পদক্ষেপে বলে দিতে হয় এটা হওয়া উচিত বা উচিত নয়। আমিও অবশ্য বুঝতে শিখলাম শারীরিক ভয় প্রদর্শন দ্বারা জনতা বা একক ব্যক্তিকে দিয়ে কোন একটা উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। এ ব্যাপারে সদেহ নেই যে সোশ্যালিস্টরা গণিতিক ছক কষে নিয়েছিল যে তাদের শারীরিক পাঠগ্রন্থ দ্বারা কর্মসূলে বা কারখানায়, জামায়েতে বা গণবিক্ষেপে এ ভয় প্রদর্শন সব সময়ই সফল হবে, যদি না তার চেয়ে বেশি ভয় এবং বীভৎসতা অপরপক্ষকে দেখানো যায়। তখন অবশ্য পার্টি মরণ আর্তনাদ করে উঠবে। এ ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার বিরুদ্ধে সেই শাসকগুলের কাছেই আবেদন জানাবে, যে শাসককুলকে তারা স্বীকার করে না বা পার্তি দেয়া না। এ ভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের লক্ষ্যপথ থেকে সরে আসবে এবং নিজেদের গান্ধারাশুল অনেক বেশি অরক্ষিত হয়ে পড়বে। তারা তখন প্রাণপণ চেষ্টা করবে উচু পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে ঘাঁড়ের মত বোকা কয়েকটাকে খুঁজে বের করতে; যারা বোকার মত চেষ্টা করলে অপরপক্ষের ভয় মিশ্রিত শুন্দি অর্জন করার, যাতে তারা তার ভবিষ্যতের বিপদ-আপনের সময় সাহায্যে আসে, এবং সে তাদের বর্তমান পথের কাঁটাটাকে ভেঙে ফেলে দূরে সরিয়ে দিতে সহায় হবে।

এ ধরনের কলাকৌশল সাধারণ গণমানসে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া তুলবে, অনুগত বা নিরুৎপক্ষ যে-ই হোক না কেন, একমাত্র তারাই বুঝতে পারবে যাদের জনতা চরিত্র ধালশুব্দে জানা আছে। হ্যাঁ, বইগড়া বিদ্যো নিয়ে নয়, নিকট অভিজ্ঞতা থেকে। এ সামলাগুলোই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসিস অনুগতরা শিঙ ফুঁকে নিজেদের সঠিক বলে প্রচার করে বেড়ায়। অপরাদিকে মার খাওয়া প্রতিপক্ষ বেশির ভাগ সময়েই নিজেদের প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রতি আস্তা হারিয়ে ফেলে।

যতই এ শারীরিক ভয় প্রদর্শন করতে থাকে, তত বেশি সহানুভূতি আমার জেগে ওছে সাধারণ জনসাধারণের প্রতি, যারা ভয়েই ওদের বশীভৃত।

সেই সময় যে সব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাকে পথ হাঁটতে হয়েছে তার জন্ম আমি নির্জেকে ধন্যবাদ দেই কারণ এটাই আমাকে জনসাধারণের কাছে এবং জনসাধারণের প্রতি ভাবতে সাহায্য করেছে। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি নকল নেতৃত্ব এবং সেই নকল নেতৃত্বের বশীভৃত বিপথগামী লোকগুলোকে আলাদা করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আমাদের উচিত এ যুক্তিক্ষেত্রে বলি হওয়া লোকগুলোর প্রতি সহানুভূতি দেখায়ন। তাঁর এখানে কয়েকটা উদাহরণ দেব যে লক্ষণগুলোর সাহায্যে সামাজিক নিচুতলার নোকওয়ের মানসিকতা বোঝা যাবে। কিন্তু আমার লেখা চরিত্রগুলো কিছুতেই জীবন্ত হয়ে উঠবে না, যান্তে না আমি স্বীকার করেনি যে সেই অস্বীকার সামাজিক নিচুতলার লোকগুলোর মধ্যেই আবেক্ষণ্য পূর্ণত্ব দেখেছিলাম: তাদের মধ্যেও কয়েকজন ছিল অবশ্যই সংখ্যায় অত্যন্ত কম, যদিনে প্রাথোৎসর্গ এবং অনুগত মনোভূমির সংজ্ঞামের সত্ত্বাকারের সঙ্গী হওয়ার যোগ্যতা বাঁচে। যেখানে প্রায় কিছুই চায় না এবং যে সাধারণ পরিবেশ তাদের ঘিরে থাকে, তাতেই তারা সন্তুষ্ট; এ শুণগুলো! বিশেষ করে পুরুনো শুমিকদের মধ্যে দেখা যেত। যুবকদের মধ্যে দেখে এ দিশের শুণগুলো দ্রুত অবরুদ্ধ পেশেও তার জন্য শহরে পরিবেশ ও আধিপতাই দায়ী; এই শুণ যুবকদের মধ্যেও কিছু ছিল যারা আন্তরিকভাবে একটা আদর্শকে (সেই নোংরা নৈর্বাণ্য ধাননে কোনোকমে বেঁচে থাকার পরিবেশের মধ্যে থেকেও) বুকের মধ্যে স্থায়ত্বে লালন পানন নান্থ। যদি ওদের মধ্যে কেউ ধন্যবাদাদাতন্ত্রের শক্তিদের সমর্থন করে থাকে, তবে তাঁর ক্ষমতা

কারণ হল সোশ্যালিস্ট আন্দোলনকারীদের কুখ্যাত মতবাদ তারা বুঝতে পারত না। এর আরো একটা কারণ হল জনসাধারণের কোন অংশই শ্রমিকদের ভাগ্য সম্পর্কে কোনরকম চিন্তা-ভাবনা করত না। আসলে সামাজিক অবস্থাটাই ছিল এ ধরনের ছাঁচে ঢালা, যাতে প্রথমে অনিচ্ছুক হলেও শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হত। শেষে এমন একদিন এল যে দারিদ্র্যতার ত্যাংকর হাঁ মুখ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের দলে।

অসংখ্যবার বৰ্জুয়া অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় শ্রমিকদের মানবতার দিকে পর্যন্ত তাকায়নি; তাদের ন্যায় দাবি দাওয়ার চরম বিরোধিতা করেছে। এ অন্যায় এবং অবিবেচনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন লাভই হয়নি। কিন্তু তার ফলে সত্যিকারের সৎ শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে রাজনীতির দিকে বাধ্য হয়ে দৌড়ে গেছে।

লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যারা প্রথমদিকে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রচল বিরোধিতা করেছে; কিন্তু তাদের সেই বিরোধিতাকে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গায়ের জোরে এমনভাবে চূর্ণবিচুর্ণ করে দিয়েছে যে তারা একসময়ে বাধ্য হয়েছে নতি স্বীকার করতে। তবু আমি বলব এ পরাজয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চরম মূর্খামীর ফল। যারা শ্রমিক শ্রেণীর সমন্ত রকম ন্যায় দাবির শুধু বিরোধিতাই করে এসেছে। এ অপরিগামদর্শিতা যেটা শ্রমিকদের উন্মত্তিতে বাধা দিয়েছে, কারখানায় কর্মরত আহত শ্রমিকের অস্তিত্ব বিপন্ন করেছে বা নাবালক শ্রমিককে কাজ করতে বাধা দেয়নি; মহিলা শ্রমিকদের কোনরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেনি, বিশেষ করে গর্ভবতী মাদের এগুলো সম্বৃপ্ত হয়েছে একমাত্র সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিকদের নেতাদের সাহায্যে। যারা প্রতি মহুর্তে সুযোগ খুঁজে বেড়িয়েছে যাতে জনতাকে প্রতারিত করে নিজেদের জালে এনে ফেলতে পারে। আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদের নিজেদের ভূলে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তা কখনই সারাতে পারবে না। কারণ সামাজিক সংস্কারের সবরকম বিরোধিতা করে তারা আসলে ঘৃণার বীজ বপন করেছে। এটাকেই ওরা অর্থাৎ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট্রা শ্রমিকদের স্বার্থ দেখেছে বলে দাবি করেছে।

এগুলোই হল ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অস্তিত্ব বিপন্নের সত্যিকারের কারণ; এবং তার ফলে শ্রমিক সংগঠনগুলো সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে।

সামাজিক এ যে সমস্যাগুলো আমাকে ধিরেছিল সেগুলো বিশ্লেষণ করে আমি চাই বা না চাই একরকম বাধ্য হই নিজেকে ট্রেড ইউনিয়নের দিকে এগিয়ে দিতে। কারণ আমি ভেবেছিলাম এগুলোও হল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অস্ত বিশেষ; বলতে বিধা নেই আমার এ তড়িঘড়ি মন ঠিক করা ভুল হয়েছিল। অবশ্যই পরে আমি এ ভুলটাকে বর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। কিন্তু এ বিশেষ ব্যাপারে আমার ভাগ্য আমাকে শুধু বুঝিয়েই দেয়নি; সেই সঙ্গে শিক্ষাও দিয়েছিল, যাতে করে পরে আমি আমার প্রথমের মনস্থির পরিবর্তন করি।

কৃতি বছর বয়সে আমি বুঝতে পারি যে ট্রেড ইউনিয়ন যেমন কর্মচারীদের দাবি এবং উন্নত জীবন ধারনের জন্য শক্তিশালী হাতিয়ার, অন্যদিকে তেমনি এ ট্রেড ইউনিয়ন রাজনৈতিক দলগুলোর শ্রেণী সংগ্রাম করারও যন্ত্র।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট্রা ট্রেড ইউনিয়ন চরিত্রের এ দিকটা ভালভাবেই বুঝত এবং তা প্রয়োজনে নিপুণভাবে ব্যবহার করত। তারা ট্রেড ইউনিয়ন নামক যত্রটিকে এমন নিপুণভাবে ব্যবহার করত যে তাতে সাফল্য অবশ্যজাবী। অপরদিকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ট্রেড ইউনিয়নের চরিত্রের এ দিকটা অক্ষম হওয়ায় রাজনীতির পটভূমিকা থেকে শুন্দা হারিয়ে ফেলে। তারা

সব সময় ভেবে এসেছে যে তাদের একগুম্বো এ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বৃদ্ধি করবে এবং রাজনৈতিক পটভূমিকা থেকে জায়গা হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু এটা কখনই সম্ভব বা সত্য নয় যে ট্রেড ইউনিয়ন মূভমেন্ট জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থ। সত্য বলতে কি এর উল্টোটাই হল অনেক বেশি সত্য। যদি ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ শ্রেণী উন্নতির কাজে লাগান যায় এবং তা সাফল্যের সঙ্গে করা যায় তবে সেই ট্রেড ইউনিয়ন মূভমেন্ট পিতৃত্ব এবং শাসককুলের বিরুদ্ধে তো যাবেই না, বরং জাতির সত্যিকারের উন্নতির সহায়ক হবে। এ পথে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন হল জাতির শিক্ষায় একটা অতি প্রয়োজনীয় অস্তিবিশেষ। এটাকে শুধুমাত্র সঙ্গে মেনে নেওয়া উচিত, কারণ এটা শুধু সামাজিক দৃষ্টিত বীজাণুগুলিকে মারবে না এবং জাতির পারিপর্শিক এবং সামগ্রিক উন্নতির পথে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সুতরাং ট্রেড ইউনিয়ন যে অতি প্রয়োজনীয় এটা জিজ্ঞাসা করা শুধু নিষ্পত্তিযোজন তা নয়, অবাধ্যনীয়ও বটে।

যতদিন পর্যন্ত কর্মচারীরা সামাজিক সচেতন না হয় এবং ন্যায্য বিচার সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে, ততদিন পর্যন্ত তাদের মালিকদের কর্তব্য, যারা আমাদের জনসাধারণের একটা অবিছেদ্য অংশও বটে, সাধারণ ব্যক্তিদের লোভ এবং অযৌক্তিক স্বার্থ থেকে তাদের রক্ষা করা। জাতীয় স্বার্থেই কেবল যেমন জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা রাখা উচিত নয়, সুস্থান্ত্রের জন্য এটা প্রয়োজনীয়ও বটে।

এ দুই ব্যবস্থাকে অসাধু মালিকেরা তয় দেখিয়ে দাবিয়ে রেখে জাতির একজন সদস্য হিসেবে চরম অন্যায় করে চলত। তাদের ব্যক্তিগত তীব্র লালসা এবং দায়িত্বহীনতাই ভবিষ্যতের যত গঙ্গাগোলের বীজ বপন করেছিল। এ অন্যায়গুলোর প্রতিরোধ করা মানেই দেশের উন্নতি করা।

এখানে বলা নিষ্পত্তিযোজন যে যদি কোন শ্রমিক মালিকের তরফ থেকে অন্যায়ভাবে বর্ষিত হয়, তবে তার পরিপূর্ণ অধিকার আছে সেকথা স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অথবা সে চাকরিস্থল পরিভ্যাগ করার। না, এ যুক্তি বর্তমানে যে প্রসঙ্গ আলোচনা করতে বসেছি তা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। এ সামাজিক বিক্ষেপ দূরে সরানো উচিত কিনা এটাই হল আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন। যদি উচিত হয় তবে এমন এক শক্তিশালী অন্তর্দিয়ে সংগ্রাম করতে হবে যাতে সাফল্য অবশ্যানীয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একজন শ্রমিকের পক্ষে তার মালিকের প্রচণ্ড ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। এটাই যদি চলার আদর্শ হত, তবে তো সংযর্মের কোন কারণই থাকত না। এখানে প্রশ্ন হল কে বেশি শক্তিশালী? যদি ব্যাপারটা অন্যরকম হত বিচারের মানবত্ব ঝগড়াটাকে সম্মানের সঙ্গে মিটিয়ে দিতে পারত; অথবা ব্যাপারটাকে আরো বেশি সঠিকভাবে উপস্থাপনা করা যেত যাতে ঝগড়াটা গড়াতেই পারত না।

যদি অসামাজিক বা ঘৃণামগ্নিত ব্যবহার মানুষকে প্রতিরোধ করতে বাধ্য করে, তখন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ তাদের নিজস্ব যত্বাদ সেই প্রতিরোধের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, আইনসভা আইনের সাহায্যে এসব শয়তানী মতবাদগুলোকে অবশ্যই দূরীভূত না করলে। সুতরাং এর থেকে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে একক শ্রমিককে যদি এ যুদ্ধে জিততে হয় তবে তাকে তার সহকর্মীদের নিয়ে একটা যুজ্বল তৈরি করে তবে মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হবে। অবশ্য মালিক তার পেটোয়া লোকদের জড়ো করার আগেই। কারণ মালিক সবসময় তার পেটোয়া লোকগুলোকে জড়ো করে নিয়েই শিল্প অথবা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে থাকে।

এভাবেই শুধু যে ট্রেড ইউনিয়ান শ্রমিকদের সংঘবন্ধ করতে পারে তা নয়। ভবিষ্যতের বাস্তব ফলাফলের রাস্তাও খুলে দিতে সক্ষম হয়। এ পথেই তারা তাদের সংঘর্ষের কারণগুলো দ্রুত করতে পারে; যেগুলো হল তাদের অসম্মোষের মূল কারণ।

ট্রেড ইউনিয়ান যে সত্যিকারের পথে কাজ করে না তার জন্য দায়ী হল যারা আইনের সাহায্যে সংক্ষারের বা সংক্ষার করা হলেও সেগুলোকে পেছন থেকে ছুরি মেরে বাস্তবে রূপায়িত হতে দেয় না। আর এ সবগুলোই তারা করে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি দিয়ে।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল না এসব বোঝার বা ইচ্ছে করেই বুঝতে চাইত না যে ট্রেড ইউনিয়ান মূভমেন্ট কত দরকারি। আর সেই সুযোগে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ফায়দা উঠিয়েছে; পুরো মূভমেন্টটাকেই নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছে। এভাবে শক্ত একটা দুর্গ বানিয়ে যখনই সংগ্রাম আকার ধারণ করেছে তার আড়ালে মুখ লুকিয়েছে; সংগ্রামের সত্যিকারের উদ্দেশ্য মানুষ বিস্তৃত হয়ে গেছে তার বদলে নতুন দৃষ্টিপিং এসে জায়গা দখল করে বসেছে। ট্রেড ইউনিয়ান মূভমেন্ট যে উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল তা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিপদে ফেলতে সমর্থ হয়নি। বরং তারা সংগ্রামটার গতি কুকু এবং বিপথগামী করে দিয়েছে নিজেদের সুবিধার জন্য।

কয়েক মুগের মধ্যেই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা নিপুণ হাতে ট্রেড ইউনিয়ন মূভমেন্টটাকে যেটা সৃষ্টি হয়েছিল মানবাধিকার রক্ষার জন্য, সেটাকে জাতীয় অর্থনীতির ধ্বংস যত্নে পরিণত করে, শ্রমিকদের স্বার্থ যাতে এক মুহূর্তের জন্যও তাদের উদ্দেশ্যের পথ রোধ করতে না পারে। কারণ রাজনীতিতে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা খুব একটা কঠিন কাজ কিছু নয়; যদি একপক্ষ যথেষ্ট অসৎ আর অপরপক্ষ প্রচওরকমের নিষ্ক্রিয় ও অনুগত হয়। এ ব্যাপারে দেশের বর্তমান অবস্থা ওপরের দুটো পথকেই মেনে নিয়েছিল।

এ শতাব্দীর প্রারম্ভে ট্রেড ইউনিয়ান মূভমেন্ট তার নিজস্বতা অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে এটার সৃষ্টি তা হারিয়ে ফেলেছিল। সময়ের স্রোতে এ ট্রেড ইউনিয়ান মূভমেন্ট সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের রাজনৈতিক ছায়ায় ছলে যায়; তোম পর্যন্ত একটা শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপারে প্রাচীনকালে অবরুদ্ধ নগরীর দেওয়াল ভাঙবার জন্য কাঠের গুঁড়ির মুখে যে লোহা বাঁধানো থাকত, এ ট্রেড ইউনিয়ান সেই লোহা বাঁধানোর পর্যায়ে গিয়ে দাঢ়ায়। ওদের পুরো পরিকল্পনা ছিল অর্থনৈতিক রাজপ্রাসাদকে, যেটা অতি কষ্টে দিনের পর দিন বহু পরিশ্রমে গড়ে তোলা হয়েছিল; আঘাতের পর আঘাতে সেটাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া। একবার এ উদ্দেশ্য সফল করতে পারলে সমগ্র দেশের ধ্বংস শুধু সময় অপেক্ষার ব্যাপার, কারণ তার আগেই তো দেশ অর্থনৈতিক বুনিয়দ থেকে বঞ্চিত। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা কখনই শ্রমিকদের স্বার্থ দেখেনি। এবং দিনে দিনে এটা শূন্যের দিকে এগিয়ে ছলে যতক্ষণ না পর্যন্ত ধূর্ত নেতারা উপলব্ধি করে জনতার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চিনাধারা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে উপেক্ষা করা উচিত; কারণ যদি জনতার মধ্যে একবার আঘসত্ত্বষ্টির ভাব আসে তা হলে আর কখনই এ রাজনৈতিক সংগ্রামে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে না।

শ্রেণী সংগ্রামের এ বিভিন্ন ভবিষ্যত, তাদের এত বেশি উদ্বিগ্ন করে তোলে যে জনতার অসম্মোষ ভবিষ্যতে হয়ত বা আর অন্ত হিসেবে কাজ করবে না; এ ভেবে সমাজ সংক্ষারের প্রাথমিক ধাপগুলো তারা শুধু প্রতিরোধী করে না, ভেঙেও দেয়। দেশের অবস্থা তখন এমনই শোচনীয় যে এ সব নেতাদের বে-আইনি কাজ করার জন্য কোনরকম অসুবিধে হয় না।

যেহেতু জনতাকে সবসময় তাদের দাবি কি করে বাড়াতে হয় সেটাই দেখানো হত, তাই তাদের সন্তুষ্টির ভাব এমন দিশেহারা হয়ে যায় যে যেরকম উন্নতির ব্যবস্থাই করা হোক না কেন, তাদের কাছে তার কোন মূল্যই থাকে না। সুতরাং এটা তখন শ্রমিক শ্রেণীকে বোঝানো অসম্ভব ছিল না যে এ ধরনের হাস্যাস্পদ ব্যবস্থা হল তাদের সংগ্রাম শক্তিকে ভেঙে দেওয়ার পৈশাচিক পথ; শুধু তাই নয় তাদের সংগ্রামের ক্ষমতাও ভেঙে দেওয়া এর উদ্দেশ্য। যাদের বোঝাবার ক্ষমতা আছে যে সাধারণ মানুষের চিন্তাশক্তি কতটুকু, তারা এ পথের সাফল্যে আশ্চর্য হবে না।

মদার্পণ মন্দ্রবায়ের মধ্যে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের এ কলাকৌশলগুলোর প্রতি ন্যায়বরই এক ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ ছিল। কিন্তু তাদের তরফ থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার জন্য কোন সংগঠন করারই চেষ্টা করা হয়নি। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিকদের ব্যাববরই একটা ওয় ছিল যে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা ভাল হলেই বুর্জুয়া সম্প্রদায়ে যোগ দেবে; সুতরাং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের হাত থেকে শ্রেণী সংগ্রামে সবচেয়ে বড় অন্তর্টাই হাতছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটেনি।

বিপক্ষদের আক্রমণ করার চেয়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিজেরাই ওদের চাপ এবং ভয় প্রদর্শন মেনে নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এমন একটা পথ বেছে নেয় যা এত খুব এবং ভৌতিক, ফলে অচিরে সেটাকে বর্জন করতে বাধা হয়। সুতরাং সমস্ত অবস্থাটাই সেগামে দাঁড়িয়ে থাকে যেখানে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ব্যাপারটাতে মাথা গলাবার পূর্বে ছিল; কিন্তু ৬৩দিনে জনসাধারণের অসংযোগ চৰমে উঠেছে।

বিদ্যুৎ ঝড়ের মত মুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন রাজনৈতিক দিগন্তে এবং ব্যক্তিগত জীবনের ওপর চক্র কেটে বেড়ায়। জাতীয় অর্থনীতির অনিচ্ছিয়তা এবং পরিনির্ভরতা হল দেশের এবং ব্যক্তিগত শারীনতার ফেন্টে এক চৰম বিপজ্জনক ব্যাপার। সর্বোপরি এ মুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্রে ওধু হাস্যাস্পদ করে তোলেনি, ভাইয়ে ভাইয়ে বাগড়াও বাঁধিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শারীনতাকে কল্পন্তীকৃত করে ধৰ্মি তুলেছে— তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে হাত না মিলাও আমরা তোমাদের মষ্টিক চূর্ণ চূর্ণ করে দেব।

সেই সময়ে আমি মানবত্বের সত্যিকারের বন্ধুকে চিনতে পারি। দিনে দিনে আমার জ্ঞান শেখন বিস্তৃত হয়, তেমনি গভীরতাও বাড়ে; তবু অস্ত এ বিষয়ে আমার মত পরিবর্তনের কোন কারণ খুঁজে পাই না।

যতই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির বাইরের কল্পের সঙ্গে পরিচিত হই, তত বেশি এ মতবাদটার অস্ত্ব প্রকৃতি দেখার জন্য আমার ত্রুট্য বেড়ে ওঠে।

এ ত্রুট্য নিবারণের উপায় পার্টির প্রচার পত্রের মাধ্যমে ছিল না। কারণ ওদের অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলোর সঙ্গে যে বিবৃতি থাকত তা মিথ্যা এবং অগভীর। ওদের রাজনৈতিক লক্ষ্য বলতে কিছু ছিল না! উপরন্তু যুক্তির্ক উপস্থাপনায় ওরা যে আধুনিক ছল চাতুরীর আশ্রয় নিত তা ছিল আমার কাছে চৰম অপ্রীতিকর। ওদের বড় বড় কথা শুধু শূন্যগর্ত এবং ধারণাত্তীত বাক্যে ভরা। হঠাৎ পড়লে মনে হয় এগুলো মহৎ চিন্তার ফসল; কিন্তু এগুলো ছিল পত্যিকারের চিন্তা-শূন্যতায় ভরা এবং অনর্থক কতগুলো শব্দের সমষ্টি। আজকের এ আধুনিক শমাজে যে কোন লোক নিজেকে ক্ষয়িত বলে মনে করে, কারণ এ শহরে জীবনের বিচ্ছি গোলকধার্ম তাদের মনকে বিপথগামী করে তোলে। সেজন্য হয়ত বা এ দুর্গন্ধময় ঝোয়ার

মধ্যে সে তার স্বাধীনতার নামে এক বিচিত্র অভিভ্রতার গন্ধ পায়। এ লেখকগুলো আমাদের জনগণের এক অংশের যে সুবিদিত লাঞ্ছনা সেইগুলোকে শুধু দেখে; আর তা দেখেই বিশ্বাস করে যে ব্যক্তিকে ধারণায় আনা যায় না, সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত জানী বা বুদ্ধিমান।

এ মতবাদের তত্ত্বের দিক দিয়ে মিথ্যা উকি এবং অবান্তরতা, এর বাইরের অভিব্যক্তির মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি কৃমে ক্রমে এর শেষ লক্ষ্য কি সেটা পরিকার বুঝতে পারি।

এ মুহূর্তগুলোতে আমি সেই ভবিষ্যতের অন্ধকার প্রতিচ্ছবি এবং অমঙ্গলের পূর্বাভাস যেন দেখতে পাই। আমার যে শিক্ষা, সেই শিক্ষার ইক্ফন জুগিয়েছে অহমিকা আর ঘৃণা যেটা গাণিতিক ছকে ফেলে হিসেব করলে সাফল্য অবশ্য়ঙ্গাবী। কিন্তু সে সাফল্য হবে মানবত্বের ওপরে প্রচণ্ড এক মুষ্টাঘাত।

ইতিমধ্যে এ ধ্রংসমূলক শিক্ষা এবং সত্যিকারের জনসাধারণের চরিত্র, যেটা এতদিন পর্যন্ত আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল স্পষ্ট বুঝতে পারি।

ইহুদীদের সম্পর্কে অজ্ঞানতা হল সোশ্যাল ডেমোক্রাসির প্রকৃত চরিত্র এবং সত্যিকারের লক্ষ্য বোঝার চাবিকাঠি। যে লোক এ জাতীয় সম্পর্কে তার দৃষ্টির সামনের কুয়াশা সবিয়ে দিতে পেরেছে, তার পক্ষে এ পার্টির অর্থ এবং লক্ষ্য পরিকারভাবে বোঝা সম্ভব; এবং তারপর এ অন্ধকার তথাকথিত সামাজিক উন্নতির কুয়াশা নরিয়ে সে মার্কসীয় মতবাদের নিকট আসল কপ দেখতে পারে।

আজকে আমার পক্ষে বলা অত্যন্ত কষ্টকর, প্রায় অসম্ভব যে কখন ‘ইহুদী’ শব্দটা আমার মনে বিশেষ এক চিন্তাধারার উদয় করেছিল। আমি ঠিক শ্বরণে আনতে পারি না, পিতার জীবিতকালে বাড়িতে থাকাকালীন এ শব্দটা আমি শুনেছি কিনা। যদি এ শব্দটা কোন অপমানকর ভাষায় ব্যবহার করা হত তাহলে সেই বৃদ্ধ লোকটি ভাবত যে এটা-একমাত্র অশিক্ষার ফল। কারণ তার চাকরি জীবনে এত বেশি এবং বিভিন্ন ধরনের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করেছে যে তাকে জাতীয় সংক্ষারমুক্ত বলা চলে। যদিও তার জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত প্রথর ছিল, এবং তার সেই প্রভাব আমার ওপরেও ভালভাবে বর্তেছিল। কুল জীবনেও আমি আমার এ ধারণার পরিবর্তনের কোন কারণ খুঁজে পাইনি; যেটা আমার মনের মধ্যে বাড়িতে থাকাকালীন বেড়ে উঠেছিল।

মাধ্যমিক ক্ষুলে আমার সাথে একটা ইহুদী ছেলে পড়াশুনা করত যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালই ছিল। কিন্তু তার মৌন ভাব এবং কয়েকটা ব্যাপারে আমরা সর্বদা সতর্ক থাকতাম। এছাড়া আমি এবং আমার বন্ধুদের ওর সম্পর্কে অন্য কোন রকম ধারণা ছিল না।

চৌক পনের বছর বয়সে আমি ‘ইহুদী’ শব্দটার সঙ্গে পরিচিত হই রাজনৈতিক প্রতিবেদনের সম্পর্কে। এসময়ে আমার মনে ইহুদী সম্পর্কে একটা বিকল্প ভাব জাগে। সত্য বলতে কি মনের এ অবস্থা আমি সব সময়ে আয়তে রাখতে পারিনি। বিশেষ করে ধর্মের সম্পর্কে সংঘর্ষের ব্যাপারগুলোতে। কিন্তু এছাড়া ইহুদীদের সম্পর্কে অন্য কোন বিকল্প ধারণা আমার মনে সে সময় ছিল না।

লিনৎস শহরে ইহুদীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। শতাদ্বী ধরে এসব ইহুদী সেখানে বসবাস করার ফলে বাইরে থেকে দেখতে ইউরোপের আর পাঁচজন অধিবাসীর মতই লাগত এবং বলতে দ্বিধা নেই আমি অন্যান্যদের মত তাদেরও জার্মান বলেই ভাবতাম। এর কারণ

হল মানুষ হিসেবে তাদের বাইরের চেহারায় অন্য কোন পার্থক্য খুঁজে পাইনি। একমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারগুলোয় তাদের অত্যুত্ত আচরণ ছাড়া। আমার তখন ধারণা ছিল যে তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য অন্যেরা তাদের ওপর নির্যাতন চালায় এবং আমারও তাদের প্রতি তীব্র একটা ঘৃণা বোধ জেগে ওঠে। তখন পর্যন্ত আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে ইহুদীদের সম্পর্কে একটা বিশেষের ভাব দেশ জড়ে ফেলু ধারার মত চলে আসছে। এরপরে আমি ভিয়েনায় চলে আসি।

জনসাধারণের চিন্তাধারায় আমি বিভ্রান্ত হই যখন আমি স্থাপত্যকর্মে নিযুক্ত। তখন অবশ্য নিজের বিপদের জন্যও আমি হতাশাপ্রতি। প্রথমে বুঝতে পারিনি সে শহরে জনজীবন কতগুলো বিভিন্ন সামাজিক স্তরে গঠিত। যদিও তখন ভিয়েনার অধিবাসীর সংখ্যা কুড়ি লক্ষ, কিন্তু ইহুদীদের সংখ্যা মাত্র লাখ দুয়েক। সেই জন্যই ব্যাপারটা আমার নজরে আসেনি। সেই প্রবাস জীবনে প্রথম কয়েক সপ্তাহ আমার মনে এবং চোখে নতুন ধারণা ও চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি। যখন আমি ধীরে ধীরে আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলাম, তখন চোখের সামনে এ গোলমেলে ছবিগুলো এক এক করে আমার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল; আমি আমার নতুন জগতটা সম্পর্কে অবিসাংবাদিত ধারণান্তিতে সক্ষম হই ও ইহুদী সমস্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই।

আমি বলতে চাই না যে প্রথমে আমি যেতাবে এ সমস্যাটার সঙ্গে পরিচিত হই, তা খুব একটা অগ্রীতিকর ছিল। ইহুদীদের সম্পর্কে তখন আমার ধারণা যে ওরা অন্যধর্মী, সুতরাং মানবত্বের খাতিরে অন্যধর্মী বলে তাদের আক্রমণ করার বিপক্ষে আমি ছিলাম। এবং ইহুদী বিরুদ্ধ যে সংবাদপত্রগুলো ভিয়েনাতে প্রচলিত ছিল তাদের সংস্কৃতির প্রতি আমার সন্দেহ ছিল। মধ্যযুগে যে বিশেষ কতগুলো ঘটনা ঘটে গিয়েছিল সেগুলোও আমার স্মৃতিতে ছিল এবং আমি চাইতাম যে এগুলোর পুনরাবৃত্তি আর যেন না হয়। বিশেষ করে বলতে গেলে এ ইহুদী বিরুদ্ধ পত্রিকাগুলো মোটেই প্রথম শ্রেণীর ছিল না। কিন্তু আমি তখম এর কারণটা বুঝতে পারিনি এবং ভেবেছি ঈর্ষার ফল, যার মধ্যে এতকুণ্ড সংগ্রহেষ্টো নেই।

আমার নিজস্ব অভিযন্ত আমি গাঞ্জীরের সঙ্গে পর্যালোচনা করতেই অভ্যন্ত ছিলাম; যে কারণে প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলো হয় তার উত্তর দিত, নয় সেগুলো পাশ কাটিয়ে যেত। ভবিষ্যতে আমি বুঝতে পেরেছি যে এটাই হল সবচেয়ে সম্মানজনক পথ।

যে পত্রিকাগুলোকে পৃথিবীর মুখ্যপ্রাত্র বলা হয়, যেমন নয়ি প্রেসে, ভিনার টাগেন্টাটে ইত্যাদি পড়তাম। আশ্চর্য হয়ে যেতাম এরা কত বেশি পরিমাণে এদের পাঠকদের জন্য সংবাদ পরিবেশনা করে। তার চেয়ে বড় কথা কোন একটা বিশেষ সমস্যাকে এরা নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে থাকে। তাদের অভিজ্ঞত ভঙ্গিতে লেখা আমার ভাল লাগত। তবে কথনো কথনো এ প্রচণ্ড রকমের স্টাইল সুর্বৰ্বশ সাংবাদিকতা আমার পছন্দ হত না। কিন্তু সারা পৃথিবীর প্রধান প্রধান শহরগুলোর সংবাদ রাখতে আমি ভালবাসতাম।

আমার ধারণায় ভিয়েনাও পৃথিবীর প্রধান নগরীগুলোর অন্যতম; সে কারণেই ভিয়েনার সংবাদের স্বল্পতা সম্পর্কে কোন নালিশ করা চলে না। কিন্তু ভিয়েনা প্রেসের রাজবংশীয়দের প্রতি এ চাকরের মত আনুগত্য আমাকে বিরুদ্ধ করত। যদি হাবস্বুর্গের প্রতি কোন আক্রমণ করা হত, সেটা যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে পাঠকদের কাছে হাজির করা হত না। এটা পৃথিবীর অন্যতম চালাক একজন রাজার প্রতি প্রচেষ্টা, তখন গৌরবের সঙ্গে তুলে না ধরাটা আমি

বোকায়ী বলেই মনে করতাম। এগুলো যেন আমাকে খুবণ করিয়ে দিত বনমোরগ তার সঙ্গনীকে চিন্তার সমৃদ্ধে ডুবিয়ে দিয়ে হঠাতে পালিয়েছে। আমি ভাবতাম এ চালাকি আর কিছুই নয়, তিলে গণতন্ত্রের আদর্শের ওপর রঙ করা মতবাদ মাত্র। এটা হল কতগুলো অপদার্থ লোকের আনুকূল্য কুড়াবার অপচেষ্টা। আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাবতাম এ ধরনের সংবাদ ভিয়েনার সংবাদপত্রগুলোর সুনামের কলঙ্ক বিশেষ।

ভিয়েনায় থাকাকালীন রাজনীতি বা সংস্কৃতি যে কোন বাপারেই হোক জার্মানিতে যা ঘটত তার প্রতি নজর বাধতাম। এবং বলতে আপত্তি নেই নিজেকে গর্বিত মনে হত যখন ভাবতাম কী ভাবে অঙ্গীয়াকে অঙ্গীকার করে নতুন সম্ভাজের অভ্যন্তর হল। সে সম্ভাজের বৈদেশিক নীতি রৌতিমত প্রশংসার যোগ্য,—যদিও আভ্যন্তরিক নীতি ততটা নয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় উইলহেলমের বিরুদ্ধে প্রচারটাকে কোন মতেই আমি মেনে নিই পারিনি। কারণ আমার চোখে দ্বিতীয় উইলহেলম শুধু একজন জার্মান সম্ভাজের অধীশ্বরই নন, জার্মান নৌ-বাহিনীরও স্ফুট। বিশেষ করে রাইখষ্টাগে তাকে বক্তৃতা দিতে না দেওয়ায় আমি ক্রুদ্ধ হই। কারণ যারা তাকে বক্তৃতা দিতে দেয় না তাদের সে ক্ষমতাই নেই। পার্লামেন্টের এক অধিবেশনে তথাকথিত রাজহংসগুলো অনেক বেশি প্যাক প্যাক করে যা পুরো রাজবংশীয়দের এমন কি দুর্বলতম রাজার সময়েও পুরো শতাব্দী ধরে এর চেয়ে অনেক কম কাজ হয়েছে।

যখন ভাবি একটা ব্যক্তির মধ্যে আধা বুদ্ধিসম্পন্ন কোন জাতির নিয়ন্ত্রকর্তা হিসেবে রাইখষ্টাগের সমালোচনা করার অধিকার রাখে ও জনতাকে লেলিয়ে দেয় এবং তার দ্বারা রাজমুকুটকে কঠোর ভর্সনা জনতার কাছ থেকে শুনতে হয়, তখন এসব নির্বোধ বিধান সভার সভাগুলোর ওপরে প্রচণ্ড রক্তবর রেগে যাই।

সবচেয়ে বিবরিক্তির যখন দেখি ভিয়েনা প্রেস রোজই গিরগিটির মত তোল পাল্টায়। হাবসবুর্গ রাজপ্রাসাদের গাড়ি টানার ঘোড়াগুলোর লেজ ঘোরানোর মধ্যে সঙ্গে ভিয়েনা প্রেসেরও মত বদলায়। সাথে সাথে এ প্রেস ভিয়েনার জনতার মধ্যে জার্মান সম্ভাজ সম্পর্কেও একটা শক্ততার আতঙ্ক জাগিয়ে তোলার প্রয়াস করে। কিন্তু আমার মতে সেই শক্ততা দৈন্যবেশে সাজানো। সঙ্গে সঙ্গে এও আবার জানায় যে জার্মানির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোনোরকম ইচ্ছৈই নেই। ইঞ্চুরের দোহাই, তারা একক্ষম ভাগ করে যে এমন একটা উকুলপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তারা বিশেষ ধন্দুরই কাজ করেছে। এবং দুই দেশের বক্রতৃ রক্ষার জন্য এটা হল নাংবাদিকসূলভ সততা; এ কথার আড়ালে তারা একটা বিষাক্ত ক্ষতে আঙুল দিয়ে ঝুঁটিয়ে আর বিষাক্ত করে তোলে।

এ ধরনের ব্যাপারগুলো আমার রক্তকে যেন টগবগিয়ে ফোটাচ্ছে।

একথা অঙ্গীকার করতে দিবা নেই মে এ বিষয়ে ইহুদী বিরোধী পত্রিকা দ্য ডয়েচে ভর্কস্ব্যাটের বক্তব্য অনেক বেশি পরিষ্কার এবং সুন্দর।

বড় বড় নামী পত্রিকাগুলো যেভাবে ফ্রান্সের জয়গানে মুথর, ভাবলেও আমার শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে ওঠে। একজন জার্মান হিসেবে তথাকথিত মহৎ সংস্কৃতি সম্পন্ন একটা জাতির শুভিমধুর জয়গানে লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়। এ নষ্টায়ী ভরা জয়গানের জন্যই একাধিক বার এ বিখ্যাত পত্রিকাগুলো আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। সেই কারণেই আমি বর্তমানে একমাত্র ভল্টকস্ব্যাটের পত্রিকাটা পড়ি। মাপে ছোট হলেও এসব বিষয়ে পত্রিকাটার

ଲେଖା ବେଶ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ । ଯଦିଓ ଓଦେର ଚଡ଼ା ଇହୁଦୀ ବିଦେଶୀ ସୁର ଆମାର ମନେର ସଙ୍ଗେ ମିଳିତ ନା; ତବୁ ଓଦେର ଯୁକ୍ତି ଆମାକେ ବାରେ ବାରେ ଭାବିଯେ ତୁଳିଲ ।

ଯାହୋକ, ଏଥର ପଡ଼ାଶୋନାର ଜନ୍ମଇ ଆମି ଭିଯେନାର ସେଇ ବିଶେଷ ମାନୁଷଟା, ସଂଘାମଟାକେ, ଏବଂ ଭିଯେନାର ଭବିଷ୍ୟତ ବୁଝିତେ ପାରି । ମାନୁଷଟା ହଲ ଡକ୍ଟର କାର୍ଲ ଲୟେଗାର ଆର ତାର ସଂଘାମେର ନାମ ହଲ କ୍ରିଷ୍ଟାନ ସୋଶାଲିଟ୍ ମୁଭମେନ୍ଟ । ସଥିନ ପ୍ରଥମ ଭିଯେନାଯ ଆସି, ତଥିନ କିନ୍ତୁ ଉଭୟରେ ବିରୋଧିତା କରେଛିଲାମ । ମାନୁଷଟା ଏବଂ ତାର ସଂଘାମ ସମ୍ପର୍କେ ଆମାର ଧାରଣା ଛିଲ— ଏରା ଉଭୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ।

ଏମନ କି ଡକ୍ଟର ଲୟେଗାର ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ ସମ୍ପର୍କେ ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରାର ପରେଇ ଆମାର ଅଭିମନ୍ତ ଆମି ବଦଳେ ଫେଲି । ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ପ୍ରଶଂସାୟ ରୂପାତ୍ମିକ ହ୍ୟ; କାରଣ ତଥିନ ଆମି ବିଚାର କରତେ ସକ୍ଷମ । ଶୁଣୁ ସେଇନିଇ ନୟ, ଆଜକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମି ଡକ୍ଟର କାର୍ଲ ଲୟେଗାରକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାର୍ମାନ ମେୟର ବା ନଗରପାଳର ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରି । ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟାନ ସୋଶାଲିଟ୍ ମୁଭମେନ୍ଟେର ପ୍ରତି ଆମାର ଏ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମାକେ ଅନେକ କୁସଂକ୍ଷାରକେ ଝୋଡ଼େ ଫେଲେ ଦିତେ ସାହାୟ କରେଛେ ।

ଆମାର ଇହୁଦୀ ବିଦେଶୀ ମନୋଭାବେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହ୍ୟ, ତବେ ସହଜେ ନୟ । ବରଂ କଟ୍ କରେଇ ଏ ମତବାଦେର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରତେ ହ୍ୟ ଆମାକେ । ସତି ବଲତେ କି ତାର ଜନ୍ୟ ଆମାକେ ମାନସିକ ଅନେକ ସଂଘାତ ସହ୍ୟ କରତେ ହେୟଛେ । ଏବଂ ଏ ସଂଘର୍ଷ ହଲ ଭାବାଲୁତାର ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧବତାର । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧବଇ ଜ୍ୟୀ ହେୟଛେ ସେଇ ମାନସିକ ଟାନାପୋଡ଼ନେର ସଂଘାତେ ।

ବହର ଦୁଇ ବାନ୍ଧବତାର କାହେ ଭାବାଲୁତା ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହେୟ ପଲାଯନ କରେ ଏବଂ ବାନ୍ଧବ ଦୃଷ୍ଟିଭିନ୍ନଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ଆମାର ମନୋଜଗତେର ପରିଚାଳକ ହେୟ ବସେ ।

ସେଇ ତିକ୍ତ ମାନସିକ ସଂଘର୍ଷର ଦିନଶୁଲେ ସଥିନ ଭାବାଲୁତାର ଆର ବାନ୍ଧବତାର ଟାନାପୋଡ଼ନିତେ ଦିନଶୁଲେ ପାଡ଼ି ଦିଛି, ତଥିନ ଭିଯେନାର ରାନ୍ତାଯ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କତଶୁଲୋ ଶିକ୍ଷା ଆମାର ଆମ୍ବଲ ପରିବର୍ତ୍ତନେ ସାହାୟ କରେ । ଏମନ ଏକଟା ସମୟ ଆସେ ସଥିନ ଆମି ଆର ଆଗେର ମତ ଅନ୍କେର ନ୍ୟାୟ ରାନ୍ତାଯାଟେ ଚଲାଫେରା କରି ନା; ବରଂ ଚୋଥ କାନ ଏମନଭାବେ ଖୁଲେ ରାଖି ଯାତେ ଶୁଣୁ ବାଡ଼ିଘରଇ ନୟ,—ମାନୁଷଶୁଲୋକେ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରତେ ପାରି ।

ଏକଦିନ ଶହରେ ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଯାଛି, ଆଜାନୁଲସିତ କାଲୋ ରଙ୍ଗେ କୋଟ ପରା ଏକଜନେର ମୂଖୋମୂଖୀ ହେଁ, ପ୍ରଥମେଇ ଭାବିବିଂ ଏ କି ଏକଜନ ଇହୁଦୀ? କିନ୍ତୁ ଲିନ୍ଟ୍ସେ ତୋ ଏ ଧରନେର ଚେହାରା ଆଗେ ଦେଖିନି । ଆମି ଗୋପନେ ସତର୍କତାର ସଙ୍ଗେ ଲୋକଟାକେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି । ସେଇ ବିଦେଶୀ ଚେହାରାଟାର ଦିକେ ତାକିଯେ ଥାକତେ ଥାକତେ ଏକ ସମୟ ମନେ ହ୍ୟ— ଏ ଜାର୍ମାନ ନୟ ତୋ?

ଆମାର ବାରାବରେ ଅଭ୍ୟାସେର ମତ ଆମି ଏବ ସମାଧାନେ ବୈହିପତ୍ର ହାତଡ଼ାତେ ଶୁରୁ କରି । ଏ ପ୍ରଥମ ଜୀବନେ ଅନେକ କଟା ପଯସାର ବିନିମୟେ ଇହୁଦୀ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଚାରପତ୍ରାତ୍ କିମେ ଫେଲି । କିନ୍ତୁ ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟବଶତ ପ୍ରଚାରପତ୍ରଗୁଲୋର କିନ୍ତୁଇ ପାଇନି । କାରଣ ଏଗୁଲୋ ଲେଖା ହେୟଛେ ଏବାବେ— ଯେ ପାଠକଦେର ଇହୁଦୀ ସମ୍ପର୍କେ ଜ୍ଞାନ ଆଗେ ଥେକେଇ ରହେ ବା ଇହୁଦୀଦେର ସଙ୍ଗେ ଏବା ବିଶେଷଭାବେ ପରିଚିତ । ଉପରତ୍ତ ପ୍ରଚାରପତ୍ରଗୁଲୋର ଟଂଟାଇ ଏରକମ ଯେ ସେଗୁଲୋ ଶୁଣୁ ଭାସା ଭାସା ତାଇ ନୟ; ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ମତବାଦେଓ ଭର୍ତ୍ତ । କମେକଟା ସଙ୍ଗାହ ଏବଂ ମାସେର ପର ଆମି ଆମାର ପୁରନୋ ଚିତ୍ରାର ବାଜ୍ୟ ଫିରେ ଆସି । କିନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ଏତ ବିକ୍ଷିତ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ଯେ ଆବାର ମନେ ଦ୍ଵିଧା ଆସେ— ହ୍ୟତ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁଟାର ପ୍ରତି ସଠିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଓଯା ହବେ ନା ।

স্বতাবতই জার্মানদের কথা নয়, যারা হয়ত বা অন্য ধর্মের, কিন্তু ওরা হল সম্পূর্ণ অন্য জাতের এবং ধাতের লোক। যখনই আমি ইহুদীদের সম্পর্কে আরো বেশি খৌজখবর নিয়ে ওদের পর্যবেক্ষণ শুরু করি, পুরো ভিয়েনাটা যেন আমার চোখের সামনে অন্য আলোতে ধরা দেয়। যত দেখি তত যেন তারা সাধারণ নাগরিকের থেকে আলাদা হওয়ায় আমার মনকে আকর্ষণ করে। বিশেষ করে শহরের অভ্যন্তর ভাগ এবং দানিয়ুব ক্যানেলের উত্তর দিকটা এ পতঙ্গের পালে অধৃষ্টিত, যাদের সঙ্গে জার্মানদের বিস্মৃত মিল নেই।

কিন্তু তবু আমার মনের মধ্যে যেটুকু দ্বিধার ভাব ছিল, ইহুদীদের একটা দলের কার্যকলাপে সে দ্বিতীয়কুও অল্প কয়েকদিনের মধ্যে উভে যায়। জিয়ানিজম্ নামে একটা বড় ধরনের বিপ্লব ওদের মধ্যে শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল জুডাইজম্ বা ইহুদী ধর্ম সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য রাখা; এবং ভিয়েনার শাসককুলের কাছে নিজেদের বক্তব্য জোরদার করে তুলে ধরা।

বাইরে থেকে হঠাত মনে হবে যে ইহুদীদের একটা দলই বোধহয় এসংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে চলেছে, অপরদিকে বেশিরভাগ ইহুদীই এর বিপক্ষে, তাই একে বর্জন করেছে। কিন্তু অত্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারি যে এ আচরণ পুরো ব্যাপারটাকেই ধোকা দেবার জন্য। এবং তা বৈচাপ্রণোদিত। তার ওপর তত্ত্বাত্মক এমনভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে, যার প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত সমস্ত ব্যাপারটা থেকেই সাধারণ জনমানসকে প্রতারণা করার জন্য। ইহুদীদের যে অংশটা নিজেদের উদারতা দেখিয়ে জিয়েনিষ্টদের সংগ্রামে অংশ নিত না, কিন্তু তাই হিসেবে তারা প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন করত। সত্যি বলতে কি নিজেদের ধর্মের ওরা তাতে ক্ষতিই বেশি করত।

তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় নিজেদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। উদার ইহুদী এবং জিয়েনিষ্টদের মধ্যে লোক দেখানো ওপর ওপর ঝগড়া আমাকে বিরক্ত করে তুলেছিল। কারণ এ ধরনের মনোবৃত্তি শুধু নৈতিক প্রবৃত্তিগুলোকেই নিচু করে না, একটা জাতির চরিত্রেও কলঙ্ক লেপন করে।

পরিষ্কার ও ছিমছাম, তা সে নৈতিক বা যে কোন বিষয়েই হোক, তার মিজিব একটা রূপ সাধারণ মানুষের কাছে আছে। যেটা জলের প্রতিবিষ্পে মুখ দেখার মত। অবশ্য যদি তারা তা দেখে। ওদের পোশাক পরিচ্ছদে বিশ্বী গন্ধ আমাকে অসুস্থ করে তুলত। তাছাড়া ওদের এলোমেলো জামাকাপড় পরা দেখে নিচু স্তরের বিদেশী বলে মনে হত।

এ বিস্তারিত বর্ণনা কারবই ভাল লাগার কথা নয়; কিন্তু সত্যি কথাগুলোর মাধ্যমে একটা বিদেশী অপরিষ্কার জাতির সাংস্কৃতিক কয়েকটা দিকে কিছু ইহুদীর কার্যকলাপের রহস্যময়তা আমার কাছে দীরে দীরে উন্মুক্ত হয়। আমি ও তার গভীরে প্রবেশ করি। এটা জীবনের সংকৃতির এমন একটা দিক যেখানে একটা ইহুদীও ছিল না যে তার নোংরা হাতের স্পর্শ রাখেনি। সেই ঘায়ের উপর ছুরি চালালেই যে কোন লোক মুহূর্তে আবিষ্কার করবে যে সেই পচনশীল দেহটায় পোকা কিলবিল করছে; আর হঠাত আলোর ঝলকনিতে প্রায় সব ইহুদীই তখন অঙ্গ।

আমার অভিযোগের পরিমাণও বাড়তে থাকে যখন দেখি সাংবাদিকতায়, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে আর নাটকে ওদের কার্যকলাপের বহর। উচ্চ নিনাদিত বিজ্ঞাপনগুলোয় খালি রঙচঙ্গেরই মোড়ক। কেউ যদি সেই বিজ্ঞাপনগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে তবে দেখতে পাবে

লেখক হিসেবে যার নাম বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, সে একজন গৌড়া ইহুদী। এভাবেই একটা সংক্রামক ব্যাধি ধীরে ধীরে জনসাধারণের ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালের কালো প্লেগের থেকেও এ রোগ অনেক বেশি তীব্র। বিশেষ করে যে ভীষণ পরিমাণে এতে বিষ মিলিয়ে জনসাধারণের কাছে পরিবেশন করা হত। হ্বাবতই যে লেখক যত নিচুমানের এবং চালক, তত বেশি তার জনপ্রিয়তা। এক এক সময় সেটার পরিমাণ এত বেশি হয়ে দাঁড়াত যে মনে হত কেউ যেন নর্দমার ময়লা জল পাস্পের সাহায্যে সমস্ত জাতির মৃখে ছুঁড়ে দিছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এ ধরনের নোংরা লোকের ঘাটতি ছিল না। একজন গ্যেটের সৃষ্টির পেছনে অত্তত দশ হাজার এ ধরনের লুট্ট কারি প্রকৃতি নিজেই নিয়ে আসে, যারা হল ভয়াবহ বীজাগুবাহক এবং মানুষের আঘাতে বিষাক্ত করাই যাদের প্রধান কাজ। যদিও কথাটা চিন্তা করতে গা শিউরে ওঠে, তবু তা অঙ্গীকার করা যায় না যে বেশিরভাগ ইহুদীদের কাজই ছিল এটা; এবং তারা পুরোপুরি এ নিচু কাজেই নিজেদের পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ করেছিল। এজন্যই কি ওদের সমাজের ওপরের স্তরের লোক বলা যায়।

এ নোংরা লোকগুলো সম্পর্কে আমি আরো বেশি খোজখবর নিতে শুরু করি। ফলে আরো বেশি তীব্র ইহুদী বিদ্যে আমার ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। যদি আমার মনোবৃত্তি ওদের বিরুদ্ধে এক হাজার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, —তবে সেই বৃদ্ধি পাওয়ার কারণগুলো খুজে বের করতে আমি সমর্থ।

সত্যিকারের ব্যাপারটা হল দশ ভাগের নয় ভাগ অশ্বীল সাহিত্য, নোংরা শিল্প এবং নাটকে বেলেঞ্চাপনা যারা চুটিয়ে করছে,—তারা সমগ্র জনসাধারণের এক অংশ-ও নয়, এটাকে অঙ্গীকার করার কোন উপায় নেই। যা সত্যি তাকে তো স্বীকার করে নিতেই হবে। এরপর মনের মধ্যে গেঁথে যাওয়া ভাবটা নিয়েই ওয়ার্ড প্রেস খুটিয়ে পড়তে শুরু করি।

সংবাদপত্রটার ভেতরে যত বেশি চুক্তে থাকি তত বেশি সংবাদপত্রটার সততা সম্পর্কে শুরু হারাই। নিজেরই আশ্চর্য লাগে কী করে এ অসৎ সাংবাদিকতার প্রতি এতদিন শুরু পোষণ করে এসেছি। ক্রমে ক্রমে সংবাদপত্রটির প্রতি বিত্তিশূ জন্মে যায়; এদের পুরো ধ্যান-ধারণাটাই ভাসা ভাসা এবং অলীক। শুধু তাই নয় সত্য ঘটনাগুলোও এমনভাবে সাজানো যে তাতেই সত্যের থেকে যথিথাই বেশি পরিবেশিত। লেখকেরা হল, —ইহুদী।

হাজার হাজার ঘটনা যেগুলোয় আগে মনোযোগ দিয়েছি, এখন দেখি সেগুলোর কোন ওক্তুই নেই। পুরো ব্যাপারটাই আমার সামনে অন্য আলোতে উত্তৃস্ত হয়ে ওঠে, যার মর্মার্থ এর আগে আমি বুঝে উঠতে পারিনি।

সাংবাদিকতার এ উদারতা আমার চোখে অন্য আলোতে পুরো ব্যাপারটা ধরা দেয়। প্রতিপক্ষকে আক্রমণের জন্য ওরা গাঢ়ীর্যপূর্ণ স্বর ব্যবহার করে, — কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ওদের সম্পূর্ণ নীরবতায় আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি যে ওরা কত ধূর্ত এবং কী পরিমাণে ঘৃণ্যভাবে পাঠককে ঠিকিয়ে চলেছে। সুন্দর সুন্দর প্রবক্ষের মাধ্যমে ইহুদী লেখকদের প্রশংসা এবং জার্মান লেখকদের প্রতি বিক্রিপ সমালোচনা যেন ওদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তার সঙ্গে দ্বিতীয় উইলহেলমকে আলত খোঁচা মারাও ওদের বাঁধাধরা মৌলিক নীতি, যেমন অপরদিকে ফ্রাসের মংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে ক্রমাগত পিঠ চাপড়ানো। প্রবক্ষের বেশিরভাগ বিষয়বস্তুই বক্ষাপচা ও বিকৃত মৌন প্রসঙ্গে ভর্তি। বিশেষ করে সংবাদ পরিবেশনের পুরো ভাষার ধাঁচটাই বিদেশী। এগে পরিবেশিত। মোদা কথা, খোলাখুলি জার্মানদের নির্লজ্জভাবে নিচু করার অপচেষ্টা।

কোন স্বার্থে ভিয়েনা প্রেস এ নীতি নিয়েছিল? হঠাতে কোন কারণ ছাড়াই কি? এর সদৃশুরগুলো খুঁজে বের করতে গিয়ে ক্রমেই আমার মন আরো বেশি সন্দিন্ধ হয়ে পড়ে।

এমনকি সমাজের বুকে গণিকা বৃত্তিতেও ইহুদীরাই সবচেয়ে বড় অংশ নিয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপীয় যে কোন শহরের চেয়ে শহরে তা অনেক বেশি স্পষ্ট। তবে দক্ষিণ ফ্রান্সের কথেকটা বন্দর শহর ছাড়া। লিওপোল্ডস্টাড শহরে রাতের বেলা রাস্তায় চলাফেরা করাই মুশ্কিল। রাস্তাঘাটের প্রতিটি বাঁকে হঠাতে যে রঙ মাথা মুখের দেখা পাওয়া যায়— যুদ্ধের পূর্বে এ জনপদবধূদের সঙ্গে জার্মানদের পরিচয়ই ছিল না। অধু জার্মান সৈন্যরা ওদের মুখোমুখি হত ইষ্টান ফ্রন্টে।

এ সত্যটার প্রথম আবিষ্কারে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠাণ্ডা হিম-শিল স্রোত যেন ছুটে নামে; এ সেই ঠাণ্ডা মাথার গওণারের চর্মধারী, নির্লজ্জ ইহুদীর দল যারা চরম ঘৃণ্য কৌশলে এ বিশাল শহরের তলানীদের বিদ্রোহের চেষ্টাকে অহরহ প্রতারণা করে চলেছে। এ সত্য আবিষ্কারের পর সেই প্রেতাঞ্চলের ওপর আমি জুলে উঠি।

এবার আর যনে কোন দ্বিধা থাকে না—যে করেই হোক ইহুদীদের দ্বারা সুসংগঠিত সমস্যাগুলো জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতেই হবে। না, একাজে কিছুতেই পেছ পা হলে চলবে না। কিন্তু ততদিনে শিখে গেছি জীবনের শিক্ষা সংস্কৃতি বলতে গেলে সবক্ষেত্রেই ওদের অভিব্যক্তির সত্যিকারের অর্থটা খুঁজে বার করা। এবং বুঝতে পারি ইহুদীরাই হল সোশ্যাল ডেমোক্রাসির তাবড় নেতা। এ সত্যটা চোখের সামনের পর্দাটা তুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার তেতরকার এতদিনের মানসিক দন্তুটারও পরিসমাপ্তি ঘটে।

আমি আমার সহকর্মীদের মধ্যে দেখতাম কত সহজে এবং অহরহ একই ব্যাপারে তারা তাদের মত পরিবর্তন করে। কখনো কখনো তাদের এ পরিবর্তন ঘটতে সময় লাগে কথেকটা দিন। কখনো বা কথেক ঘন্টার মধ্যেই তাদের মতামত পরিবর্তিত হয়। বিশেষ করে একটা ব্যাপার তো আমার মাথাতে কিছুতেই চুক্: না যে একজন ব্যক্তি একক হিসেবে যুক্তিতর্কের জাল সুন্দর বিস্তার করে; কিন্তু সেই ব্যক্তিই যখন জনতার মুশোমুখি হয়, পুরো বিষয়টাই সে গুলিয়ে ফেলে এলোমেলো করে দেয়। আর এ ব্যাপারটাই লোকটাকে হতাশার সমূদ্রে নিমজ্জিত করে। আমি ঘন্টার পর ঘন্টা যুক্তিতর্ক দিয়ে তাদের স্বত্তে আনতে চেষ্টা করতাম। শেষে আমার সাফল্যে আরী আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়তাম। কিন্তু পরের দিনই দেখতাম পুরো ব্যাপারটাই ভশ্মে যি ঢালা। এটা চিন্তা করলে দৃঢ় পেতাম যে ব্যাপারটার ইতিমধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে। পেগুলামের দেদুলামান অবস্থার মত তারা তাদের আগেকার মতামতের পর্যায়ে ফিরে গেছে।

ওদের অবস্থাটা অবশ্য আমি বুঝতে পারতাম। ও ওদের ভাগ্যকে নিয়ে সর্বদাই অসন্তুষ্ট—যেটা ওদের দৃঢ়ভাবে জীবনে আধাত করেছে। ও ওদের মালিককে মনেপাণে ঘৃণা করে, বিশ্বাস করে ওদের যাত্রিক হৃদয়হীন শাসনই তাদের এ নিষ্ঠুর গতবোঝে ঢেলে দিয়েছে। প্রায়ই ওরা সরকারি কর্মচারীদের প্রতি অশ্রাব্য কটুতি করত। ওরা ভাবত এ সরকারি কর্মচারীদের শ্রমিকদের প্রতি কোন সহানুভূতি নেই। নিত্য নৈমিত্তিক জিনিসপত্রের মূল্য-বৃদ্ধির জন্য লোক জড় করে সত্তা করত আর রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষেপ খিছিল বার করত। অবশ্য এসব ব্যাপারগুলোর পেছনে যুক্তির মাধ্যমে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া চলত। কিন্তু যে ব্যাপারটা কিছুতেই আমার বোধগম্য হত না, সেটা হল ওদের পরম্পরারের প্রতি পরম্পরারের তীব্র ঘৃণা।

নিষেধের জাতটাকেই নিদা করত; এর মহত্ব নিয়ে উপহাস করত। ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে অঙ্গীতের পরম গৌরবমণ্ডিত মানুষগুলোকে সমালোচনার মোংরা নর্দমায় টেনে আনত।

তাদের নিবট আঞ্চলিক বন্ধু-বাস্তবদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব, —দেশ এবং জাতির পাঁত ধূণায় যে অপরাধেয় ক্ষতি সাধন করেছে তা পূরণ করা অসম্ভব। এটা একটা প্রকৃতি পুরুষ কাণ্ড।

অধু তাঁই নয়, এটা মানসিক এক ধরনের ব্যাধিও বটে; যেটাকে সাময়িকভাবে অর্থাৎ কখনো যাম ন-যোৰ্কেন্দিনের জন্য সুস্থ করা সম্ভব। কিন্তু পরে ওদের সঙ্গে দেখা হলেই বুঝতে পারতাম যে আগে যা ভেবেছি যে ওদের মতের পরিবর্তন হয়েছে, —তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। ওরা নদের আগেকার জায়গাতেই ফিরে গেছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাদের সেই মানসিক পীড়া খাগার নিষ্ঠুর থাবা বসিয়েছে।

আমি ত্রয়মেই বুঝতে পারি যে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক প্রেসও ইহুদীদের করতলগত। কিন্তু অন্যান্য প্রেসগুলোর যে একই অবস্থা এটা আগে কখনো বুঝতে পারিনি। সবচেয়ে উল্লঙ্ঘন সত্ত্ব হল, একটা সংবাদপত্রও ছিল না যাতে ইহুদীরা জড়িত নয় এবং যেটাকে সত্যিকারের আংগীয়তাবাদী সংবাদপত্র বলা যেতে পারে। অন্ততপক্ষে এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান এবং বিদ্যা শুরু অনুসারে আমি যা বুঝতাম।

অনেক চেষ্টার পর নিজের ভেতরের অলসতাটা ভেঙে আমি মার্কিসিস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত এ ধরনের প্রবন্ধগুলো পড়তে শুরু করি। কিন্তু তাতে ওদের প্রতি বিরুপতাই বাঢ়ে। এবং এরপরে আমি এসব লেখক আর প্রকাশকদের সম্পর্কে আরো বেশি খৌজিয়ব— নিতে শুরু করি।

এসব পত্রিকার প্রকাশক থেকে শুরু করে সবচেয়ে নিচু তলার কর্মী পর্যন্ত সবাই ইহুদী। মার্কিসবাদী জননেতার নাম শরণে আসতে দেখি প্রায় সবাই এ একই সম্প্রদায়ের— রাজ পর্যবেক্ষণের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক সদস্যবৃন্দ থেকে শুরু করে ট্রেড ইউনিয়নের সেক্রেটারী, পথরোধকারী, পিষ্টোলকারী, সবক্ষেত্রে এ একই সাজানো ছবি। আমার পক্ষে অষ্টারলিটজ্জ, ফেডিগু, আড়্লার,— এলেনবোগেন এবং অন্যান্য নামগুলো বিশুভ্র হওয়া কখনই সম্ভব নয়। একটা সত্ত্ব আমার সামনে বল বল করে ওঠে; আমি যে দলটার সঙ্গে মাসাধিকাল মত শিরোধে লিঙ্গ, তারা ওদেরই একটা ছেট শাখা বিশেষ। তবে শেষমেষ আমার একটা শাস্তি কিম যে ততদিনে জেনে গেছি ইহুদীরা আর যাহোক জার্মান নয়।

এবাবে আমি আবিষ্কার করতে সর্বোচ্চ হই, কারা সেই প্রেতাত্মা যারা আমাদের জনসাধারণকে নিয়ত তাড়িত করে ছাইদিনির দিকে নিয়ে চলেছে। ভিয়েনায় আমার বছর বানেকেন প্রবাসী জীবনে বুঝতে পারি যে কোন শ্রমিকের এ বিষয়ে ধ্যান ধারণার শিকড় এত গঠীর নয়। এখন ত্রয়মে মার্কসীয় মতবাদ সম্পর্কে আমি একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠি এবং এ বিষয়ে আরও জানকে, নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার যত্ন হিসেবে ব্যবহার করি। বলতে আপাত নেই যে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কৃতকার্য হয়েছি। এ বিশ্বাল জনসাধারণকে অবক্ষয়ের পথ গেতে ত্বরিত হওয়ায় অসম্ভব নয়; তবে তার জন্য প্রয়োজন প্রচুর সময় এবং প্রচণ্ড অম্বাবস্য।

কিন্তু ত্রয়মে ইহুদীকেও তার স্থির মতবাদ থেকে এক চুল নড়ানো সম্ভব নয়।

আমি তখন ওদের শিক্ষার অবাস্তবতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে শুরু করি। যে ছোট গণিটা আমাকে ঘিরে থাকত, গলা না চেরা এবং কষ্টস্বর বসে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের একনাগাড়ে বুঝিয়ে যেতাম। আমি মনে করি শেষ পর্যন্ত মার্কিসিস্ট মতবাদের ভয়াবহ দিকটার ছবি আমি তাদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হব। যত আমার মতামতটাকে আমি প্রতিষ্ঠা করি, তত ওদের একগুরুমিটা বেড়ে ওঠে।

তর্ক করতে করতে আমি ওদের কৌশলটা বুঝে ফেলি। তর্কের প্রথম পর্যায়ে ওরা বজ্জ্বার নিরুদ্ধিতার সুযোগের ফাঁক গলে বেরিয়ে পড়ে; কিন্তু যখন তর্কের জালে জড়িয়ে যুক্তির হালে আর পানি পায় না, তখন তপিতা করে সহজে প্রতিরিত হয়েছে, এমন ব্যক্তিরা যুক্তির জাল এড়িয়ে অভিনয় করে যেন বজ্জ্বার কিছুই ওরা বুঝতে পারছে না এবং প্রাণপণে চেষ্টা করে অন্যদিকে তর্কের স্রোতটাকে প্রবাহিত করার। তারা স্বত্সিঙ্ক সত্যটাকে এড়িয়ে গিয়ে অন্য পথে কথাবার্তা বলে চলে। যদি এটাকে সহ্য করে নেওয়া হয়, তবে ওরা তর্কের ব্যাপারটাকে ভিন্নমূর্খী করে দিয়ে গোড়ার সমস্যার থেকে অন্য কোন বিষয় বস্তুতে চলে যায়। যার সঙ্গে আগের বিষয়বস্তুর কোন সম্পর্কই নেই।

আবার যদি ওদের মূল তর্কের বিষয়ে টেনে আনার চেষ্টা করা হয়, ওরা আবার পালাবে সেই জাল থেকে। মোটকথা ওদের দিয়ে বিষয়বস্তুটার ওপরে কোন মন্তব্যই পাওয়া সম্ভব নয়। যখন কেউ শক্ত যুঠিতে এ তথাকথিত অবতারদের একজনকে পাকড়াতে চেষ্টা করে, জেলী বা আঠালো কাদার মত ঠিক আঙুলের ফাঁক দিয়ে সে গলে গিয়ে পরক্ষণেই আবার সেই কাদা বা জেলী জমে শক্ত জিনিসের অবয়ব ধরবে। যদি উপস্থিত জনতার উপস্থিতিতে বিরুদ্ধজনক পরিস্থিতিতে কারোর বিরুদ্ধপক্ষ যুক্তি স্বীকারও করে নেয়, এবং তা নিয়ে কেউ যদি ত্বেবে স্বত্ত্বির নিঃশ্঵াস ফেলে যে যাক শেষপর্যন্ত ওদের একটা নির্দিষ্ট জমিতে দাঢ় করান গেছে, তা হলে তার পরের দিনের জন্য তার কাছে অবাক করা কিছু লুকানো থাকবে। ইহুদীরা বড়ই বিশ্বত্পরায়ণ। অর্থাৎ কাল যা ঘটেছে তা আজ তুলে যেতে ওরা এতই ওস্তাদ যে তারা-আবার গতকালের সেই অসংগতিপূর্ণ যুক্তিটাকেই তুলে ধরবে এমনভাবে যেন গতকাল তাদের সঙ্গে কোন আলোচনাই হয়নি। তখন যদি কেউ রাগ করে তাকে গতকালের কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়, —সে এমন অবাক হওয়ার ভাগ করবে যেন তার কিছুই মনে নেই। শধু একমাত্র তার যা স্মরণ আছে তা হল গতকাল সে তো প্রমাণই করে দিয়েছে যে তার যুক্তিগুলোই ঠিক। আমি তো এ অবস্থায় হতবুদ্ধি হয়ে যেতাম। আমাকে ঠিক কোনটা হতবুদ্ধি করে দিত, —তার বাগাড়স্বরের প্রাচুর্য নাকি সুনিপুণভাবে মিথ্যেটাকে সত্য বলে পরিবেশন করার ভঙ্গি, তা বলতে পারব না। ক্রমে ক্রমে আমি তাদের ঘৃণা করতে শুরু করি।

তবু এসবগুলোর ভাল একটা দিক ছিল,—কারণ আমি যত বেশি এসব নেতাদের ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারি, (নেতা না বলে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির প্রচারক বলাই ঠিক) আমার নিজের লোকেদের প্রতি তত বেশি ভালবাসা বাঢ়তে থাকে, ঠিক সেই অনুপাতে। ওদের এ পৈশাচিক কুশলতা যেটা এ শয়তান মন্ত্রণাসভার সভাগুলোর কার্যকলাপ এবং কথাবার্তায় প্রদর্শিত হত, তাতে ওদের নিকটে হতভাগ্য পরাজিতদের পরাজিত হওয়ার জন্য কোন দোষ আমি দেখি না। সত্য বলতে কি, এ প্রাদেশিক বিশ্বাসঘাতকগুলোর সঙ্গে কোনরকম সামঞ্জস্য রেখে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সত্য বলায় বিকৃত এ মুখগুলো, যারা নিজেদের উচ্চারিত কথা পরম্পরাতেই অশ্বীকার করে, পরফর্মেই আবার মুক্তির ধর্জা তুলে

ধরতে তর্ক প্রসঙ্গে সেটাকেই ফিরিয়ে আনে, এরকম নোংরা জীবগুলোর বিরুদ্ধে তর্ক যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রস্তাবটাও নির্বর্থক। অসম্ভব তো বটেই। না, যত বেশি ইহুদীদের আমি চিনতে পারি, তত সহজে আমি সেই শ্রমিকদের মতামতের জন্য তাদের ক্ষমা করি। শেষে আমার মত হল এ যে শ্রমিকদের মধ্যে নিম্নৈয়ি কিছু নেই। কিন্তু যারা নিজেদের আপন লোকদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর কষ্টটুকু পর্যন্ত স্থীকার করতে নারাজ, তারা জাতির পরিশৰ্মী স্থানকে বিনা দ্বিধায় অবিচার স্থীকার করে নিতে বাধ্য করেছে, অপরদিকে একদল নিচুমনা শোভি এবং দুর্নীতিপরায়ণকে প্রশংস্য দিছে, যাদের কোনরকমেই ক্ষমা করা উচিত নয়।

আমি নিত্যদিনের অভিজ্ঞতাকে সংশ্লিষ্ট করে মার্কসবাদীয় মতবাদের শিখার উৎস মুখটা শুঁড়াতে আরও করি। কারণ এ মতবাদের ফলাফল আমি বিস্তারিতভাবেই জানতাম। সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে এ মতবাদের নিত্য বিস্তারও আমার নজর এড়ায়নি। কারও একটু কল্পনা শক্তি থাকলেই ব্যাপারটার ভবিষ্যত ফলাফল সম্পর্কে ধারণা করে নেওয়া কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপারই নয়। শুধু একটাই জিজ্ঞাসা— এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতারা কি আজকের ফলাফল তাদের উদ্বিষ্যত দ্রষ্টার দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিল? নাকি প্রতিষ্ঠাতারা নিজেরাই নিজেদের ভুলের গালে জড়িয়ে পড়েছে? আমার তো মনে হয় দুটোরই সম্ভাবনা আছে।

যদি দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর ‘হ্যাঁ’ হয়, তবে প্রতিটি চিত্তাশীল ব্যক্তির উচিত তথনই এ দানবকে রক্ষুন্বদ্ধ করা, যাতে ভবিষ্যতে আরো খারাপ কিছু না করতে পারে। কিন্তু যদি প্রথম প্রশ্নটার উত্তর ‘হ্যাঁ’ হয়, তবে এটাকে স্থীকার করে নিতেই হবে যে এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতারা ইচ্ছে করেই জাতির মধ্যে এক মৃত্য শয়তানকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। একমাত্র কোন দানবীয় অস্তিত্বই, হ্যাঁ— মানুষের নয়; এ ধরনের কোন সংগঠনের সৃষ্টি করতে পারে যার কার্যকলাপ ভবিষ্যতে মানব সভ্যতাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে পৃথিবীটাকে সাহারা বানিয়ে ছাড়বে।

এ যদি ব্যাপারটা হয়ে থাকে, তবে এর প্রতিকরণ হল সমস্ত মনুষ্যাশক্তি, বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা করা এবং পুরো ব্যাপারটাকেই তাগের ওপর ছেড়ে দিয়ে দেখা কার মাত্রে হাত বাড়ার হাত বাড়া।

সফ্যামের মূল স্তরগুলো জানার জন্য আমি এ তথাকথিত প্রবন্ধ সম্পর্কে আরো বেশ সংবাদ সংগ্রহ করতে শুরু করি। সত্যি বলতে কি, আমার উদ্দেশ্যের কাছাকাছি আমি অনেক ঢাঁড়াওড়ি পৌছে যাই। এত শীত্র যে পৌছাব এটা আমিও আশা করিনি। আসলে ইহুদীদের ব্যাপারে ততদিনে আমার জ্ঞান চঙ্গু বুলে গেছে। এতদিন পর্যন্ত ইহুদীদের সম্পর্কে আমার জ্ঞান ছিল ভাসা ভাসা। এ নতুন অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে আমি সত্যিকারের বিষয় বস্তুটার প্রক্রিয়াগত তথাকথিত সোশ্যাল ডেমোক্রাসির অবতারনের লিখিত আদর্শবাদীতার থেকে ক্ষণব্যাপী দৃশ্যে, এ সত্যটা বুঝতে পারি। কারণ ততদিনে ইহুদীদের ভাষা হ্রদয়স্ম করতে আমি পক্ষম হয়েছি। ইহুদীরা ইচ্ছে করেই এমন কৌশলে তাদের বক্তব্য রাখত যাতে ভাষার কাঁধপাঁধের ভাল ভেদ করে কেউ ওদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে। সুতরাং একমাত্র ধনের লেখাগুলোর বিশ্লেষণ করেই তা ধরতে পারা সম্ভব। এ জ্ঞানই আমার ভেতরে সবচেয়ে বেশি মানবিক ধন্দের সৃষ্টি করে। একজন হ্রদয়বান জাতীয় সংক্রান্ত শহরবাসী থেকে কটুর ইচ্ছী বিবোধী করে তোলে।

মাত্র একবার হ্যাঁ, শেষবারের মত আমি নিরাশার চিত্তায় নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করি, যা আমাকে কিছু সময়ের জন্য উদ্বিগ্ন করে ভুলেছিল।

আমি ইহুদীদের অতীতের দীর্ঘ ইতিহাসের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করি, কোন দুর্ভেগে কারণে যেটা আমাদের হতভাগ্য নব্বদের বোধগম্যের বাইরে, পরিণতির অপরিবর্তনীয় আদেশে প্রচন্ড রয়ে গেল। আর জয় সুনিশ্চিতভাবে চলে যাবে এ ছেট্ট একটা জাতির হাতে। হতে পারে পৃথিবীতে এতদিন ধরে যারা বসবাস করে এসেছে, পৃথিবীর নিকট তারা তাদের ঝগ কি পরিশোধ করেনি? নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আমরা এ যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছি তার ভিত্তিমূল কি বাস্তবতার মাটিতে প্রোথিত? নাকি এটা শুধু একটা রঙিন কল্পনা? আমি যত বেশি মার্কসীয় মতবাদ সম্পর্কে অনুধাবন এবং বিশ্লেষণ করি, তাগাই আমাকে এর উন্তর দিয়ে দেয়। ইহুদীদের কার্যকলাপ এদের সঙ্গে কর্তব্যনি জড়িত তা স্পষ্ট চোখে আড়ুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয়।

ইহুদীদের মার্কসীয় মতবাদ প্রকৃতির সম্ভাব্য আদর্শগুলোকে বর্জন করে। এভাবে ওদের শিক্ষা জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা থেকে সাধারণ মানুষকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এবং এর অর্থ মানুষের অস্তিত্ব এবং সভ্যতাটার ভিত্তিমূলটাকেই প্রচেতনভাবে নাড়া দেওয়া। যদি মার্কসীয় মতবাদকে জীবনের ভিত্তিমূল বলে সারা পৃথিবী মেনে নেয়, তবে মানব মনের প্রৱো ধ্যান ধারণাটাই অনুসৃত্য হয়ে যাবে। এবং এ ধরনের কোন মতবাদকে মনে নেওয়ার অর্থই হল নিজেদের মধ্যে বিশ্বজ্ঞানের সৃষ্টি করা, যা এ পৃথিবী নামক মধ্যগ্রহের বাসিন্দাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে ছাড়বে।

সুতরাং ইহুদীরা যদি ওদের এ মার্কসীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীতে কোনরকমে জয়ী হতে পারে, তবে সেদিন হবে মানুষের ইতিহাসের শেষদিন। এ উপর্যুক্ত আবার তাহলে জনপ্রাণীহীন মহাশূশান হিসেবে তার অক্ষরেখা ধরে পরিক্রমা করবে, যা আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে করত।

আমি বিশ্বাস করি যে আমার ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তাধারা সেই সর্বশক্তিমানের দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং ইহুদীদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোই হল ইশ্বরের আগন হাতে সৃষ্ট মহান শিল্পকর্মকে রক্ষা করার একমাত্র পথ।

ভিয়েনায় প্রবাসের দিনগুলোয় আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারা

তিরিশ বছর বয়স হবার আগে কোন পুরুষের প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক ঘটনাতে অংশগ্রহণ করা উচিত নয় বলেই আমি মনে করি। অবশ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের মত এক্ষেত্রেও যদি দৈশ্বরদণ্ড প্রতিভা তার থাকে, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। এটা বলাবাহ্য আমার মতামত। এর কারণ হল তিরিশ বছর পর্যন্ত মানুষের মানসিকতাটা গড়ে ওঠে দৈনন্দিন যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করে, সেসব অভিজ্ঞতাগুলোকে উল্টেপাল্টে এদিক ওদিক সরিয়ে সে একটা নির্দিষ্ট চিন্তায় হির হতে পারে; আর এটাই তাকে ভবিষ্যত রাজনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তি গড়তে সাহায্য করে। তার পক্ষে সব বিষয়ে মনস্থির করে একটা নির্দিষ্ট পথ নেওয়া সম্ভব হয়। একজন পুরুষের পক্ষে প্রথম উচিত হল সাধারণ জ্ঞানের একটা ভাস্তুর নিজের মধ্যে গড়ে তোলা, যাতে জীবন সম্পর্কে তার নিজস্ব চিন্তাধারার একটা সুসংবন্ধিত লাভ করতে পারে। অর্থাৎ যাকে এককথায় জীবন দর্শন বলে। তাহলে তার একটা নিজস্ব মানসিক ব্যারোমিটার গড়ে ওঠে, যেটা ছাড়া তার

পাক দেন্দিন কোন সমস্যা সম্পর্কে নিজের বিচার বিবেচনা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। এবং এটাই তাকে ফোন রাজনৈতিক বিষয়ে দৃঢ় এবং স্থির সংকল্প নিতে সাহায্য করবে। আপাতদৃষ্টিতে এখনের পুরুষ তার রাজনৈতিক চরিত্রের দিক থেকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের যোগ্যতা নাই।

এ ধরনের মানসিক জমি প্রস্তুত না করে যদি কেউ রাজনীতিতে প্রবেশ করে, তবে সে উভয় সংকটে পড়তে বাধ্য। প্রথমে সে উপলক্ষ্য করবে জরুরী কতগুলো ঘটনায় তার চিনামান সম্পর্কে ভাস্তু, তার চিনাধারা অসমর্থনীয় হওয়াতে তার আগের মতবাদ সমর্থন না পাওয়ায় শুভাবতই তাকে আরও ভাল জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ বিচারের আশায় ছুটতে হবে। যদি সে তার আগের চিনাধারাটাকে আঁকড়ে পড়ে থাকে, তবে অতি শৈঘ্র এমন এক পাকাপূর্ণ জায়গায় এসে দাঁড়াবে যে সেটা অতিক্রম করা তার পক্ষে দৃঃসাধ্য। কারণ তা হলে তার চিনাধারায় এত বেশি অসংগতি দেখা যাবে যে তাকে কেউ নেতৃ বলে আগের মত মানবে না। আর তার অধীনস্থ পার্টির লোকেরা সহজেই বুঝে ফেলবে যে যাকে তারা এত দিন নেতৃ বলে মেনে নিয়েছে, তার চরিত্রে পরিবর্তন তাদের মধ্যে নৈরাশ্য এনে দেবে, যেটা তাদের নেতৃ আগে কখন সহ্য করত না।

যদি সে দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করে— যেটা ইন্দীন অহরহ ঘটে থাকে, সেক্ষেত্রে অন্যাধারণকে প্রদত্ত প্রতিক্রিয়া পেছনে নিজের মানসিক প্ররোচনা কাজ করে না। এটার উপরাগাতে তাকে বেশি করে ভাবিয়ে তোলে। এবং বিষয়বস্তুর ওপরেই ভাসিয়ে নিয়ে গেড়ায়। ভেতরে চুক্তে দেয় না। সুতরাং আবারক্ষার খাতিরে তাকে নোংরা পথ বাধ্য হয়েই অবগত করতে হয়। যেহেতু সে নিজেই তার স্বপ্নের পেছনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় না, তাই ফোন মানুষই মনেগ্রান্থে সেই মতবাদকে বিশ্বাস করে না এবং তার জন্য জীবন দিতে খাণ্ডানকভাবেই প্রস্তুত ও হয় না। তখন সে তার অনুবৃত্তীদের কাছ থেকে আরও বেশি কিছু দাঁধ করে। সত্যি বলতে কি, যত বেশি পরিমাণে তার নিজের চিনাধারার স্বচ্ছতা এবং মানামক গতিবেগ হ্রাস পায়, তত বেশি চাপ আসে তার অনুগত কর্মীদের ওপর। শেষপর্যন্ত পাঠানামের নেতৃত্বের খোলস্টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাজনীতির সঙ্গে সে শুধু খেলাই করে। এভাবে দিনে দিনে তার দৈনন্দিন কাজকর্মের অসংলগ্নতা সামঞ্জস্যের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়। এমন সঙ্গে যোগ হয় অসত্যতা আর একগুরুমৈ মনোভাব,—যেটার সমাপ্তি হওয়া সম্ভব নাকেবারে চরমে উঠে। দলিল মানুষদের দুর্ভাগ্যের জন্য এ ধরনের লোকেরা নিজেদের দুধের নোতলটাকে দৃঢ় হাতে ধরে নিয়ে বসে পার্লামেন্টে, আর নিজের সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারের সমস্ত রকম বিলাসিতার খরচ জোগাড় করতেই রাজনৈতিক খেলা দেখায়।

পারিবারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে তার রাজনৈতিক খেলাও বাড়তে থাকে। সে কারণে যে মানুষ নিজেকে রাজনীতির খেলায় যত বেশি দক্ষ বলে মনে করে, নিজেই সে নিজের তত বড় শক্তি। পাঠিটি নতুন সংগ্রামের ক্ষেত্রে সে নিজেকেই ধাক্কা দিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে নিয়ে চলে গঠণ তার চেয়ে যোগ্যতা যে কোন ব্যক্তিকেই সে নিজের আলোয় অযোগ্য বলে মনে করে।

এ সমস্যার গভীরে ঢোকার সময় এ ধরনের নিচ লোকগুলো পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে নির্মাণে ওপরে ওঠে তার বিশদ ব্যাখ্যা করব।

একজন মানুষ যখন তার ত্রিশ বছরের বদরে পা রাখে, তখন তার সমূদ্যাত্মার অনেক গাঁথ। অর্থাৎ তার সামনে শিক্ষণীয় অনেক কিছু পড়ে থাকে। এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু

দুর্ভাগ্যবশত সে তার আগের চিন্তাধারাটাকেই আঁকড়ে ধরে বসে থাকে,—যেটা তার জীবনের সংগে ততদিনে অঙ্গসীভাবে জড়িত হয়ে গেছে। নতুন ঘেণুলো সে শোনে, সেগুলো আগেকার আদর্শগুলোকে পরিত্যক্ত করতে পারে না, বরং মনের অবচেতনে গভীরভাবে পৌঁথে দেয়। তার সহকর্মীরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না যে তারা তার চিন্তাধারা বা আদর্শ নিয়ে প্রতারিত হচ্ছে। উপরত্ত তাদের নতুন চিন্তাধারাকে পরিপাক করার ক্ষমতা দেখে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সুতরাং তার অনুগামীদের মধ্যে নেতার মতবাদে আরও বিশ্বাস আনে। তাদের চোখে এ ধরনের প্রতিটি ঘটনা তাদের নেতার উন্নতির ঝর্ণেজ্জল স্বাক্ষর।

একজন নেতা যাকে একদিন নিজের ভুলের ভিত্তের ওপর স্থাপিত পটভূমি ছেড়ে দিতে হয়, তখন সে আবার সম্মানের সঙ্গে কাজ শুরু করতে পারে, —যদি তার পক্ষে ভুলগুলোকে ভুল বলে মেনে নিয়ে বাস্তবকে স্বীকার করার মত মানসিক জোর থাকে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে গণজীবনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে তার সরে আসাটাই উচিত। একবার যখন সে ধর্ষণের পথে পা বাড়িয়েছে, দ্বিতীয় বারেও যে সেদিকে সে যাবে না তার স্থিরতা কোথায়। যাহোক এক্ষেত্রে অন্তত তার অনুগামীদের কাছ থেকে নেতৃত্ব দাবি ব্যক্তে থাকা উচিত নয়।

বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের চারিত্রিক দুর্নীতিপ্রায়ণতার এগুলো হল প্রধান কারণ। তাই আজকের রাজনৈতিক আকাশে একজনকেও খুঁজে পাওয়া দুর্কর, যে এ দুর্নীতির আওতার বাহিনে নিজেকে রেখে আলোর গতিপথে এগিয়ে চলেছে।

অবশ্য অতীতের সেই দিনগুলোয় রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর চিন্তার পেছনেই আমি বেশি সময় খরচ করতাম; কিন্তু তবু আমি রাজনৈতিতে প্রকাশ্যভাবে অংশ নেওয়ার পথেকে অতি সতর্কভাবে বিরত থাকতাম। যে সমস্যাগুলো অবিরত আমাকে দংশনে ক্ষত-বিক্ষত করত, সেগুলো নিয়ে সীমাবদ্ধ অতি স্বল্পসংখ্যক লোকের কাছে মুখ খুলতাম, আলোচনা করতাম, সীমাবদ্ধ এ গঞ্জির আলোচনা চলানোর সুফল অনেক। নিজে কথা বলার চেয়ে আমাকে যিরে থাকা স্বল্পসংখ্যক লোকগুলোর চিন্তাধারা এবং মতামত বুবাতে অনেক বেশি সচেষ্ট থাকতাম। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের চিন্তাধারা এবং মতামত সে করলে ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত; তবু এ পথেই আমি মানুষ সম্পর্কে আমার জ্ঞান বাড়িয়েছি। ভিয়েনায় এ ব্যাপারে যত সুযোগ আমি পেয়েছি জার্মানদের সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ানোর, অন্য কোথাও সে সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয়।

জার্মানির চেয়ে প্রাচীন ভারুবিয়ান সম্রাজ্যের রাজনৈতিতে অনেক বেশি বৈচিত্র পরিধি বিস্তৃত ছিল। অবশ্য প্রশিয়ার কিছুটা অংশ, হামবুর্গ এবং নর্থ-সীর প্রত্যন্ত প্রদেশের কয়েকটা জেলা ছাড়া। যখন আমি অস্ত্রিয়ার কথা বলি, তখন অবশ্য হাবুসবুর্গ সম্রাজ্যের কথাই বোঝাই। কারণ সেই সুবিত্তীর্ণ জার্মান অধ্যায়িত হাবুসবুর্গ সম্রাজ্যের অধিবাসীদের রাজনৈতিক জীবনের মধ্যকার সাংস্কৃতিক জীবনটা ছিল নিছকই কৃত্রিম। যত দিন যেতে থাকে তত যেন অস্ত্রিয়ান সম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি হাবুসবুর্গ সম্রাজ্যের বীজাগু ভর্তি ইটের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

বংশগত বাজকীয় সম্পদায় হল সে সম্রাজ্যের হৃদয়বৰুপ। আর সে হৃদয়ই দেশের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ত সঞ্চালনের দাঁড়া নাড়ীর গতি ঠিক রাখে। এ সম্রাজ্যের হৃদয়ের মন্ত্রিশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি হল ভিয়েনা। তখনকার দিনের ভিয়েনার চালচলন দেখে মনে হচ্ছে যেন মুকুটহীন রাণী, যার আঙুল সঙ্কেতে বিভিন্ন জাতিরা মুহূর্তে একটা পিণ্ডে

পরিণত হয়ে হাবুসবুর্গ রাজ্যদণ্ডের নিচে মাথা পেতে দিত। রাজধানী শহরের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে রাজাগুলোর বার্ধক্যান্তি অবক্ষয়তা নজর এড়িয়ে যেত।

যদিও ভেতরে গেওয়ে তখন সে সাম্রাজ্য ক্ষয়িত। কারণ আর কিছুই নয়, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অখৃত্য। কিন্তু বাইরের জগৎ থেকে বিশেষ করে জার্মানির নজরে তা পড়ত না। কারণ তাদের দৃষ্টি থখন সেই সুন্দর শহরের দিকেই একমাত্র নিবক্ষ। সেই কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে পদান কানে এল শহর ভিয়েনা— তখন তা গৌরবের উত্তুঙ্গ শীর্ষে। সুযোগ্য মেয়ারের সুন্দর পশামানে সেই প্রাচীন শহর যেন ঘোবনের নতুন সাজে সুসজ্জিত।

সবশেষে যে মহান জার্মান সাধারণ জনতার মধ্য থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং পুরো পৃষ্ঠাপনাটা কভা করতে পেরেছিল, সত্যিকারের নেতা যদিও তাকে বলা যায় না, তবু এ উচ্চর পৃষ্ঠাগুল মেয়ার হিসেবে এ সাম্রাজ্যের রাজধানীটিতে এতটুকু প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। তখন যে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকে সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যের হৃদয়টাই নতুন দৃষ্টিপন্থায় জেগে উঠেছিল। সেই কারণে তৎকালীন রাজনীতিজ্ঞদের থেকে নেতা হিসেবে তার স্থান অনেক উঁচুতে।

এটাও সত্য যে এ ধরনের পাঁচ মিশেলী জাতির সমন্বয়ে গঠিত অন্তিয়া শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক অক্ষমতার জন্মেই তেঙ্গে পড়ে। অসম্ভব পরিস্থিতির পরিণতিই হল এ ভঙ্গুর অংশশা। পশ্চাশ লক্ষ বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত কতগুলো প্রদেশকে, যারা প্রতিনিয়ত সংঘর্ষে নিষে— দৈশলক্ষ লোকের একটা দেশ হয়ে তাদেরকে শাসন করা অসম্ভব। যদি না শেষপর্যন্ত বিশেষ সংগঠিত কোন পরিকল্পনা হাতে থাকে।

অন্তিয়ায় বসবাসকারী জার্মানদের চিত্তাধারা সব সময়েই উঁচু ছিল। বিরাট একটা পাম্রাজ্যে বসবাস করে এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে সদা সর্বদাই সচেতন থাকত। অন্তিয়ার এতগুলো প্রদেশের মধ্যে একমাত্র ওরাই এককালি জামি পেরিয়ে সীমান্তের ওপরের দেশটায় দৃষ্টি মেলে দিত। সত্য বলতে কি, নিয়তি তাদের নির্জেদের পিতৃভূমির থেকে বিছিন্ন করে দিলেও, তাদের ওপর সম্পর্কিত কর্তব্য তারা খোলেনি। এ কর্তব্য বা দায়িত্ব হল স্বদেশপ্রেম, যা তাদের পূর্বপুরুষেরাও মনেপ্রাণে পোষণ করে এসেছে। তবে এটাও শ্রণণীয় যে অন্তিয়ার জার্মানরা মনেপ্রাণে সেই পথের প্রয়াসী হতে পারেন। কারণ হৃদয় এবং মৃত্তিক তাদের মাতৃভূমির আঞ্চলিকজনের থেকে বিছিন্ন হতে দেয়নি। সে কারণে সমস্ত শক্তি তাদের পক্ষে বিনিয়োগ করা সম্ভব ছিল না।

অন্তিয়ার জার্মানদের মানসিক উদারতাও ছিল অন্যান্যদের চেয়ে বেশি। তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সেই শিখিত সাম্রাজ্যের প্রায় প্রতিটি শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত। অধিকাংশ বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের দ্বারাই পরিচালিত। শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেশিরভাগ তাদের মধ্যে থেকেই এসেছে। এমন কি বৈদেশিক বাণিজ্যও তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত; বিশেষ করে ইহুদীদের এ জগতে ঠাই ছিল না বললেই হয়। শুধু তাই নয়, অন্তিয়ার বসবাসকারি জার্মানরাই বিভিন্ন প্রদেশগুলোকে একসূত্রে গ্রাহিত করে রেখেছিল। তাদের সামরিক কলাকৌশলের খ্যাতি দেশের সীমাত্ত পেরিয়ে বহুদ্রে গিয়েছিল। যদিও সে বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক জার্মান, তবু তাদের রাখা হয়েছিল হেরজে-গাভিনা এবং ভিয়েনা অথবা গেলিসিয়া প্রভৃতি জায়গায়। হাবুসবুর্গ সামরিক বাহিনীর অফিসার এবং বেসমারিক অফিসারবৃন্দ প্রায় সবাই ছিল জার্মান। বিজ্ঞান এবং শিল্পকলাও ছিল তাদেরই হাতে।

তথাকথিত আধুনিক শিল্পকলার নামে আবর্জনা বিশেষ; যা এমন কি নিষ্ঠাদের পক্ষেও সৃষ্টি করা সহজ। বাকি উচ্চ দরের শিল্পকর্ম বলতে যা বোঝায় সবাই প্রায় জার্মান গোষ্ঠী থেকেই সৃষ্টি হত। সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য বা অক্ষন শিল্প —প্রত্তি যেসব শিল্পকর্ম দ্বারা শহর ভিয়েনা সমৃদ্ধ, তার অধিকাংশের সৃষ্টিকর্তা ছিল অস্ত্রিয়ার বসবাসকরি জার্মানরা। এবং এ ভাস্কর নিঃশেষিত হবার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল না। সর্বপরি, এ জার্মানরাই বৈদেশিক নীতির নির্ধারক ছিল, যদিও খুবই স্বল্প পরিমাণে হাসেরীয়ানরাও এ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সহায়তা করত।

কিন্তু সমস্ত প্রদেশগুলোকে এক সূতোতে বেঁধে রাখার জন্য প্রাথমিক উপকরণ যা দরকার তারই অভাব ছিল অত্যন্ত বেশি।

এ বিভিন্ন প্রদেশের জাতিকে এক জায়গায় ধরে রাখার মাত্র একটাই পথ। অস্ত্রিয়ার প্রদেশগুলোকে অঙ্গস্তোক দিয়ে শাসনের মাধ্যমে শক্তিশালী এক কেন্দ্রের নিচে নিয়ে আসা। অন্য আর কোন পথই ছিল না যার দ্বারা এর অস্তিত্ব রক্ষা করা যায়।

মাঝে মধ্যেই ওপর মহলে এ সত্য আবিক্ষার হত। কিন্তু তা কিছুক্ষণের বা কয়েকদিনের জন্য। এক সময় সবাই তা ভুলে যেত বা ইচ্ছে করে ভুলে থাকত। এ দিনের আলোর মত স্পষ্ট সত্যটাকে। কারণ এটাকে বীকার করে নেওয়ার মত কষ্টটাকে দৃঢ়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে বাঁধার চিত্তাধারা কখনই কার্যকর করা হত না। এ চিত্তাধারাটাকে কার্যে পরিণত করার মত শক্তিশালী কোন কেন্দ্রও ছিল না। এখানে মনে রাখা সবিশেষ প্রয়োজন যে তৎকালীন অস্ত্রিয়ার অবস্থা বিসমার্ক শাসিত জার্মানির মত ছিল না। জার্মানির সমস্যা তখন একটাই; তা হল রাজনৈতিক। কারণ বিসমার্কের সময় জার্মানির সাংস্কৃতিক পটভূমিতে কোন মিশেল ছিল না। সাম্রাজ্যের প্রতিটি সদস্য একই জাতির বা গোষ্ঠীর; শুধু স্বল্প সংখ্যক কয়েকটা টুকরো ছাড়।

অস্ত্রিয়ার গৃহ ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। হাসেরী ব্যতীত রাজনৈতিক কোন ধারা ছিল না, এবং এটা আচীনকাল থেকেই চলে আসছিল। যদি থেকেও থাকে, তবে তা ইতিমধ্যে হয় ধুয়ে মুছে লুণ হয়েছে, নয় যুগের অক্ষকারে তলিয়ে গিয়ে তা নিষিঙ্ক হয়ে গেছে। সর্বপরি এ যুগটা হল জাতীয়তাবাদী উত্থানের প্রাক-মুহূর্ত। আর সে কারণে হাবুসবুর্গ রাজদণ্ডের নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেশগুলোও তার স্বাদ ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে। এ নতুন উদ্ভূত জাতীয়তাবাদী মতাদর্শকে দমন করে রাখাও অসম্ভব। তার কারণ হল সীমান্ত দ্বৰা সাম্রাজ্যগুলো এ নতুন জন্ম দেওয়া প্রদেশগুলো হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশগুলোর আঘাত হওয়াতে এর ছোয়া লেগে সাম্রাজ্য রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। অস্ত্রিয়ার বসবাসকারী জার্মানদের থেকে ওদের হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের ওপর প্রভাব ছিল অনেক বেশি।

এমন কি ভিয়েনা পর্যন্ত এ প্রতিবন্ধিতায় খুব বেশি দিন নেতৃত্ব দিতে পারে নি। তখন বুদ্ধাপেন্তেও ধীরে ধীরে ইউরোপের একটা প্রধান নগর হিসেবে সবেমাত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শক্তিগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে না রেখে, কোন একটা বিশেষ শক্তিকে আরও বেশি শক্তিশালী করা। কিছুদিনের মধ্যে প্রাগ্নও বুদ্ধাপেন্তের মত একই লাইনে গিয়ে ভেড়ে। পেছনে পেছনে আসে লেমবার্গ, লাইবার্থ আর অন্যান্যরা। এসব প্রাদেশিক শহরগুলো ধীরে ধীরে রাজধানীতে রূপান্তর হওয়ায় এদের এক পৃথক সাংস্কৃতিক জীবনও গড়ে উঠে। এবং সাধারণ জনতার মাধ্যমে ওরা নিজেদের সাংস্কৃতিক দৃঢ় তত্ত্ব স্থাপন

করে। এক সময় সাধারণ জনতার স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থটাই উচু হয়ে ওঠে, যখন সমস্ত পর্যায়টা এক ছন্দে ওঠে, তখনই অন্তিমার ভাগ ওদের কাছে বন্ধক পড়ে।

বিশেষ করে প্রতীয় যোসেপের মৃত্যুর পর সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সামাজিক দ্রুতগতি নির্ভর করে অনেকগুলো বিষয়ের ওপর, কয়েকটা বিষয়ের জন্য স্বয়ং রাজা দায়ী। বাকিগুলো অবশ্য বৈদেশিক নীতির গর্ভে উভূত।

অন্তিমার পদেশগুলোকে বিশেষ কোন একটা কেন্দ্রীয় শক্তি ছাড়া একসূতোয় বাঁধা একেনাশেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্য কিছু করার আগে সমস্ত প্রদেশগুলোয় একমাত্র একটা ভাগাগ পচলন করার দরকার। যার মাধ্যমে সরকারি কাজকর্ম চালানো সম্ভব হবে। এ একটা মুকো দিয়েই একমাত্র রাজকীয় টুকরোগুলোকে একসঙ্গে জোরে বাঁধা যায়। সুতরাং পুরো শাসন ন্যাবহৃটাই এমন এক যন্ত্রের মাধ্যমে বাঁধতে হবে, যা ছাড়া রাজনৈতিক একতা সম্ভব নাম। এভাবেই প্রতিটি বিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একই মন্ত্র জপ করে মনের এমন এক গুরে গৌথে দিতে হবে যে নিজেরা নিজেদের একই দেশের নাগরিক বলে মনে করে। এটা অবশ্য দশ-বিশ বছরের মত অন্ত সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয়। এ প্রচেষ্টা শতাব্দী ধরে ঢালানোর প্রয়োজন, বিভিন্ন উপনিবেশ স্থাপন করার সময় যেমন মানসিক ধৈর্যের প্রয়োজন সাময়িক উৎসাহের চেয়ে অনেক বেশি।

সুতরাং এটা বলা নিষ্পত্যোজন যে এ পরিবেশে দেশের শাসনব্যবস্থা একত্র আদর্শে দৃঢ় থাকে পরিচালিত হওয়া উচিত।

অন্য প্রদেশের চেয়ে পুরনো অন্তিমার অস্তিত্ব রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল শক্তি এবং পুরিচালিত সরকারের। হাবুসবুর্গ সম্রাজ্যের পরিচালনার ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে অভাব ছিল মানুষ যে বাঁধনে পরস্পরকে বাঁধে, সে বন্ধনের। এবং কোন জাতির যদি ভিত্তি মানবজাতির বন্ধনের ওপর গড়ে ওঠে তবে সরকার পরিচালন ব্যবস্থায় অনভিজ্ঞ হলেও সহসা তা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা নেই। যখন কোন প্রদেশ বিভিন্ন জাতির সমষ্টিয়ে গড়ে ওঠে, তখন তাদের সামাজিক জড়তা পরস্পরকে কুশাসন এবং অপরিণত শাসনব্যবস্থা সন্তোষ বিস্থায়করভাবে দীর্ঘদিন ধরে রাখে।

অনেক সময় মনে হয় যে এ রাজনৈতিক দেহ থেকে জীবনের আদর্শগুলোই হয়ত যা মরে গেছে। কিন্তু যথা সময়ে দেখা যায় সে মৃতদেহগুলো আবার হঠাৎ জেগে উঠে কলরব করতে শুরু করেছে, এবং এ রকম অবিনষ্ট শক্তি দেখে পৃথিবী বিস্য মানে।

কিন্তু যে দেশের লোকসংখ্যা মিশ্রিত নয়, সে দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। কারণ শাসন ব্যবস্থা সেখানে একার হাতে থাকলেও রক্ত তো এক নয়। যদি এমন সরকার বহাল থাকে যা ঘুমিয়ে থাকা একটা জাতিকে জাগানোর পক্ষে দুর্বল, তবে তা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয় যতক্ষণ না পর্যন্ত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কেন্দ্রীয় কোন সরকার পরিচালিত হয়। এ ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিপদের সংঘাত কর্ম থাকে যদি শতাব্দী ধরে একই শিক্ষা, এক ট্রাইসিন এবং একই ধরনের স্বার্থ থাকে। সরকার যত নবীন হয়, কেন্দ্রের ওপর তার নির্ভরশীলতাও তত বাড়ে। যদি তাদের ভিত্তি কোন সক্ষম নেতার ব্যক্তিত্বের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, তবে সে নেতা বা ব্যক্তিত্বের অপসারণের সংগে সংগে সে অট্টালিকা ভেঙে পড়ার সংঘাত। কারণ ব্যক্তিত্ব বিবাট হলেও সে তো একক। কিন্তু শতাব্দী ধরে সহশিক্ষা থাকলেও আমি যে সব ব্যক্তিত্বের কথা বলছি তাদের এড়িয়ে যাওয়া সবসময় সম্ভব নয়। অনেক সময়

তারা হয়ত বা সুশ্রুত অবস্থায় থাকে, কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা দেখলেই হঠাতে তারা জেগে ওঠে। এবং সে সময় একক ব্যক্তিত্বের স্থার্থের প্রোত্তে শতান্ধী ধরে চলে আসা শিক্ষা বৃট্ট্রাডিসন ভেসে যেতে বাধ্য।

এ সব সত্যগুলোর অবলুপ্তি হল হাবুসবুর্গ শাসকদের অপরাধ বিশেষ।

একমাত্র একজন হাবুসবুর্গ শাসকের চোখের সামনে ভবিতব্যের আলোটা দপ্ত করে জুলে ওঠে, যাতে হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হয়। কিন্তু সে হঠাতে আলোর ঝলকানি ও চিরতরে নিতে যায়।

যোসেপ দ্বিতীয়: জার্মান জাতির রোমান সম্রাট যখন অত্যন্ত উদ্বিঘ্নিতার সঙ্গে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল, তখন অবশ্য পুরো ব্যাপারটাই সীমান্তের ওপরে দাঁড়িয়ে। ক্ষয়িক্ষা, মিশ্রিত দেশবাসীর দ্বারা সৃষ্টি বিরাট বিরাট ঘূর্ণবর্তণুলি যেন হাঁ করে পুরো সাম্রাজ্যটাকেই গিলতে আসছে। যদি শেষ মুহূর্তে তার পূর্বপুরুষদের অবহেলার প্রতিকার এ মুহূর্তেই কিছু করা যায়। অতি মানবীয় মানসিক শক্তিতে দ্বিতীয় যোসেপ তার পূর্বপুরুষদের অবহেলা এবং বোকাখির মোকাবিলা করে, মাত্র এক যুগের মধ্যে সে প্রাণপনে চেষ্টা করে শতান্ধী ধরে ফুটো হওয়া নৌকাটাকে সারাতে। যদি তার ভবিতব্য তাকে আর মাত্র চল্লিশটা বছর পরিশ্রম করার সুযোগ দিত, এবং পরবর্তী দুটো বৎশর তার ইস্পিত কাজ চালিয়ে যেতে পারত, তবে হয়ত বা আচর্যজনক কিছু ঘটে যাওয়া বিচ্ছিন্ন ছিল না। কিন্তু মাত্র দশ বছরের শাসনকার্যের পর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, তার প্রগতিমূলক কার্যাবলী ও দৃষ্টিভঙ্গিও কবরের অঙ্ককার গহ্বরে চিরতরে প্রোগ্রাম হয়ে যায়; যারা আর কোনদিন প্রাণের ইসারা নিয়ে জেগে ওঠেনি। সেগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত তার পরবর্তী বৎশরদের মধ্যে না ছিল ইচ্ছাশক্তি, না কর্মক্ষমতা।

সমগ্র ইউরোপে নব বিপ্লবের সঙ্গে ধীরে ধীরে তা অন্ত্রিয়াতেও ছড়িয়ে যায়। কিন্তু সেই আগন্তনের শিখা ভালভাবে প্রজ্ঞালিত হওয়ার আগেই তা জ্যোতিষীন হয়ে পড়ে। কারণ আর কিছুই নয়, এ আগন্তনের উৎপত্তি হয়েছিল মিশ্রজাতিদের মধ্য থেকে। সুতরাং জোর থাকবে কোথায়। ১৮-৪৮ সালের ইউরোপের বিপ্লবের সময় যখন সমগ্র ইউরোপ শ্রেণী সংগ্রামে রত, তখন অন্ত্রিয়ায় এর রূপ ছিল পরম্পরারের জাতি বিদ্যমে। অন্ত্রিয়ায় বসবাসকারী জার্মানদের ব্যাপার হল তারা বিপ্লবের মূল উৎপত্তির কারণটাকেই হয়ত বা ভুল বুঝেছিল; অথবা প্রথমদিকে ব্যাপারটাকে ঠিক মত বুঝে উঠতে না পারায় শেষমেষে তাদের ভাগ্যের দরজাটাই বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে একরকম নিজেদের অজ্ঞাতস্বারে তারা পশ্চিমের গণতন্ত্রে জাগরণ নিয়ে আসে এবং কালে যা তাদের নিজেদের অস্তিত্বটাকেই বিপন্ন করে তোলে।

এ তথাকথিত ব্যাপারটা দুঃখজনক হলেও অভিজ্ঞতা যে বাড়ায় তাতে সন্দেহ নেই। সহস্র ধারায় প্রবাহিত হয় এ অমোগ ইতিহাসের আদেশ। এ বিশাল জনতার অঙ্কতৃ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে অন্ত্রিয়ার ধ্বংস ডেকে আনে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনও যেমন নেই, অবকাশও কম। কারণ তা এ বইয়ের বিষয় বস্তুর বাইরে। আমি শুধু সে বিষয়গুলোর ওপরেই আলোকপাত করতে চাই, যেগুলো একটা জাতি এবং প্রদেশগুলোকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। উপরন্তু এসব ঘটনাগুলো আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতেও অনেক সাহায্য করেছে।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি ধ্বংস ডেকে এনেছে তা হল দুর্বল এবং সন্ধীর্ণময় ব্যক্তিবর্গ, যারা নিয়মিত ভিড় করেছে পার্লামেন্টে বা ইম্পেরিয়াল কোর্ট-এ, অন্ত্রিয়ায় যে নামে পার্লামেন্টকে অভিহিত করা হয়।

এ ধরনের সশ্চিলিত সভা ঠিক ইংল্যান্ডের অনুকরণে গঠিত হয়েছিল; ইংল্যান্ড হল গণতন্ত্রের সুরক্ষামূলক।

প্রায় সময় সংঘটাই বলতে গেলে অন্তিমাতে পাচার করে দেওয়া হয়েছিল। সামান্য কিছু বদবদল করে।

ব্রিটেনের বদলী ভিয়েনাতে দু'কামরা বিশিষ্ট গণতন্ত্রের প্রচলন করা হয়। সহকারী সদস্যদের জন্য একটা কামরা আব লর্ডদের জন্য আরেকটা। বাড়িগুলোই অন্যরকম ঢঙে তৈরি করা হয়েছিল। ব্যাবি যখন তার রাজপ্রাসাদ তৈরি করে, যাকে আমরা হাউস অফ পার্লামেন্ট বলে থাকি, টেমস নদীর ধারে, সে বাড়িটার স্থাপত্যের উৎসমুখ ছিল বৃটিশ সম্রাজ্যের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের মধ্য থেকেই সে প্রচুর উপকরণ এবং মালমশলা সঞ্চাহ করে যা দিয়ে 'ব্যাবী বারশ' কুলাছি, খাম প্রত্তির অলংকরণ করে সেই ক্রপকথার মত সুন্দর প্রাসাদ ও অট্টালিকা তৈরি করে। সে অট্টালিকার গাণ্ডীয় এবং অলংকরণ, রঙ সবকিছুই জাতির জন্য একটা বিশিষ্ট মর্যাদার স্থান অধিকার করে। যেটা মন্দিরের মত পবিত্রও বটে।

এখনেই ভিয়েনা প্রথম অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যখন হানসন, ওলন্দাজ স্থাপত্যবিদ সেই মর্মর প্রস্তরে তৈরি প্রাসাদটার ঢালু ছাদ দিয়ে ঘেরা দেওয়ালের তিন কোণ উপরিভাগ পায় শেখ করে এনেছে, ঠিক তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ে প্রাসাদটি অলংকরণের। কারণ এমন একাদিন আসবে যখন সেইসব প্রতিনিধি নিয়মিত বসবে যারা সমস্ত দেশে জনপ্রিয়। সুতরাং অলংকরণের প্রয়োজনে তাঁকে বাধ্য হয়েই পুরনো দিনের মহৎ শিল্পের দিকে মুখ ঘূরাতে হয়। পাঁচমী গণতন্ত্রের এ নাটকীয় মন্দিরকে সাজানো হয় বিভিন্ন মূর্তি দিয়ে। গ্রীক ও রোমান রাষ্ট্রীয়তা ও দার্শনিকদের প্রতিচ্ছবি সে প্রাসাদে স্থাপন করে। যেন ভাগ্যের পরিহাসের মত, একদল উন্তেজক ঘোড়া পরম্পরাকে টানছে ঢালু ছাদ দিয়ে ঘেরা চারিদিকের প্রাসাদটার দেওয়ালের দিকে। অবশ্য বাড়িটার ভেতরে যা চলছিল, এর থেকে ভাল প্রতীক অন্তত এ প্রাসাদে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না।

বাড়িটা অলংকরণের ব্যাপারে জাতীয়তাবাদীকে পুরোপুরি বর্জন করা হয়, ধরে নেওয়া হয়েছিল যে জাতীয়তাবাদী দোষের এবং তা জনসাধারণকে উন্তেজনার খোরাক জোগাবে। এ একই ব্যাপার জার্মানিতে ঘটেছিল। রাইখষ্টাগ বাড়িটা যখন ভালেট তৈরি করে, তখন এটা জার্মান জাতির জন্য মোটেই তৈরি করা হয়নি; যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশ্বযুক্তের কামান গর্জে ওঠে। তখন শুধু পাথরে খোদাই করা এক উৎসর্গনামা জনসাধারণের জন্য স্থাপন করা হয়েছিল।

আমার তখন কৃতি বছর বয়সও হয়নি, যখন প্রথম সেই ফ্রান্জেনস্ট্রিডের প্রাসাদে সদস্যদের বক্তৃতা শোনার জন্য প্রবেশ করি। প্রথম অভিজ্ঞতাই প্রচণ্ড ঘৃণার উদ্বৃক করে। সংসদকে আমি বরাবরই ঘৃণা করে এসেছি। তবে প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, ঠিক তার উন্টে কারণে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আবাদনের জন্য এর থেকে ভাল রাজনৈতিক পদ্ধতি আমি কল্পনাতেও আনতে পারি না। কিন্তু যে আলোর আশ্য আমার হাবুসবুর্গ সংসদের পরিচয়, সে একনায়কতন্ত্রের কথা চিন্তা করার জন্য নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হয়েছে।

অবশ্য আমার এ চিন্তাধারার পেছনে ব্রিটিশ সংসদের দান অনেকখানি। বয়সে কম ছিলাম বলে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে সংসদের অতিরিক্তিত করা ব্যাপার পড়ে আমার সংসদ রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ আরও বেড়ে যায় এবং এ আকর্ষণ আমি সে মুহূর্তে ঘেড়ে ফেলে

দিতে পারিনি। যেরকম অভিজাত্যের সঙ্গে ব্রিটিশ হাউস অফ কমনস্ তাদের কর্তব্য সম্পাদন করত, তাঁতে আমার শ্রদ্ধা আৰ বেশি বেড়ে গিয়েছিল। এৱ জন্য অবশ্য অন্তিমাব সংবাদপত্রকে ধন্যবাদ, যারা গালভোৱা বিশ্লেষণ দিয়ে ঘটনাগুলোকে উপস্থাপিত করত। আমি নিজেকেই বারবার জিজ্ঞাসা কৰতাম, জনসাধারণের নিজস্ব দৰকার ছাড়া অন্য কোন আৰ উন্নত ধৰনের সৱকার গঠন কৰা সম্ভব কিনা।

কিন্তু এ চিন্তাগুলোই আমাকে আৱও বেশি অন্তিমাব পার্লামেন্টেৰ বিৱৰণবাদী কৰে তোলে। যতদিন পৰ্যন্ত গোপন ভোটে নিৰ্বাচনপথা শুল্ক কৰা না হয়েছিল, ততদিন পৰ্যন্ত জার্মান প্রতিনিধিৱাই সংখ্যায় বেশি ছিল। যদিও এ সংখ্যাধিক্য নামে মাত্। এ পৱিষ্ঠিতিতে ব্যাপারটা আৱও বেশি ঘোলাটে হয়ে ওঠে। কাৰণ জার্মানদেৱ মধ্যে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদেৱ ওপৰ কখনই বিশ্বাস কৰা যায় না। বিশেষ কৰে জাতীয় বিপৰ্যয়েৰ সময়। জার্মানদেৱ পক্ষে ব্যাপারটা আৱও বেশি বিপদজ্জনক হয়ে উঠে, কাৰণ যে কোন বিষয়বস্তু আলোচনাৰ সময়েই তাৰা জার্মানদেৱ বিৱৰণিতা কৰতে শুল্ক কৰে। এৱ কাৰণ আৱ কিছুই নয়, তাদেৱ ভয় অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলে তাদেৱ যেসব অনুগত কৰ্মী আছে তাৰা যাতে দল ছেড়ে চলে না যায়। ভোট পথা চালু হওয়াৰ আগেই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলকে তখন আৱ কোনক্রমেই জার্মান জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে গণ্য কৰা চলে না। ভোটপথা চালু কৰাৰ সঙ্গে সঙ্গে জার্মান সংখ্যাধিকোৱ পৱিসমাপ্তি হয়। এভাৱেই অন্তিমাবে জার্মানদেৱ প্ৰতাৰ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আমাৰ জাতীয়তাবাদী মন এবং চৰিত্র এ সদস্য ব্যবস্থাকে মেনে নিতে কখনই সায় দেয়নি, যাতে জার্মান জাতীয়তাবাদী দলকে সত্যিকাৱেৰ প্রতিনিধিত্ব কৰতে দেওয়া হয়নি। কাৰণ যারা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদেৱ এক অংশেৰ দ্বাৰা প্ৰতাৱিত হয়েছে, এৱকম এবং আৱও অনেক দোষ কৃতি, সেগুলোৰ জন্য পার্লামেন্টকে দোষাবোপ কৰা ঠিক নয়। এৱজন্য সম্পূৰ্ণ দায়ী অন্তিমাৰ সৱকাৰ। এখন পৰ্যন্ত আমি বিশ্বাস কৰি যে যদিও জার্মান সংখ্যাধিক্য সংসদে পাওয়া যায়নি, তবু তাৰ জন্য পার্লামেন্টোৱ প্ৰথাকে কোন রকমেই দোষাবোপ কৰা চলে না। এৱজন্য সম্পূৰ্ণ দায়ী তৎকালীন অন্তিমাৰ সৱকাৰ।

আমি যখন সে পৰিব্রত অথচ কলহুখৰ সভায় প্ৰবেশ কৰি, তখন আমাৰ ধ্যান ধাৰণা ছিল এৱকম। আমাৰ কাছে তাৰ পৰিব্রত কাৰণ সেই গৌৱৰময় প্ৰাসাদেৱ আনন্দবাজ্ঞক রূপ। জার্মানিৰ মাটিতে একটা শ্ৰীক অত্যাকৃষ্ণেৰ নিৰ্দেশন।

কিন্তু মাত্ কিছুদিনেৰ মধ্যেই সে বিকট দৃশ্য আমাৰ চোখেৰ ওপৰ ঘটতে দেখে কুন্দ হয়ে উঠি। কয়েক শ'সদস্য যারা একটা বিবাট অৰ্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনাৰ জন্য উপস্থিত এবং প্ৰত্যেকেই বক্তৰ্যাৰ বাখাৰ জন্য উদ্বোধ।

আমাৰ সে একদিনেৰ অভিজ্ঞতা পৱিবৰ্তী অনেক সংগ্ৰহেৰ ক্ষুণ্ণবৃত্তি কৰেছিল।

সে বিতৰকে বুদ্ধিমত্তাৰ কোন ছাপই ছিল না। বৱং তা অনেক নিচু ধামে বাঁধা। কখনও আমাৰ মনেই হয়নি যে বিতৰকত সদস্যদেৱ মাথায় কিছু আছে। বেশ কিছু সদস্য যারা সেখানে উপস্থিত, জার্মান ভাষাতেই তাৰা কথা বলেনি, শুধু সমানে নিজেদেৱ প্ৰদেশেৰ উপভাষা চালিয়ে গেছে। এভাৱেই এতদিন যা সংবাদপত্রে পড়ে এসেছি মাত্, তা শুচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰি। একদল অবাধ্য দাঙ্গাবাজ মানুষ বিশ্বী আকাৰ ইঙ্গিত সহকাৱে হৈ হল্লা কৰে চলেছে, পৱিষ্ঠেৰ প্ৰতি, আৱ কৰুণা পাওয়াৰ যোগ্য একজন বৃক্ষ ক্ৰমাগত ঘন্টা বাজিয়ে সে

হিস্তি সভার ঘর্যাদা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে; তার আবেদন, নিবেদন, উপদেশ বা পরামর্শ অথবা সতর্কতায় কেউ কান দিছে না।

ব্যাপার স্যাপার দেখে আমি না হেসে পারিনি। কয়েক সপ্তাহ পরে আবার আমি যাই। এবারের সভার চিত্র সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এত আলাদা যে বোঝাই কষ্টকর এ সভাতেই আমি কয়েক সপ্তাহ আগে এসেছিলাম। পুরো সভাকক্ষই বলতে গেলে শূন্য। সংসদ সদস্যবৃন্দ নিচের আরেকটা ঘরে টানা যুক্ত দিছে। মাত্র কয়েকজন সদস্য সভাকক্ষে পরস্পরের মুখোমুখি বসে আলস্য বিজড়িত হাই তুলছে। একজন সভাপতি চেয়ারে বসে। তার এদিক ওদিক তাকানোর ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায় যে তার চেয়ারে বসে থাকতে একধৰ্ম্যে লাগছে।

তখন পুরো ব্যাপারটা নিয়েই আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করি। এবং সময় পেলেই আমি সংসদে যাওয়া শুরু করি নিঃশব্দে কিন্তু গভীর অভিনিবেশ সহকারে দর্শকদের লক্ষ্য করি। বিতর্ক শুনি এবং সেই মিশেলী রাজ্যগুলো থেকে আসা বিচ্ছিন্ন সদস্যদের বুদ্ধির পরিমাপ করার চেষ্টা করি। ধীরে ধীরে আমার মনোজগতে একটা সুসংবন্ধ চিন্তাধারা জন্মে, যা যা দেখতাম তাকে অবলম্বন করে।

একটা বছর চুপচাপ পর্যবেক্ষণই আমার পুরনো ধ্যান-ধারণা ভেঙে সংসদের চরিত্র বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। অস্ত্রিয়ার সংসদ সদস্যদের বিপথগামী সদস্যরা শুধু বিরোধিতা নয়, সমস্ত প্রথাটকেই মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এতদিন পর্যন্ত তৈবে এসেছি যে অস্ত্রিয়ার সংসদের এ দুর্ভাগ্যজনক রক্তাল্পাতার জন্য দায়ী জার্মান সদস্যদের লম্পিষ্ঠতা। কিন্তু এখন বুবাতে পারি সংসদ গঠিতই হয়েছে তুল উপাদানে।

তাদের জন্য অনেকগুলো সমস্যা এসে আমার মনের পর্দায় তিচ্ছে করে। আমি ভোটদান পর্বটাকে নিয়ে অনেক চিন্তা করি আর সংসদ সদস্যদের বুদ্ধিমত্তা এবং নৈতিক দিকটার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও ভাবি।

সূতরাং এ পৃথিবীতে শুধু সংসদ চরিত্র নয়, যাদের দ্বারা এটা গঠিত তাদেরও অনুধাবন করতে পারি। তাবে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আমার সময়কার তথাকথিত পূজনীয় চরিত্র সম্পর্কে আমার মনের আয়নায় শ্পষ্ট একটা ছবি ফুটে ওঠে, সে হল সংসদ সভাপতি। তার ছবিটা মনের এত গভীরে দাগ কেটে বসে যায় যে আজ পর্যন্ত তা ভুলিন বা ভোলার প্রয়োজন হয়নি।

আরও একবার বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া এ সোজাসুজি শিক্ষা আমাকে ফাঁদে ফেলতে পারেনি, যা দিনের পর দিন লোককে প্রলুক্ত করে এসেছে। যদিও পুরো ব্যাপারটাই হল মানব জাতির অবক্ষয়ের চিহ্নস্বরূপ।

গণতন্ত্র, যা আজকের পশ্চিম ইউরোপে মেনে চলা হয়, তা হল মার্কসীয় মতবাদের পথিকৃৎ। সত্যি বলতে কি মার্কসীয় মতবাদের জন্যই হয়েছিল গণতন্ত্রের গর্ভে। গণতন্ত্র হল মার্কসীয় বীজাগু জন্মানোর পক্ষে এক অতি উর্বর ক্ষেত্রবিশেষ, যাতে এ বীজাগু অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে। আর এ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রচলন হল অকালে গর্ভপাতের মত ঘটনা বিশেষ। যার শিক্ষা প্রচলিত হওয়ার আগেই সৃষ্টির আগন নির্বাপিত।

আমি ভাগ্যের কাছে সত্যিই ঝণী যে ভিয়েনাতে থাকাকালীন ব্যাপারটা আমার নজরে এসেছিল। ঘটনাক্রমে যদি আমি জার্মানিতে থাকতাম, তবে হ্যাত বা ব্যাপারটার ভাসা ভাসা একটা সমাধানও খুঁজে পেতাম। আর যদি আমি বাল্লিনে বাস করতাম তাহলে আমি প্রথমেই

উপলক্ষি করতে পারতাম এ সংসদ কর্তব্যানি অযৌক্তিক, আমি হয়ত বা সহজেই অন্য প্রাত্নে বিশ্বাস করতাম। যেরকম অনেকে কোন কারণ ছাড়াই বিশ্বাস করে যে জনসাধারণের রক্ষা পাওয়া সম্ভব যদি সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করা যায়, এবং সাম্রাজ্যের ভিত্তি শক্ত করার একমাত্র পথ তথাকথিত রাজকীয় আদর্শগুলোকে সমর্থন করা। যারা এ পথে ভাবত, তাদের যেমন দুরদৃষ্টির অভাব ছিল, তেমনি জনসাধারণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কেও তারা অবহিত ছিল না।

অঙ্গীয়াতে সহজে কাউকে প্রতারিত করা সম্ভব নয়। সেখানে একটা ভুলের মধ্য থেকে আরেকটা ভুলে পদক্ষেপ করা অসম্ভব। যদি সংসদ অর্থহীন হয়ে থাকে, তবে হাবুসবুর্গ নিকৃষ্টতম। অথবা বলা যায় সামান্যতমও ভাল ছিল না। কিন্তু সংসদীয় পদ্ধতিকে বাতিল করে দিয়ে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তক্ষুণি প্রশ্ন উঠে পারে— তবে? তবে কি করা? ভিয়েনার সংসদকে বর্জন এবং ধ্বংস করে দিলে তো সমস্ত শক্তি গিয়ে জড় হবে হাবুসবুর্গের হাতে। আমার কাছে এ চিন্তাটা কল্পনায় আনা ও সম্ভব ছিল না।

বিশেষ করে এ সমস্যাটা অঙ্গীয়ার বেলায় এতই তীক্ষ্ণ যে বাধ্য হয়েই সে অল্প বয়সে ব্যাপারটা নিয়ে অনেক বেশি মাথা ঘামাতে হয়, সমস্যাটা এত গভীর না হলে এটা আমি অন্তত সে বয়সে কখনই করতাম না।

পরিস্থিতি বিবেচনার পর মেটা প্রথমেই আমার নজরে পড়ে, সেটা হল সংসদ সদস্যদের ভেতর স্পষ্টত এককভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে চলা।

সংসদের এক একটা আইন বা বিল পাশের প্রতিক্রিয়া দেশের চরম দুর্দশা তেকে এনেছে। কিন্তু তার জন্য কাউকে দায়ী করা যায়নি। কোন একক ব্যক্তিকে কারণ দর্শাবার জন্য প্রশ্ন করাও সম্ভব নয়। কেউ হ্যাত বলবে না যে সংসদ তার কর্তব্য সম্পাদন করেছে, যখন এসব আইন বা বিলের আনীত কোন দুর্যোগ উপস্থিতি হওয়ার পর সভার কার্যকাল শেষ হয়ে যায়। অথবা সংসদ যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সামর্যিক মিলনে গঠিত হয় বা ভেঙে যায়, তখনই কি সেই সংসদ তার ওপর সফরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে? দায়িত্বের আদর্শ মানে কি একক ব্যক্তির ওপর অর্পিত দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া?

সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত নেতাদের, যারা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত সদস্য বিশেষ কোন কার্যকলাপের জন্য তাদের কাছে কি হিসেব চাওয়া সম্ভব? নাকি, কোন নেতার পক্ষে এসব তথাকথিত নির্বাচিত রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা পাওয়া যায়। তার পক্ষে এ ব্যবসায়ীদের তোষামোদ এবং অনুনয় বিনয় করেই সম্ভতি আদায় করতে হয়।

এটাই কি একজন রাজনৈতিক নেতার পক্ষে অপরিহার্য শুণ যে, কোন একটা ভবিষ্যতের বীজকে বর্তমানের মাটিতে রোপণ করতে হলে তাকে সানুনয় বিনয় দ্বারা নিজের দৃষ্টিভঙ্গের সমানুপাতে সবাইকে নিয়ে আসতে হবে?

একজন রাষ্ট্রনেতা কি অযোগ্য বলে প্রমাণিত হবে যদি সে তার মতাদর্শ বেশির ভাগ ভোটে পাশ করতে না পারে?

অবশ্য বলা বাহ্য্য সে সংসদ সদস্যদের বেশির ভাগ হ্যাত বা জাল ভোটের দ্বারা নির্বাচিত।

এ সংসদ সভা কি কোনদিন কোন মূল্যবান রাজনৈতিক মতবাদ চালিয়ে তার মূল্য নিরূপণ করে তবে তা এহণ করেছে?

বাস্তব পৃথিবীতে প্রতিকারণ ব্যক্তির প্রতিভা কি অনস এবং জড় জনতার দ্বারা সদাসর্বদা প্রতিহত হয়নি। তাহলে সে রাষ্ট্রনেতার কি করা কর্তব্য, যদি সে সেই দলে ভারী সংসদ সদস্যদের মতামত আদায় করতে না পারে? তবে কি তার কিছুর বিনিময়ে তা কেনা উচিত? অথবা যদি সে নেতা খোশামুদ্দি করে একগুচ্ছে সদস্যদের সমুষ্ট করতে না পারে, তবে সে কি সেপথ ছেড়ে দেবে, যা সে জাতির প্রতি প্রয়োজনীয় এবং সঠিক বলে মনে করেছিল। এ অবস্থায় তার কি রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নেওয়া উচিত? নাকি ক্ষমতায় থাকবে?

এরকম পরিস্থিতিতে সত্যিকারের চরিত্বান একজন রাষ্ট্রনেতা কি তার নিজের মুখোমুখি হবে না? একদিকে তার নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাধারা, অপরদিকে নৈতিক ন্যায়, নিষ্ঠা আরও স্পষ্টভাষ্য বলতে গেলে নৈতিক সাধুতা।

তা হলে ঠিক কোথায় আমরা জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য এবং নিজের সম্মানবোধের সীমারেখা টানব?

সত্যিকারের একজন নেতা নিচ্ছয়ই তাকে ঠিকাদারের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসার কথা চিন্তা করবে না। এবং অপরদিকে, প্রতিটি রাজনৈতিক ঠিকাদার কি ভাববে না যে সেও রাজনীতির এ খেলায় মাতে? কারণ ব্যক্তিগত কাউকে তো হিসেবের জন্য বলা যাবে না; তার দায় তো অগুষ্ঠি জনসাধারণের।

সুতরাং নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে সংখ্যাধিক্য নির্বাচিত সংসদীয় এ গণতান্ত্রিক সরকার কি একজন রাষ্ট্রনেতার আদর্শকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে না?

সত্যিই কি কেউ বিশ্বাস করে যে মানুষের প্রগতি শুধুমাত্র একদল মানুষের মন্তিক প্রসূত? কোন একক ব্যক্তির বৃদ্ধিমত্তা এবং সদিচ্ছা দ্বারা তা সম্ভব নয়? অথবা, এটাই ধরে নেওয়া যায় যে ভবিষ্যৎ মানবিক সভ্যতা এ পরিস্থিতিতেই শুধু বেঁচে থাকবে?

তবে কি আজকের মত সেদিন একক ব্যক্তির দ্বাক্ষমতা এতটা নির্ভরশীল ছিল না?

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিধান সভাক্ষয় ক্ষমতায় একক ব্যক্তির বৃদ্ধিমত্তা খারিজ হয়ে যেত একদল বেনামী মাথার কাছে। কিন্তু এভাবে প্রকৃতির মূল আইন অর্থাৎ আভিজাত্যেই সংঘাত লাগত। যদিও এ অবক্ষয়ের যুগে আমাদের বোৰা উচিত এ আভিজাত্যপূর্ণ চিন্তাধারা শুধু সমাজের ওপরের শ্রেণীর হাজার দশকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই।

যারা ইহুদী প্রেসের সঙ্গে পরিচিত, তাদের পক্ষে এ সংসদীয় ক্ষয়িত শক্তি সম্পর্কে কোনৰকম আঁচ করা সম্ভব নয়। যদি না তারা নিজেরা নিজেদের ভেতরে স্বতন্ত্র চিন্তাধারা গড়ে তুলতে পারে, বা সংবাদগুলো যাচাই করার ক্ষমতা রাখে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোই রাজনীতিতে অতি সাধারণ লোকেদের ভিড় বাড়ানোর জন্য দায়ী। এসব বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে একজন পুরুষ যার ভেতরে সত্যিকারের রাষ্ট্রনেতা হবার যোগ্যতা আছে, সে চেষ্টা করবে রাজনীতির প্রাঙ্গণ এড়িয়ে যেতে। কারণ এ পরিবেশে যার গঠনমূলক কাজ করার ক্ষমতা আছে, তা তাকে করতে দেবে না। বরং যার পক্ষে অধিকাংশের ভিড়ে ভিড়ে যাওয়া সম্ভব, রাজনীতি তাকেই আকর্ষণ করবে। সুতরাং এ পরিবেশ সংরক্ষণনাদের জন্য এবং তাদেরই টানবে।

মানসিক দিক থেকে সংকীর্ণযন্ন এবং জ্ঞানের দিক থেকে অপ্রতুল এসব রাজনীতির দিনমজুরদের রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞানের ভাস্তাৰ সীমাবদ্ধ, যার জন্য সে স্বভাবতই জনতার মনের ভিড়ে নিজের মতাদর্শ মিলিয়ে যেতে দেবে ধাতে তার প্রতিজ্ঞা বা বৃদ্ধিমত্তার পরিমাপ কেউ করতে না পারে; বরং এ ধরনের কৌশলপূর্ণ বিচক্ষণতা একজন অভিজ্ঞ সরকারি

কেবাণীর পক্ষে ভাল, কিন্তু একজন রাজনীতিজ্ঞের জীবনে নয়। বাস্তবিকপক্ষে তার ধ্যান ধারণা এ সংকীর্ণ কৌশল রাজনৈতিক প্রতিভার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। এ ধরনের সাধারণ সোকে তার কাজ সম্পর্কে কোনরকম দায়িত্ব গ্রহণের উদ্বিগ্নিতা থেকে মুক্ত। কারণ প্রথম থেকেই তার রাষ্ট্রনৈতিক খেলার ফলাফল যাই হোক না, পরমায় তো তারার আলোর মত বাঁধাধরা। একদিন তারই মত বুদ্ধিসম্পন্নকে তার জায়গাটা ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের এ ক্ষয়িত যুগে এ কারণেই সম্ভবত উচ্চ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞের অভাব ঘটেছে। এবং যত বেশি একক ব্যক্তিত্ব সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, তত বেশি এ ক্ষমতা কর্মে আসবে। সত্যিকারের রাজনৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন কেউ এ ধরনের হাসের ঝাঁকের ভিড়ে উচ্চ কষ্টব্ররে দিগৃ দিগন্ত নিনাদিত করবে না।

আর এ ধরনের সভাপতিদের একমাত্র সাম্রাজ্য যে যেসব সদস্যদের তাকে পরিচালিত করতে হয়, তাদের বুদ্ধিমত্তাও তার চেয়ে বেশি নয়। সূতরাং সবাই একই ধরনের বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন হওয়ায় বিতর্ককালে ভাবে যে এমন একদিন আসবে যখন অপরকে ডিয়ে তার পক্ষে ওপরে ওঠা সম্ভব। আজকে যদি পিটার কর্তা হতে পারে, তবে আগামীকাল পাউলারই বা তা' হতে বাধাটা কেথায়? বুদ্ধির ব্যারোমিটারের পারা যখন উভয়েরই একসূরে বাঁধা।

এ নয়া গণতন্ত্রের একটা অঙ্গু দিক আছে, যেটা প্রচণ্ড রকমের অপকার ছড়ায় সমাজে। সেটা হল আমাদের বিরাট একদল তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা উৎপাদন। যখনই কোন জরুরী বিষয়ের অবতারণা করা হয়, তারা তক্ষুণি সংখ্যাধিক্যের পেছনে মুখ লুকায়।

এসব রাজনৈতিক কৌশলগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে কিভাবে মিষ্টি কথায় সংখ্যাধিক্য সদস্যদের ভূলিয়ে সে যা করতে চায় তার মতামত আদায় করে নিছে। আর এসবই হল মূল কারণ যার জন্য সাহসী এবং চরিত্রবান কোন রাজনৈতিক নেতার কাছে পুরো ব্যাপারটাই ঘৃণ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিচুতরের লোকদের ঠিক এ জিনিসটাই প্রচন্ড আকর্ষণ করে, যারা নিজেদের কাজকর্মের দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু সব সময়ই নিজেদের কৃতকর্মের জন্য একটা আবরণ খুঁজে বেড়ায়। তাদের বদমাস এবং অসৎ লোকদের দলে দেখা উচিত। যদি কোন জাতীয় নেতা রাজনীতির নিচুতরের থেকে আসে, তবে তার মধ্যেও এসব দৃষ্টি কৌশল প্রবেশ করবে। কারও পক্ষেই তখন সাহসের সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট পথ নেওয়া সম্ভব নয়। তারা তখন গালাগাল এবং অব্যাক্তির কাছে নতি স্থীর করে নিয়ে সাহসের সঙ্গে কোন মত প্রকাশ করবে না। এভাবে একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে তার ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানকে বাঁধা রেখে রাজনীতির নির্দিষ্ট পথে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে প্রয়াসী।

একটা সত্য সবসময় মনে রাখা উচিত যে সংখ্যাধিক্য কখন একক ব্যক্তিত্বের পরিপূরক হতে পারে না। সংখ্যাধিক্য শুধু অঙ্গু প্রকাশ করে না, কাপুরুষও হয় বটে। যেহেতু একশো বোকা একজন জননীর সমত্বে নয়, সেই রকম একজন কষ্টসহিষ্ণু এবং নৈতিক চরিত্রবান রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে রাজনীতির ক্ষেত্রে যা করা সম্ভব, একশোটা কাপুরুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

কর্তব্যের বোকা একজন নেতৃত্বের ওপর যত কম চাপবে, ততবেশি উটকো সাধারণ নেতার দল তাদের দুর্নীতির বোকা কমাতে জাতির কাছে ভিড় জমাবে। তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষার এত বেশি উচ্চ শিখরে অবস্থান করে যে তাদের পক্ষে তাদের জন্য নির্দিষ্ট এবং যথাযথ

সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। লোকগুলোকে বিশ্ব মুখে গোনে এবং মনে মনে নির্দিষ্ট প্রহরের আঁক করে কথন তাদের পালা আসবে। তারা প্রতিটি ঘটে চলা ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করে যা তাদের প্রতিনিয়ত আশা নিরাশায় দোল দেয় এবং প্রত্যেকটি অপবাদকে উপভোগ করে, যা লাইনে দাঁড়ানো অন্য প্রার্থীদের লাইন থেকে সরিয়ে দিয়ে তাকে ইঙ্গিত বস্তুর প্রতি এগিয়ে দেবে। যদি কেউ ভাগ্যক্রমে দীর্ঘদিন তার চেয়ার দখল করে বসে থাকে, তবে তারা এটাকে তাদের প্রতি পরম্পরার বোআপড়ার বিশ্বাসঘাতকতা বলে ধরে নেয়। তারা এত হিস্ত হয়ে ওঠে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই দায়িত্বজনহীন লোকটা আরামপ্রদ জনসাধারণের দেওয়া গদি না ছাড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কিছুতেই শান্ত হয় না। অবশ্য এ ধরনের ঘটনার পর তার আবার সেই গদীতে ফিরে আসার সংশ্ববনা খুব কমই থাকে। সাধারণত তাড়িয়ে দেওয়া এ লোকগুলো আবার গিয়ে লাইনে ভিড় করে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত লাইনের দাঁড়ানো অন্যান্য উচ্চাকাঞ্চিত দল এদের তাড়িয়ে দেয়।

সরকারি পরিচলন ব্যবস্থায় এ ধরনের হঠাত পরিবর্তনের ফলে অনেক সময়েই গণজীবনে বিপর্যয় নেমে আসে; বিশেষত দেশ যখন কোন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি। শুধু অজ্ঞ এবং অযোগ্য ব্যক্তিরাই এ সংসদীয় গণতন্ত্রের বলি হয় না। সত্যিকারের যোগ্য নেতৃত্বও অনেক সময় এ পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়ে, যদি না ভাগ্য তাকে যোগ্য হওয়াতে নেতার পদে ঠেলে দেয়। আর যখনই তার যোগ্যতার আভাস ফুটে ওঠে, তখন অযোগ্যরা দল বেঁধে তার বিরুদ্ধচারণ করতে নামে। বিশেষ করে যদি সে নেতা তাদের দল থেকে না আসে এবং তথাকথিত বলমলে এ দুর্বল চিত্ত লোকদের সঙ্গে তার মেলামেশার অভ্যাস না থাকে। তারা ব্রহ্মবত তাদের নিজেদের যুথের মধ্যেই মোরাফেরা করে এবং কেউ যদি তাদের সমকক্ষ না হয়, তৎক্ষণাৎ তারা দল বেঁধে তার বিরুদ্ধচারণ করে। তাদের সহজাত প্রকৃতি অন্যদিকে ভোংতা হলেও এ বিষয়ে অত্যন্ত প্রথৰ।

এর অবশ্যজাতীয় ফলাফল হল সরকারি পরিচলন ব্যবস্থায় বুদ্ধিমানের দল ত্রুটাগত আর বেশি করে ঢেকে। যদি কেউ এ শ্রেণীর নেতা না হয়, তবে তার পক্ষে ভবিষ্যত্বাণী করা অতি সহজ যে এ পরিস্থিতিতে একটা জাতি এবং দলের কঠটা ক্ষতি হতে পারে।

পূর্বে অন্তিমার সংসদীয় গণতন্ত্র মূল আদর্শের দিক থেকে ছবছ একই রকম ছিল, যার বর্ণনা আমি উপরে দিয়েছি।

যদিও অন্তিমার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হত সম্মাটের ঘারা, তবু এ নিযুক্ততা সত্যিকারের সংসদীয় কার্যকলাপে কোন চেউ তুলতে পারত না। ফেরিওয়ালা মনোবৃত্তি আর দর কষাকষি এ সব মন্ত্রীগুলি নিয়ে এত বেশি চলত যে পশ্চিমী গণতন্ত্রের সত্যিকারের রূপ এর মাধ্যমেই ফুটে উঠত। আদর্শ অনুযায়ী ফলাফলও প্রকাশিত হত; দুজনের ভেতর বদলির সময় করতে করতে এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ায় যে তাকে পরম্পরার প্রতি মৃগয়া ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। প্রতিটি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নেতার গুণাবলী করতে বাধ্য; শেষপর্যন্ত সে ছোট ধরনের রাজনৈতিক ফেরিওয়ালায় পরিণত হয়। এসব লোকের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের পরিমাপ হল— কত নিপুণতার সঙ্গে মিশ্রিত রাজনৈতিক দলগুলোকে সে টুকরো টুকরো করতে পারে। অন্য কথায় বলা যায়, এদের কৌশল হল নোংরা রাজনৈতিক পট পরিবর্তন; আর সেটাই হল এ ধরনের সদস্যদের সত্যিকারের যোগ্যতর কাজ।

এ ব্যাপারে ভিয়েনাকে একটা শিক্ষায়তন বলে অভিহিত করা চলে, যার যোগ্য উদাহরণ আর কোথাও বুজে পাওয়া মুশ্কিল।

আর একটা ব্যাপার, যেটা আমার সব সময় নজরে আসত সেটা হল তার চারিত্রিক বিরোধিতা; জ্ঞান এবং প্রতিভার দিক থেকে শুধু যে একের সঙ্গে অপরের কোন মিলই নেই শুধু তা নয়, প্রকৃতিগত ভাবেও এরা পরম্পর বিরোধী। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এসব বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে উত্তুত সদস্যদের সংকীর্ণতার চিন্তা থেকে কেউ মুক্ত হতে পারত না। তারা একরকম বাধ্য হয়ে ভাবত কিভাবে এ তথাকথিত মহান চরিত্রগুলো প্রথম গণমানসে উদ্দিত হল।

এটা সত্য একটা গবেষণার বিষয় যে এসব ভগ্ন ব্যক্তিরা তাদের প্রতিভাকে কিভাবে দেশের কাজে লাগাত। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, ওদের কার্যপ্রণালীর বিস্তারিত খৌজখবর নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

সংসদীয় গণতন্ত্রের জীবনটা যত বেশি স্পষ্ট করে ধরা দেয়, মানুষের আশাও তত বেশি নিতে আসে। বিশেষ করে যখন কেউ এর সত্যিকারের চেহারা এবং যাদের নিয়ে এটা গঠিত তা বিশেষভাবে অনুধাবন করে। অবাক হতে হয় এ সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শগত কার্যসূচীর দিকটার দিকে নজর দিলে। সত্য বলতে কি, এর বৈষয়িক দিকটাকে ভালভাবে বোঝা উচিত, কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের ধর্মপিতার দল প্রতি কথায় এর বৈষয়িক দিকটাকেই জনসাধারণের চোখে তুলে ধরতে সচেষ্ট থাকে। তাদের কথায় তো মনে হয় পুরো ব্যাপারটাই পরিষ্কার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ন্যায় বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কেউ যদি এসব ভদ্রলোকদের এবং তাদের অতি অধ্যাবসায়ে তৈরি আইন-কানুন সতর্কভাবে পরীক্ষা করে দেখে, তবে তার ফলাফল দেখে অবাক হয়ে যাবে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শের মত এত অস্তুপ্রারশ্ন্য আর কোন আদর্শকে সম্ভবত বুজে পাওয়া যাবে না। যদি অবশ্য এর বৈষয়িক দিকটা বিচার করা যায়।

আমদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রথম ধাপে কিভাবে নির্বাচন পর্ব সমাধা করা হয়, সেটা বিচার করবে। তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখা উচিত যে তারা কিভাবে অফিসে আসে এবং নতুন নামে অর্থাৎ সংসদ সদস্য হিসেবে নিজেদের চেয়ারে স্থাপন করে। এটা সত্য যে মাত্র অল্পসংখ্যক জনসাধারণের ইচ্ছা বা প্রয়োজনই মাত্র এ তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রতিফলিত। প্রত্যেকে, যাদের কিছুটা রাজনৈতিক চেতনা আছে এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার দিকটা বোঝে, তারা সবাই জানে যে সাধারণ জনগণের রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি অত্যন্ত কম, তাই তাদের পক্ষে এমন কাউকে নির্বাচন করাও সম্ভব নয় যে তাদের চিন্তাধারাকে দ্রুপ দিতে সক্ষম।

আমরা যতই বলি না কেন ‘গণ মতামত’ কিন্তু বাস্তবে অতি অল্প সংখ্যক লোকের চিন্তাধারা এবং অভিজ্ঞতা প্রসূত হল এ মতামত। এর বেশির ভাগ ফলাফলই আসে জনসাধারণের কাছে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিপুণভাবে পরিবেশিত হয়ে।

ধর্মের জগতে সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস আসে শিক্ষার দিক থেকে। কিন্তু ধর্মের বার্ধক্যহেতু তা’ অলসভাবে মাটির ওপর ঘূমিয়ে থাকে। আর সেই কারণেই জনসাধারণের রাজনৈতিক মতামত গড়ে উঠে মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে সৃত্তসৃতি ও বৃদ্ধিমত্তার প্রয়োগে অবিশ্বাস্য ধৈর্য প্রয়াসের ফলে।

নাগৈনেতিক শিক্ষার সবচেয়ে ফলপ্রদ দিক হল সংবাদপত্রের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সংবাদ প্রাপ্তবেশনার দিকটা। সংবাদপত্রই হল রাজনৈতিক আলোকসম্পাতের প্রধানতম হাতিয়ার। এটা প্রাণ ব্যক্তিদের জন্য এক রকমের ক্লুণও বলা চলে। এ শিক্ষা কর্মকাণ্ডটি সরকারের হাতে থাকে না। এটা থাকে তাদের হাতে চরিত্রের দিক থেকে যারা অতি নিন্দিতদের। যৌবনকালে শিখেন্নায় থাকাকালীন এসব মানুষের সম্পর্কে আসার সুযোগ হয়েছিল, যাদের হাতে এ শোকশিক্ষার যত্ন, তাদের মাধ্যমে এর আদর্শও জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হতো। অথবা তো আমি বিশ্বে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কত ক্ষুদ্র সময়ে এ ভয়ঙ্কর শক্তিধরটি জনসাধারণের মধ্যে কোন বিশেষ একটা বিশ্বাস উৎপাদন করতে সক্ষম। এবং তা, এ পথে চলতে গিয়ে প্রায়ই জনসাধারণের ইচ্ছা ও মতবাদকে উপস্থাপনা করে। একটা হাস্যাস্পদ তৃষ্ণ ঘটনাকে জাতীয় পর্যায়ে তুলে আনতে সংবাদপত্রের মাত্র কয়েকদিন সময়ের প্রয়োজন হয়। যে মাধ্যমে জাতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন একটা সমস্যাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা, অপহরণ বা অন্য কোন উপায়ে জনসাধারণের কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে রাখে।

সংবাদপত্রের আর একটা ভাগ্যমতীর খেলা হল কোথা থেকে একটা নাম খুঁজে পেতে নার করে এনে কয়েক সঙ্গাহের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলা। আগে হয়ত কেউ সে নাম শোনেওনি। তারা নামগুলোকে এমনভাবে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করে যেন সেই নামগুলোর সঙ্গে জনসাধারণের অনেক আশা জড়িয়ে আছে। তারা নামটাকে জনপ্রিয়তার গুণটা ঠিক মাপে টেনে তোলে যা সত্যিকারের কোন ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার পক্ষে সারাজীবনেও সম্মত জনপ্রিয়তা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ সমস্ত করা হয়, যদিও এ সব নামগুলো হয়ত বা সামাজিক আগেও অঙ্গৃত ছিল এবং কেউ উচ্চারণ পর্যন্ত করত কিনা সন্দেহ, সংবাদপত্র প্রতিশ্রূতকে খ্যাতির পাহাড়ের চূড়ায় টেনে তোলার আগে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন এবং ক্লান্ত নাগৈনেতিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত লোকদের নাম এ সংবাদপত্রগুলো জনসাধারণের স্মৃতিশক্তি থেকে ধীরে ধীরে আনন্দ করে এনে শেষে একসময় ভুলিয়ে দেয়, যোন গান্ধি মৃত। যদিও তখন তারা অনেক স্বাস্থ্যবান এবং পরিপূর্ণ উৎসাহে টেগবগ করে গুটিকে। অথবা, অনেক সময় এসব লোকদের প্রতি এমন সব নোংরা গালাগাল বর্ণণ করা হয় যে জনসাধারণের মনে করে এরা অত্যন্ত নিচ। সংবাদপত্রের অনিষ্ট করার ক্ষমতা যে কত নাই; মাঝে মাঝে বৃষ্টতে হলে বিশেষ করে কৃত্যাত ইহুদী সংবাদপত্রগুলোকে অনুধাবন করা হয়ে থাই। সে কৃত্যাত ইহুদী সংবাদ পত্রগুলোর সংবাদ পরিবেশনা করার পদ্ধতি দ্বারা তারা নামান্তর এবং সুন্দর লোকগুলোর নাম প্রথমে জনসাধারণের শৃতিতে মলিন করে আনে। ধীরে ধীরে এমন প্রতি এমন খিস্তি খেউরের কাদা হোড়ে চারদিক থেকে যে পুরো ব্যাপারটাই গাঢ়া মড কাজ করে।

এ দ্ব্যান্তিগত ডাকাতের দল তাদের শয়তানের চক্র সফল করার জন্য কিছু করতেই পারে না।

তারা এমন কি পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলিয়ে এমন কয়েকটা নোংরা ব্যাপার নিয়ে কামা চাঁচাহুঁচ করে যাতে প্রতিপক্ষের সম্মান সম্পূর্ণভাবে ধূলোয় লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু এসব নথুও যাদ পাঠিপক্ষের নাম এবং সম্মান টেনে নিচে অপমানকর জায়গায় না নামান যায়, দখন নন্মা তাকে লক্ষ্য করে কৃত্যসিত গালাগাল দেয় এ বিশ্বাসে যে তার কিছু অংশ প্রতিপক্ষের মাঝে শেগে থেকে জনসাধারণের কাছে তাকে হেয় করে তুলবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একে

প্রতিরোধ করার কোন অন্ত্র প্রতিপক্ষের হাতে আর থাকে না। কারণ এরা একসঙ্গে এতগুলো কৌশল অবলম্বন করে যে তা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। কিন্তু বাইরে থেকে এতটুকু বোঝার উপায় নেই যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলো করা হচ্ছে। জনসাধারণও তা বুঝতে পারে না। যেসব শয়তানের দল তার সমকালীন কাউকে এরকম অপমানকরভাবে নিচে নামায় এবং নিজেরা নায়ক সেজে যশের মুকুট মাথায় পরে, সেইসব দুর্ভুতদের সাংবাদিকতার কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে দেখা যাবে তৈলযুক্ত কথায় নির্বাচিত সেকেল বোকা বোকা শব্দ দ্বারা তারা নিজেদের জয়চাক পিটাচ্ছে। যখন এ খুঁটে খাওয়া মাছগুলো এক জায়গায় মাছের ঝাঁকে জড় হয় এবং সেই সভায় তারা এঁটেল মাটির মত সেঁটে বসে তাদের নিজেদের সম্মানের কথা বলে চলে যাকে তারা বলে সংবাদপত্রসৌন্দরের সম্মানে সম্মানিত ব্যক্তি। তখন আবার তারা পরস্পরকে উচ্চতর জীব ভেবে নিয়ে মাথা ঝুকিয়ে সম্মানও জানায়।

এ জঘন্য প্রকৃতির জীবেরাই তথাকথিত জনসাধারণের মতামত নিজেদের কল্পনায় তৈরি করে।

পদ্ধতিটার পুরোপুরি হিসেব এবং তার ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার শূন্যগর্ভতা সম্পর্কে বলতে গেলে বেশ কয়েক অধ্যায়েও কুলাবে না। সুতরাং এ ব্যাপারে বিস্তারে না গিয়ে এর কাজ চলাকালীন ফলাফল বিচার করব এবং আমি মনে করি নির্দোষ এবং সরল বিশ্বাসী লোকেদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেওয়ার পক্ষে এটাই যথেষ্ট। ফলে তারা এ প্রতিষ্ঠানের বৈষম্যিক দিকটার অসারাত্ত সম্পর্কে সহজেই বুঝতে পারে।

এ গণমানসের নেতৃত্বে অবনতি কতখানি ক্ষতিকারক, যা বোঝার সবচেয়ে সহজ এবং সর্বোত্তম উপায় হল এ সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে যদি জার্মান গণতন্ত্রের কেউ তুলনা করে।

এ সংসদীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে বিশ্বয়কর দিকটা হল একদল লোক, ধরা যাক বর্তমানে 'শ' পাঁচেক তার মধ্যে ঝীলোকও আছে, সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসে। তারপর যে কোন বিষয়ে অর্থাৎ সব বিষয়েই তাদের ওপর শেষ বিচারের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তারাই কিন্তু সবকিছুর পরিচালক, যদিও তারা নামে একটা মন্ত্রীসভা গঠন করে এবং বাইরে থেকে মনে হয় এ মন্ত্রীসভাই বুঝি সবকিছু চালনা করছে। কিন্তু সত্যিকারের ক্ষতিয়ে দেখতে গেলে মন্ত্রীসভার আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। আসলে সংসদ সদস্যদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকারের কিছু করার ক্ষমতাই নেই। এমন কি কোন একটা বিষয়ের হিসেব নিকেশও পাওয়া এদের কাছ থেকে অসম্ভব। কারণ কর্মীয় কিছু করার দায়িত্ব তো তথাকথিত মন্ত্রীসভার নয়; সংসদের অধিকাংশ সভোর ভোটে তা ঠিক করা হয়েছিল। সংসদের গরিষ্ঠ সদস্যদের চিন্তাধারার বাহন হল মন্ত্রীসভা। এর রাজনৈতিক সফলতা নির্ভর করে কতটা পরিমাণে এরা গরিষ্ঠ সদস্যদের সঙ্গে নিজের মত মিলিয়ে নিয়ে মানিয়ে থাকতে পারে। অথবা পড়িয়ে টাড়িয়ে তাদের নিজেদের মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য করে। কিন্তু এর অর্থ হল সত্যিকারের শাসকের আসন থেকে নিচে নেমে ভিক্ষাজীবিদের ন্যায় গরিষ্ঠ সংসদ সদস্যদের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করে মত আদায় করা। সত্যি বলতে কি মন্ত্রীসভার প্রধান কাজই হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত শাসকদলের গরিষ্ঠ সদস্যদের নিয়ে দের পক্ষে দলে টানা। আর টানতে না পারলে নতুন গরিষ্ঠতা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। যদি দু'য়ের মধ্যে একটাতেও এরা সাফল্য লাভ করতে পারে, তবেই সরকারে এরা টিকে থাকে। আর গরিষ্ঠ সদস্যদের মতামত নিজেদের স্বপক্ষে জড় করতে না পারলে ব্যতাবত মন্ত্রীসভাও ভেঙে যায়।

কিন্তু এ দুই প্রচেষ্টার একটাও যদি সাফল্য লাভ করতে পারে, তবে আর কিছুদিনের জন্য। মন্ত্রীত্ব চালিয়ে যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হল, এ ধরনের রাজনীতি সঠিক না বে-ঠিক? অথবা এর কোন অর্থ নেই। দুটোর মধ্যে যেটাই হোক না কেন?

এভাবেই বাস্তবে সবার দায়িত্ব ধরে মুছে যায়। তবে এর ফলাফল একটা রাজ্যকে কেখায় টেনে নামাতে পারে সেটা বোঝার জন্য নিম্নবর্ণিত সহজ ঘটনাপঞ্জী পড়লেই বোঝা সম্ভব।

এ পাঁচশ সদস্য, যারা জনসাধারণের ভোটে সংসদে নির্বাচিত, তারা আসে জীবনের অসমতল ক্ষেত্র থেকে। সুতরাং তাদের মধ্যে পারম্পরিক রাজনৈতিক ক্ষমতাতেও যে মিল খাবে না তা'তে আর আচর্য কি। যার ফলে সেগুলোকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের সময় প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং সমস্ত ভবিষ্যতের ছবিটাই বিবর্ণ হয়ে আসে। এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে যদি কেউ চিন্তা করে এ নির্বাচিত পাঁচশ প্রতিনিধি হল উৎসাহ এবং শুল্কমতার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ তাহলে সেটা মন্ত তুল। এমন নির্বোধ সম্ভবত একজনকেও পাওয়া যাবে না যে নাকি ভাবে যে এ তথাকথিত ভোটের কাগজগুলো থেকে হঠাতে শয়ে শয়ে এন্ট্রেনেতা বেরিয়ে আসবে; যারা আর যাই হোক সাধারণের চেয়ে একবিন্দুও বুদ্ধি বেশি রাখেন।। প্রতিভাবানরা যেসব ধ্যান ধারণা নিয়ে জন্মহৃষণ করে, এক কথায় তা নাকচ করে দেওয়া সম্ভব নয়। বরং সত্যিকারের একজন রাষ্ট্রনেতার অভ্যন্তর একটা জাতির পক্ষে আশীর্বাদবর্ধন। কারণ এসব রাষ্ট্রনেতারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসে না। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের প্রতি একটা স্বাভাবিক অনীহা ভাব থাকে। ভোটের দ্বারা নির্বাচিত সত্যিকারের একজন রাষ্ট্রনেতার সঙ্গান পাওয়ার চেয়ে সম্ভবত একটা ছুঁচের সুতো গলার ফাঁক দিয়ে পুরো একটা ডেট গলে যাওয়াও সহজ।

ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে জনসাধারণের যা অতীতে উপকার করেছে, তা' সম্ভব হয়েছে একক কোন ব্যক্তির উৎসাহ এবং কর্মশক্তির তৎপরতায়।

কিন্তু গণতন্ত্রের দোহাই পড়ে এখনে পাঁচশ অতি সাধারণ বুদ্ধিজীবি মানুষ জাতির পক্ষে অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা নিয়ে বিচার করে তার রায় দেয়। তারা যে সরকার তৈরি করে প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই মন্ত্রীসভাকে সেই রঙচে সংসদের অনুমোদন নিতে হয়, অর্থাৎ যে পথ তারা বাছে, সেটা হল পাঁচশ লোকের মিলিত পথ।

যাহোক, এসব সদস্যদের বুদ্ধিমত্তার দিকটার দিকে যদি আলোকপাত করা যায় তবে মেঝে যাবে কি ধরনের কাজকর্ম এসব পদের জন্য অপেক্ষা করছে। যদি আমরা এসব মামান সত্যিকারের রূপটা চিন্তা করি, তবে দেখতে পাব, কত বকমারি এবং বিভিন্ন বকম এ মদমাশগুলোর ধরন। তখনই বুঝতে কষ্ট হয় না যে তথাকথিত মন্ত্রীসভা এসব নানামূর্মী ধরণের সমাধানের ব্যাপারে কতখানি অক্ষ। একে তো তাদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার অভাব, ন্যূনান্ত আগুণ্ঠা বলতেও কিছু নেই, সুতরাং সমস্যাগুলোর সমাধান কি করে করবে? একটা ধরণে ন্যূনান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য যখন সংসদে উপস্থিত করা হয়, তখন দেখা যাবে যে ন্যূনান্ত সদস্যেরও প্রাথমিক অর্থনৈতিক জ্ঞানটুকুও নেই। এর অর্থ যাদের ওপর কর্তৃত ন্যূনান্ত হয়েছে তাদের সেই বিষয়ে সামান্য জ্ঞানটুকুও অভাব; সুতরাং সেই বিশেষ বিষয়টার ন্যায়ানে তাদের কাছ থেকে কি আশা করা যেতে পারে।

অন্য সমস্যাগুলোর ব্যাপারেও এ একই সমস্যা। সদাসর্বদা একদল অজ্ঞ এবং অযোগ্য লোক সমস্যার সমাধানে ভ্রূতী। সমস্যাগুলো যদিও জীবনের বিভিন্ন কোণ থেকে উদ্ভৃত, কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্যবৃন্দ তো একই মান র্যাদায় তৈরি। ন্যায় বিচার তখনই সম্ভব যদি এসব সদস্যবৃন্দের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য যে জ্ঞান দরকার তা থাকত। এটা অকল্পনীয় যে যারা যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তারাই আবার বৈদেশিক নীতি নির্ধারণেও দক্ষ; অবশ্য যদি না এরা প্রতিভাসম্পন্ন হয়। কিন্তু পুরো একটি শতাদিতে একজনের বেশি প্রতিভা খুব কমই জনপ্রিয় করে। তাই এসব ক্ষেত্রে সত্যিকারের প্রতিভাসমূল গান্ধীয়ের দেখা খুব কমই পাওয়া যায়। বেশির ভাগই সেসব লিলিকলার অনুবাদীবৃন্দ যাদের মন অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং একওয়েই। এরা জঘন্য বেশ্যাবৃত্তিতে পারদর্শী। আর এ কারণেই এসব তথাকথিত সম্মানিত ভদ্রলোক মহোদয়গণ কোন বিষয়ের ওপর আলোচনা চলাকালে এবং বিচারের সময় এত চপলতা দেখিয়ে থাকে; যেসব বিষয়বস্তু বিচারের সময় বুদ্ধিমান লোকদেরও অতি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। একটা দেশের ভবিষ্যৎ অঙ্গেই জন্য যে ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের প্রয়োজন, তা ত এসব সংসদে নেই-ই বরং যে আবহাওয়ায় এসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়, তা তাসের আড়ায় ঠিক মানানসই। জনসাধারণের ভাগ্য ঠিক করার চেয়ে তাসের আড়ায় এসব ভদ্রমহোদয়দের উপর্যুক্ত স্থান।

অবশ্য এটা বলা ঠিক হবে না যে এর মধ্যে কোন সদস্যেরই সামান্যতম কর্তব্যজ্ঞানটাকুও নেই। তা অবশ্য প্রশ়াস্তীত।

কিন্তু বিশেষ করে এ পদ্ধতিতে যা কিনা একজন ব্যক্তিকে যে বিষয়ে সে দক্ষ নয়, তার ওপর জোর করে তার বিচার আদায় করে নেয়, এর অর্থ হল মৈতিক দিক থেকে তাকে টেনে নিচে নামানো। কেউ-ই সাহস করে বলবে না যে, ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছি সে বিষয়ের কিছুই আমাদের জানা নেই। আমি বা আমাদের এ বিষয়টার ওপর কিছুমাত্র যোগ্যতা নেই। অবশ্য এ ধরনের স্বীকারোক্তিতেও খুব বেশি একটা যায় আসে না, কারণ এ ধরনের সোজাসুজি সরলতা বুঝবেই বা কে? যে লোকটি এরকম স্বীকারোক্তি করবে, তাকে সম্ভবত সম্মানিত গাধা হিসেবে ধরে নিয়ে এ রকম মজাদার খেলা নষ্ট করতে দেওয়া হবে না। যাদের মনুষ্যচরিত সম্পর্কে বিদ্যুত্ত্বাত্মক ধ্যান ধারণা আছে, তারা ভালভাবেই আনে যে সহকর্মীদের গভীর মধ্যে কেউ বোকা সাজতে চায় না। এবং এক্ষেত্রে বিশেষ সাধুতাকে বোকামী বলে গণ্য করা হয়।

এভাবে একজন সোজা কথার লোক যখন সংসদে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়, শেষমোষ হ্যত বা পরিবেশের চাপে পড়ে বিনা আপন্তিতে তাকেও ব্যাপারগুলো মেনে নিতে হচ্ছে, জনসাধারণ তার ওপর যে বিশ্বাস করে সংসদে তাকে পাঠিয়েছিল তার প্রতি বিশ্বাসগ্রাহকত্বই বলা চলে। তখন ব্যাপারটা হল কোন একজন একক ব্যক্তিত্ব যদি কোন বিশেষ আলোচনায় অংশগ্রহণ না করে, তাতে কিন্তু পরিস্থিতির বিদ্যুত্ত্বাত্মক কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু তার স্বাধানটাই মাঝের থেকে ধূলিসার্ণ হয়ে যায়। শেষে হ্যত বা সে সদস্য নিজেকে বোবাতে সমর্থ হয় যে আর যাহোক দলের মধ্যে সে নিকুঠি নয় এবং এসব বিতর্কে অংশগ্রহণ না করে সবচেয়ে যারাপ কিছু ঘটার হাত থেকে রেহাই পায়।

এর বিরুদ্ধেও ধূঁকি স্থাপন করা যায়। বলা যেতে পারে যদিও একক কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন প্রশ্নের বিতর্কে নিজেকে জড়ানোর মত ঝোন নেই, তবু তার ধ্যান-ধারণা তার দলের

ଦେଶେର ଓପର ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏବଂ ବଲା ହୟେ ଥାକେ ଯେ ତାର ଦଲ ବିଶେଷଜ୍ଞଦେର ଏକଟା ଦଲ ଗଡ଼େ, ମାଦେର ବିଷୟଟିର ଓପର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଆଛେ, ପୁରୋ ବ୍ୟାପାରଟାଇ ତାଦେର ସାମନେ ରାଖା ହୟ ।

ହୀଠାଏ ଏକ ନଜରେ ମନେ ହବେ ଯୁକ୍ତିଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଜୋରାଳ । ତବୁ ଆରେକଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥେକେ ଯାଯ, ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ କୋନ ସମୟା ସମାଧାନେର ଜନ୍ୟ ମାତ୍ର କଯେକଜନେର ଜ୍ଞାନ ଥାକେ, ତବେ ଆର ପାଞ୍ଚଶ ଗୋଟିକେ ନିର୍ବାଚନ କରା କେନ୍ତା?

ଆସଲେ ଆମାଦେର ଆଧୁନିକ ଗଣତାତ୍ତ୍ଵିକ ସଂସଦୀୟ ପଦ୍ଧତିର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ବାଚନ ସଦସ୍ୟଦେର ଏକତ୍ରିତ ନା କରା । ନା; ଏକେବାରେଇ ନଯ । ବରଂ ପଦ୍ଧତିଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହଲ ମାନ୍ୟମାନ ଅବିବେଚକ, ଯାଦେର ଦୃଢ଼ିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେଇ ଅନ୍ୟେର ଓପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଯାତେ ସହଜେଇ ଯାଦେନ ପରିଚାଳନ କରା ଯାଯ । କାରଣ ପ୍ରତିଟି ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମନା । ଏ ଏକଟା ଉପାୟେଇ ଧର୍ମାୟ ଆଦର୍ଶ ଆଜକେର ଦିନେର ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ଵରୂପ ଯା ପ୍ରକଟିତ ତାକେଇ କାଜେ ଲାଗାନ୍ତେ ଯାଯ । ଏ ପଦ୍ଧତିଟିରେ ଏକମାତ୍ର ସଭ୍ୱ ଅନ୍ଦ୍ୟ ହାତେ ସବକିଛୁକେ ପରିଚାଳନା କରା, ଯାତେ ନିଜେକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରନାରେ ରାଖା ଯାଯ; ଆର ଏ କାରଣେଇ ତାକେ ତାର କାଜେର ଆର ହିସେବ ନିକେଶେର ଜନ୍ୟ ତଳବ କରିବା ସଭ୍ୱ ନଯ । ଏ ଅବହାତେ ଯଦି କେଉଁ ଜାତିର ପକ୍ଷେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତକ କୋନ ପଥ ଠିକ କରେ;— ତୁ ତାର ଜନ୍ୟ ତାକେ ଦୟାୟି କରା ଉଚିତ ହବେ ନା । ଯଦିଓ ସବାଇ ଜାନେ ତାର ଏକକ ଶ୍ୟାତନି ପାଞ୍ଚଭାବୀ ଏର ଜନ୍ୟ ଦୟାୟି । କାରଣ ପୁରୋ ଦୟାୟିତ୍ୱଟା ତୋ ଗିଯେ ପଡ଼େ ଦଲେର ଘାଡ଼େ ।

ବାସ୍ତବେ କିନ୍ତୁ ପୁରୋ ବ୍ୟାପାରଟାଇ କାର କୋନ ଦୟାୟିତ୍ୱ ଥାକେ ନା । କାରଣ ଦୟାୟିତ୍ୱ ଯେ ଏକକ ନାହିଁ ଓତ୍ତରେ ଓପର ବର୍ତ୍ତାନୋ ସଭ୍ୱ — ସଂସଦୀୟ ସଦସ୍ୟବ୍ୟବେର ଶୂନ୍ୟଗର୍ତ୍ତ ଚିଠକାରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ କି କଥେ ହେବ?

ମଂସଦ ନାମକ ଗଣତାତ୍ତ୍ଵିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପୌଚ୍ଚ ଧରନେର ଲୋକଦେରଇ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ଥାକେ, ଯାରା ଦିନେର ଆଲୋ ସହ୍ୟ କରତେ ଅପାରଗ । ସାହସୀ ଏବଂ ସୋଜା କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ତାର ନିଜେର କାଜେର ଦାୟାତ୍ୱ ନିତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, — କଥନେଇ ଏ ଧରନେର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବେ ନା ।

ଏ କାରଣେଇ ଏ ତଥାକଥିତ ଛାପମାରା ଗଣତତ୍ତ୍ଵ ସେ ଜାତିର ହାତେର ଯନ୍ତ୍ରେ ପରିଣତ, ଏବା ଯାଦେର ନିଜେଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନେର ଜନ୍ୟ ଦିନେର ଆଲୋର ଦିକେ ପେଛନ ଫିରିଯେ ଥାକେ । ଯା ଏବା ନାମାଣି କରେ ଏମେହେ ଏବଂ ଆଜଓ କରଛେ । ଏକମାତ୍ର ଇହନୀରାଇ ଏ ଧରନେର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ପ୍ରଶଂସା କଣେ, କାରଣ ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓଦେର ମତି ଦୁନୀତିଗଣ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରତାରଣାୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଏ ଧରନେର ଗଣତତ୍ତ୍ଵର ଠିକ ଉଲ୍ଲୋପିଷ୍ଠ ହଲ ଜାର୍ମାନ ଗଣତତ୍ତ୍ଵ, ଯାକେ ସତ୍ୟକାରେର ଗଣତତ୍ତ୍ଵ ବଲେ ଯାଥାରେ ଦେଓଯା ଯାଯ । କାରଣ ଏଥାନେ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ଅବାଧେ ହୟେ ଥାକେ ଏବଂ ତାରା ତାଦେର କାଗେର ଫ୍ରଟିର ଜନ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୟାୟିତ୍ୱ ନିତେ ସଦାସର୍ବଦୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାକେ । ସମୟାଗୋଟିକେ ଗରିଷ୍ଠତାର ନାମାଣି ଦେଖା ହୟ ନା । ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୟାୟିତ୍ୱ ସେଥାନେ ସମାଧାନେର ପଥ ଖୋଜେ । ଏବଂ ତାର ଜନ୍ୟ ନା ପ୍ରଥମାତ୍ରେ ତାର ଯା କିଛୁ ଆଛେ ସବକିଛୁ ବନ୍ଦକ ଦିତେ ତୈରି ଏମନ କି ନିଜେର ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

ଏମନ ମାନୁଷ ପାଓଯା ସଭ୍ୱ କିନା ଯେ ନିଜେକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଉଂସର୍ଗ କରିବେ; ଏଥାନେ ହୟତ ବା ଆପଣାଓ ଡାଇବେ । ଆପଣି ଉଠିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ହଲ: ଦୈଶ୍ୱରକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆମାଦେର ଜାର୍ମାନ ଗଣତତ୍ତ୍ଵରେ ଅନୁନିର୍ଦ୍ଦିତ ଶକ୍ତିଟା ତାକେ ପଦଲୋଭି ହୟେ ଉଠିଲେ ଦେବେ ନା । ଯେ ହୟତ ବା ବୁଦ୍ଧିର ଦିକେ ଥେବେ ନିକୃଷ୍ଟମ ଏବଂ ନୈତିକ ଦିକେ ଥେବେ ଅସାଧୁ ଚାଲାକିର ପଥ ବେଯେଇ ଏମନ ଏକ ଜାୟଗାୟ ନାମାଣି ଯେଥାନ ଥେକେ ସେ ତାର ସହ ନାଗରିକଦେର ଓପର ଶାସନକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଯେ ଯାଛେ । ଜାର୍ମାନ ଗଣତତ୍ତ୍ଵରେ ଏ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ଦୟାୟିତ୍ୱର ଭୟଟାଇ ତାକେ ଅଜତା ଏବଂ ଶତତା ଥେକେ ଦୂରେ ରାଖିବେ ।

যদি এর মধ্যে কেউ বুকে হেঁটে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে তার লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে চলে, তবে তাকে চিনে ফেলা কষ্টকর হয় না; এবং কর্কশ কষ্টে সে শুনতে পারে; দূরে হঠো বদমাস। এ মাটিতে তোমার পাপ রাখার জ্ঞানগা নেই, কারণ এ হাঁটা তাকে সোজা সর্পদেবতার মন্দিরের দ্বারে নিয়ে যাবে, এবং সেখানে নিকৃষ্ট প্রকৃতির কোন লোকের প্রবেশ নিষেধ; একমাত্র মহান চরিত্রের লোকই সেখানে যেতে পারে।

ভিয়েনায় সংসদ সভা দু'বছর পর্যবেক্ষণের পর আমার এ ধারণাই হয়েছিল। এরপর অবশ্য আমি সেখানে আর যাইনি।

এ সংসদীয় গণতন্ত্রেই হল অন্যতম কারণ যার জন্য হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব শেষের দিকে ক্রমান্বয়ে বারবার ঢলে পড়েছিল। যত বেশি জার্মান প্রভাব চেঁচে বাদ দেওয়া হচ্ছিল,— ঠিক তত বেশি বিভিন্ন জাতির মধ্যকার ঝগড়াটা প্রকট হয়ে উঠেছিল। রাজকীয় সংসদ পদ্ধতির জন্য সর্বদা জার্মানরা মার খেয়েছে। যার অর্থ হয়েছে সম্রাট সামগ্রিকভাবে নিজের ক্ষতিই ডেকে এনেছে। শতাব্দীর শেষের দিকে সবচেয়ে সোজা এবং নির্বোধ লোকটাও দৈত রাজতন্ত্রের সংযোগশীল শক্তির দ্বন্দ্ব দেখতে পেত, যেটাকে আর কোনরকমই ঢেকে রাখা সম্ভব ছিল না, এবং যা বিভিন্ন জাতিকে আলাদা করার অভিপ্রায়ে নিয়ত টানাটানি করে চলত।

উপরত্ত্ব, প্রদেশগুলো সেদিন বর্নিতরতার জন্য যে পথ বেছে নিয়েছিল তা অত্যন্ত সংকীর্ণমন এবং পরম্পরের প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক। শত্রু হাসেরী নয়, সমস্ত প্রদেশগুলোই যারা এ রাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা এ রাজতন্ত্রের দুর্বলতা বুঝতে পারেনি, আর এ দুর্বলতা যে তাদের পক্ষে কত ক্ষতিকর তা আর কে বোঝাবে। বরং বার্ধক্যজনিত কারণে এ ক্ষয়ে যাওয়াকে অভ্যর্থনাও করেছিল। তারা অপেক্ষা করছিল সুস্থ হওয়ার জন্য নয়; বরং সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ার দিনটা গুণছিল।

জার্মানসহ নির্যাতিতদের গণতান্ত্রিক সংসদকে ভেঙে ফেলার জন্য সবরকম দাবিই করেই বেঁড়ে উঠতে থাকে। সমস্ত দেশ জুড়ে এক জাতের সঙ্গে অপর জাতের সংঘর্ষ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু মোটামুটি এ সংঘর্ষগুলো প্রায় সবটাই একমুখী; অর্থাৎ জার্মানদের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে যখন থেকে সিংহাসনের দাবি বর্তায় আর্ট হিউক ফ্রানজ ফারনান্দের ওপর, চেকেরা সেই সুবিধা নিয়ে শাসনব্যবস্থার উচু স্তর থেকে নিচু স্তর পর্যন্ত নিজেদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি বিস্তার করে ফেলে। দৈত রাজকীয়তন্ত্রের উত্তরাধিকারী সমস্ত কিছু সুযোগ সুবিধা নিয়ে জার্মানদের প্রভাব প্রতিপত্তি র্থব করতে মাঠে নেমে পড়ে, সোজাসুজি না হলেও সে এ পদ্ধতির রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ চালিয়ে যায়। শাসনব্যবস্থার অফিসারদের যত্ন হিসেবে ব্যবহার করে জার্মান জেলাগুলোকে; ধীরে ধীরে চূড়ান্তভাবে মিশ্রভাষার বিপজ্জনক সীমার মধ্যে টেনে আনা হয়। এমন কি অন্তিয়ার নিচের দিকের প্রদেশগুলোতেও একই ব্যবস্থা বলবৎ করা হয়; আর ভিয়েনাকে তো চেকেরা তাদের সবচেয়ে বড় শহর হিসেবে দেখত।

এ নতুন হাবুসবুর্গ রাজপ্রাসাদের লোকেরা নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তা চালানোর জন্য চেক ভাষাটাকেই বেশি পছন্দ করত। আর্ট ডিউকের স্তৰ চেকদেশের রাজকন্যা এবং রাজকুমারের সঙ্গে এ বিয়ে ঠিক সমানে সমানে হয়নি। রাজকুমার সংস্কৰণে বলা যায় তার চেয়ে সব বিষয়ে নিচু এ রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিল। রাজকন্যা যে পরিবার এবং পরিবেশ থেকে এসেছিল, সেখানে জার্মানদের বিরুদ্ধাচারণ ছিল বংশপ্রস্তরায়, রক্তে রক্তে, শিরা

উপশিরায়। আর্চ ডিউকের মনের ইচ্ছে ছিল মধ্য ইউরোপে শ্বান্ত সম্ভাজ বিস্তার করা, যেটা পরিপূর্ণ ক্যাথলিক ধারায় হবে। অর্থাৎ গৌড়া রাশিয়াকে বাধা দেবার আচীর হিসেবে যাতে এ ক্যাথলিক ধর্ম কাজ করে।

হাবুসবুর্গের ইতিহাসে বারবার এ জিনিসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ধর্মকে কাজে লাগানো হয়েছে; আর এ বাপারে নিষ্কর্ষ শোষণ পদ্ধতিকে কার্যকরী করার জন্য অবশ্যই সেখানে জার্মান স্বার্থ আছে। এর ফলফল অনেক জায়গাতেই শোকাবহ হয়ে ওঠে।

তবে হাবুসবুর্গ প্রাসাদ বা ক্যাথলিক চার্চ যা আশা করেছিল তা কিন্তু পায়নি। হাবুসবুর্গ তার সিংহাসন হারায়, আর চার্চের প্রভাব পুরো দেশটা থেকেই মুছে যায়। ধর্মীয় উদ্দেশ্য বাজনীতিতে ঢালার জন্য আরেকটা উত্তেজনার উদ্ভব হয়।

জার্মান মতবাদকে রাজকুমার রাজত্বের থেকে উচ্ছেদ করতে গিয়ে জার্মান আন্দোলন সমস্ত অঙ্গীয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। গত শতাব্দীর আশি সালের দিকে ম্যানচেষ্টার লিবারালিজম যার চিত্তাধারার মূল ভিত্তি ছিল ইহুদীরা, এ দৈত রাজত্বে তার সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে, এর প্রতিক্রিয়াটা ঠিক সামাজিক দিক থেকে আসেনি, এসেছিল জাতীয়তাবাদী থেকে। যেটা পুরনো অঙ্গীয়ায় সদা সর্বদা হয়ে এসেছে। কিন্তু জার্মানদের নিজেদের অধ্যাবসায় উৎসাহের সঙ্গে প্রাণপথে চেষ্টা করেছে নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রাখার। তখন অবশ্য অর্থনৈতিক চাপ মাত্র মাথা চাড়া দিতে পুরু করেছে; কিন্তু তা তো দ্বিতীয় শরের সমস্য। সাধারণ রাজনৈতিক এ বিশ্বালালার থেকে দুটো দলের অভ্যাধান হয়। একটা পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী, আর অপরটা চরিত্রগত দিক থেকে সামাজিক; কিন্তু উভয় দলই ভবিষ্যতের পক্ষে উৎসাহদায়ক এবং উদ্দেশ্যমূলক।

১৮৬৬ সালের যুক্তে অঙ্গীয়ার নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হাউস অফ হাবুসবুর্গ তখন বদ্ধপরিকর। শুধুমাত্র স্মার্ট ম্যাক্সিমিলিয়ান অফ মেক্সিকোর করুণ পরিণতিই ফ্রাসের সঙ্গে খুব নিকট সম্পর্ক স্থাপন করতে দেয় না। ম্যাক্সিমিলিয়ানের সর্বনাশ অভিযানই তৃতীয় নেপোলিয়ানকে ডেকে আনে এবং সত্য বলতে কি ফরাসী লোকটা তাকে যেভাবে টেলটলায়মান অবস্থায় একা ফেলে রেখে সরে পড়ে, তাতে সবারই ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ জেগে ওঠে। তবুও হাবুসবুর্গ সুযোগের অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করেছিল। যদি ১৮৭০-৭১ সালের মাঝল্য না আসত, হয়ত বা ডিয়েনায় সাদা ওয়া যুদ্ধের প্রতিহিংসার দর্কন রক্তগঙ্গা বয়ে যেত।

এ দুইবছরের অর্থাৎ ১৮৭০-৭১ সালের বীরত্বময় সংঘর্ষ আরো একটা অবিশ্বাস্য গীগাপারের সৃষ্টি করে; যার জন্য হাবুসবুর্গ বাধ্য হয় তার হৃদয় পরিবর্তনের। অবশ্য সে প্রাণবর্তন হৃদয়ের অন্তঃস্থলের প্রেরণায় নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়ে। পূর্বের জার্মানরা গৌরবময় জয়ের পথ দিয়ে জার্মান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের খণ্ডণ মহৎ পুনরুদ্ধার প্রত্যক্ষ করে।

এর জন্য অবশ্য এ বাপারে আমাদের কোন ভুল বোঝাবুঝি থাকা উচিত নয়, মাত্তাকারের অঙ্গীয়ার জার্মানরা উপলক্ষি করে যে এ সময় থেকে বাজ্যাভিমেক প্রয়োজন হলেও করুণ পরিণতির জন্য দায়ী, —যদিও এটা সাম্রাজ্য পুনস্থাপনের জন্য একটা কর্তব্যও নাই। কিন্তু তা পক্ষাধিক পুরনো কৃতৃষ্ণিতার মত শেষমেষ বোঝা হয়ে রুগ্ন ক্ষয়ে যাওয়া খণ্ডণ মহৎ অবস্থায় এসে না দাঢ়ায়। সর্বোপরি, জার্মান-অঙ্গীয়ান উভয়েই উপলক্ষি করে যে

হাবুসবুর্গ প্রাসাদের ঐতিহাসিক দিন শেষ হয়ে এসেছে এবং নতুন সাম্রাজ্য যে নয়া সম্ভাটকে অভিষেক করা হবে, তাকে নায়কোচিত ছাঁচে গড়া হবে, যাতে 'রাইনের মুকুট' পরার ঘোগ্যতা তার থাকে। এ অভিপ্রায় এবং স্থিরতাই সেই হাবুসবুর্গ প্রাসাদের একটা শাখা বেছে নিতে সাহায্য করে, যে শাখায় ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট অতীত দিনে সমগ্র জাতিকে গৌরবের শিখায় তুলে ধরে জাতির মুখ গৌরবোজ্জ্বল করেছিল।

১৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধের পর হাবুসবুর্গ প্রাসাদ স্থির মাথায় সমস্ত জার্মানদের নির্মূল করার কাজে নেমে পড়ে,— যাদের সম্পর্কে ওদের ধারণা ধীরে ধীরে হলেও একেবারে বিনাশ করা চাই। আমি ইচ্ছে করে 'নির্মূল' শব্দটা ব্যবহার করেছি; কারণ এ শব্দটা দিয়েই একমাত্র বোঝানো সম্ভব শ্লাভদের পদ্ধতির ফলাফল কি হতে পারে। যাদের ওপর নির্মূলের বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে, তারাই বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জুলিয়ে তোলে। এবং সেই আগনের শিখা এতই লেলিহান যে আধুনিক জার্মান ইতিহাস তা কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি।

এ প্রথম জাতীয়তাবাদী এবং দেশপ্রেমিকরা একত্রে বিদ্রোহীতে পরিণত হয়। জাতি বা দেশের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ নয়। এ বিদ্রোহ হল সরকারের বিরুদ্ধে, যে সরকার তাদের মতে সুনিচিতভাবে জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে, আধুনিক ইতিহাসে এ প্রথম যখন বৎশ পরপ্রায় রাজবংশীয় দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী দলের পিতৃভূমির প্রতি ভালবাসা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে খোলাখুলি সংঘর্ষ লাগে।

অন্তিয়াতে সর্বব্যাপী জার্মান আন্দোলন, যা গত শতাব্দীর শেষের দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল যে একটা দেশ তার শাসকবর্গের কাছে পরিষ্কার এবং সুস্টেন্ডাবে দাবি জানাতে পারে, তার শাসনকার্য দেশের স্বার্থে পরিচালিত হবে, অথবা কমপক্ষে তা জাতির ক্ষয় ডেকে আনবে না।

শাসকবর্গের শাসন কখনও নিজে থেকে সরে যাবে না। তা হলে তো যে কোন রকম অত্যাচার লজ্জনীয় এবং পরিদ্র বলে বিবেচিত হত।

শাসক যদি তার শক্তি জাতির ধ্বংসের কাছে নিয়োজিত করে, তবে বিদ্রোহ শুধু সঠিক পদ্ধাই নয়, প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্যও বটে।

এখন প্রশ্ন হল কখন এবং কী ভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে, তা শুধু মীরস প্রবক্ষ লিখে সংজ্ঞ নয়। তার জন্য প্রয়োজন শক্তির। হ্যাঁ, শুধুমাত্র শক্তিই এ সমস্যার সমাধান করতে পারে।

প্রত্যেকটি শাসকবর্গ, যদিও এরা নিকৃষ্টতম এবং হাজার বার জাতির সঙ্গে বিশ্বাসযাতকতা করেছে, তবু তারা দাবি করবে যে তারা জাতিকে টেনে ওপরে তুলেছে। এর প্রতিপক্ষরা, যারা জাতীয়তাবাদী সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে তাদেরও উচিত একই হাতিয়ার ব্যবহার করা, যা শাসকবর্গ ব্যবহার করে চলেছে। একমাত্র এ পথেই এ ধরনের অপশাসন রোখা যায় এবং নিজেদের মুক্তি ও স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারা সম্ভব। সুতরাং এ সংঘর্ষ আইনগতভাবেই চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত শাসক সেই পথে চলবে; কিন্তু বিদ্রোহীর দল বে-আইনী কার্যকলাপও শুরু করতে পারে যদি অত্যাচারী শাসকবর্গ সে পথে চলে।

বিশেষ করে বলতে গেলে, আমাদের তুলে যাওয়া উচিত নয় যে মানবজাতির অঙ্গিত্বরক্ষা শুধু শাসনকার্যের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে না; অধিকস্তু জাতিকে সংরক্ষিত রাখাই তার প্রধানতম কর্তব্য।

যদি জাতিই বিপন্ন হয়ে পড়ে অথবা নির্মূল হওয়ার পথে পা বাড়ায়, তবে আইন-টাইন দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশ্ন। শাসকবর্গ অবশ্য এক্ষেত্রে শুধু আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাই নেবে। কিন্তু অত্যাচারিতভাবে নিজেদের রক্ষা করার প্রবৃত্তি সহজাত, সূতরাং যে কোন উপায়ে তা করা উচিত।

একমাত্র এ পথই স্বীকৃত, এ সংগ্রামের নজীর ইতিহাস খুঁজলে ভূরি ভূরি পাওয়া যাবে। নিজেদের অত্যাচারিত শাসকের হাত থেকে বা বিদেশী বক্ষন খুলতে এর কোন বিকল্প নেই।

মানুষের অধিকার শাসকের অধিকারের থেকে অনেক ওপরে। কিন্তু কেউ যদি মনুষ্যত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়, তার অর্থ বিশেষ লক্ষ্যে পৌছাবার পক্ষে তার প্রয়াস যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

অন্তিম হল একটা পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কত সহজে একটা বিক্ষুকতা পোশাকের নিচে আইনের নামে তার মাথা লুকাতে পারে।

হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের আইনগত শক্তির দিকটার ভিত্তই ছিল সংসদের জার্মান বিরোধিতা। কারণ সংসদে তখন অর্জার্মানদের গরিষ্ঠতা, এবং রাজবংশীয়রা যারা বরাবর জার্মানদের বিরোধিতা করে এসেছে। দেশের শাসন ব্যবহারটাই এ দুটো বিষয়ের মধ্যে সংঘবদ্ধ। জার্মানদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য এ দুই নির্বর্থক বিষয়ের উৎখাতের চেষ্টা করাটাও ছিল নিষ্ফল। যারা উপদেশ দিত এ আইনানুগ পথে যেতে এবং শাসনব্যবস্থার অনুগত হওয়ার জন্য, তাদের পক্ষে কোন রকম বিরোধিতা করাই সম্ভব নয়। কারণ আইন অনুযায়ী বিরোধিতা করার কোন পথই খোলা নেই। এ আইন বিশেষজ্ঞ সংসদ সদস্যদের উপদেশ মেনে চলার অর্থই হচ্ছে রাজতন্ত্রের মধ্যে জার্মানদের অনিবার্য ধ্রংস; এবং এ ধ্রংস আসতেও বেশি সময় লাগে না। সত্যি বলতে কি সম্ভাজ্য নিজে থেকে ভেঙে পড়ার জন্যই জার্মানরা রক্ষা পায়।

চশমাধারী তাত্ত্বিকরা তাদের নিজেদের মতবাদের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে, কিন্তু লোকের জন্য নয়। কারণ মানুষই আইন তৈরি করেছে এবং ত্রুটি করে সে ভাবতে শেখে যে আইনের জন্যেই সে বেঁচে আছে।

জার্মানদের সর্বব্যাপী আন্দোলন এসব নির্বর্থক ধারণাগুলো মুছে দিতে সাহায্য করেছিল, যদিও মতবাদধারী তাত্ত্বিক এবং অন্যান্য ভক্তিতে গদগদ পূজারীরা যে এতে চমকে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

যখন হাবুসবুর্গ তাদের হাতের সমস্ত কলাকোশল নিয়ে জার্মানদের কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করে, তখন এ জার্মানরা নিষ্ঠুর হাতে সেই উজ্জ্বল রাজবংশীদের প্রচণ্ড আঘাত করে। এ দলই প্রথম শাসকবর্গের দুর্নীতির মূখোশ খুলে দেয় এবং হাজার হাজার মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হয়। এভাবে প্যান জার্মান মুভমেন্ট বা সর্বব্যাপী জার্মান আন্দোলন দেশকে রাজবংশীয়দের শোচনীয় আলিঙ্গন থেকে রক্ষা করে।

পার্টি তার প্রথম আর্বিভাবেই বিরাট এক অনুগামীদের আস্থা লাভ করে। কিন্তু প্রথমদিকের সাফল্য বেশি দিন ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। আমি যখন ভিয়েনাতে আসি তখন প্যান জার্মান পার্টিতে গ্রহণ লাগা শুরু হয়ে গেছে। খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট পার্টি ইতিমধ্যে শাসন ক্ষমতা দখল করে বসে আছে। প্যান জার্মান পার্টি তখন কৃষ্ণতার গভীরে প্রায় পুরোপুরি নিম্নগুলি।

একদিকে প্যান্ জার্মান আন্দোলনের উত্থান এবং পতন, অপরদিকে খৃষ্টান সোশ্যালিস্ট পার্টির চমৎকার অগ্রগতি আমার অনুধাবন করার জন্য বিশ্বাকর বিষয়বস্তু; আর সেই কারণেই আমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের পক্ষে এদের দান অপরিসীম।

আমি যখন ডিয়েনাতে আসি, আমার সহানুভূতি ছিল সম্পূর্ণরূপে প্যান্ জার্মান আন্দোলনের দিকে।

বিশেষ করে তাদের জয়ধর্মি। জয় হোক হোয়েন জোলারেন, আমাকে বিশ্বায়ে অভিভূত করে ফেলত; তাদের মনের জোর দেখে আমার বুক ভরে উঠত। তারা নিজেদের অখণ্ড জার্মানির অংশ বলে ভাবত, যেখান থেকে তারা সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন। তারা সুযোগ পেলেই জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলত যা আমার শুধু আঘাতিশাসই বাড়িয়ে দেয়ানি, উৎসাহও বর্ধিত করেছে। জার্মান সম্পর্কিত সমস্ত আদর্শকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা এবং কোন বিষয়ে আপোষ নয়; আমার মনে হয় এ পথেই শুধু দেশকে বাঁচানো যায়। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না যে এত বড় একটা আন্দোলন কি করে তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ল; এবং এটা কিছুতেই বোধগম্য নয় যে এত অল্প সময়ের মধ্যে খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট পার্টি কি করে এতখানি অগ্রগতি করল। তারা ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তার উত্তৃত্ব শৃঙ্গে ঢেঢ়ে বসেছে।

যখন এ দুই আন্দোলনকে আমি তুলনামূলক বিচার করতে বসি, তখন ভাগ্য আমাকে সহায় দেয়, এ হত্যাকাণ্ডের সমস্যাটা বোঝায়। ভাগ্যের এ সহায়তা আমাকে যেন আমার পরিবেশে আরো বেশি সংকুচিত করে দেয়।

আমি এখানে দুটো মানুষ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা, যাদের এ আন্দোলনের স্তৰা এবং নেতৃত্ব বলে মান্য করা উচিত। একজন হল জর্জ ভন্স্ট্রোয়েনার, আর অপরজন হল ডষ্টের কার্ল লুইগার।

ব্যক্তিত্বের দিক থেকে দুজনেই সাধারণের চেয়ে ওপরে এবং তথাকথিত সংসদ সদস্যদের থেকেই উচু ছিল। তারা তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করত নিষ্কলঙ্ঘ, নির্দোষ এবং চরম সাধুতার মধ্যে, চারিদিক যখন দুর্নীতির বিষবাল্পে আচ্ছাদিত। ব্যক্তিগতভাবে প্রথমে আমি প্যান্-জার্মান প্রতিনিধি শ্রোয়েনারকে পছন্দ করতাম, কিন্তু ধীরে ধীরে খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতাকে একইভাবে পছন্দ করে ফেললাম।

উভয়ের যোগ্যতা বিবেচনায় আমার মনে হয় গোড়ার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে শ্রোয়েনারের চিন্তাধারা উচু ধরনের এবং বলিষ্ঠ; সে তার দূরদৃষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত সাম্রাজ্যের পতন যে কারোর চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিল। যদি হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্য সম্পর্কে তার কথাগুলোয় জার্মানরা সময় মত মনোযোগ দিত, তবে সর্বনাশা যুক্তে সারা ইউরোপের বিরুদ্ধে হয়ত বা জার্মানিকে জড়িয়ে পড়তে হত না।

কিন্তু যদিও শ্রোয়েনার সমস্যার গভীরে ঢোকার ক্ষমতা রাখত, তবে মানুষ চেনার ব্যাপারে তার প্রায়ই ভুল হত।

এবং এখানেই ডষ্টের লুইগারের বিশেষ প্রতিভা ছিল। মানুষের চরিত্র বোঝার ব্যাপারে তার ছিল ইঞ্চলনও ক্ষমতা। সে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মানুষের মূল্যায়ন করত এবং সেই মূল্যায়ন করতে গিয়ে তার প্রাপ্তের চেয়ে বেশি কখনই দিত না। সব পরিকল্পনাই মানুষের বাস্তব দিকটার দিকে নজর রেখে হত, কিন্তু এ বিষয়ের প্রভেদটা শ্রোয়েনার ঠিক বুঝত না। প্যান্ জার্মান আন্দোলনের ধ্যান-ধারণাগুলো ঠিকই ছিল, সেগুলো জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে

দিয়ে সার্থক করে তুলতে যে দূরদৃষ্টি এবং মনের দৃঢ়তা দরকার তা তার ছিল না। এবং এসব পরিকল্পনা যাতে সহজেই জনসাধারণ দিতে পারে, সেভাবে তৈরি করার ক্ষমতাও তার ছিল না। কারণ জনসাধারণ সম্পর্কে বোধশক্তি ছিল খুবই সীমাবদ্ধ এবং কোনদিনই তার আর বাড়েনি। সুতরাং শ্রোয়েনারের জ্ঞানবুদ্ধি ছিল পয়গঘরের মত, যা তার পক্ষে কোনদিনই বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

মানব চরিত্র সম্পর্কে তার বোধশক্তির অভাব, জনসাধারণের শক্তি সম্পর্কেও তাকে ভুল ধারণা দিয়েছিল। শুধু কয়েকটা আন্দোলনের ব্যাপারেই নয় পুরনো প্রতিষ্ঠানগুলোর সহজাত ক্ষমতা সম্পর্কেও।

বাস্তবিকপক্ষে শ্রোয়েনার বুৰুজে পেরেছিল যে সব সমস্যার তাকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে, সেগুলো সব মানবিক। কিন্তু তার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না যে একমাত্র জনসাধারণই সেই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে, কারণ সেগুলো ছিল ধর্মরূপে।

দুর্ভাগ্যবশত তথাকথিত বুর্জুয়াদের সংগ্রাম শক্তি সম্পর্কেও তার ধারণা ঠিক ছিল না। এ দুর্বলতা মূলত তাদের নিজেদের ব্যবসার স্বার্থরক্ষার কারণে এবং তারা যে বিষয়ে এককভাবে কোনমতেই কোনরকম দায়িত্ব বা ঝুঁকি নিতে রাজী ছিল না। এটাই তাদের যে কোন সংগ্রামে অংশ নিতে বাধা দিয়েছে। বিশেষভাবে বলতে গেলে সর্বাত্মক আন্দোলন কখনই সার্থকতা লাভ করতে পারে না, যদি না বিশাল জনসাধারণ তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাতে অংশগ্রহণ না করে।

জনসাধারণের এ নিচেকার স্তর সম্পর্কে ভুল ধারণা সামাজিক সমস্যাগুলো সম্পর্কেও সঠিক ধারণা থেকে তাকে বন্ধিত রাখে।

এসব ব্যাপারে ডেটার লুইগার ঠিক শ্রোয়েনারের বিপরীত পথী ছিল। মানব চরিত্র সম্পর্কে তার সাধারণ জ্ঞান বিভিন্ন সামাজিক শক্তিগুলো সম্বন্ধে তার ধারণাকে সঠিকভাবে উপস্থিপিত করে এবং বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে অবহেলার মনোভাব নেওয়ার হাত থেকে তাকে বক্ষ করে; এবং সম্ভবত তার এ গুণটাকেই সে ব্যবহার করে এসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগায়।

আমাদের সেই ঘটনাবস্থল কালে, সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল যে সমাজের ওপরের স্তরের সংগ্রাম করার ক্ষমতা বলতে কিছু নেই, এবং নতুন নতুন বড় সংগ্রাম করতেও তারা অসমর্থ, যতক্ষণ না পর্যন্ত বোঝে যে এ আন্দোলনে জয় তাদের সুনিশ্চিত। সুতরাং সমাজের এ বিশেষ শর্টটাকে জয় করার জন্য সে প্রাগমন ঢেলে দেয় এবং তাদের পশ্চু করার চেয়ে সযত্ত্বে সাময়িক উদ্দীপনা তাদের মধ্যে লালন পালন করে; কারণ এদের অস্তিত্বই তখন বিপন্ন। দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমর্থন পাওয়ার জন্য সত্ত্বর যত বকচের উপায় বেছে নেওয়া সম্ভব; তার সবগুলোকেই সে গ্রহণ করেছিল; যাতে তার এ আন্দোলনের জন্য সেইসব প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলোর থেকে যতটা সম্ভব শক্তি আরোহণ করা যায়।

এ কারণে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে, যাদের প্রায় নির্মূল করার জন্য সরকার উঠে পড়ে গেগেছিল, দলের ভিত্তি হিসেবে তাদের নির্বাচন করে। এভাবে সে যে অনুগামীয়া দল তৈরি করে, যারা নিজেদের উৎসর্গ করতেই যে সব সময় প্রস্তুত ছিল শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে সংগ্রাম করার মত যথেষ্ট মানসিক শক্তি ও বর্তমান। ক্যাথলিক চার্চের প্রতি তার ধ্যান ধারণা ধীক পদ্ধীদেরও দলে টানে এবং প্রাচীন পুরুষের দল একরকম বাধ্য হয়েই বক্ষণক্ষেত্র থেকে

রণে ভঙ্গ দেয়; যুবকরা এ আশাতেই নতুন দলে যোগ দিয়েছিল যে ধীরে ধীরে নতুন পার্টি তাদের ওপরে উঠতে সাহায্য করবে।

একমাত্র তার চরিত্রের এদিকটাকে বিচার করার অর্থই হল তার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা। কারণ তার মুদ্র কৌশল ছিল অনন্য। সংস্কারক হিসেবে তার প্রতিভাকেও কোনমতেই ছেট করে দেখা চলে না। কিন্তু এসব ক্ষমতা অর্থাৎ অতিভুবোধ এবং যোগ্যতা ছিল সীমাবদ্ধ।

এ বিখ্যাত ব্যক্তিটির লক্ষ্য ছিল কিন্তু সত্যিকারের বাস্তব সম্ভত। তার ইচ্ছে ছিল ভিয়েনা জয়ের, যা হল রাজতন্ত্রের হৃদয়স্বরূপ। এ ভিয়েনা থেকেই অসুস্থতা এবং বার্ধক্যহেতু জরাজীর্ণ সম্রাজ্যের শেষ নাড়ীর স্পন্দন শোনা যেত। যদি কোনভাবে হৃদয়টাকে সূস্থ করে তোলা যায়, তবে শরীরের অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও সজীব হতে বাধ্য।

ধারণাটা আদর্শগতভাবে ঠিকই ছিল; কিন্তু যে সময়ের মধ্যে এ আদর্শকে রূপায়িত করতে হবে তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এবং এটাই হল তার দুর্বল স্থান।

শহর ভিয়েনার মেয়ের হিসেবে তার কার্যালী অসাধারণ; কিন্তু তাতেও রাজতন্ত্র রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। কারণ পুরো ব্যাপারটাই তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রোয়েনার কিন্তু ব্যাপারগুলোকে স্পষ্ট উপলক্ষ্মি করতে পেরেছিল। উচ্চতর লুইগার যে বিষয়গুলোর বাস্তব প্রয়োগ করেছিল, তা কার্যকরী হয়নি। শ্রোয়েনার শেষ ধাপ বলে যা ভেবেছিল, সেখানে পৌছতে পারেনি। কিন্তু তার আশক্তাগুলো আচর্যজনকভাবে সত্যে পরিণত হয়েছিল। এভাবে উভয়েই তাদের লক্ষ্য পৌছতে সক্ষম হয়নি। লুইগার অত্যিয়া রক্ষা করতে পারেনি, আর শ্রোয়েনারের পক্ষে অত্যিয়ার জার্মানদের পতন রোধ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

এ দুই দলের পতনের কারণ আমাদের যুগের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বিশেষ।

আমার বন্ধুদের পক্ষে ব্যাপারটা যে বিশেষভাবে উপকারি হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ অনেক বিষয়েই সেদিনের সেই পরিবেশ ও আমাদের সময়ের মিল ছিল। সুতরাং এ শিক্ষা থেকে শেখা উচিত ছিল যে তুলগুলো আন্দোলনটাকে খতম করে দিয়ে পুরো জামিটাকে বন্ধ্য করে দিয়েছিল, তা থেকে রেহাই পাওয়ার।

আমার মতে অত্যিয়াতে প্যান-জার্মান আন্দোলনের ধর্মসের জন্য মূলত তিনটে কারণ দায়ী।

প্রথম কারণ হল, তৎকালীন নেতাদের সামাজিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। বিশেষ করে নতুন আন্দোলন ঘটে চরিত্রগতভাবে বিদ্রোহাত্মক।

শ্রোয়েনার এবং তার অনুগামীদের দল তাদের মনোযোগ পুরোপুরি বুর্জোয়া শ্রেণীর ওপর দিয়েছিল; সুতরাং তাদের সেই আন্দোলন নিরীহ এবং মধ্যমগোছের আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। ভাল সময়ে অর্থাৎ সুশাসনের সময় সম্বাজের বিশেষ স্তরের এ মনস্তত্ত্ব সম্বৰ্দ্ধীয় ধ্যান ধারণা দেশের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু খারাপ শাসকের সময়ে এ বিশেষ গুণটাই ধর্মসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অধ্যাবসায় পূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্যান-জার্মান আন্দোলনকারীদের উচিত ছিল জনসাধারণকে জয় করার। এ ব্যর্থতার জন্য আন্দোলনটির প্রাথমিক কোন আবেগের চেউ-ই ছিল না, এবং এ কারণেই আন্দোলনটাতে এত অল্প সময়ে ভাঁটা পড়ে যায়।

অসংখ্য আধুনিক বুর্জুয়া যারা এ আন্দোলনে শামিল হয়েছিল, এর অন্তর্নির্হিত আবর্তন স্থির করে এবং এ উপায়ে আগে থেকেই জনসাধারণের সমর্থন আশা করে। এ পরিবেশে এ ধরনের একটা আন্দোলন বিতর্ক সমালোচনার পরিধি ছাড়িয়ে ওপরে উঠতে পারে না। ধর্মোন্যাদনা এবং আঝোংসর্গের প্রেরণা এ আন্দোলনে আর ছিল না। তার পরিবর্তে জায়গা নিয়েছিল দেশের বর্তমান সরকারের সবকিছুকে মেনে নেওয়া এবং কঠিন সমস্যাগুলোকে ঠেলে এককোণে সরিয়ে দিয়ে এক অপমানজনক শক্তির মধ্য দিয়ে সব কিছুর সমাপ্তি ঘোষণা করা।

প্যান-জার্মান আন্দোলনের জন্য দায়ী হল এর নেতারা, যাদের উচিত ছিল সাফল্যের কারণে অনুগামীর দল বিশাল জনসাধারণের মধ্যে থেকে খুঁজে বের করে নেওয়া।

এভাবে পুরো আন্দোলনটাই গিয়ে পড়ে বুর্জুয়া, সমাজের তথাকথিত ব্যক্তিবর্গ এবং আধুনিক পন্থীদের হাতে। এ অসফলতার দরুণ দ্বিতীয়বার ধস্ত নামে।

প্যান-জার্মান আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তিয়ার জার্মানদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। অন্তিয়ার জার্মানদের নির্ভূল করার জন্য পার্লামেন্টকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শেষ সময়ে এ অন্তিয়ার জার্মানদের বক্ষা করার একমাত্র পথ ছিল এ সংসদ গণতন্ত্রকে ছেড়ে ফেলে দেওয়া। কিন্তু তার আশা খুবই কম বা ছিল না বললেই চলে।

সুতরাং প্যান-জার্মান আন্দোলনের মূল প্রশ্ন হল এখন কি করা? সংসদীয় গণতন্ত্রের ভেতরে থেকে তাকে সাবোতাজ্জ করা, নাকি বাইরে থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দেওয়া।

প্যান-জার্মানরা পার্লামেন্টে ঢুকতে পরাজিত হয়েই ফিরে আসে। কিন্তু নিজেদের পার্লামেন্টে ঢুকতে পারার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করে।

বাইরে থেকে এ ধরনের সংঘাত চালানোর জন্য প্রয়োজন হল অদম্য ও অজেয় সাহসের শৈবৎ আঝোংসর্গের প্রেরণাকে অন্ত হিসেবে ব্যবহার করা। এ সব ক্ষেত্রে স্বাঁড়কে শিঙ ধরে দোর করে বলপূর্বক অধিকৃত করতে হয়। কুকুশক্তি হয়ত বা আক্রমণকারীকে বারবার মাটিতে আঝড়ে ফেলবে, তবু বলিষ্ঠ মনের জোরে তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে, যদিও হয়ত বা নান ইতিমধ্যে কিছু হাড় ভেঙে গেছে, এবং এ ধরনের দীর্ঘ যুদ্ধের পরই একমাত্র বিজয়ী হওয়া সম্ভব। নতুন যোদ্ধারা এ আঝোংসর্গের প্রেরণাতেই এসে জোটে। এ অদম্য উৎসাহ শামাদে তাদের মাথায় বিজয়ীর মুকুট পরিয়ে দেয়।

এ ধরনের ফলাফলের জন্য অবশ্য জনসাধারণের মধ্যে মহৎ সন্তানের প্রয়োজন। সামাজিক একমাত্র প্রয়োজনীয় মানসিক বৈর্য এবং অধ্যবসায় থাকে যার দ্বারা কোন রক্তক্ষয়ী প্রাপ্তিমূল গমাপ্তি করা সম্ভব। কিন্তু প্যান জার্মান আন্দোলনে এ ধরনের কোন যোদ্ধা ছিল না; এ সামাজিক সাধারণের জন্য সংসদে ঢোকা ছাড়া গত্যুর কোথায়!

এখন নানে করলে ভুল হবে যে নেতৃত্ব দিক থেকে অন্তর্জাতে দিদাহুদ্দের পর এ পথ স্থির মান ও যোগ্য বা এটা সূচিত্বিত কোন চিত্তাধারার ফসল। না, এ সমস্যা সমাধানের জন্য অন্য মানবিক চিংড়াই করা হয়নি। তারা যিথ্যা ধারণা আর ভুল চিত্তাধারার বশবর্তী হয়েই আর তারা নির্যান যে এ প্রতিষ্ঠানে মাথা গলাবাব কি ফলাফল হতে পারে, যদিও ব্যবহার করণশীল ও তাবে এ প্রতিষ্ঠানে ঢোকার বিরোধিতা নিজেরাই করে এসেছে। অশা করেছিল এ প্রথম নানা জনসাধারণের নিকট পৌছতে পারবে কারণ তাদের কথা আবা উনবে তারাই

তো সংস্কারের জাতির প্রতিনিধি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শয়তানির একেবারে গোড়ায় ঘা দিতে পারবে, বাইরে থেকে যেটা কোনমতেই সংজ্ঞা নয়। তাদের বিশ্বাস ছিল সংসদের মুক্তির মধ্যে তারা যদি নিজেদের রক্ষা করতে পারে, তবে একক ব্যক্তিত্বের ভূমিকাটা হবে কোন নাটকের মত, যা দিনে দৃঢ় এবং বর্ধিত হবে।

কিন্তু বাস্তবে পুরো ব্যাপারটাই বিপরীতভাবে দেখা দেয়। বিচারালয়, যার সামনে প্যান-জার্মান আন্দোলনের প্রতিনিধিবর্গ তাদের বক্তব্য উপস্থিত করে, তা মোটেই বিশাল হয়ে ওঠে না। বরং ক্ষুদ্রই হয়েছিল। উপস্থিত তারাই থাকত যারা ওদের বক্তব্য শুনতে রাজী; অন্যেরা পরেরদিন সংবাদপত্রে তা পড়ে নিত।

সংসদ কিন্তু প্রধান বিচারালয় নয়, সবচেয়ে বড় বিচারখানা হল জনসাধারণের সামনে খোলা আকাশের নিচে সভা করা। কারণ এখানেই হাজার হাজার লোকের জমায়েত, এবং তারা শুনতে আসে শঙ্খ কি বলছে; কিন্তু সংসদে শ্রোতা বলতে তো মাত্র কয়েকশ লোক। এবং বেশিরভাগই সেখানে উপস্থিত থাকে তাদের ধার্য দৈনিক ভাতা পাওয়ার ধান্ধায়, জনের আলোকবর্তিকার শিখা বাড়াবার জন্যে নয়; এরাই তথাকথিত জনসাধারণের প্রতিনিধি।

তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে জমায়েতে জনসাধারণ কিন্তু শিখতে আসে না, কারণ শেখার জন্য যতটুকু বৃক্ষিমতা এবং ইচ্ছাক্ষেত্রের প্রয়োজন, তা তাদের কারোরই প্রায় থাকে না।

এ সংসদের একেবারে প্রতিনিধিও সত্যের কাছে শুন্দাবনত হয়ে নিজেকে কাজের জন্য উৎসর্গ করে না। অ দ্বন্দ্বস্পন্দনায়ের একজনও এ কাজ করবে না, যদি না ভাবে আগামীবারে নির্বাচনে সে আবার একই জায়গা থেকে সংসদের সদস্যপদ নির্বাচিত হওয়ার আশা রাখে। সুতরাং এসব সদস্যরা তখনই নতুন পার্টির খৌজে বের হয় যাদের ভোটে জেতার সংশ্বান্ন আছে, যখন দেখে তার পুরনো দলের খারাপ সময় চলছে। অবশ্য এ দল পরিবর্তনের আগে মুক্তির বন্যায় নিজেদের নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং যখনই দেখা যায় বর্তমান পার্টি নির্বাচনে পরাজয়ের মুখোযুক্তি এসে দাঁড়িয়েছে, তখন দলে দলে নেতাদের দল ভেঙে নতুন দলে যেতে দেখা যায়। সংসদীয় ইন্দুরের দলে তখন জাহাজ ছাড়ার হিতিক পড়ে।

কোন একক ব্যক্তিত্বের বিষয়বস্তুর ওপর দখলের জন্য এগুলো হয় না। এ দল ভাঙ্গাভঙ্গির খেলা হয় কোন এক অতীন্দ্রিয় বিষয়ে অন্তদৃষ্টির জন্য। সংসদ মাছির দল ঠিক মুহূর্তে অন্য পার্টির বিচারালয়ের পোকার মত লাফিয়ে পড়ে। আর এসব বিচারালয়ের সামনে বক্তৃতা করা হল বিশেষ কোন জন্মদের দিকে মুক্তা নিক্ষেপ করা। বাস্তবিকপক্ষে এত কঠের কোন প্রতিদান পাওয়া যায় না। কারণ ফল তো সর্বদাই নেতৃত্বাচক।

এবং এটাই সব সময় হয়ে এসেছে। প্যান-জার্মান সদস্যরা হয়ত বা কর্কশ কঠে চিক্কার করে গেছে, কিন্তু তাদের কথা শুনছেটা কে!

সংবাদপত্রগুলো হয় গ্রাহের মধ্যে আমে না, না হয় কেটে ছেঁটে সেই বক্তৃতাগুলো এমনভাবে প্রকাশ করে যে তার মধ্যেকার সার বন্ধুই ধৰ্ম হয়ে যায়, অথবা সেগুলোকে এমনভাবে মোচড় দেওয়া হয় যে তার অর্থ একেবারে অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। যা পড়ে সাধারণ দর্শক নতুন আন্দোলন সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকে। একক সদস্যরা কি বলছে সেটা অপ্রয়োজনীয়। দরকার হল সেই বক্তৃতা সাধারণ মানুষ কিভাবে পড়ছে এবং নিচে।

সুতরাং প্রকাশিত সংবাদপত্রে বক্তৃতাগুলো আর কিছুই নয়, প্রদত্ত বক্তৃতার কাট-ছাঁট করা অংশবিশেষ; যা পাঠকগণকে অসংলগ্ন স্বচ্ছতার ধারণা দেয়। কিন্তু এটা করা বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। সুতরাং দর্শক বলতে সত্যি বোঝায় মাত্র পাঁচশ লোক; এবং তাই যথেষ্ট। নিষ্কৃতম হল নিচের বিষয়বস্তুটা :

প্যান-জার্মান আন্দোলনটা হয়ত বা সফল হত যদি তার নেতারা উপলক্ষ্মি করতে পারত যে আন্দোলনটা যতটা নতুন পার্টির জন্য তার চেয়ে বেশি সর্বমানবাত্মক চরিত্রের। এ একটাই উপলক্ষ্মি এতে বড় একটা সংগ্রাম চালানোর জন্য যে অন্তর্নিহিত শক্তির দরকার, তা জাগাবার জন্ম যথেষ্ট। অবশ্য এ ধরনের সংগ্রাম চালানোর জন্য প্রয়োজন নেতাদের অসীম বৃদ্ধিমত্তা এবং অদম্য সাহস। যদি এ সর্বাত্মক আন্দোলন যারা চালনা করবে তারা তাদের সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত না থাকে, তাহলে শীঘ্ৰই দেখতে পাবে এমন অনুরাগী আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যারা এ সংগ্রামের সাফল্যের জন্য নিজেদের জীবন শুল্ক তুচ্ছ বলে মনে করে। যে তার নিজের অভিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে,— সে সমাজকে সেবা করবে কি করে?

সাফল্যের পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োকের উচিত এটাকে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে ভাবী বংশধরেরা এটাকে স্থান এবং গৌরবের চোখে দেখে; তবে এ আন্দোলনের শৈশ্বরিক সভ্যদের কোনরকম প্রতিদান আশা করা অন্যায়। যদি এ ধরনের আন্দোলনে শৈশ্বরিক সভ্যদের উচ্চপদ এবং চেয়ার পাওয়ার সুযোগ থাকে তবে প্রচুর পরিমাণে খ্যোগ্য সভ্যরা সেই দলে ভিড় করবে। এবং দিনে দিনে মুনাফাখোরদের দলই পার্টির শেওয়ার বেশি গুরুত্ব পাবে। সত্যিকারের যোদ্ধার দল যারা প্রথম দিকে আক্রমণের প্রচণ্ড ধাক্কা পামালে তাদেরই হয়ত বা মুনাফাখোরের দল পরিত্যক্ত পাথরকুচির মত বাতিল করে দেবে। সুতরাং আন্দোলনের মৃত্যু তো সেখানেই ঘটে যাবে।

একবার যখন প্যান-জার্মান আন্দোলনকারীরা ঠিক করে যে সংসদের সঙ্গে হাত মিলাবে, তখন নেতা এবং যোদ্ধারা আর জনপ্রিয় আন্দোলনের অংশহৃংকারী থাকে না, সংসদে সদস্যে পরিণত হয় তারা। এভাবে আন্দোলন সাধারণ একটা রাজনৈতিক দলে পরিণত হয় এবং তার যুক্তিপ্রিয় চরিত্র হারিয়ে ফেলে; কোনক্ষেই আর শহীদ হতে চায় না।

সংগ্রামের পরিবর্তে প্যান-জার্মান আন্দোলনের নেতারা বক্তৃতা আর দর কষাকষিতে দিশাসী হয়ে পড়ে। নতুন সংসদ সদস্যরা এ ভেবে খুশি হয় যে সর্বাত্মক আন্দোলন চালানোর জন্ম বাস্তুতা অনেক ভাল অস্ত; এতে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি কম, যা তাকে পদে পদে সশ্রেষ্ঠ আন্দোলনের সময় মুখোমুখি হতে হয় এবং তাতে যে কোন সময়ে তার জীবন হারাতে হতে পারে। এ সংগ্রামের ফলাফল কি হবে তা যেমন বলা যায় না তেমনি ব্যক্তিগত লাভও এতে নাই।

ঠারা যখন সংসদের সভাপদ অলংকৃত করে, তখন তাদের অনুগামীর দল কোন এক ধরণের কিছু ঘটবে ভেবে আশা নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করে। স্বত্বাবতই কোন অস্তুত ব্যাপার নাই না, পটভূতে পারে না। কিন্তু আন্দোলনের অনুগামীর দল শীঘ্ৰই অধৈর্য হয়ে পড়ে; কারণ ঠারা সংবাদপত্রে যা পড়ে; তার সঙ্গে নির্বাচনের কোন প্রতিশ্রুতির মিলই ভোটদাতারা খুঁজে পায় না। তার কারণ অবশ্য বেশি খোঁজার দরকার নেই। এর প্রধানতম কারণ হল সংবাদকরা প্যান-জার্মান আন্দোলনের নেতারা বাস্তবে কি করছে না করছে তার সত্যিকারের নামরণ কখনই প্রকাশ করে না।

নতুন সংসদ সদস্যদের দল সংসদের ভেতরে বিদ্রোহী মনোভাবের খুব অল্প ছাপই রাখে।

প্রকাশ্য জনসভা করাও দিনের পর দিন কমে আসে; যদিও এটাই হল জনসাধারণকে উদ্বৃদ্ধি করার এবং তাদের কাছে পৌছবার একমাত্র পথ। কারণ এখানে জনসাধারণের ওপর সোজাসুজি প্রভাব ফেলা যায় ও বিরাট জনসমর্থনও পাওয়া যায়।

বিরাট বীয়ার হলের টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে হাজার হাজার শ্রোতার সামনে যে বক্তারা তাদের বক্তৃতা রাখত তারা যখন সেই টেবিল খালি করে সংসদের উচ্চ বক্তৃতামঞ্চে সামান্য কয়েকজন নির্বাচিত সদস্যদের সামনে তাদের বক্তৃতা রাখে, তখন তাদের বক্তৃতা আর জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হয় না, হয়ে দাঁড়ায় নির্বাচিত কয়েকজন সদস্য উদ্দেশ্যে। এবং প্যান-জার্মান আন্দোলন তার নিজস্ব চরিত্র হারিয়ে ফেলে নিছক একটা ক্লাবে পরিণত হয় যেখানে কঠিন সমস্যাগুলোরও কেতোবী ঢঙে আলোচনা চলে।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে দলের যে ভুল ধারণা গড়ে ওঠে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বারা সেটাকে পরিশুল্ক করার চেষ্টাও করা হয়নি। যেটা একমাত্র প্রকাশ্য জনসভার মাধ্যমেই সম্ভব, যেখানে একক কোন ব্যক্তিত্ব তার কাজের হিসেবে নিকেশ দাখিল করার সুযোগ পায়। এর চরম পরিণতি হল প্যান-জার্মান শব্দটাই বিশাল জনসাধারণের কানে বিষবৎ শোনায়।

আজকের কলমের যোদ্ধাগণ এবং সাহিত্যের চালিয়াতের দলের বোৰ্ডা উচিত যে পঞ্চবীর ইতিমধ্যে পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে, সেটা রাজহাসের পাখার কলমে হয়নি। না; কলমের প্রধান কাজ হল এ পরিবর্তনের তাত্ত্বিক দিকটার ব্যাখ্যা করা। বক্তৃতাই একমাত্র যাদুশক্তি যা ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে যাদুদণ্ডের মত কাজ করে।

বিরাট জনসাধারণকে একমাত্র বক্তৃতা দ্বারাই শাসন করা যায়, অন্য কোন শক্তি দিয়ে নয়। সমস্ত জনপ্রিয় আন্দোলনই হল মহান আন্দোলন। মানুষের ইচ্ছা এবং অনুভূতির এগুলো হঠাৎ আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ নিষ্ঠুর ধর্মসের কাজে অথবা জাতিগত্বার কাজে নিয়োজিত হয়। কোন ক্ষেত্রেই মহান কোন আন্দোলন ড্রাইংরুমের নায়কদের চিনি মিশ্রিত করিতা এবং রঙিন কল্পনার দ্বারা সংগঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

একটা জাতির ধৰ্ম একমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই এড়নো সম্ভব। কিন্তু যাদের মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি বর্তমান, তারাই অপরের মধ্যে সেই ইচ্ছাশক্তির চেউ জাগাতে পারে। একমাত্র নেতাদের মধ্যেকার ইচ্ছাশক্তির বন্যা হাতুড়ির আঘাতের মত জনসাধারণের হস্তয়ের দুয়ার খুলতে সমর্থ।

যে এ অনুভূতির প্রাবন তাকে বক্তৃতার মাধ্যমে রূপ দিতে সক্ষম নয়, তার পক্ষে দ্রুদশীর্ণ এবং তার ইচ্ছার আগামীদিনের দৃত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং একজন তাত্ত্বিক লেখক তার কালি দোয়াত নিয়ে প্রশ্নোত্তরেই ব্যস্ত থাকবে। কারণ তার যোগ্যতা এবং জ্ঞান দুইই বর্তমান, কিন্তু সে জননেতা বা নেতা নির্বাচিত হওয়ার জন্য জন্মায়নি।

প্রতিটি আন্দোলন, যার শেষ পর্যায়ে কেন মহান রূপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা মে ধরনের আন্দোলনে সব সময় নজর রাখতে হবে যেন সেটা জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। প্রত্যেকটা সমস্যাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করার প্রয়োজন, এবং সেই সাথেই সমাধানের জন্য যে পথ বাছা হবে সেখানে আন্দোলন সঙ্গে যেন হন্দও বজায় থাকে।

এ আন্দোলনে এমন সব কিছুকে পরিভ্যাগ করা দরকার—যা নাকি সেই আন্দোলনকে জনতার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এটা সহজ সরল সত্য যে কোন মহৎ আন্দোলনই জনসাধারণের শক্তিছাড়া সফল হতে পারে না। তা যত সম্মত বা উন্নতমানেরই আপাতদৃষ্টিতে দেখাক না কেন। একমাত্র নগ্ন, বাস্তব উদ্দেশ্য সাফল্যের দরজায় পৌছে দিতে পারে। কঠিন এবং বাস্তব রাস্তা ধরে হাঁটার অনিষ্টাই হল আমাদের নিজস্ব লক্ষ্যে না পৌছানো এবং এ অনিষ্ট ইচ্ছাকৃতই হোক আর অনিষ্টাতেই হোক।

যে মূহূর্তে প্যান-জার্মান আন্দোলনের নেতারা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে, সেই মূহূর্ত থেকেই তারা জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন; এবং মূহূর্ত কয়েকের সন্তো সাফল্যের জন্য তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উৎসর্গ করে বসে থাকে। তারা সংগ্রামের জন্য সহজ পথটা বেছে নেয় এবং তা নিতে গিয়ে বিজয়ীর পক্ষে অযোগ্য বলে নিজেদের প্রমাণ করে।

ভিয়েনা থাকাকালীন আমি গভীরভাবে এ দুটো প্রশ্ন অনুসূরণ করেছি। এবং উপলক্ষ করেছি যে প্যান-জার্মান আন্দোলন ধরে পড়ার পেছনের কারণগুলো হল, এ প্রশ্নগুলোই পুরোপুরি বিশ্বেষণ না করা। আমার ধারণা সেই সময়ে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল অঙ্গীয়ার জার্মানদের দ্বারা।

এ দুই বিবার ভূলই হল প্যান-জার্মান আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পারস্পরিক প্রধান কারণ। অস্ত্রনির্মিত শক্তি যা মহান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেৰণা দেয়, তা' আসে জনসাধারণের কাছ থেকে। কিন্তু সেই জনসাধারণের প্রেৰণা থেকেই আন্দোলন বঞ্চিত হয়েছিল। এর ফলাফল হল সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধানের কোন চেষ্টা করা হয়নি। এবং এ আন্দোলনের মাধ্যমেও সমাজের নিচু এবং দুর্বল শ্রেণীর মন কাড়ার চেষ্টা করেনি। আরেক ফলাফল হল সংসদীয় গণতন্ত্র স্থাপন করে মেওয়া—যার প্রতিক্রিয়া হয় আগেরই মত।

যদি জনসাধারণ আন্দোলনের সময়ে যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে তার সঠিক মূল্যায়ন করা হত, সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রতি নজর দেওয়া হত এবং প্রচার সম্পর্কে অন্য পক্ষতি নেওয়া হত, তবে আন্দোলনের ভারকেন্দ্র সংসদে না গিয়ে রাস্তায় এবং কলকারবানায় ছড়িয়ে পড়ত।

তৃতীয় ভূলটা হল জনসাধারণের মূল্যায়নের শিকড়টাকে খুঁজে বার করার কোন চেষ্টাই হয়নি। কোন অসাধারণ প্রতিভাবান লোক দিয়ে বিশেষ একটা নির্দিষ্ট দিকে জনসাধারণের প্রতিটাকে টিক করে দিতে হয়। জনসাধারণ যখন একবার সেই গতিতে চলে তখন যত্ন নিয়ামক ভাবী চর্তুর মত আপন ভরবেগেই সে চলতে থাকে, বাইরের আর কোন শক্তিরই পাশে চালাতে প্রয়োজন হয় না।

প্যান-জার্মান নেতাদের ক্যাথলিক চার্চের বিকল্পে সংগ্রামের নীতিটার মধ্যেই ভুল ছিল, ক্যাথলিক চার্চ ধানুমের আধ্যাত্মিকতার দিকটাতে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেনি।

নতুন দল যে বোনের বিকল্পে সশ্রেণ প্রচারে নেমে পড়েছিল তার কারণগুলো নিচে বলা হচ্ছে:

হাউস অফ হাবসবুর্গ যখন অঙ্গীয়াকে একটা শ্বাভ প্রদেশে পরিণত করতে চাইল, তখন গার্ব নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোন রকম পথ বেছে নিতে কসুর করেনি। এমন কি এ নতুন প্রদেশ গড়তে গিয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুন্দি প্রতারিত করতে তাদের বিবেকে গঠন কু ধার্ঘনি। অনেকগুলো পদ্ধতির একটা হল চেক ধর্ম্যাজকদের পল্লীগুলো এবং তাদের

যত্র হিসেবে ব্যবহার করে অন্তিমাকে শ্লাভ নেতৃত্ব দেওয়ার পথ করে দেওয়া। পদ্ধতিটা ছিল এরপঃ ।

জার্মান জেলাগুলোতে চেক ধর্ম্যাজকদের পক্ষী জোর করে বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ধীরে ধীরে সেই ধর্ম যাজকদের চার্টের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দিয়ে তাদের এগিয়ে দেয়, এভাবে জেলাগুলোকে জার্মান ছাড়া করার কাজে শ্লাভ যাজকপক্ষী এবং যাজকেরা তৎপর হয়ে ওঠে ।

দুর্ভাগ্যবশত অন্তিমার জার্মান পদ্ধীরা এ পদ্ধতির বিরোধিতা করতে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। শুধু জার্মানদের তরফ থেকে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে তারা অপারগ হয়নি, চেকদের বাধা দানেও তারা ছিল অক্ষম। সুতরাং ধীরে ধীরে হলেও প্রত্যয়ের সঙ্গেই তাদের পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া হয়; একদিকে যেমন রাজনীতির জন্যে ধর্মের বিকৃতি, অপরদিকে তেমনি সফল বিরোধীতা। ছেটখাট সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে এটাই ছিল পদ্ধতি, বড় বড় সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রেও এ একই পদ্ধতি কাজ করছিল ।

হারুসবুর্গ যে জার্মান বিরোধিতা করে চলছিল যাজকদের সাহায্যে, সেই বিরোধিতাকে অধিকতর বলিষ্ঠ কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। সুতরাং জার্মান প্রতিপত্তি ধর্মীয় দিক থেকে ধীরে ধীরে কমে আসে। সাধারণের ধারণা যে ক্যাথলিক চার্ট বিপুলভাবে জার্মান জনসাধারণকে অবহেলা করে চলেছে ।

ওপর থেকে মনে হচ্ছিল যে ক্যাথলিক চার্ট জার্মানদের একেবারেই দেখছে না, বিকল্প পক্ষও এ মতবাদের প্রচারে সমর্থন করে এসেছে। এ শয়তানির শিকড় হল শ্রোয়েনারের মতে, ক্যাথলিক চার্টের নেতৃত্ব জার্মানিতে ছিল না, এবং একটা কারণই যথেষ্ট যে আমাদের লোকেরা চার্টের শক্রভাবাপন্ন হয়ে ওঠে ।

তথাকথিত সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলো পাদ প্রদীপের আড়ালে চলে গিয়েছিল। শুধু সাংস্কৃতিক সমস্যা কেন, সব সমস্যাগুলোরই এক গতি হয়েছিল। ক্যাথলিক চার্টের প্রতি প্যান-জার্মান আন্দোলনের মৌলিক অধিকার ঠেলে পেছনে ফেলে দিয়েছে ।

জর্জ শ্রোয়েনার যে কাজ ধরত তা অর্ধেক করে খেঞ্চে পড়ার মানুষ ছিল না। সে চার্টের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে নামে, কারণ তার ধারণা ছিল যে একমাত্র এ পথেই জার্মানদের রক্ষা করা সম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে রোম থেকে সরে আসার আন্দোলন জোরাদার করা হয়েছিল; কিন্তু এ পদ্ধতিতে বিরুদ্ধপক্ষের দুর্গ ধূলিসাং করা শুধু কষ্টকর নয়, অস্ত্রবও বটে। শ্রোয়েনার বিশ্বাস করত যে যদি এ আন্দোলনকে সার্থকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে এ যে জার্মানিতে দুটো বিরাট ধর্মীয় সংস্কার দুটুকরো হয়ে গেছে, তাকে রোধ করে যে বিশাল অর্তনিহিত শক্তির উৎপত্তি হবে, তার দ্বারা জার্মান সাম্রাজ্য এবং জাতিকে যে অতিশয় সম্মুক্ত করা যাবে; শুধু তাই নয়, একেবারে বিজয়ের তোরণদ্বারে নিয়ে গিয়ে হাজির করা সত্ত্ব।

কিন্তু এ ব্যাপারটার শুরু এবং শেষ, দু'দিকই ভুলে ভর্তি ছিল ।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, জার্মানদের সম্পর্কে যে কোন বিষয়ে জার্মান পদ্ধীদের প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যদের থেকে অনেক কম ছিল; বিশেষ করে চেকদের সঙ্গে বুরবার ক্ষমতা তো ওদের ছিল না বললেই চলে। একমাত্র কোন অজ্ঞ ব্যক্তিরই বোধ হয় অজ্ঞাত ছিল যে জার্মানির স্বার্থরক্ষার জন্য জার্মান পদ্ধীরা কোনরকম চেষ্টাই করেনি ।

কিন্তু এ সঙ্গে যারা একেবারে অন্ধ নয়, তারা স্বীকার করবে যে আমাদের চারিত্রিক দোষেই আমরা প্রায় ধূঃস হতে চলেছি। এ চরিত্রের জন্য আমরা আমাদের জাতিকে শুদ্ধা জানাতে কার্পণ্য করছি, জাতিকে শুদ্ধা দেখানো যেন এমন একটা জিনিস যেটা আমাদের ধরাছেঁয়ার বাইরে। চেক পদ্মীরা অবশ্য নিজেদের লোক সম্পর্কে অন্তমুখী আর নিজেদের জাত সম্পর্কে বহিশুরী। দুঃখের বিষয় আমাদের ক্ষেত্রে খুব কম করে হাজারটা বিষয়ে এ একই জিনিস দেখা যাবে।

এটা কোন রকমেই ক্যাথলিক ধর্মের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নয়; এ জিনিসের উৎপত্তি আমাদের ভেতরেই যা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সারবস্তুকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে; বিশেষ করে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে, যাদের নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমাদের সরকারি অফিসাররা জাতির পুনরুত্থানের যে চেষ্টা করেছিল তার সঙ্গে যদি তুলনা করা হয়, অন্য জাতের সরকারি অফিসাররা এসব ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই দেখাত না। অথবা, আরো স্পষ্ট ভাষায় বলা যেতে পারে, অন্য কোন জাতির ক্ষেত্রে জাতীয় উচ্চাকাঞ্চকার জন্য সামরিক অফিসারবৃন্দ একইরকমভাবে পাশে এসে দাঁড়াত না। বরং ‘প্রদেশের শাসক’ বলে তার দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়া, যা আমাদের দেশে গত পাঁচবছর হয়েছে এবং এ ধরনের পুরুষারের যোগ্য কোন যোগ্যতাই তারা দেখাত না। অথবা আমরা যদি আরেকটা উদাহরণ ধরি, ইহুদী সমস্যা সম্পর্কে দুই দৃষ্টিশীল ধর্মীয় সম্প্রদায় যে ধরনের মতবাদ পোষণ কর তা কি আজকের জাতির পক্ষে অত্যাবশ্যক, নাকি ধর্মের স্বার্থে? ইহুদী পুরোহিতদের যে কোন ব্যাপার যদি বিবেচনা করা যায়, এমনকি ইহুদী জাত সম্পর্কে সাধারণ একটা ব্যাপার—তাহলে তাদের মনোভাব এবং আমাদের গরিষ্ঠ জার্মান পদ্মীদের মতবাদে কত ফারাক; তা ক্যাথলিক বা প্রটেস্টেন্ট যাই হোক না কেন।

সমস্ত বিমূর্ত ব্যাপারেই আমরা এ একই ধরনের মতবাদে বিশ্বাসী।

‘দেশের শাসকবৃন্দ’ ‘গণতন্ত্র’, বিষ্ণুজীন শাস্ত্রিবাদ, আন্তর্জাতিক একতা ইত্যাদি ধারণাগুলো যেন দৃঢ়, প্রামাণিক হয়ে দাঁড়ায় আমাদের কাছে, এবং জাতির জন্য সত্যিকারের যা প্রয়োজনীয় সেগুলোও যেন একান্তভাবেই এ আলোতে বিচার করা হয়ে থাকে।

এ যে জাতির প্রয়োজনীয় সবকিছুকে আগের ধারণা নিয়ে দেখার মজাগত অভ্যাস আমাদের দাঁড়িয়ে যায়, যাতে সবকিছুকে আমরা বাঁকাভাবে দেখতে শুরু করি, সোজাসুজি কিছুই যেন আর নজরে আসে না। যেটা নিজেদের মতবাদেরই পরিপন্থী। শেষে পুরো ব্যাপারটাই নিজেদের কাছে ফিরে আসে। জাতির কোনরকম উন্নতির চেষ্টা করলেই অপকারি নলটা তাঁদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কারণ এ ধরনের যে কোন প্রচেষ্টাকেই শাসনের অন্তরায় নলে ধরে নেওয়া হয়। শাসনের অন্তরায় বলে যারা ভাবে, তাদের চোখে শাসন মানে সেবা নয়, তারা হল প্রামাণিক কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী, এবং সে তার নিজের দুর্দশার জন্য ক্ষমার যোগ্য। যদি কেউ একন্যায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টামাত্রও করে, তবে তারা সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ আরঞ্জ করে দেয়। যদি সে ব্যক্তি ফ্রেডারিক দ্য প্রেটও হয়। এমনকি সংসদে যারা সংসদীয় গণতন্ত্র করেছে, তারা যদি সংখ্যায় লঘিষ্ঠ এবং অক্ষমও হয়, অথবা বুদ্ধিমতার একেবারে নিচের শুরে থাকে, তবু হৈ চৈ করতে কসুর করে না। কারণ এসব নিয়মবাদীদের কাছে গণতন্ত্রের আদর্শ জাতির আদর্শের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। তার আদর্শ অনুসারে এসব অন্য সম্প্রদায়ীরা প্রত্যক্ষ নিপীড়িত হয়ে ধূঃসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেও এ তথাকথিত শাসনের সমর্থন করে

চলবে, অপরদিকে উপকারি সরকার হলেও তাকে অগ্রহ্য করবে, কারণ সেটা যে তার ধারণার ‘গণতন্ত্র’ নয়।

একই উপায়ে জার্মান শাস্তিবাদীর দল নিষ্কৃপ থাকছে যখন জাতি যন্ত্রণায় এবং উৎপীড়নে গভীর আর্তনাদ করছে। আর যখন পুরো দেশ প্রতিবাদের জন্য উন্মুখ। কিন্তু এ প্রতিবাদের অর্থ হল সামরিক শক্তি প্রয়োগ, যা হল শাস্তিবাদীদের আদর্শের বিরুদ্ধে।

আন্তর্জাতিক জার্মান সোশ্যালিস্টদের পৃথিবীর অন্য সব দেশের সহকর্মীরা একতার নামে প্রতারণা এবং লুট্ঠন করতে পারে; কিন্তু তারা সবসময়ই তাদের ভ্রাতৃবৃৎ দেখে এসেছে, এবং কখনই তাদের ফিরতি প্রতারণা বা লুট্ঠন করতে চায়নি। এমনকি নিজেদের আঘাতক্ষা পর্যন্ত করেনি। কিন্তু কেন? কারণ সে হল—জার্মান।

এ ধরনের সত্যকে হয়ত বা মেনে নেওয়া ঠিক নয়; কিন্তু কিছু যদি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে তা আমাদের প্রথমে রোগটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা উচিত।

যে ব্যাপারটা আমি ইইমাত্র ব্যক্ত করলাম, সেটা প্রমাণ করে যে জার্মান পদ্ধীদের একাংশ কর্ত দুর্বলভাবে জার্মানদের স্বার্থ দেখত।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে এ দৃঢ়তা এবং স্থিরতার অভাবের কারণ হল আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি। আমাদের যুবকদের জার্মান জাতিকে উপযুক্ত করার চেয়ে এ শিক্ষার উদ্দেশ্য যেন ওদের আদর্শের কাছে অসহায় করে তোলে। আদর্শ যেন একটা প্রতিমূর্তি।

যে শিক্ষা পদ্ধতি তাদের কতগুলো ধারণার ভঙ্গ করে তোলে, যেমন গণতন্ত্র, আন্তর্জাতিক সোশ্যালিজম, শাস্তিবাদী ইত্যাদি ধ্যান-ধারণাগুলো বাইরে থেকে তাদের এমনভাবে গড়ে যে জীবনের মূল উদ্দেশ্য যেন এ ধারণাগুলোকেই রূপ দেওয়া। কিন্তু অপরদিকে নিজের জাত জার্মানদের সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই একটা অনীহার ভাব গড়ে ওঠে। শাস্তিবাদী যারা জার্মান তারা দেহমন ছোটবেলা থেকেই গোড়া আদর্শের কাছে বিকিয়ে দিয়ে বসে থাকে; যখনই বিপদজনক কোন অবস্থার মুখোযুবি জাতি এসে দাঁড়ায়, তখন এরা বিচার করতে বসে কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয়। এমনকি এ বিপদ যদি মারাত্মক এবং প্রায় ধর্মসের কাছেও জাতিকে নিয়ে যায়, তবু সে নিজের লোকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংগ্রামে নামবে না; এমনকি নিজেদের আঘাতক্ষার প্রশঞ্চেও নয়।

বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের ওপর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে তার আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যায়। যখন বৎশ পরম্পরায় জার্মান আদর্শ হয়, প্রটেস্টান্ট ধর্মতের লোকেরা তাদের আদর্শকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের বেলায় এরাই সবচেয়ে আগে সরে দাঁড়ায়। কারণ এটা ধর্মের আদর্শ বা বৎশ পরম্পরায় কোন ব্যাপার নয়,—কোন একটা কারণ দেখিয়ে তা বাতিল করে দেবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রটেস্টান্টো নৈতিক সাধুতা বা জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির ভাষা বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নিজেদের রক্ষা করার জন্য মনোপাল সঁপে দেবে; কারণ এগুলোই যে ওদের ধর্মীয় আদর্শ যার জন্য তারা প্রতিজ্ঞাবন্ধ। কিন্তু এ প্রটেস্টান্টোই জাতি যখন শক্তির আক্রমণের মুখোযুবি, তা থেকে উদ্বারের প্রতিটি প্রচেষ্টাকে তারা প্রাণপণে বাধা দেবে। কারণ ইহুদীদের প্রতি এদের ধারণা দৃঢ় এবং গোড়াভাবে স্থির। যদিও এটাই হল প্রথম সমস্যা যার সমাধানের প্রয়োজন, এবং জার্মান জাতির এ চৰম অধিঃপতনের থেকে পুনরুত্থানের পথে টেনে ওঠানো এ সমস্যার সমাধান ছাড়া অসম্ভব।

ভিয়েনার প্রবাসী দিনগুলোয় আমার প্রচুর অবসর এবং সুযোগ ছিল কোনরকম সংক্ষার ছাড়াই সমস্যাটাকে বিশ্লেষণ করার এবং প্রত্যহ যে হাজার হাজার লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হত, তার থেকে আমার সমাধান যে নির্ভুল এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলাম।

এ আলোতেই যেখানে অনেক জাতির লোক এক বিন্দুতে এসে মিলেছে, তাদের কাছে এটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট যে জার্মান শক্তিবাদীর দল তাদের জাতির স্বার্থের ওপরই দেখেছে। উপরন্তু আমি দেখেছি জার্মান সোশ্যালিস্টরা একমাত্র আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং জাতির স্বার্থের ব্যাপারে কোন রকম দাবি দাওয়াই তাদের নেই; একমাত্র অন্য দেশের সহকর্মীদের কাছে বিলাপ করা ছাড়া। কেউ কিন্তু চেক বা পোলিশদের চরিত্রে এ কলঙ্ক আরোপ করতে পারবে না। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, চরিত্রের এ কলঙ্কময় দিকটার জন্য দায়ী সেই দিনের মতবাদ। পুরোপুরি দায়িত্ব হল শিক্ষা ব্যবস্থার; যেটা আমাদের জাতীয় আদর্শকে কখনই গড়তে দেয়নি।

সুতরাং প্যান-জার্মান আন্দোলনের নেতাদের ক্যাথলিক ধর্মতের বিরোধিতা আমার মতে পুরোপুরি অসমর্থনীয়।

একমাত্র এ শহতানির সমাধানের উপায় হল, জার্মান যুবকদের ছেটবেলা থেকে মনটাকে বিষয়ে দেওয়ার পরিবর্তে কি করে স্বার্থরক্ষা করতে হয়, সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। যখন তারা অত্যন্ত ছোট, তখন থেকেই প্রত্যেকটা বস্তুকে ওপর থেকে দেখার প্রবণতা তাদের ভেতরে প্রবেশ করে, যেটা ভবিষ্যতে আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে ফেলে। এর ফলে আয়ারল্যান্ড, পোল্যান্ড কিংবা ফ্রান্সের মত ক্যাথলিকরা প্রথমে এবং সর্বাপ্রে হবে জার্মান। কিন্তু এ যে আগে থেকে শিক্ষা তা সরকারের একটা মৌলিক পরিবর্তন আনতে সমর্থ হবে।

আমার এ মতবাদের সবচেয়ে জোরাল সমর্থন হল, ইতিহাসের সর্বিক্ষণে যখন শেষবারের মত ইতিহাসের বিচারশালায় আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল, সে ছিল জীবন ঘরণের সৎভায়।

যতদিন পর্যন্ত ওপরের নেতৃত্বের অভাব ছিল না, জনসাধারণ তাদের কর্তব্য যতটা সম্ভব বেশি পরিমাণেই পালন করেছে। তা সে প্রটেক্টেন্ট ধর্ম্যাজক বা ক্যাথলিক পন্থী যে-ই হোক না কেন, চেষ্টা করেছে আগ্রান তা তুলে ধরতে শুধু বাইরের জীবনেই নয়, দৈনন্দিন জীবনেও। বিশেষ করে উৎসাহের প্রথম জোয়ারের সময়। উভয় ধর্মই পবিত্র জার্মান সাম্রাজ্যকে ভাগাভাগি করা হয়নি, যা রক্ষা এবং ভবিষ্যত সমৃদ্ধির জন্য তারা ঈশ্বরের কাছে সতত প্রার্থনা করেছে।

অস্ত্রিয়ার প্যান-জার্মান আন্দোলনের নেতাদের নিজেদেরই একটা প্রশ্ন করা উচিত, যতদিন পর্যন্ত তাদের বিশ্বাস ক্যাথলিক ধর্মে আছে, ততদিন পর্যন্ত অস্ত্রিয়াতে এ জার্মানিদের খাকতে দেওয়া উচিত কিনা? যদি এ প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হয়, তবে রাজনৈতিক দল হিসেবে এর ধর্মীয় দলাদলিতে জড়িয়ে পড়েটা উচিত হয়নি। কিন্তু উত্তরটা যদি নেতৃত্বাচক হয়, তবে এদের ধর্মীয় সংক্ষারে নামা উচিত ছিল; রাজনৈতিক আন্দোলনে নয়।

যারা বিশ্বাস করে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় সংক্ষার সম্ভব, তাদের শুধু ধর্ম নয়, কোন মতবাদে বিশ্বাস এবং বাস্তবে চার্টের কি প্রতিক্রিয়া—এসব সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই।

কোন মানুষের পক্ষে দুঃজন প্রভুকে সেবা করা সত্ত্ব নয় এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি যে ধর্মের ভিত্তিভূমি উপরে ফেরার চেয়ে কোন দেশের সরকার উপরে ফেলা অনেক সহজ। সত্যি বলতে কি, একটা দলের পক্ষে এটা বিশেষ কিছু কাজ নয়।

এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি থাটে না। বরং বলা যায় আক্রমণটা করা হয়েছিল আত্মরক্ষার খতিরে, কোন বহিরাক্রমণ রূপাবার জন্য নয়।

সন্দেহ নেই যে সব সময়েই কিছুসংখ্যক নীতিজ্ঞান শূন্য দুরাঘা থাকে, যারা রাজনীতির পটভূমি হিসেবে ব্যবহারের জন্য ধর্মকে টেনে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসে। প্রায় সব সময়েই এদের মনে ধর্ম এবং রাজনীতি নিয়ে ব্যবসা করার ধান্দা থাকে। কিন্তু এরজন্য চার্চকে দোষারোপ করা অন্যায়; কারণ সর্বদাই এ সংসারে কিছু দুরাঘা থাকে, তারা যারই সংস্পর্শে আসে তাকেই প্রতারণা করে। তার জন্য ধর্ম বা কোন ধার্মিক সম্প্রদায়কে দোষী বা দায়ী করা যায় না।

এ সংসদীয় কুঁড়ে এবং প্রবন্ধকদের কাছে কোন একটা বলির ছাগল খোঝার চেয়ে সুস্থান্ত বস্তু আর কিছু নেই; অবশ্যই ঘটনা ঘটে যাবার পর। যে মুহূর্তে ধর্ম বা ধর্মীয় কোন সম্প্রদায়কে এর জন্য আক্রমণ করা হয়, সেই মুহূর্তে সে এবং তার প্রষ্ঠ দল হৈহস্ত্রা চিত্কার জুড়ে দিয়ে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আর্কর্ষণ করে এবং বোঝাতে চেষ্টা করে সে এবং তার সৃষ্টি গোলমালই একমাত্র চার্চ এবং ধর্মকে রক্ষা করেছে। জনসাধারণ স্বভাবতই বোকা এবং শৃঙ্খলাক্ষিণি না থাকায় মনে করতে পারে না যে এ গোলমালের পেছনে চাবিকাটি কে নাড়েছে এবং কার জন্য এ হাঙ্গামা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গোলমালটা কে শুরু করেছিল ভুলে যাওয়াতে এ প্রবন্ধকগুলো সহজে রেহাই পেয়ে যায়।

ধূর্তেরা সব সময়ই জানে তার কুকাজের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং যখন সে দেখে সৎ অর্থে কৌশলহীন প্রতিপক্ষ হেরে গেছে, তখন সে জামার অভিন্ন গুটিয়ে নিয়ে আরো বেশি হাসতে শুরু করে এবং তার প্রতিপক্ষ একসময় জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে জনজীবনের কোন ব্যাপারে অংশগ্রহণের থেকে অবসর নেয়।

কোন একক বাস্তির কুকর্মের জন্য চার্চ বা ধর্মকে দায়ী করা আরেকটা দৃষ্টিকোণ থেকেও অন্যায়। কেউ যদি দলের বিশালভুক্ত তুলনা করে, যেটা সাদা চোখে সবাই দেখতে সক্ষম, তাহলে মানব চরিত্রের সাধারণ দুর্বলতাগুলো মেনে নিয়েও আমাদের স্বীকার করা উচিত যে খারাপের চেয়ে ভালুর দিকের পালাই এখানে বেশি তারী। পাত্রীদের মধ্যেও কয়েকজন থাকতে পারে যারা তাদের পরিত্র আহ্বান রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণের কাজে লাগায়। দুর্ভাগ্যবশত কিছু ধর্ম্যাজক ভুলে যায় এ রাজনৈতিক দাঙায় তাদের আরো বেশি বিশ্বস্ত যোদ্ধা হওয়া উচিত। মিথ্যা এবং দুর্দৰ্শনের সাহায্যকারী হিসেবে কোন কাজ করা তাদের পক্ষে অন্যায়। তবে প্রতিটি অন্যায়কারীর তুলনায় আরো হাজার ধর্ম্যাজক আছে, যারা এ পংকিল সমন্বয়ের মধ্যে ছোট ছোট দ্বিপের মত মাথা উঁচু করে নিজেদের ধর্মীয় কাজ অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে।

আমার পক্ষে চার্চকে দোষী করা সত্ত্ব নয়, তার স্বপক্ষে যথেষ্ট কারণও নেই। যদি কিছু প্রষ্ঠ ব্যক্তি পাত্রীর পোশাক পরে নৈতিক আইন কানুনের বিরুদ্ধে কোনকিছু করে, তবু মুহূর্তের জন্যও আমি চার্চকে দোষারোপ করব না। চার্চের অগুষ্ঠ সভ্যদের মধ্যে কয়েকজন হয়ত বা তাদের স্বদেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। কারণ এ যুগে তো সেটা খুব সাধারণ

ব্যাপার। বিশেষ করে আমাদের যুগে ভোলা উচিত নয় যে গ্রীক বিশ্বাসঘাতক এফিলটেসের সময়েও হাজার লোক বর্তমান ছিল যাদের হন্দয়ে তাদের দ্বন্দ্বের স্বাধীনে সুখের সূর্য মুখ বাড়াবে, তখন এরাই জাতির মুকুট হিসেবে বিবেচিত হবে।

এখানে যদি এ প্রশ্ন কেউ তোলে যে আমরা দৈনন্দিন ছেট ছেট সমস্যাগুলোর আলোচনা করছি না, কিন্তু ধর্মের ব্যাখ্যা করে চলেছি, তবে তার একমাত্র উত্তর হল:

তুমি কি মনে কর সময় তোমাকে পৃথিবীতে সত্ত্ব স্থাপনের জন্য আহ্বান করেছে? তাই যদি হয়, তবে তাই কর। কিন্তু সে কাজ প্রত্যক্ষভাবে করার মত সাহস তোমার থাকা চাই এবং কোন রাজনৈতিক দলকে মুখবন্ধ হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এ উপায়ে তুমি তোমার বৃত্তিকেই ত্যাগ করবে। বর্তমানে যার অস্তিত্ব আছে তাকে আরো ভাল কিন্তু করা উচিত যা ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে।

যদি তোমার সে রকম সাহস না থাকে বা এর পরিবর্তে সঠিক জিনিসটা কি হবে জানা না থাকে, তবে সেটাকে আগের মতই থাকতে দাও। নাড়াচাড়া করাটা ঠিক হবে না। কিন্তু যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, রাজনৈতিক দলের স্বার্থে ঘোরাপথে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে যেও না, যদি তোমার মুখোশ খুলে সংগ্রাম করার মত সংসাহস না থাকে।

রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্মের ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকাবই নেই, যদি না তার সঙ্গে জাতির স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত থাকে। কারণ তা সম্পূর্ণ জাতিকে সংক্ষতি, নেতৃত্বিক প্রভৃতি সবদিক থেকে টেনে নিচে নামিয়ে নিয়ে যাবে।

যদি কোন উচ্চ পদস্থ যাজক ধর্মীয় উৎসব বা কৃশিক্ষা ব্যবহার করে যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী তবু তার প্রতিপক্ষের সেই রাস্তাতে যাওয়া উচিত নয় বা একই অঙ্গে যুদ্ধ করাটা ও ঠিক হবে না।

কোন রাজনৈতিক নেতার কাছে যদি ধর্মীয় অনুশাসন এবং তার প্রচার পরিব্রত এবং অলজনীয় বলে বিবেচিত হয়, তবে তাকে কোনরকমেই রাজনৈতিক নেতা বলা চালে না। সে হল ধর্ম সংক্ষারক। যদি অবশ্য তার ধর্ম সংক্ষারের জন্য প্রয়োজনীয় গুণগুলো থাকে।

প্যান-জার্মান আন্দোলন এবং তাদের রোমের সঙ্গে বিরোধ নিয়ে আমি স্থির নিশ্চিত যে, বিশেষ করে শেষের দিকে প্যান-জার্মান আন্দোলনকারীরা সামাজিক সমন্যাগুলো থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার ফলে জনসাধারণের সমর্থনও হারিয়ে ফেলে, যার হল এ ধরনের সংঘামের অতি নির্ভরযোগ্য যোদ্ধা। সংসদে প্রবেশ করে প্যান-জার্মান আন্দোলনকারীরা নিজেদের তেতরের শক্তিটাকে হারায়, যার উৎসস্থল হল জনসাধারণ এবং সংসদের প্রারজন্মের বোঝাটাকেও তাদের ঘাড়ে এসে পড়ে।

* হেরোডটিস্ তার দেখায় গ্রীক বিশ্বাসঘাতক এফিলটেসের বর্ণনা করেছেন। থার্মোপাইলের যুদ্ধে প্রায় প্রারজিত পারস্যরাজ জেরেক্সের কাছে গিয়ে এফিলটেস্ প্রস্তাৱ করে যে তাকে যদি যুদ্ধ দেওয়া হয়, তবে সে গ্রীক দেশে ঢোকার গুপ্তপথ দেখিয়ে দেবে। প্রাণ্যদোগের পৰ পাহাড়ের গিরিপথ দিয়ে একদল পারস্যদেশীয় সৈন্যকে জেনারেল হাইডেরলেসের অধীনে পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু গ্রীক সৈন্যরা, স্পার্টার রাজা লিওনিডাসের নেতৃত্বে দুঘূরী পারস্য অভিযানের মোকাবিলা সেই সংক্রিন গিরিপথে করে। সেই সংগ্রামে লিওনিডাসের মৃত্যু হয়।

চার্চের সঙ্গে তাদের বেষাবেষির দরুন, নিচু এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসংখ্য জনসাধারণের আস্থা তারা হারিয়ে ফেলেন; ওপরের স্তরেরও অনেকে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে— যাদের অনেককেই জাতির মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য করা চলে। সুতরাং অন্তিমার সংস্কৃতি আন্দোলনের হিসেবের খাতায় লাভের পরিবর্তে ঢাঢ়াই পড়ে।

যদিও তারা দশ লাখ লোককে চার্চের আওতা থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল, তবু তাতে পরবর্তীদের কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ চার্চের পক্ষে হারানো মেষগুলোর জন্য চোখের পানি ফেলার কোন মানে হয় না। এরা হৃদয় দিয়ে চার্চকে কোনদিন ভালবাসেনি। এ নতুন সংস্কারের সঙ্গে মহাসংস্কারের পার্থক্য এ যে মহাসংস্কার কালের একটা বিখ্যাত ঘটনা, যখন চার্চ ধর্মের জন্য তার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারায়। কিন্তু এ নতুন সংস্কারে তারাই একমাত্র চার্চ ছেড়ে বেরিয়ে আসে যাদের সঙ্গে চার্চের যোগাযোগ আগেও নিবিড় ছিল না। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে শুধু হাস্যাস্পদ ঘটনাই বলা চলে না, শোচনীয়ও বটে। আরো একবার জার্মান জাতির পক্ষে প্রতিশ্রুতিময় একটা রাজনৈতিক আন্দোলন যা ব্যর্থ হয়। কারণ এটাকে কৃত বাস্তবের প্রতি অবিচলিত অনুরূপ রেখে পরিচালিত হয়নি। তাই এমন একটা জায়গায় আন্দোলনের স্রোত গিয়ে পড়ে যেখানে আপনা থেকেই তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে বাধ্য।

যদি বিশাল জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারত তবে প্যান-জার্মান আন্দোলন নিচয়ই এ ভূল করত না। মেতাদের যদি এটা জানা থাকত তবে একমাত্র মনস্তত্ত্বিক কারণেই জনসাধারণের সামনে একটার বেশি দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হতে দিত না, কারণ এটা তাদের সংগ্রাম করার শক্তিটাকেই টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল। তাদের উচিত ছিল পূর্ণশক্তি নিয়ে একক প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে দাঁড়ানো। একটা রাজনৈতিক দলের নীতির পক্ষে এটা বিপজ্জনক, যা কিনা এমন একজন মানুষের দ্বারা পরিচালিত যে তার আঙুল প্রতিটি মটর দানার ওপর রাখতে চায়, কিন্তু সহজ একটা ব্যঙ্গন রান্না করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়।

বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের বিপক্ষে কথা বলা যেতে পারে এমন অনেক কিছুই আছে, তবু রাজনৈতিক মেতাদের ভূলে যাওয়া উচিত নয় যে ইতিহাসের শিক্ষা কোন নির্ভেজাল রাজনৈতিক দল এ পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে ধর্মের সংস্কার করতে সক্ষম হয়নি। কেউ ইতিহাস পড়ে না শিক্ষাকে অবিশ্বাস করতে বা ভূলে যাওয়ার জন্য, যখন সত্ত্বিকারের সময় উপস্থিত হয় তা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য। এ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়েছিল এ ধারণা করাটা ভূল হবে, যেখানে ইতিহাসের অনন্তকালের সত্যটা ঠিক খাটে না। কেউ ইতিহাসের শিক্ষা নেয় বর্তমানে সেটা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে, যে সেটা করে না, তার কোন যোগাতাই নেই। বাস্তবে তার জন তা'হলে ব্যাপারটায় ভাসা ভাসা অথবা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যা হয়ে থাকে, সে একটি দাঙ্গিক কিন্তু সহজে প্রতারিত হয় এমন নির্বোধ ব্যক্তি— যার সৎ উদ্দেশ্য তার বাস্তব ব্যাপারে অক্ষমতার পরিপূরক নয়।

নেতৃত্বের কৌশল, যা নাকি বিরাট বিরাট নেতৃত্বার যুগে যুগে করে এসেছে, তা হল সমন্ত জনসাধারণের মনোযোগ একত্রিত করেছে মাত্র একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে এবং সর্তর্কতা নিয়েছে যাতে কোন রকমেই সেই মনোযোগী জনসাধারণ ভেঙে টুকরো টুকরো না হয়। যত বেশি জনসাধারণের যুদ্ধের শক্তি একটা দৃশ্যের ওপর পড়বে, তত বেশি নবাগত সেই আন্দোলনে যোগ দেবে তার চৌম্বক শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে যার দ্বারা সেই আন্দোলনের তীব্রতা

অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে। প্রতিভাধর নেতাদের এমন ক্ষমতা থাকা উচিত যাতে নাকি তারা অনেক বিরক্ত মতাবলম্বীদেরও একই ধরনের বিরোধিতা বলে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারে; দুর্বল এবং টলমলে চরিত্রের নেতাদের নিজেদের কাজ সম্পর্কে সন্তুষ্ট মনোভাব নিজেদের ভেতরে গড়ে উঠবে, যদি তাদের অনেকগুলো বিভিন্ন ধরনের শক্তির সঙ্গে যোকাবিলা করতে হয়।

যে মুহূর্তে অস্ত্রিজ জনসাধারণ দেখতে পাবে তাদের প্রতিপক্ষ রকমারী দলের সংমিশ্রণে তৈরি, তখনই তারা মনে করবে যে এটা কি রকম হল? আমরা এবং আমাদের আন্দোলনই একমাত্র সঠিক। আর প্রতিপক্ষের মত এবং আদর্শ তুল।

এ ধরনের অনুভূতি প্রথমেই তাদের সংগ্রাম করার শক্তিটাকে পঙ্ক করে দেবে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের শক্তি একই কেন্দ্র থেকে ছিটকে বেরিয়েছে। তাদের এক জায়গায় আটকে একটা প্রতিপক্ষের সৃষ্টি করতে হবে, যাতে সংগ্রামরত জনসাধারণ তাদের সামনে একজন প্রতিপক্ষকেই দেখতে পায়; যার বিরুদ্ধে তাদের লড়তে হবে। এ ধরনের একতা তাদের নিজেদের বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করবে এবং প্রতিপক্ষের প্রতি বিরোধিতার অনুভূতিটা চরমে নিয়ে যাবে।

প্যান-জার্মান আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী হল এর নেতারা, যারা এ সভ্যের রহস্যটা অনুধাবন করতে পারেনি। তারা তাদের লক্ষ্যটাকে স্পষ্ট দেখেছিল এবং ভেবেছিল তাদের নীতিটাই সঠিক; কিন্তু এ ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা তুল বাস্তায় গিয়ে পড়েছিল। এদের কার্যকলাপের সঙ্গে তুলনা করা চলে সেই আলপন্ পর্বতে আরোহণকারী, যে চূড়ার দিকেই দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে পথ এগোছিল, যার দৃঢ়তা এবং শক্তি ছিল প্রেষ্ঠাদের তুঙ্গে, কিন্তু পায়ের নিচেকার রাস্তাটাকেই সে দেখেনি। তার দৃষ্টি উদ্দেশ্যের প্রতি এতই নিবন্ধ ছিল যে সে আরোহণের পথটা নিয়ে চিন্তা করেনি বা তাকিয়েও দেখেনি; তাই শেষে তাকে বাধ্য হয়ে পরাজয় বরণ করে নিতে হয়েছে।

প্যান-জার্মান পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের লক্ষ্যে পৌছবার জন্য যে রাস্তা বেছে নিয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের নির্বাচিত রাস্তা শীঘ্রতার। কিন্তু এদের উদ্দেশ্যে পৌছবার জন্যে ধ্যান-ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল না। যেসব কারণে প্যান-জার্মান আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল, সেই সব নীতি সম্পর্কে খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট পার্টি ছিল সঠিক এবং নিয়মতাত্ত্বিক।

তারা জনসাধারণের গুরুতু ঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিল এবং প্রথম থেকেই আন্দোলনের সামাজিক চরিত্রটার দিকে নজর দেওয়ায় বিপুল জনতার জনপ্রিয়তা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং শ্রমশিল্পীদের প্রতি আবেদন রাখায় তাদের সমর্থন পেয়েছিল—যারা বিশ্বাসী, ধৈর্যশীল এবং আঝোৎসর্গকারী। খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতারা প্রথম থেকেই অতি সতর্কভাবে ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হন্দ সম্পর্ক বজায়

ঠাক্য এ বিশাল প্রতিষ্ঠানের পুরো সমর্থন পেয়েছিল। এ আন্দোলনের নেতারা বিরাটভাবে প্রচার ব্যবস্থায় বিশ্বাস করত এবং এরা প্রকৃতই ধার্মিক ছিল। যে কারণে বিশাল জনতার মধ্যে আধ্যাত্মিক একটা সহজাত প্রেরণা জাগাতে পেরে এরা তাদের সমর্থন লাভ করে।

এ পার্টির নিজের লক্ষ্যে পৌছতে না পারার প্রধান দুটো কারণ ছিল, যে কারণদ্বয়ের জন্যে তাদের পক্ষে অস্ত্রিয়াকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

খ্রিস্টান সোশ্যালিস্টদের ইহুদী বিদ্বেষের পটভূমি ধর্মীয় ভিত্তিতে ছিল, জাতি বিদ্বেষের আদর্শের ওপর নয়; এ ভুল থেকেই দ্বিতীয় ভূলের জন্ম হয়েছিল।

খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের ধারণা ছিল যদি অন্তিয়াকে রক্ষা করতে হয় তবে তাদের ধ্যান-ধারণা জাতিগত ইওয়া উচিত হবে না। কারণ তাদের মনে হয়েছিল এ ধরনের নীতি নিলে অন্তিয়া টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। পার্টির সর্বোচ্চ নেতার ধারণা ছিল যে ডিয়েনা টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে এমন কোন ব্যাপার বা চিন্তাধারা স্থানে পরিহার করা উচিত। এবং যে সব চিন্তাধারা রকমারী জাতিকে এক সুতোয় বাঁধতে পারবে, একমাত্র তাকেই উৎসাহ দেওয়া উচিত।

সে সময় ভিয়েনার পরদেশীদের মধুচক্র ছিল, বিশেষ করে চেক্সের। এদের জার্মান বিরোধী নয় এমন কোন দলে তালিকাভুক্ত করতে সবিশেষ ধৈর্যের প্রয়োজন ছিল। অন্তিয়াকে বাঁচাতে হলে ওদের অপরিহার্যতাকে স্বীকার করে নিতেই হয়। সুতরাং ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের সমর্থন পাওয়ার সবরকম চেষ্টাই করা হয়েছিল, যাদের বেশির ভাগই ছিল চেক। যাঁরা ম্যানচেস্টার স্কুলের উদার আদর্শের তথাকথিত যোদ্ধা, তাদের বিশ্বাস এ ধরনের মতবাদের সাহায্যে তারা ইহুদীদের বিরোধিতা করতে সক্ষম হবে। কারণ ধর্মীয় অনুসন্ধানের জালে জড়িয়ে পড়ে অন্য ধর্মের লোকেরা একত্রিত হবে, যা পুরনো অন্তিয়ার লোকসংখ্যার সমস্থিক।

এটা পরিকার যে এ ধরনের ইহুদী বিদ্বেষ ইহুদীদের খুব একটা ভাবিয়ে ভুলতে পারেন। কারণ এটা পরিকার ধর্মীয় ভিত্তিভূমিতে স্থাপিত। খুব বেশি খারাপ হলে তো দরকার মাত্র কয়েক ফোটা পবিত্র পানির, যা ছিটিয়ে দিলেই সমস্যা শেষ। তার পরেই নিশ্চিত মনে যেমন ব্যবসাও করা যাবে আর তেমনি ইহুদী জাতীয়তাও বজায় রাখা যাবে।

এসব ভাসা কারণে সম্পূর্ণ সমস্যাটাকে সমাধান করার ব্যাপারে যুক্তিসংগতভাবে অসম্ভব ছিল। তার ফলে বহুলোকই ইহুদী বিদ্বেষী ব্যাপারটা পুরোপুরি অনুধাবন করতে না পেরে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণই করে না। আদর্শের চৌম্বক শক্তি এভাবে নিতান্ত একটা সংকীর্ণমান দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কারণ নেতারা অনুভূতির আরো উচ্চতরে আরোহণে অসমর্থ হয়ে পড়ে এবং তার ভিত্তিভূমি সঠিক যুক্তিসংগতভাবে স্থির করা হয় না। আদর্শগতভাবে বৃদ্ধিমানেরা তাই এ নীতিকে সমর্থনও করে না। সমস্ত আন্দোলনটাকেই যেন মনে হচ্ছিল ইহুদীদের ধর্মান্তরকরণের একটা নতুন প্রচেষ্টা। অপরদিকে মনে হচ্ছিল এটাকে দলবদ্ধভাবে এ ধরনের আন্দোলনের আরো একটা প্রচেষ্টা। এভাবে সমগ্র সংগ্রামটাই তার আধ্যাত্মিক এবং ভক্তিসম্মত উৎপাদক চরিত্রটা হারিয়ে বসে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, কিছু মানুষের চোখে, যাদের কোন রকমেই অপদার্থ বলা যায় না, পুরো আন্দোলনটাকেই আদর্শব্রহ্ম এবং তিরকারের যোগ্য বলে মনে হয়। সুতরাং সমস্ত মানব জাতির পক্ষে ভৌমণ প্রয়োজনীয় কোন সমস্যা বর্তমান, যার ওপরে ইহুদী ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করছে—এ বিশ্বাস মানুষের মধ্যে জাগাতে ব্যর্থ হয়।

গয়ংগঙ্গভাবে নিয়ে পুরো সমস্যাটাকে সমাধানের প্রচেষ্টা খ্রিস্টান সোশ্যালিস্টদের বিদ্বেষী নীতিকে ভোংতা করে দেয়।

এ আন্দোলনের বাইরের রূপটাই ছিল একমাত্র ইহুদী বিদ্বেষী। এবং এর ফলাফল অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায়, তার চেয়ে সম্ভবত ইহুদী বিদ্বেষী ভাব আন্দোলনে না থাকলেই তাল ছিল।

কারণ এ ভুল ধারণা মানুষের মধ্যেও একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে শক্তিকে কান ধরে টানা হয়েছে; কিন্তু সত্যিকারের অবস্থা দেখতে গেলে দেখা যাবে, শক্তিকে কান ধরে টানার পরিবর্তে জনসাধারণকেই নাকে খত্ত দিতে হয়েছে।

ইহুদীরা এ ইহুদী বিদ্যৈ পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয় এবং দেখে যে এ ইহুদী বিদ্যৈ পরিবেশই তাদের পক্ষে লাজনক। এ পরিবেশের অবলুপ্তি তাদের ক্ষতি ডেকে আনবে।

পুরো আন্দোলনটাই দেশের কাছে, যা অসদৃশ্য জাতির সমরয়ে গঠিত আরও বেশি আঘোৎসর্গ কামনা করে, বিশেষ করে জার্মানদের অঙ্গীরাপে বেশি প্রয়োজন ছিল।

এমনকি ত্যেঝাতেও কেউ জাতীয়তাবাদী হতে সাহস করত না পায়ের তলায় মাটি সরে যাবার ভয়ে। হাবুস্বুর্গ সরকারের ধারণা ছিল জাতীয়তাবাদী প্রশঁটা চুপচাপ এড়িয়ে যেতে পারলেই বোধহয় হাবুস্বুর্গ সরকার রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু এ নীতি সরকারের ধৰ্মস ডেকে নিয়ে আসে এবং একই নীতি প্রিস্টন সোশ্যালিজমের মৃত্যুও ঘনিয়ে আনে। এভাবে আন্দোলনটা যার থেকে একটা রাজনৈতিক দল তার প্রয়োজনীয় এগিয়ে যাবার শক্তি আহরণ করবে, সেই একমাত্র উৎসটাকেই হারিয়ে ফেলে।

এ বছরগুলোতে আমি উভয় আন্দোলনকেই সতর্কভাবে অনুধাবন করি। কেমন করে তারা উন্নতির ধাপে ধাপে এগোচ্ছিল। একটা আন্দোলনের সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগ ছিল, আর আরেকটা সঙ্গে এ বিশৃঙ্খল মানুষটার প্রতি আমার শুদ্ধা ছিল, যাকে আমার তখন মনে হয়েছিল অঙ্গীয়ায় বসবাসকারী জার্মানদের শ্রেষ্ঠ প্রতীক।

যখন মৃত বৃগার মাস্টার বা মেয়ারের শব্দ্যাত্মার মিছিল্টা সিটি হল থেকে রিঙ্গ স্ট্রাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, হাজার হাজার লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে অধিও দেখেছিলাম সে পবিত্র নীরব শব্দ্যাত্মার মিছিলকে চলে যেতে। পুরো ব্যাপারটা যেন আমার মনটাকে সজোরে নাড়া দিয়ে যায় এবং আমার সহজত প্রবৃত্তি যেন বলে দেয়, এ মানুষটার সমস্ত কাজই পওশ্যম হয়েছে। কারণ একটা অনন্মনীয় দানব ভাগ্য এ সরকারকে টেনে নিয়ে চলেছে পতনের দিকে। যদি ডষ্টের লুইগের জার্মানিতে বসবাস করত, তবে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে নেতৃত্বের পদ তাকে দেওয়া হত; এটা তারই দুর্ভাগ্য যে এমন একটা দেশে তাকে কাটাতে হয়েছে যেখানে তার করার কিছুই ছিল না।

তার মৃত্যুর পরেই বালাকান দেশসমূহে আগুন জ্বলে উঠেছিল। এবং মাসের পর মাস তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেদিক থেকে তার ভাগ্য খারাপ বলতেই হবে, কারণ যার জন্য সারাজীবন সে সংগ্রাম করে গেছে তা শেষ পর্যন্ত সে দেখতে পায়নি।

আমি বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হই কি কারণে একটা আন্দোলন এরকমভাবে ব্যর্থ হয়ে গিয়ে ধৰ্মসের পথে এগিয়ে গেল। এসব অনুসন্ধানের ফলাফলে আমার দৃঢ় ধারণা হয় যে পুরনো অঙ্গীয়াকে একত্তি করতে না পারার দরুন উভয় দলই বিরাট ভুল করেছিল।

প্যান-জার্মান দল তাদের আন্দোলনের লক্ষ্যে পৌছবার জন্য জাতিগত আদর্শ ঠিকই বেছে নিয়েছিল, সেটা হল জার্মান জাতির পুনরুত্থান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যে রাস্তাটা ওরা লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে নির্বাচিত করেছিল সেটা সঠিক হয়নি। এটা হল জাতীয়তাবাদী, কিন্তু ওরা সামাজিক সমস্যাগুলোর দিকে খুব অল্পই নজর দিয়েছিল, এবং সেই কারণেই জনতার সমর্থনও পায়নি। কিন্তু সত্যটাকে বিচার করতে গিয়ে ওরা তুল করেছিল, যার জন্য তুল পদ্ধতিতে ওদের একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে।

খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট আন্দোলন অনেকগুলোর মধ্যে জার্মানদের পুনরুত্থানের ভূল ধারণা ছিল, কিন্তু ওদের বুদ্ধিমত্তা এবং দলীয় আদর্শের লক্ষ্যে পৌছবার জন্য নির্বাচিত পথটা বাছা ভাগ্যক্রমে সঠিক হয়েছিল। খ্রিস্টান সোশ্যালিস্টরা সামাজিক সমস্যাগুলোর চরিত্র ঠিকমত অনুধাবন করতে পেরেছিল; কিন্তু ইহুদীদের সঙ্গে সংঘামের পথটা তাদের ভূল ছিল এবং তারা জাতীয়তাবাদীকে রাজনৈতিক শক্তির উৎস হিসেবে মূল্য দিতে সম্পূর্ণ ভূল করেছিল।

যদি খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট দল তাদের ধূর্ত বিচার বুদ্ধির সঙ্গে যা তারা জনপ্রিয় জনতা সম্পর্কে নিয়েছিল, জাতিগত সমস্যা সম্পর্কেও সেই বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করত—যেটা প্যান-জার্মান আন্দোলনকারীরা ঠিক মত ধরতে পেরেছিল,—এবং এ পার্টি যদি সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী হত; অথবা যদি প্যান-জার্মান আন্দোলনের নেতারা অপরদিকে ইহুদীদের এবং জাতীয়তাবাদী সম্পর্কে সঠিক ধারণার সঙ্গে খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট দলের মত বাস্তববাদী হত—বিশেষ করে সামাজিক দিক থেকে, তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি আন্দোলন এমন ক্লাপ নিত যা জার্মানদের গত্যটাকে সফলভাবে ঘূরিয়ে দিত।

তৎকালীন দলগুলোর কারোর মধ্যে আমার মতবাদের মিল দেখতে পাইনি, আর সে কারণে তার দলভুক্ত সদস্য হবার জন্য আমার নামও লেখাইনি, এবং আমার সাহায্যের হাতও তাদের দিকে বাড়াইনি। এমনকি এসব দলগুলো তাদের সব শক্তি হারিয়ে ফেলে তখন শ্রান্ত, ক্লান্ত। তাই তাদের পক্ষে সত্যিকারের শক্তভাবে ধরে জার্মান জাতির পুনরুত্থান করাটাও সম্ভব ছিল না।

আমার অন্তরের বিত্তশাং হাবস্বুর্গ শাসকদের প্রতি দিনে দিনে আরো বেশি বাড়তে থাকে।

যতই আমি এদের বৈদেশিক নীতি নিয়ে পর্যালোচনা করি, তত বেশি আমার ধারণা জন্মায় যে এ অপশাসক নিচিতভাবে জার্মানদের দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনবে। আমি দিনের পর দিন আরো বেশি উপলক্ষ করি যে জার্মান জাতির ভাগ্যের গত্যস্থল কিছুতেই এদের দ্বারা নির্দিষ্ট হতে পারে না। তা একমাত্র সম্ভব কোন জার্মান সাম্রাজ্যে। এটা শুধু রাজনীতির ব্যাপারেই নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এটা সত্য।

এ সমস্ত ব্যাপারগুলোই সংক্ষিত এবং শিল্পের ক্ষেত্রে আঘাত করেছে, যেখানে অস্ত্রিয়া সাম্রাজ্যে বার্ধক্য হেতু জীর্ণ বলিবেশ ফুটে উঠেছে। অথবা কমপক্ষে, যে কোন বিপদের মুখোমুখি নিয়ে গিয়ে জার্মান জাতিকে দাঁড় করাবে, অন্তত এসব ব্যাপারে। এ সত্যটা আরো বিশেষভাবে প্রকটিত স্থাপত্য বিদ্যার ব্যাপারে। আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যা অস্ত্রিয়াতে কোন ফলাফলই দেখাতে পারেনি। কারণ রিং ট্রাসের বাড়িগুলো, এমনকি সমগ্র ভিয়েনার স্থাপত্যকলা জার্মান স্থাপত্যকলার তুলনায় প্রগতির দিক থেকে নেহাত-ই তুচ্ছ এবং ক্রমে হয়ে আমি এক দৈত সমস্যার সম্মুখীন হই, কারণগুলো এবং বাস্তবতা আমাকে বাধ্য করে অস্ত্রিয়ার অমস্মণ শিক্ষানবীশ করতে, যদিও আমি আজ স্বীকার করি এ শিক্ষানবীশের ফলাফল শেষ পর্যন্ত ভালই হয়েছিল আমার পক্ষে। কিন্তু আমার হৃদয় পড়েছিল অন্য কোথাও।

একটা আঞ্চলিক মনোভাব আমার মনের ভেতরে যাখাচাড়া দিয়ে গঠে, এবং যত বেশি এ সরকারের অন্তঃস্মারক্ষণ্যতা অনুভব করি তত বেশি আমাকে হতাশায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমার দৃঢ় ধারণা হয় যে এ সরকার যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে বাধ্য। এর হাত থেকে কিছুতেই অব্যাহতি নেই। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয় এ সরকার জার্মানদের জন্য সবরকম দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনবে।

আমার দৃঢ় ধারণা হয় এ হাবস্বুর্গ সরকার প্রতিটি জার্মানের মহানুভবতাকে বাধা দিয়ে তার গতিরোধ করবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি অজার্মানদের অসৎ কার্যকলাপকে সাহায্য করে যাবে। অসদৃশ্য ভিত্তিন জাতির সমষ্টি এ রাজধানীতে যেন একটা জড়বৎ পিণ্ডের মত হয়ে আছে। বিশেষ করে চিত্র-বিচিত্র চেক, স্প্যানিশ হাসপেরিয়ান, রুমানিয়ান, সার্বস এবং ক্রট প্রভৃতিরা। সর্বদা এ সমাজের তলাকার বীজাগু ওখানে সব জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ইহুদীরা আমার কাছে অত্যন্ত অগ্রীভূতিকর। এ বিশাল শহরটা যেন সংকর জাতীয় নীতিভূষণের নদন কানন।

জার্মান ভাষা যা আমি ছোটবেলা থেকে বলে এসেছি, তা হিল লোয়ার ব্যাভিরিয়ার ভাষা। আমি বিশেষ ভঙ্গিতে বলার ভাষাটা কখনই ভুলতে পারিনি; আর সেই কারণেই ভিয়েনার উপভাষাও কখনো শিখিনি। যতদিন আমি সেই শহরে ছিলাম, বিদেশী পাঁচ মিশেলী পতঙ্গদের পালের প্রতি তত ঘৃণা আমার ভেতরে জেগে ওঠে। সেটা সুপ্রাচীন জার্মান সংস্কৃতির ওপরে বেতের মত নিরন্তর আঘাত করে চলে। আমার দৃঢ় ধারণা এ সরকার দীর্ঘদিন কিছুতেই স্থায়িত্ব পেতে পারে না।

অস্ত্রিয়ার তখনকার অবস্থা ছিল এক কারুকার্যময় সিমেট্রের মত, যেটা শুকিয়ে গিয়ে বহু পুরাতন এবং ডংগুর অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের আর্ট ছোঁয়া না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা ঠিকই থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে বাইরের কোন আঘাত এর ওপরে এসে পড়ে সেই মুহূর্তে এটা ভেঙে হাজার হাজার টুকরো হয়ে যায়, সূতরাং এখন সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটা হল, কখন এ আঘাত এসে পড়বে।

আমার হৃদয় সব সময়ই স্বপ্ন দেখত জার্মান সাম্রাজ্যের। অস্ত্রিয়ার রাজতন্ত্রের সঙ্গে কখনো সঙ্গ দেয়নি। সূতরাং অস্ত্রিয়ার শাসকবর্গের অবলুপ্তি দেখে আমার মনে হয়েছিল জার্মান জাতির স্বাধীনার প্রথম ধাপ উপস্থিতি।

এসব কারণগুলোই ও দেশটা ছেড়ে যাবার জন্য আমার হৃদয়ের ইচ্ছাটাকে আরো বলবত্তি করে তোলে; যেটা আমার যৌবনের প্রারম্ভেই কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল।

আশা করেছিলাম স্থপতি হিসেবে নিচ্য একদিন আমি সফল হব এবং আমার দেশের সেবায় তা বড়ভাবে বা ছোটভাবে (যা ভাগ্যের ইচ্ছা) ঢেলে দেব।

সেদেশে যারা কাজ করছিল তাদের মধ্যে আমার দীর্ঘদিন বসবাস করার কারণ হল আন্দোলনটা সেখান থেকেই শুরু হবে, যা আমার হৃদয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতীক্ষা করে এসেছে, বিশেষ করে যে দেশের চৌহদির ভেতরে আমাদের পিতৃভূমিতে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম সে হল জার্মান সাম্রাজ্য।

অনেকেই হ্যাত জানা নেই যে এ ধরনের ইচ্ছা কত বলবত্তি হতে পারে, কিন্তু আমার আবেদন দু'দল লোকের প্রতি। প্রথম দল হল এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যা বলেছি সেই সুবিগুলো যারা স্বীকার করতে নারাজ। দ্বিতীয় দল হল, যারা একবার এ সুখের স্পর্শ পেয়েছে, কিন্তু ভাগ্য নির্মম হয়ে তা কেড়ে নিয়েছে। আমি তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি যারা তাদের মাতৃভূমিকে হারিয়েছে এবং এখনে যারা উত্তরাধিকার সূত্রে পৈতৃক সম্পত্তিশুল্ক বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। তাদের মাতৃভাষা, যার ওপরে অকথ্য নির্যাতন চলছে,—তাদের জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা এবং বিশ্বাস করবেন। তারা বুকের ভেতরে প্রবল ইচ্ছা নিয়ে অপেক্ষা করছে, কখন পিতৃভূমির উষ্ণ ক্রোড়ে ফিরে যেতে পারবে। তাদের উদ্দেশ্যে আমার এ বক্তব্য, এবং আমি জানি তারা আমার বক্তব্যকে সম্যক্তভাবে অনুধাবন করতে পারবে।

যে তার পিতৃভূমি থেকে বিভাড়িত—সেই উপলক্ষ্মি করতে পারবে কী গভীর সেই স্বদেশের প্রতি আকুলতা যা তাকে নির্বাসিত ভাবতে বাধ্য করেছে। এটা হল একটা চিরস্থায়ী মনন্তোপ যার কোন প্রকার সাম্মতা নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না পিতৃঘরের দরজা খোলা যায়। একমাত্র তখনই শিরা উপশিরায় প্রবাহিত চঞ্চল রক্ত শান্তি পেতে পারে তাদের নিজভূমিতে আশ্রয় পেয়ে।

ভিয়েনা আমার পক্ষে কঠিন বিদ্যালয় ছিল; কিন্তু এটাই আমাকে জীবনে সুগভীর শিক্ষাও দিয়েছিল। আমাকে তখন বড়জোর বালক বলা চলে যখন আমি সে শহরে আসি, এবং যখন আমি সে শহর ছাড়ি তখন আমি মনের দুঃখে ভারাক্রান্ত বিষণ্ণ ঘৃবক। ভিয়েনাতেই আমার আন্তর্জাতিকতাবাদের দীক্ষা এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিশ্বেষণের শুরুও হয় এ শহরেই। সেই দিনকার সেই আন্তর্জাতিকতাবাদ চিন্তাধারা, রাজনৈতিক মতবাদ আমাকে আর কখনই ছেড়ে যায়নি। যদিও তারা ভবিষ্যতে তিন্মুখী হয়ে বিভিন্ন পথে ছুটেছে। বর্তমানে আমি আমার সেই ফেলে আসা শিক্ষানবীশ দিনগুলোর সঠিক মূল্যায়ণ করতে পারি।

এ কারণেই আমি সেদিনগুলোর বর্ণনা পুজ্জনপুজ্জনপে দিয়েছি। এ ভিয়েনাই আমাকে ঝঢ় বাস্তব শিক্ষা ও সত্ত্বের সম্বান্ধ দেয়, যা ভবিষ্যতে আমার রাজনৈতিক আদর্শের পটভূমি হিসেবে কাজ করে পরবর্তী পাঁচ বছর ধরে জনতার সমর্থন লাভ করে। আমার ইহুদী, সামাজিক গণতন্ত্র বিশেষ করে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে কোন ধ্যান ধারণাই ছিল না। এবং সেদিন তাই অত পরিশ্রম এবং পড়াশোনায় ভাগ্যের লাঞ্ছন্য তৈরি করেছিলাম নিজেকে।

পিতৃভূমির দুর্ভাগ্যের জন্য যে হাজার হাজার লোক মনে মনে নিজেদের তোলপাড় করে চলেছে, তাদের পক্ষেও একজন যে প্রবল বাঁচার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজের ভাগ্যকে তৈরি করেছে, তার মত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব নয়।

মিউনিক

অবশ্যে আমি এলাম মিউনিকে, সেটা ১৯১২ সালের বসন্তকাল। শহরটা আমার পূর্বপরিচিত; কারণ এ শহরের চার দেওয়ালের গতির ঘণ্টে আমার বেশ কয়েকটা বছর কেটেছে। এর কারণ হল আমার স্থাপত্যবিদ্যায় পড়াশুনার জন্য জার্মান প্রধান শহরগুলো শিল্পের কেন্দ্র হওয়াতে আমার দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল মিউনিকের দিকে। জার্মানিকে চিনতে গেলে মিউনিক না দেখলে জার্মান শিল্পকলা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করাও সম্ভব নয়।

এসব জিনিস বিচার করলে দেখা যাবে, যুদ্ধ-পূর্ব জীবনটা আমার অনেক সুখের ছিল। যদিও আমার রোজগার অত্যন্ত অল্প ছিল, তবুও শুধু ছবি আঁকার জন্য আমি জীবন ধারণ করিনি। আমি ছবি এঁকেছি প্রাণ ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাই যোগাতে আর পড়াশুনা করার নিমিত্তে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আমি নিশ্চয়ই পৌছাব এবং এ বিশ্বাসই আমার দৈনন্দিন ছোট ছোট দুঃখগুলোকে পেরিয়ে নিয়ে যেতে যথেষ্ট ছিল; যার জন্য আমি কখনই উদ্বিগ্ন বোধ করিনি।

উপরত্ব আমার প্রবাসের প্রথম মুহূর্ত থেকেই এ শহরটাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম, যা আমি আর অন্য কোন জায়গার প্রতি-ই উপলক্ষ্মি করিনি। এ হল জার্মান শহর! নিজের মনেই আমি বারবার উচ্চারণ করতাম। ভিয়েনার থেকে কত আলাদা। আরেকটা আনন্দের বিষয় হল এখানে লোকে জার্মান ভাষায় কথা বলে, যেটা ভিয়েনার অন্য ভাষার চেয়ে আমার নিজের

বলার ভাষায় অনেক কাছাকাছি। মিউনিকের বাক্ পদ্ধতি আমার ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিত, বিশেষ করে যারা লোয়ার ব্যাডেভেরিয়া থেকে মিউনিকে আসত। হাজার বা তারও বেশি জিনিস ছিল যা আমি অন্তর থেকে ভালবাসতাম; অথবা মিউনিকে থাকাকালে যাদের প্রতি ভালবাসার জন্য আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু যা আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল, তাহল শহরের শিল্পপ্রেরণার সঙ্গে গ্রামের মাটির কলা চাতুর্যের বক্সন, যার সুন্দর ছবি হেব্রো হাউস থেকে ওডেন পর্যন্ত, অঞ্চোবর উৎসব থেকে পিনাকোনোক পর্যন্ত বিস্তৃত। মিউনিকের মত আর কোন জায়গা আমার হৃদয়ের সুতোয় এত জড়ানো নয়; কারণ আমার ব্যবহারিক জীবনের উন্নতির সঙ্গে এ মিউনিক শহর ওত্তোলনভাবে জড়ানো এবং সত্য বলতে কি, এ শহরটা দর্শনের পর থেকেই আমার অন্তরে খুশির বান ডাকে, বিশেষ করে এ সুন্দর শহর আমার আস্ত্রণ্তিও এনে দেয়। আমার মনে হয় যাদের ভেতরে সৌন্দর্যবোধের আশীর্বাদ সৈম্প্রয়োগিক দিয়েছেন, বাণিজ্যিক শিল্পকলা ব্যতিরেকে তারাই এ শহরকে ভাল না বেসে থাকতে পারবে না।

আমার পেশাগত কাজ ছাড়াও বর্তমান রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে আমি যথেষ্ট পড়াশুনা করতাম। বিশেষ করে বৈদেশিক সম্পর্কিত বিষয়গুলোই আমাকে বেশি করে আকৃষ্ট করত। আমি পুরো ব্যাপারটাই জার্মান নীতি কুটুম্বিতার দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতাম, যদিও ভিয়েনা শহরে দিনগুলো কাটানোর পর আমার ধারণা হয়েছিল, সমস্ত ব্যাপারটাই ভুলে ভর্তি। কিন্তু ভিয়েনাতে থাকাকালীন আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারিনি ঠিক জার্মান সাম্রাজ্য কত আঘাতের পথে এগিয়ে গেছে। ভিয়েনার দিনগুলোতে আমার এ ধারণা হয়েছিল যা বলা যেতে পারে, আমি নিজেকে বুঝিয়েছিলাম যাতে জার্মানদের ভুলগুলো হাক্কাতাবে নিতে পারি বা কম নজরে আসে। হয়ত বা জার্মানের শাসকবর্গের জন্ম ছিল বাস্তবে এ ধরনের সম্পর্কের মূল্য কতটুকু। কিন্তু কোন একটা রহস্যজনক কারণে তারা জনসাধারণের কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা গোপন করে গেছে। তাদের ধারণা ছিল বিসম্মার্কের মাধ্যমে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তাকে তাদের সমর্থন জানিয়ে যাওয়া উচিত। হঠাৎ কিছু করে বসার ফলাফল ভাল দাঁড়াবে না; এছাড়া অন্য কোন কারণ সম্ভবত নেই যার জন্য বিদেশী রাষ্ট্রগুলো এ দেশের ভেতরের সক্রীর্গমন লোকগুলোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে আমার যোগাযোগের ফলে, ভয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে আমার চিন্তাধারা ভুল ছিল। সবচেয়ে অবাক লাগল দেখে যে যারা প্রায় সব বিষয়েই ভালরকম খবরাখবর রাখে, তাদের পর্যন্ত হাবস্বুর্গ রাজতন্ত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। সাধারণ জনসাধারণের ভেতরে বাঁধাধরা একটা ধারণা ছিল যে অস্ত্রিয়া গণনার মধ্যে ধরার মত শক্তিশালী এবং তারা বিপদের সময় পেছনে এসে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। সাধারণ মানুষ তখন পর্যন্ত অস্ত্রিয়াকে জার্মান রাষ্ট্র বলেই বিবেচনা করে এসেছে, এবং ভেবে এসেছে যে ওদের ওপর সত্যিই নির্ভর করা যায়। জার্মানির মতই লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ দিয়ে ওদের শক্তির পরিমাপ করা ছিল। প্রথমত, তারা ভাবতে পারেনি যে অস্ত্রিয়া কোন জার্মান সাম্রাজ্যেই নয়, দ্বিতীয়ত অস্ত্রিয়ার বর্তমান অবস্থা তাকে দুঃসাহসে ভর করে ধ্বংসের একেবাবে মুখে ঠেলে এনে ফেলেছে।

সে সময়ে অস্ত্রিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে আমার জ্ঞান যে কোন পেশাদারী কুটনীতিজ্ঞদের চেয়ে বেশি ছিল। বন্ধচক্ষুবিশেষ দেখতে অক্ষম এসব কুটনীতিজ্ঞদের দল

হোচ্চট খেতে খেতে ধৰ্মসের দিকে চলে। সরকারি অফিসগুলো থেকে যে প্রচলিত মতবাদে তাদের কর্ণপটহ বিদীর্ঘ করা হয়েছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই মতবাদেরই প্রতিক্রিন্নি শোনা যেত।

এবং এ সরকারি অফিসারের দল এ কুটুম্বিতার কাছে হাটু গেড়ে এমন ভাব করত যেন তারা সোনার বাছুরের কাছে নতজানু হয়েছে। তারা বোধহয় ভাবত যে তাদের বিনয় এবং অমায়িকতায় অন্য পক্ষের সততার অভাব ঢাকা পড়ে যাবে। এভাবে তারা প্রতিটি নির্দেশের পূর্ণ মর্যাদা দিত।

এমন কি ভিয়েনাতে থাকাকালীন মাঝে মাঝে সরকারি অফিসারদের ভাষা এবং ভিয়েনার সংবাদপত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য দেখে রেণে যেতাম। কিন্তু তবু ভিয়েনা ছিল জার্মান শহর; অত্যন্ত দূর থেকে দেখতে তো বটেই। তাই ভিয়েনা ছেড়ে বেরোলেই সবাইকে অন্য ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হতে হত। বিশেষ করে শ্বাত কোন দেশে গেলে। আগের সংবাদপত্রগুলোর প্রতি নজর দিলে এক লহমায় বোঝা যেত এ তিন কুটুম্বের বাজীকরণের ভেঙ্গী কত উন্নত। আগে অবশ্য সেই সুদক্ষ রাজনীতির ভাগ্যে গালাগাল আর ঘৃণা মিশ্রিত নাক সিটকানো ছাড়া আর কিছু জোটেনি। এমন কি শাস্তির সময় বিজয় উৎসবে যখন দুই সম্রাট পরম্পরের কপালে চুম্বন করে বঙ্গুত্ত্বের চিহ্ন স্বরূপ, সেইসব সংবাদপত্রগুলো তখনো বিশ্বাস করতে রাজী নয় যে — মুহূর্তে হঠাতে বিকমিক করে জুলে ওঠা গৌরব নিবালিদেন্দের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে তা' নিভে যাবে।

কয়েকবছর পর প্রচও ক্রোধ জেগে ওঠে; এ মৈত্রী বাস্তবের পাথরে পরীক্ষার জন্য টেনে আনা হয়। ইতালি যে ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রীর জাল ছিড়ে বেরিয়ে যায় শুধু তাই নয়, অপর দু'জনকে একা ফেলে রেখে সে গিয়ে শক্রশিবিরেও যোগ দেয়। ইতালি অস্ত্রিয়ার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এক সারিতে যুদ্ধ করেছে, — এ কথা অবিষ্মাস্য। অবশ্য কুটনীতিজ্ঞদের মত যদি সে অক্ষত্রোগে না ভোগে। ঠিক এ ধারণাটা অস্ত্রিয়ার লোকদের তখন ছিল।

অস্ত্রিয়াতে একমাত্র হাবুস্বুর্গ আর অস্ত্রিয়ার জার্মানরা এ মৈত্রী সমর্থন করেছিল। হাবুস্বুর্গ অত্যন্ত ধূর্ত্বাত্মীয় সঙ্গে আঁক করে এবং নিজেদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে এ কাজ করেছিল। জার্মানরা সরল বিশ্বাস এবং রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় এ মৈত্রীকে সমর্থন জানিয়েছিল। তাদের এ সরল বিশ্বাস ছিল যে এ ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রীকে সমর্থন জানিয়ে তারা জার্মান সাম্রাজ্যের দেবা করছে এবং তাদের প্রতিরক্ষাকে শক্ত ও একত্রিত করায় সাহায্য করছে। তবু বলতে বাধা নেই, এ ধরনের ধ্যান ধারণার জন্য তাদের রাজনৈতিক অভিভাই প্রকাশ পায়। আসলে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করায় তা জার্মান সাম্রাজ্যের সাহায্যের বদলে, আসলে একটা মৃতকল্প রাষ্ট্রের সঙ্গে শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধা হয়েছে — যার যে কোন মুহূর্তে কবরের সঙ্গে গাউছাড়া বাঁধার সংজ্ঞাবনা ছিল। সর্বোপরি, এ রাজ্য হাবুস্বুর্গ নীতি অস্ত্রিয়াকে জার্মান শূন্য করতে সাহায্য করেছে।

এ মৈত্রীর জন্য হাবুস্বুর্গের বিশ্বাস ছিল যে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জার্মান সম্রাট নাক গলাবে না। সুতরাং তারা এ জার্মান শূন্য করার কাজটা সহজেই কোনরকম দায়সারা ভাবে করে যেতে পারবে। তাদের আভ্যন্তরীণ নীতি ছিল ধীরে ধীরে অস্ত্রিয়াকে জার্মান শূন্য করা। শুধু জার্মান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গই নয়, কোনদিক থেকেই প্রতিবাদ আসার সংজ্ঞাবনা ছিল না। কিন্তু একজনের পক্ষে এ জার্মান অস্ত্রিয়ার মৈত্রী কখনই ভোলা সভ্য হয়নি এবং সেই

কারণেই তাদের স্তুতি করে দেওয়া হয়েছে। তারা তিরকারের যোগ্য এ কারণে যে এ নীতির মাধ্যমে তারা এ দৈত রাজতন্ত্রের ভেতরে শ্বাত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় রত।

অস্ত্রিয়ায় বসবাসকারী জার্মানরা কি করতে পারে, যখন জার্মান সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা প্রকাশেই তাদের বিশ্বাস এবং আস্থা হাবুসবুর্গ শাসকের কাছে জানিয়ে দিয়েছে? তাদের কে এতে বাধা দেবে? তবে তো প্রকাশেই সবাই বলে বেড়াবে যে এরা এদের জাতিবর্গের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে নিজেদের জাতীয় স্বার্থে, তারা যারা এত যুগ ধরে এত ত্যাগ স্বীকার করে এসেছে।

একবার যদি কোনক্রমে অস্ত্রিয়ার ওপর থেকে জার্মান প্রভাব মুছে ফেলা যায়, তবে আর এ মৈত্রীর মূল্য কতটুকু! যদি এ ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রী জার্মানদের পক্ষে লাভজনক হত তবে উচিত ছিল না অস্ত্রিয়াতে জার্মানদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা; অথবা, কারোর পক্ষে কি বিশ্বাস করা সম্ভব যে জার্মানি হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের মৈত্রী সংযে টিকে থাকতে পারে যার নেতৃত্ব শ্বাতদের অধিকারে?

জার্মান কুটনীতিজ্ঞদের সরকারি ধ্যান ধারণা এবং সাধারণ জনতার হাবুসবুর্গের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কে চিন্তাধারা শুধু বোকামীরই পরিচায়ক নয়, সম্পূর্ণরূপে অঙ্গও বটে। এ মৈত্রীকে শক্ত পটভূমি ধরে নিয়ে তারা সতর লক্ষ একটা জাতির ভবিষ্যত নিরাপত্তা এবং অস্তিত্ব তাদের হাতে সঁপে দিয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার অংশীদারকে সেই শক্ত পটভূমি ভাঙ্গার ক্ষমতা দিয়েছে, যা সে যথারীতি এবং স্থির সংকলনে করে চলেছে। এমন একদিন আসবে যখন ভিয়েনার রাজনীতিজ্ঞদের সঙ্গে কাগজে সই করা চুক্তি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। শেষপর্যন্ত জার্মানির কাছে এ মৈত্রীটাই হারিয়ে যাবে। ইতালি অবশ্য একাজ আগেই আরম্ভ করে দিয়েছিল।

যদি জার্মানির লোকেরা ইতিহাস পড়ত এবং কিছুটা মনস্তুও বুঝতে পারত তবে কথনই মহুর্তের জন্য বিশ্বাস করত না যে ভিয়েনা রাজদুর্গ একত্রে মুক্তিশেষে এসে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। সম্পূর্ণ ইতালি আগ্রেয়াগিরির মত জুনে উঠত যদি একজন ইতালিয়ানকেও হাবুসবুর্গ যুদ্ধের জন্য পাঠানো হত।

এদের প্রতি ইতালিয়ানদের ঘৃণা এতই তীব্র ছিল যে ইতালিয়ানরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে এদের শক্ত ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না। একাধিকবার আমি এ ঘটনার সাক্ষী যখন, তখন ইতালিয়ানদের এ মৈত্রীর বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে গড়তে দেখেছি। হাবুসবুর্গ রাজতন্ত্র অনেক শতাব্দী ধরে ইতালির মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছে তা ভোলা অসম্ভব; এমন কি প্রচও সদিচ্ছা থাকলেও। কিন্তু এ সদিচ্ছা কারোর ভেতরেই ছিল না; জ্ঞানসাধারণ—না সরকার। সুতরাং ইতালির সামনে ছিল দু'টো পথ গোলা—মৈত্রী অথবা যুদ্ধ। প্রথমটাকে বেছে নেওয়ার সুবিধে হল ধীরে ধীরে দ্বিতীয়টার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ।

বিশেষ করে অস্ত্রিয়া এবং রাশিয়ার সম্পর্কটা যখন যুদ্ধের মাধ্যমে নিষ্পত্তির দিকে এগোছিল, তার মৈত্রী সম্বন্ধে জার্মান নীতি শুধু অর্থহীন-ই নয়, বিপজ্জনক ও বটে। এটাই হল কোন উদার অথবা যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারার অভাবের উজ্জ্বল উদাহরণ।

কিন্তু তাহলে এ মৈত্রীর কারণটা কি? জার্মান রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এ মৈত্রীর চেয়ে নিজেদের উৎসের ওপর নির্ভর করা উচিত ছিল। কিন্তু জার্মান রাষ্ট্রের জার্মানদের ভবিষ্যত নিরাপত্তার প্রশ়্নাটাই তুলে ধরে বেশি করে।

তাহলে বাকি যে প্রশ্ন রইল, তা হল এরকম : নিকট ভবিষ্যতে জাতির স্বরূপটা কি হবে? বলা যেতে পারে, সময়টা এমন হওয়া উচিত যাতে পূর্বভাস করা যায়। এবং কিভাবে ইউরোপের জাতিদের মধ্যে শক্তির বস্টন হওয়া উচিত যাতে জাতির সার্বিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সংস্থা?

জার্মানির বিদেশ নীতি যে রাজনীতিবিদ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার পরিষ্কার বিশ্লেষণ করলে নিচের ধারণায় পৌছানো যায় :

জার্মানির লোক উৎপাদন তখন বছরে প্রায় ন'লক্ষ। এ বিবাট বাণেবর নতুন আসা নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সবকিছু দেওয়ার অক্ষমতা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের ওপর বিপর্যয়কারী ঘটনা হিসেবে নেমে আসবে, যদি না এ বিষয়ে পূর্বে কোন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা যায়। তবে নিশ্চিত যে তাদের ওপর দুঃখ এবং অনাহার নেমে আসবে। এ বিভৎস বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার চারটে পথ আছে।

প্রথমত এ ব্যাপারে ফরাসী উদাহরণ গহণ করে ক্রিয় উপায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে এ বিশাল জনতার উপস্থিতি বক্ষ করা সম্ভব।

কয়েকটি অবস্থায় বিপদের মুখে অথবা প্রাকৃতিক দৈবদুর্ঘোগে বা মাটি যদি পর্যাপ্ত ফসল না দেয় তবে প্রকৃতি ভাবে কোন কোন দেশে এবং জাতের মধ্যে নিজে থেকেই জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু পদ্ধতিটি যথেষ্ট পরিমাণেই নিচুর। তবে এতে জননক্ষমের কার্যক্ষমতাকে বাধা দেওয়া হয় না; কিন্তু যারা অতো শক্তিশালী অথবা সুস্থানের অধিদায়ী নয় এভাবে তাদের বংশাবলী অস্তিত্ব হারিয়ে কোন এক অজানাকে আলিঙ্গনে বাঁধে। যারা এ অস্তিত্বরক্ষার কঠিন পথ বেয়ে বেঁচে থাকে তাদের ইতিমধ্যেই সহস্রণ পরীক্ষা হয়ে দেওয়ে যে তারা যে কোন অবস্থাতেই বেঁচে থাকতে পারে এবং জননক্ষম। সুতরাং ব্যাপারটার তো পুনরাবৃত্তি হয়েই চলেছে। এভাবে নির্দয়তার সঙ্গে ব্যক্তির লড়াই যে মুহূর্তে সে প্রকৃতির বিপক্ষে লড়াই করতে অক্ষম হবে, তাঁকে শ্বরণ করিয়ে দেবে। প্রকৃতিই জাতির শক্তি বজায় রাখে এবং উন্নততর শ্রেণীর অস্তর্গত শ্রেণী উৎপাদন করে এবং তাকে বাড়িয়ে নিয়ে চলে।

সংখ্যার অবরোহণ কিন্তু শক্তির উচ্চতাই দেকে আনে। অবশ্যই একক ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। এবং শেষে পুরো প্রজাতিটাকেই বলশালী করে তোলে।

মানুষ প্রকৃতির বন জঙ্গলের খণ্ড খণ্ড অংশ নয়। সে মনুষ্যত্ব নামক মান মশলার তৈরি তার জ্ঞান নির্দিয়া জ্ঞানের রাণীর চেয়ে অনেক বেশি। সে একক ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব রক্ষায় বাধা দেয় না। কিন্তু জননক্রিয়ায় বিরত থাকতে পারে। একক ব্যক্তিত্বের বাঁধে, যে শুধু নিজের কথাই ভাবে, সমস্ত জাতির কথা নয়; এ ধরনের চিন্তাধারা তার কাছে অনেক বেশি মনুষ্যত্ববেদ সম্পন্ন বলে মনে হবে এবং অপরটায় মনুষ্যত্ব ব্যাপারটাকেই সে খুঁজে পাবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ব্যাপারটার পরিণতি সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ।

এ জননক্রিয়া বক্ষ না করে এবং একক ব্যক্তিত্বে প্রস্তুত থাকার সংগ্রামে তৈরি করে নিতে শাব্দে, প্রকৃতি তার মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ মানুষটাকে বেছে নেবে এবং উন্নত একটা প্রজাতি এ প্রকৃতির মাধ্যমে তৈরি হবে স্বাভাবিক উপায়ে। কিন্তু মানুষ নিজে থেকেই এ জননক্রিয়া সীমাবদ্ধ হাঁকে এবং জেদী হয়ে যে এসেছে তাকে যে কোন ঘূলে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ইংৰেজের ইচ্ছাকে উদ্ধিকরণ মনে হয় এবং মেন অনেক বেশি জ্ঞানের পরিচায়ক এবং মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন। প্রকৃতির ওপর ভিত্তিতে পেরে সে আনন্দে উৎখন হয় এবং এভাবে

দেখা যায় প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেও পারা যায়। সেই সর্বশক্তিমান পিতার প্রিয় বানরটি এ ভেবে খুশি হয় যে সেই সংখ্যাবিষয়ক সীমাবদ্ধতায় সে কিছুটা আলোড়ন আনতে পেরেছে। কিন্তু তাকে যদি বলা যায় যে পদ্ধতিটি ব্যক্তিত্বের গুণ অধোগতি করে দেয়, তবে সে নিচয়ই সুরী হবে না।

যে মূর্ত্তে এ জননক্ষম কার্যক্ষমতাকে বাধা দেওয়া হয়, জন্মের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে; অস্তিত্বরক্ষার জন্য স্বাভাবিক সংগ্রাম, যা শুধু স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিশালী ব্যক্তিকেই বাঁচিয়ে রাখে, তার বদলে ক্ষীণ, দুর্বল এবং রুগ্নদের পর্যন্ত যে কোন মূল্যে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিযোগিতায় মানুষ উন্মত্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু এ নীতি যদি চালিয়ে যেতে দেওয়া যায় তার শেষ ফলাফল হবে জাতি তার অস্তিত্বটাই হয়ত বা পৃথিবীর বুক থেকে যুহে ফেলবে। যদিও মানুষ কিছুদিনের জন্য জননক্রিয়ার চিরসত্য আইনটাকে উপেক্ষা করতে পারে,— কিন্তু সত্ত্ব অথবা কিছু পরে প্রতিহিংসা ঠিকই মাথা উঁচু করবে। একটি শক্তিশালী জাতি দুর্বল হয়ে পড়ে সমস্ত জাতিকে উচ্চদের পথ টেনে নিয়ে যাবে। শেষে চাপা পড়া আকুলী ধীরে ধীরে একসময় রূপ নিয়ে একক ব্যক্তিত্বের তথাকথিত মনুষ্যত্ববোধটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে প্রকৃতি তার স্বাভাবিক কাজ করে যাবে, যা সবলকে স্থান করে দেবার জন্য দুর্বলকে যুহে ফেলবে।

যে কোন নীতি যা জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট, তা কিন্তু সেই জাতির ভবিষ্যৎ হরণ করে।

দ্বিতীয় সমাধান হল অর্ত উপনিবেশনে। এ কথাটা নিয়ে আমাদের সময়ে অনেক নাড়াচাড়া হয়েছে এবং প্রায় প্রত্যেকেরই হৃদয় ভরে উঠেছে ব্যাপারটায়। এ উপদেশের অর্থটা খুব ভাল। তবে অনেকেই এটা ভুল বুঝেছে।

এটা অতি সত্যি যে জমির উৎপাদন ক্ষমতা একটা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে বাড়নো যেতে পারে, সেই জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে জার্মানির ক্রমবর্ধমান জন্মের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুরাহাও করা চলতে পারে, যাতে অনাহারটা এড়ানো যায়। কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত যে জন্মের থেকেও জীবন-যাপনের মান অনেক বেশি দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। খাদ্য এবং পোশাকের চাহিদা বছরে বছরে অনেক বেশি বেড়ে চলেছে। এবং সেই চাহিদার পরিমাপের সঙ্গে আমাদের প্র-পিতামহদের সময়কার চাহিদার কোন তুলনাই হয় না। অন্ততগুরে শাখানেক বছর আগেকার ব্যাপার ধরলে। সুতরাং এ ধারণটা সম্পূর্ণ ভুল যে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে পারলেই ক্রমবর্ধমান জনতার খাদ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব। না। সেটা কিছুদূর পর্যন্ত সম্ভব। জমি যে পরিমাণে বেশি উৎপাদন করবে, তার একটা ভাগ তো দিনে দিনে যে চাহিদা বেড়ে চলেছে তাদেরই দাবি মেটাতে চলে যাবে। এমন কি যদি এ চাহিদা সবচেয়ে নিচু রেখায় টেনে সীমাবদ্ধ রাখা যায়, এবং আমরা যদি আমাদের সমস্ত শক্তি নিবিড় চাষে নিয়েজিত করি, তবু আমরা এমন একটা সীমায় এসে থমকে দাঁড়াব, যা প্রকৃতির সহজাত স্বাভাবিক ক্ষমতা। আমরা কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যত পরিশ্রমই করি না কেন, তবু আমরা মাটির উৎপাদন ক্ষমতার সীমার বাইরে কি করে যাব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সেই ধরনের সময়টা আমরা কিছু সময়ের জন্য পিছিয়ে দিতে পারলেও শেষপর্যন্ত তা একদিন এসে হাজির হবেই। প্রথমে মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, ঠিক খারাপ শস্য উৎপাদনের পরেই ইত্যাদি—। দিনে দিনে যত লোক বেড়ে চলবে, দুর্ভিক্ষও ঘন ঘন হবে —

দুই দুর্ভিক্ষের মধ্যবর্তী সময়টা কমে গিয়ে। শেষে একমাত্র প্রচুর ফসল উৎপাদনের সময় ছাড়া — দুর্ভিক্ষ হবে নিয়ন্ত্রণের সঙ্গী।

অবশ্যে এমন একসময় আসবে, যখন প্রচুর ফসলের বছরগুলোতেও আর কুলানো যাবে না। সুতরাং ক্ষুধা আবার জাতির দরজায় এসে আঘাত করবে। প্রকৃতি আবার পা ফেলে এগিয়ে আসবে এবং কারা বাঁচার যোগ্য তা বাহতে শুরু করবে। অথবা, মানুষ যদি তার নিজের সংখ্যাধিক না বাড়াবার জন্য কৃত্রিম উপায়ে গ্রহণ করে, তার জন্য কৰ্তৃ ভীষণ ফলাফলের মুখোমুখি তাকে তার জাতি বা প্রজাতির জন্য হতে হবে তা আমি আগেই বলেছি।

এখানে হ্যত বা কেউ আপন্তি জানিয়ে বলবে, মানুষ্যত্ববোধের জন্যই ভবিষ্যত, এবং একক কোন জাতি বা ব্যক্তির পক্ষে এখনই তা এড়ানো সম্ভব নয়।

প্রথম নজরে মনে হবে, এ আপন্তির পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে; কিন্তু আমাদের নিচের ব্যাপারগুলোকেও গণনার মধ্যে আনা উচিত :

নিচয়ই সেদিন আসবে, যখন সমস্ত মানব জাতিকেই তার প্রজাতিদের বৃক্ষি বস্তা রাখতে হবে। কারণ তখন আর সভ্ব হবে না জমির উৎপাদনের সঙ্গে তাল রেখে এ নিয়ত বর্ধিত জনসংখ্যাকে পোষণ করার। প্রকৃতিকে তখন তার পদ্ধতি কাজে লাগাতে দিতে হবে। অথবা মানুষ সেই সীমাবদ্ধতার কাজ নিজে হাতেই তুলে নেবে। এবং আজকে যা প্রচলিত তার থেকে উন্নত কোন ভারসাম্য সম্পন্ন পথ খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু তখন সমস্যাটা হয়ে দাঁড়াবে সমস্ত মনুষ্যজাতির; আজ যেখানে আরো বেশি জমি দখল করার জন্য প্রচুর শক্তি এবং বীর্য নেই বলে যে সমস্ত জাতিকে কষ্ট পেতে হচ্ছে যাতে তাদের প্রয়োজন মেটে, আজকের যা অবস্থা, সারা পৃথিবীতে বহু অনাবাদী জমি পতিত পড়ে আছে, সেই জমিগুলো শুধু কর্ষণের অপেক্ষা। এবং এটা ধ্রুব সত্য যে প্রকৃতি সেই জমিগুলো কোন জাতি বা প্রজাতির জন্য পশ্চারণের ক্ষেত্র ভেবে ফেলে রেখে দেবে না। এগুলো ভবিষ্যতের জন্য প্রকৃতিরই সঞ্চয় করে রাখা ভাগার। এ জমিগুলো তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, যারা নিজেদের শক্তিতে সেগুলো দখল করে পরিশ্রমের দ্বারা সেগুলো আবাদী জমিতে পরিণত করবে।

রাজনৈতিক সীমান্ত বলতে প্রকৃতি কিছু বোঝে না। পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চার করে দিয়ে তার কাজ হচ্ছে শক্তির লড়াই চূপ করে দেখা। যারা শক্তিমান, সাহসী এবং পরিশ্রমী তাদের সে বুকের কাছে টেনে নেয়। এবং তারা তার রাজ্যে বাঁচার একচেত্র সম্মাট।

যদি একটা জাতি নিজেদের উপনিবেশে আবন্ধ রাখে, অপরদিকে অন্য জাতিরা তাদের জমির সীমারেখা নিয় বাড়িয়ে চলেছে, পৃথিবীতে সেই জাতি তখন বাধ্য হয় জন্য নিয়ন্ত্রণের পথ বেছে নিতে, যখন অন্য জাতিরা তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে, এ অবস্থা শেষমেষ এসে দাঁড়াবেই। যদি জাতিটার দখলে জমির পরিমাণ কম হয়, তবে অবস্থাটা সত্ত্বর এ পর্যায়ে এসে উপস্থিত হবে; বর্তমানে এটা দুর্ভাগ্যজনক যে শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহ — অথবা, খুব স্পষ্ট করে বলতে গেলে একমাত্র সংকৃতিসম্পন্ন জাতিগাই মানব জাতির প্রগতির ধরাজার একমাত্র বাহক, — তারা অক্ষতাবে যুদ্ধ বর্জন বাঞ্ছনীয় এবং সভ্ব এ মতবাদ মেনে নিয়েছে; এভাবে তারা আর নতুন জমি ও দখল করছে না। শুধু নিজেদের উপনিবেশটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে রয়েছে। বিস্তৃ সঙ্গে সঙ্গে অনেক নিয় গুণসম্পন্ন জাতিরা উপনিবেশের জন্য পৃথিবীর অনেক জায়গা দখল করে রেখেছে; অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত কোথায় এসে দাঁড়াবে নিচে তার ফলাফল দেওয়া

যে সব জাতি সাংস্কৃতিক ব্যাপারে অন্য জাতের চেয়ে উচ্চ, কিন্তু কম নির্দয়, তারা তাদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি রাখতে বাধা হবে; কারণ তাদের সীমাবদ্ধ জমির আয়তনের জন্য — যার দ্বারা এর বেশি লোকসংখ্যাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতিরা তাদের লোকসংখ্যা বাড়িয়েই চলতে পারে, কারণ তাদের কাছে তো প্রচুর জমি পড়ে রয়েছে। অন্য কথায়, এ ব্যাপার যদি দীর্ঘদিন ধরে চলতে দেওয়া হয়, এক সময় সমস্ত পৃথিবীটাই দখল নিয়ে বসবে এ অপেক্ষাকৃত কম সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতিরা, যাদের শক্তি এবং কাজ করে চলার ক্ষমতা বর্তমান।

এমন এক সময় আসবে, সুদূর ভবিষ্যতে হলেও, যখন বিকল্প হিসেবে মাত্র দুটো পথ খোলা থাকবে : হয় পৃথিবীটা শাসিত হবে আমাদের আধুনিক গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা হিসেবে; তখন প্রতিটি মতামত লোকসংখ্যার শক্তিশালী জাতির পক্ষে যাবে। অথবা পৃথিবীটা শাসিত হবে প্রকৃতির শক্তি বন্টনের মাধ্যমে; সেক্ষেত্রে সেইসব জাতিই জয়ী হবে, যারা নির্দয় এবং আত্মবঞ্চিত্ব রাজী হয়নি।

কারোর হয়ত বা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এ পৃথিবীতে একদিন অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মনুষ্য জাতির মধ্যে বীভৎস সংগ্রাম শুরু হয়ে যাবে। শেষে মানবতাবোধের আঙ্গন গলাধঃকরণ করার পূর্বে, যা একমাত্র নির্বৈধ ভৌকৃতা এবং বৃথা অহংকারের সমবর্যে গঠিত, একদিন তা মার্চের প্রথর রৌদ্রতেজে গলে যাবে। মানুষ মহান হয়েছে নিত্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পথ চলার জন্য, এ চিরস্থায়ী শাস্তিতে তার সে মহত্ব নিচে নামতে বাধ্য।

আমাদের অর্থাৎ জার্মানদের পক্ষে ‘অর্ট’ উপনিবেশ’ কথাটাই ভ্যানক; কারণ এটা আমাদের বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করবে যে আমরা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি বিশ্বজনীন শাস্তিবাদ অনুসারে একটা পথ খুঁজে পেয়েছি এবং যা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজন তা জোগাড় না করে অর্ধ-নির্দিত অবস্থায় অস্তিত্ব রক্ষা করে চলবে। এ শিক্ষা যদি আমাদের লোকেরা মনেপ্রাণে মেনে নেয়, তবে পৃথিবীতে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সঠিক জায়গা আর কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারব না। যদি গড়পড়তা জার্মান একবার এ নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে যে এ পদ্ধতিতেই সে তার প্রয়োজনীয় জীবন-যাপন এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তা খুঁজে পাবে, তবে সে আর কিছুতেই গা হাত পা নেড়ে লাভজনক জীবন-যাপনের পথ মাড়াবে না। তখন আমাদের দেশের সামনের সবচেয়ে মূল্যবান এবং বড় প্রশংসনীয় বাঁচার সংগ্রামটাই নির্বর্ধক হয়ে দাঁড়াবে। জাতি কি এটা মেনে নিয়ে মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় বৈদেশিক নীতিকে মৃত করবের সমতুল্য বলে মনে করে তাদের আশাভরা ভবিষ্যতও হেলায় দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

আমরা যদি উপলক্ষি করতে পারি যে ‘অর্ট’ উপনিবেশ’ তত্ত্বের ফলাফল মাত্র একটা ঘটনা নয়, তাহলে আমাদের বুবাতে কষ্ট হবে যে এ ক্ষতিকর চিত্তাধারা যারা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে, তাদের প্রথম সারিতে রয়েছে ইহুদীরা। সে তার নিজের কোম্পলতার কথা ভালভাবেই জানে। কিন্তু বুবাতে অক্ষম যে প্রতিটি নোংরা কাজের শিকার হল তারা; যেটা ওপর থেকে সোনা মোড়া প্রতিশ্রুতির মত লোভনীয় মনে হয়। যা প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠতর কৌশলে পরাজিত করবে এবং তাদের অতিরিক্ত কিছু এনে দেবে — যার সাহায্যে তারা এ নির্দয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে জয়ী হতে পারবে। শেষ পর্যন্ত সম্মাট বলে নিজেদের কল্পনায় ভেবে নেবে; যখন সুযোগ অল্প কিছু কাজ করার, তা হাসিমুখে করবে।

এটা জোর করে বলা যায় না যে জার্মান অর্ত উপনিবেশ স্থাপন করতে হলে প্রথম সামাজিক অভাব অভিযোগগুলো দূর করতে হবে। অর্ত উপনিবেশন পদ্ধতির প্রথম ধাপে জমিগুলোকে মুক্ত করে স্বাধীন করতে হবে; কিন্তু এটাই একটা জাতির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়; তাকে নতুন জমি দখল করতেই হবে।

অবশ্যে যদি ভিন্ন পদ্ধতি বেছে নিই, তবে দেখতে পাব জমিগুলো এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যখন তার বেশি ফসল উৎপাদন এদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে জন-শক্তির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে যাবে জাতি, যার থেকে তাকে আর বাড়ানো যাবে না।

অবশ্যে নিচের বক্তব্যগুলো রাখা উচিত :

এটা সত্য যে অর্ত উপনিবেশ স্থাপন একটা সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা; জাতীয় সীমার সীমাবদ্ধ অবস্থায় সে জমির পরিমাণ তুলনায় খুবই কম এবং তার ফলে জননশ্ফম কার্যক্ষমতাকেও সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য — এ দুটো জিনিস জাতির সাময়িক এবং রাজনৈতিক জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করবে।

কতখানি পর্যন্ত জাতীয় সীমা প্রয়োজনে তা স্থির হবে জাতির বহিঃশক্তি কি পরিমাণে শক্তিশালী। জমির পরিধি যত বড় হবে, জাতির আঘাতকার সুযোগও তত বেড়ে যাবে। সামরিক তৎপরতা অনেক বেশি সত্ত্বৰ; সহজে এবং অনেক বেশি পরিপূর্ণভাবে নেওয়া সম্ভব হবে যদি বিরুদ্ধ জাতির জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ হয়। অপরদিকে যে রাষ্ট্রের জমির পরিমাণ বেশি তাদের বিপক্ষে সামরিক অভিযান চালানোও কষ্টকর। উপরন্ত সীমা বহু বিস্তৃত হলে ভয় থাকে না যে চট করে অপর কোন জাতি সে দেশ আক্রমণ করার দায়িত্ব নেবে। কারণ সেক্ষেত্রে সংগ্রাম অনেক দীর্ঘতর এবং জয় বিলম্বিত হওয়ায় বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সেই আক্রমণের দায়িত্ব এত বেশি যে খুব বিশেষ কারণ না থাকলে বহিৎ আক্রমণ কেউ করবেই না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সীমান্তের ওপর জাতির স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। অপরদিকে যে জাতির জমির সীমা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, আক্রমণকারীরা তার দিকে লোপুণ দৃষ্টিতে তাকাবেই।

সত্য বলতে কি, জার্মান রাষ্ট্র এ দুটো কারণ এবং তার ফলাফল নিয়ে কখনই চিন্তা করেনি, তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে সীমান্তটাকে সেই তুলনায় দাঁড়িয়ে যেত। অবশ্য এর কারণগুলোর আমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তার চেয়ে অনেক আলাদা। কয়েকটা নৈতিক চারিত্রিক কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে রোধ করার চেষ্টা করা হয়নি। অর্ত উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাবও রোষবশতই বাতিল করা হয়, কারণ তাদের ছিল এ ধরনের কোন ব্যবস্থা বড় জমিদারের স্বার্থে আঘাত হানবে। এ ধরনের আঘাত ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রচণ্ড আঘাত হানার অঞ্গগামী দৃত হিসেবে কাজ শুরু করবে।

প্রবর্তী সমস্যার সমাধান অর্থাৎ অর্ত উপনিবেশ সম্পর্কে যা কিন্তু কথা হয়েছিল তা শুধু বড় জমিদারের সংশয় উদ্দেক করার জন্য।

কিন্তু যে উপায়ে উপনিবেশ স্থাপনের পশ্চ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল তা খুব কৌশল সম্পন্ন ছিল না। বিশেষ করে এ বাতিলের পশ্চ জনসাধারণের ওপর তার গভীর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। যাহোক সমস্যার গভীর মূল পর্যন্ত কখনই যাওয়া হয়নি।

মাত্র আর দুটো পথ খোলা ছিল, যাতে এ বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ এবং কঢ়ি জোগাড় হতে পারে।

তৃতীয়, নতুন নতুন জমি দখল করার চিন্তা করা উচিত ছিল, যাতে প্রতি বছরে এ নিত্য বর্ধিত জনসাধারণ বসবাস করতে পারে।

চতুর্থ, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এভাবে সুসংগঠিত করা উচিত যাতে রশ্মানী বৃদ্ধি পায়, এবং বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যের লভ্যাংশের দ্বারা আমাদের জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতাও বাড়ানো যাবে, যা বর্ধিত জনসংখ্যাকে ভরণ-পোষণে সাহায্য করবে।

সুতরাং সমস্যাটা হল : কোন নীতি নেওয়া উচিত? দেশের সীমান্ত বাড়ানো অথবা উপনিবেশ স্থাপন, নাকি ব্যবসা বাণিজ্য। অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনার পর দুটো নীতিকেই বাতিল করা হয়; এবং তার ফলে দ্বিতীয় পছন্দটাকেই বাছা হয়। অবশ্য সদেহ নেই প্রথমটাই ছিল অনেক বেশি বলিষ্ঠ নীতি।

নতুন জমি দখল করে সীমান্ত বাড়ানোর আদর্শ, যাতে বর্ধিত জনসংখ্যাকে বদলানো যেতে পারে, অনেক বেশি সুযোগ পাওয়া যাবে তাঁতে; বিশেষ করে আমরা যদি আজকের বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের হিসেবটাকেও কষে দেখি।

প্রথমত এ ধরনের নীতি গ্রহণের জন্য যুব বেশি একটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয় যা আমাদের কৃষক সম্প্রদায়কে জাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য। আমাদের বর্তমানের অনেক শয়তানীর মূল শিকড় হল পৌর গ্রাম্য জনসংখ্যার মধ্যের অসমতা।

আজকের সামাজিক ব্যাধিগুলোর বিরুদ্ধে ভালরকম ছেট এবং মাঝেরী গোছের চাষীরা আশ্রয় পেয়ে এসেছে। উপরতু, ঘরোয়া জাতীয় অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে এটাই একমাত্র সমস্যা সমাধানের পথ, যার দ্বারা জাতি প্রত্যেক নাগরিকের নিত্যকার ক্ষুধার কুটি জোগাতে পারে।

এ অবস্থা যদি একবার বহাল করা যায়, তবে ব্যবসা বাণিজ্য তাদের অধান্তুকর শীর্ষস্থান থেকে জাতীয় অর্থনৈতিক সাধারণ পদ্ধতি নিজের জায়গায় এসে স্থান নেবে, আজকের মত জাতীয় অর্থনৈতিক সাধারণ স্থান দখল করে বসে থাকবে না; চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যেও একটা সমতা বজায় রাখবে। এভাবে শিল্প এবং বাণিজ্য জাতীয় ভিত্তি হিসেবে কাজ না করে, একটা সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। তাদের যথাযথ কাজ চালিয়ে নিতে দিয়ে, জাতীয় উৎপাদন এবং জাতীয় চাহিদার মধ্যে সমতা এনে দিলে এরা জাতির ভিত্তি দৃঢ় করার কাজ স্বাধীনভাবেই করতে পারবে, যা প্রতিটি স্বাধীন দেশেই হয়ে থাকে। এবং জাতিকে মুক্ত এবং স্বাধীন রাখতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে, বিশেষ করে ইতিহাসের এ কুটিল সন্ধিক্ষণে।

এ সীমান্ত নীতি প্রায়ে সফল না হলেও একান্তভাবেই ইউরোপের জিনিস; একজনের প্রিয়ত্বে এবং সরাসরি এ সত্ত্বের মুখোমুখি হওয়া উচিত। সর্বশক্তিময় ইন্ধনের তার বন্টনের রাজ্যে একটা জাতিকে অপর জাতির থেকে কখনই পঞ্চাশ শুণ বেশি দেবে না। এ আজকের ব্যাপার পর্যালোচনা করে, কারোরই উচিত নয় রাজনৈতিক সীমান্তকে চারিদিক থেকে টানাটানি করে শক্ত বিচারবৃদ্ধির আদর্শগুলোর থেকে বিচুত হওয়া। এ পৃথিবীতে যদি সবার প্রচুর পরিমাণে বসবাসের জায়গা নির্দিষ্ট থেকে থাকে, তবে আমাদের অঙ্গিতৃ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অংশটুকু আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত।

অবশ্যই স্বতঃপ্রোদ্দিতভাবে জায়গা কেউ ছেড়ে দেবে না। ঠিক এ জায়গায় আস্তসংরক্ষণের নীতি তার কাজ করবে। এবং যখন বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে এ সমস্যাগুলো সমাধান

করা সম্ভব হবে না, দৃঢ় মুষ্টিতে তা ধরতে হবে যা বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করতে দেয়নি। অতীতে যদি আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা আজকের মত শাস্তিবাদী বৌধাইনতায় নির্ভর করে থাকে, তবে আমাদের আজকের বা সীমান্ত তার তিনভাগের এক ভাগের বেশি পাওয়া উচিত নয়, এবং সম্ভবত তাহলে ইউরোপে তার ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার জন্য আর কোন জার্মানই অবশিষ্ট থাকবে না।

আমরা আমাদের সম্ভাজ্যের দ্বাই সীমান্তের কাছে ঝণী, জার্মান, অন্তিয়া হল দক্ষিণের পূর্ব সীমান্ত এবং ইষ্ট প্রশিয়া হল উত্তরে পূর্ব সীমান্ত, যা আমাদের পূর্ব পুরুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নিরপেক্ষভাবে স্থির করেছিল। এবং এ সংগ্রামের মধ্যেই আমরা আমাদের অর্তশক্তির বৃক্ষি করতে সক্ষম হয়েছি, যা আমাদের ওধু জাতিগত এবং রাজনৈতিক সীমান্ত বজায় রাখতেই সাহায্য করেনি, আজ পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্বও বজায় রেখেছে।

অনেক সমকালীন ইউরোপীয় দেশগুলো পিরামিডের মত তাদের শৃঙ্গের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এ সব দেশের ইউরোপের সীমান্ত আশ্চর্যজনকভাবে ছোট, যখন তাদের উপনিবেশ এবং বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যের বোঝার সঙ্গে তুলনা করা হয়। অবশ্য এ প্রসঙ্গে এটা বলা চলতে পারে যে তাদের শৃঙ্গ ইউরোপে থাকলেও ভিত্তি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে। ঠিক আমেরিকার উল্টো, যার ভিত্তি রয়েছে আমেরিকা মহাদেশে আর শৃঙ্গ ছয়ে রয়েছে সারা পৃথিবীতে। যা আমেরিকাকে অতুলনীয় অর্তশক্তি এনে দিয়েছে। এবং অপরদিকে এর উল্টো অবস্থার জন্যই ইউরোপের উপনিবেশ স্থাপনকারী শক্তিগুলো এত দুর্বল।

এ চিত্তাধারার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের বলার কিছু থাকতে পারে না। যদিও বৃত্তিশ সম্ভাজ্যের মানচিত্রের ওপর চোখ বুলালে অনেকেরই হয়ত সমগ্র অ্যাংলো-স্যাক্সন পৃথিবীটা নজর এড়িয়ে যাবে। ইংল্যান্ডের অবস্থার সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য কোন রাষ্ট্রের তুলনা চলে না; কারণ যে বিশাল সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ভাষার উপাদানে এ মহাদেশের সামাজিক পটভূমিকা গঠিত তার সঙ্গে একমাত্র আমেরিকারই তুলনা চলে।

সুতরাং জার্মানিকে যদি বলিষ্ঠ সীমান্ত নীতি কাজে পরিণত করতে হয়, তবে ইউরোপে তাকে নতুন জায়গা দখল করতে হবেই। উপনিবেশগুলো কখনই এ উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেগুলো বৃহৎ ভাবে ইউরোপীয়দের বসবাসের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের কলোনী শাস্তিপূর্ণ উপায়ে দখল করার কোন উপায় ছিল না। তাই এ ধরনের উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করার অর্থ-ই ছিল প্রচুর পরিমাণে সামরিক প্রত্তুতি। সেই কারণে সামরিক সংগ্রাম ইউরোপের মধ্যেই জায়গা দখল করা সাগরের ওপারে কোন জমি দখল করার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব সম্ভব ছিল।

অবশ্য এ মতবাদের জন্য প্রযোজন জাতির একত্রিত শক্তি এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা; এ ধরনের নীতি সফল করার জন্য এতে জড়িত প্রত্যেকের প্রতি আনন্দ, উৎসাহ এবং শক্তির প্রয়োজন, কখনই হেলাফেলায় চিত্তবিক্ষিণ অবস্থাতে এর রূপায়ণ সংষ্করণ নয়। জার্মান সম্ভাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই সময়ে এর উদ্দেশ্য সফলের নিমিত্তে নিয়োজিত করা উচিত ছিল। এ কাজ সম্পাদন করার আগে আর কোন কাজে হাত দেওয়া উচিত হ্যানি। এবং এর সম্পাদনা সুচারুরপে শেষ করার উপায় খাঁজ বার করাই ছিল এ নেতৃত্বের প্রধান কাজ।

জার্মানির এ সত্য উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে এ ধরনের কাজ একমাত্র মূল্য দ্বারাই সম্পাদন করা সম্ভব; সুতরাং সেই যুদ্ধে আগে থেকে সবরকম সংকল্প নিয়ে নামা উচিত ছিল।

পুরো মৈত্রী সম্পর্কটার মুখোযুথি এবং মূল্যায়ণ করা উচিত ছিল এ দৃষ্টিকোণ থেকে, যদি ইউরোপে নতুন অঞ্চল অধিকার করতেই হত, তবে তা করা উচিত ছিল রাণিয়ার জমি থেকে, এবং নতুন জার্মান সম্বাধ্যের সেই আগেকার রাস্তাতেই চলা উচিত ছিল, যে একদা টিউটনিক নাইটদের পদাঘাতে লাঙ্কিত। এবারে অবশ্য জার্মান লাঙ্গলের জন্য জমি জার্মান তরবারী দিয়েই দখল করতে হবে, যাতে জাতিকে তার নিত্য প্রয়োজনীয় ঝটি সরবরাহ করা যায়।

এ নীতি সফলভাবে রূপায়ণের জন্য ইউরোপের মাত্র একটা দেশের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। সেটা হল ইংল্যান্ড।

একমাত্র ইংল্যান্ডের সঙ্গে মৈত্রী বক্ষনের দ্বারাই এ নতুন জার্মান ধর্ম-যুদ্ধে তার রথের পেছনের ঢাকা বক্ষা করতে সমর্থ। এ অভিযানের স্বপক্ষে যুক্তি এত বলিষ্ঠ, পূর্ব পুরুষেরা এর বিপক্ষে যেসব যুক্তি দেখিয়েছে সেগুলো অত নির্ভরশীল মোটেই নয়। পূর্বদেশের অধিকৃত জমিতে উৎপাদিত শস্যের দ্বারা তৈরি ঝটি খেতে শাস্তিবাদীরা কথনই গরুরাজী হবে না, যদিও প্রথম লাঙ্গলকে ব্যবহার করতে তরবারী হিসেবেই বলা হয়েছে।

কোন ত্যাগই মহান নয়, যদিও ইংল্যান্ডের বন্ধুত্বের নিমিত্ত এটা প্রয়োজন। উপনিবেশ এবং নৌ-শক্তিতে একইস্বরে সন্তুষ্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখা পরিত্যাগ করা উচিত এবং বৃত্তিশ শিল্পের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাটাও উচিত হবে না।

একমাত্র সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট নীতির সাহায্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। এ নীতি অবশ্য পৃথিবীর বাজার জয়ের চেষ্টাটাকে পরিহার করতে বলবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন এবং নৌ-যুদ্ধে শক্তিমান হওয়ার আশাটাকেও পরিত্যাগ করতে হবে। রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি এ স্থল যুদ্ধে নিয়োজিত করার আবশ্যক। এ নীতি বলিষ্ঠ এবং মহান ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানে কিছুটা আঘাত্যাগ স্থিরাক করতে বলবে।

এমন এক সময় ছিল যখন ইংল্যান্ড এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একটা রফায় আসত; ইংল্যান্ড ভালভাবেই বুঝেছিল, নিয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে জার্মানির সমস্যাটা। ইংল্যান্ডের সাহায্যে ইউরোপে অথবা পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্তে তার জমি দখল নিতান্তই প্রয়োজন।

এ দৃষ্টিভঙ্গিই হয়ত বা এ শতাব্দীর শেষে লক্ষনকে জার্মানির এত কাছাকাছি টেনে এনেছিল।

এ প্রথম জার্মানির মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যার পরিণতি নেহাত-ই করুণ। লোকে এ অসুস্থী ধারণা নেয় যে পরে হয়তো বা আমরা ইংল্যান্ডের কাছে তাদের বাদাম আগুন থেকে উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য তৈরি থাকবে। এ যেন একটা মৈত্রী সম্পর্ক, শুধু দেওয়া নেওয়ার পরিবর্তে আর যে কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে বেড়ে উঠতে পারে। এবং ইংল্যান্ডকেও সেই পারম্পরিক দর কষাকষির দলে ফেলা যায়। বিটিশ কুটনীতিজ্ঞরা তখনো ঘন্থেট বৃক্ষিমান, যে কাজ ইতিমধ্যেই করেছে, তারা জানে এর সমতুল্য প্রাপ্তি আসন্ন।

ধৰে নেওয়া যাক, ১৯০৪ সালে আমাদের জার্মানদের বৈদেশিক নীতি অত্যন্ত ধূর্তমির সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল, যা জাপানীদের সঙ্গে আমাদেরও অংশগ্রহণে বাধ্য করে। এর ফলাফলের তীব্রতা সহজে বোধা সম্ভব নয়, যার ফলাফল জার্মানিকেই ভোগ করতে হয়েছিল।

মহাযুদ্ধ না হতেই ১৯০৪ সালে যা রক্তপাত হয়েছে — ১৯১৪ পর্যন্ত তার এক দশমাংশ রক্তপাত হত কিনা সন্দেহ। এবং আজকে পৃথিবীর মানচিত্রে জার্মানি কত উচুতে স্থান পেত।

যে কোন শর্তে অন্তিমার সঙ্গে মৈত্রীর বক্ষন তখন অসম্ভব ছিল।

এ গলিত শবের মত রাষ্ট্রটা কখনই জার্মানির সঙ্গে নিজেকে জড়াত না যুদ্ধের উদ্দেশ্যে। বরং চিরহায়ী শান্তি বজায় রাখত, যার দ্বারা ধীরে ধীরে জার্মানদের এ দৈত রাজতন্ত্রের থেকে নির্মূল করা যায়।

চরিত্রের এ অস্থাভাবিকতার আরেকটা দিক হল জার্মান জাতীয় স্বার্থরক্ষায় ওরা কখনই সক্রিয়ভাবে পাশে এসে দাঢ়াত না। কারণ তখন ওরা নিজেরাই উপলক্ষ্মি করত যে নিজেদের নীতি, অর্থাৎ নিজেদের সীমান্তের ভেতরেই জার্মানদের নির্মূল করার কাজ চালিয়ে যাওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি জার্মানি নিজেরাই দৃঢ় জাতীয় মনোভাবের সাহায্যে এবং যথেষ্ট পরিমাণ নির্দয়তার সঙ্গে এ হাবুসবুর্গ রাষ্ট্রের দশলক্ষ অধিবাসীর ভাগ্য নির্ধারণের খেলায় না জড়াত। তবে হাবুসবুর্গ কখনই মহান এবং সাহসী জার্মানদের মদত দিত না। পুরনো জার্মান রাষ্ট্রের মনোভাব অস্ত্রিয়ার প্রতি হল জাতির বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে অক্রান্ত পরিশৃম করার ক্ষমতার পরীক্ষার মত।

যাহোক, জার্মানদের ওপর নির্যাতনের নীতি অস্ত্রিয়াকে চালিয়ে যেতে দিতে কখনই উচিত হয়নি, বাধা দেওয়া দূরে থাক। বরং বছর বছর তা বেড়ে গিয়ে শক্তিশালীই হয়েছে। অস্ত্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর মূল্যায়ণ সঠিক হত যদি সেখানকার জার্মানদের ওপরে তুলে ধরা যেত। কিন্তু তা করা হয়নি।

তারা স্বপ্ন দেখেছিল পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের; কিন্তু ধূম থেকে জেগে উঠে দেখে বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে তারা দাঁড়িয়ে।

এ শান্তির জন্য স্বপ্ন দেখার পেছনে এক গভীর অর্থ নিহিত ছিল, কারণ ওপরে উল্লিখিত তৃতীয় পথ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জার্মানির সম্প্রসারণকে বেছে নেওয়ার কথা কর্তব্যের মধ্যে ধরা হয়নি। ব্যাপারটা হল নতুন জমি দখল করে সীমাত্ব বাড়ানো একমাত্র পূর্বদিকেই সম্ভব ছিল; কিন্তু তা করতে গেলে যুদ্ধ অনিবার্য, তখন তারা যে কোন মূল্যে শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। জার্মানির এক সময়ের বৈদেশিক নীতির ধূয়া ছিল; জার্মান জাতির সংরক্ষণে যে কোন পথ বেছে নাও। এখন সেটার পরিবর্তন হয়ে দাঁড়িয়েছে : যে কোন উপায়ে পৃথিবীর শান্তি রক্ষা করতে হবে। আমরা অবশ্য এর ফলাফল জানি। আমি এ বিষয়ের ওপর আরো বিশদভাবে পরে আলোচনা করব।

তবে আরেকটা বিকল্প পথ হল, যাকে আমরা চতুর্থ বলতে পারি। এটা হল শিল্প এবং পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য, নৌ-শক্তি এবং উপনিবেশ স্থাপন।

এ ধরনের উন্নতি অনেক তাড়াতাড়ি এবং সহজে করা সম্ভব। কোন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন এক অতি ধীর গতিসম্পন্ন পদ্ধতি; প্রায়ই সেটা পুরো শতাব্দী জুড়ে করতে হয়। তবু বলতে হবে, এর জন্য প্রয়োজন অর্থশক্তির। হঠাতে অতি উৎসাহের বশে এ কাজ করা কখনই সম্ভব নয়, বরং ধীরে ধীরে অনেক বাধা বিঘ্ন সহ্য করেই এটা করা যায়, যা শিল্প উন্নতির চেয়ে একেবারে ভিন্ন। শিল্পান্তি কয়েক বছর সময়ের মধ্যে বিজ্ঞাপনের দ্বারা করা সম্ভব। অবশ্য এর ফলাফল খুব একটা দৃঢ় ভিত্তি সম্পন্ন হয় না। বরং দুর্বল, যাকে সাবানের বুদ্বুদের মত ক্ষণহায়ী বলা যেতে পারে। নতুন সীমাত্ব অধিকার করে সেখানে কৃষক বসিয়ে কৃষি কাজের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার চেয়ে একটা পুরো নৌ-বহর গড়ে তোলা অনেক বেশি সহজ কাজ।

কিন্তু একথাও সত্যি যে পুরো নৌ-বহর ধৰ্মসও কৃষিক্ষেত্রের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি হয়। এ পদ্ধতিকে অনুসরণ করার অর্থই হল আজ হোক্ কাল হোক্ জার্মানিকে যুদ্ধে জড়িয়ে

পড়া,— এটা জার্মানির বোৰা উচিত ছিল। একমাত্র ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষেই বিশ্বাস করা সম্ভব যে মিটি এবং তৈলাক্ত মধুর সঞ্চারণ অবিরত অকপট খীকার দ্বারাই তাদের কলার ভাগ পেতে পাবে, যা তারা ধরে নিয়েছিল জাতিশুলোৱ বস্তুত্বের বিনিময়ে পাবে, এবং তার জন্য কখনো তাদের যুদ্ধে নামতে হবে না।

একবার আমাদের এ পথ বেছে নেওয়াৰ অৰ্থই হল আজ হোক্ কাল হোক্ ইংল্যাণ্ড আমাদের শক্তি হতে বাধ্য। অবশ্য আমাদেৱ বোকার মত ধাৰণাৰ সঙ্গে এটা ঠিক খাপ খেয়ে গিয়েছিল। তবুও আমাদেৱ ঘৃণা-মিশ্রিত রোষ বাড়ানো এৱ দ্বাৰা অমূলক ছিল। সত্যি বলতে কি, এমন একদিন এল যখন ত্ৰিচিশ আমাদেৱ শাস্তি প্ৰিয়তাৰ মোকাবিলা কৱল নিৰ্দয় চৰম হিংসা ব্যার্থবাদীতাৰ মাধ্যমে।

স্বাভাৱিকভাৱেই আমৱা এ কাজ কখনই কৱতাম না।

ৱাশিয়াৰ বিৱৰণে ইউৱোপেৰ সীমান্ত দৰ্থল নীতি সফল কৱা সম্ভব হত যদি আমৱা ইংল্যান্ডেৰ সঙ্গে মৈত্ৰী বহনে আবক্ষ হতে পাৰতাম। অপৱাদিকে একমাত্র ৱাশিয়াৰ সাহায্যেই উপনিবেশ স্থাপন এবং পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য কৱা সম্ভব ছিল। কিন্তু সে ক্ষেত্ৰে এ নীতিৰ আগাগোড়া ফলাফল ভোবে সচেতন মন নিয়ে গ্ৰহণ কৱা উচিত। সবচেয়ে আগে যেটা প্ৰয়োজন অন্তিয়াকে সবাৰ আগে বাতিল কৱা।

শতাব্দীৰ শেষে অন্তিয়াৰ সঙ্গে মৈত্ৰী প্ৰকৃত অৰ্থেই সমস্ত দিক থেকে নিৰৰ্থক হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু ইংল্যান্ডেৰ বিৱৰণে দাঁড়ানোৰ জন্য ৱাশিয়াৰ সঙ্গে মৈত্ৰী সম্পর্ক স্থাপনেৰ কথা কেউ চিন্তা কৱেনি, তেমনি ৱাশিয়াৰ বিৱৰণে দাঁড়াবাৰ জন্য ইংল্যান্ডেৰ সঙ্গে মৈত্ৰী সম্পর্ক স্থাপনেৰ কথা ও কেউ ভাবেনি। কাৰণ উভয়ক্ষেত্ৰেই ফলাফল গিয়ে যুদ্ধে পৰিপতি লাভ কৱত এবং একমাত্র যুদ্ধ এড়াতেই শিল্প এবং বাণিজ্য নীতিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এটা তৎকালে বিশ্বাস কৱা হয়েছিল, যে শক্তিৰ সাহায্যে চিৰদিনেৰ জন্য পৃথিবী জয়েৰ বদলে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বাৰা পৃথিবীটা জয় কৱা সম্ভৱ; এবং এটা শাস্তিপূৰ্ণ নীতিও বটে।

অবশ্য মাঝে মাঝে এ নীতিটা সম্বন্ধে সন্দেহেৰ অবকাশ যে থাকত না, তা নয়। বিশেষ কৱে বেশ কয়েকবাৰ যখন ইংল্যান্ডেৰ দিক থেকে ধাৰণাৰ অতীত সাবধান বাণী উচ্চারিত হল, — এ কাৰণেই নৌ-বহুৰ তৈৱি কৱা হয়েছিল। ইংল্যান্ডকে আক্ৰমণ বা লাঙ্ক্ষিত কৱাৰ উদ্দেশ্য নয়। একমাত্র পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপনেৰ মতবাদটাকে সংৰক্ষণেৰ নিমিত্তে, — যা ওপৱে বলা হয়েছে, এবং সেই শাস্তিপূৰ্ণ উপায়ে পৃথিবীটা জয়েৰ উদ্দেশ্যেই এ কাজ কৱা হয়েছিল। সে কাৰণে এ নৌ-বহুৰ একটা নিৰ্দিষ্ট পৰিসীমাৰ মধ্যে ধৰে রাখা হয়েছিল। নৌ সংখ্যা এবং ওজনেৰ দিক থেকে নয়, যুদ্ধাৰ্থে প্ৰস্তুতিৰ দিক থেকেও। এ উদ্দেশ্যেৰ পেছনে এ নীতিই কাজ কৱেছে। আমৱা প্ৰমাণ কৱতে তৎপৰ যে এ নৌ-বহুৱেৰ সৃষ্টি শাস্তি স্থাপনেৰ জন্য প্ৰয়োজন, — যুদ্ধেৰ কাৰণে নয়।

বাণিজ্যিক উপায়ে শাস্তিপূৰ্ণভাৱে পৃথিবী জয়েৰ ব্যাপারটা সম্ভবত রাষ্ট্ৰেৰ আদৰ্শ পৰিচালনাৰ ব্যাপারে সবচেয়ে নিৰৰ্থক বস্তু। এ নিৰৰ্থক ব্যাপারটা বোকামীৰ চৰম পৰ্যায়ে ওঠে যখন ইংল্যান্ডকে এ ব্যাপারে উদাহৰণ হিসেবে দেখিয়ে বলা হয় যে ব্যাপারটা বাস্তবে কিভাৱে প্ৰয়োগ কৱতে হয়। ইতিহাস সম্পর্কে আমাদেৱ মতবাদ এবং রাজ্য সম্বন্ধে আমাদেৱ

তথাকথিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধ্যান-ধারণা অপূরণীয় ক্ষতি করেছে এবং আমাদের লোকেরা না বুঝে কিভাবে ইতিহাস শেখে। সত্য বলতে কি —, বাণিজ্যিক উপায়ে পৃথিবীটা জয়ের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড হল যুক্তিপূর্ণ উদাহরণ। ইংল্যান্ড ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন জাতি বাণিজ্যিক উপায়ে পৃথিবী জয়ের জন্য তরবারী ধরেন এবং অপর কোন জাতি এত নির্দয়তার সঙ্গে এ বিজয়কে সংরক্ষণ করেন। ব্রিটিশ রাজনীতি বিদ্যা বিশারদদের কি এটা চারিত্রিক গুণ নয়, যে তারা জানে রাজনৈতিক শক্তিটাকে অর্থনৈতির সাফল্যে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, এবং বিপরীতভাবে অর্থনৈতির সাফল্যটাকে রাজনীতির শক্তি হিসেবে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়? কি বিশ্বয়র ভূল এটা ভেবে নেওয়া যে ইংল্যান্ড তার নিজস্ব অর্থনৈতিক সম্পদসারণের জন্য নিজের রক্ত ঢালবে না। ইংল্যান্ডের নিজস্ব জাতীয় সৈন্যদলে এ সত্যের কোন মূল্য নেই। সেই ব্যাপারে এ মুহূর্তে এটা সামরিক প্রধান রাজ্য নয়, বরং হাতের কাছে যা সৈন্য পাওয়া যায় তা দিয়ে কাজ সারে— মনের জোরে আর গতব্যে পৌঁছনোর স্থিরতায়। ইংল্যান্ডের প্রয়োজন মাফিক সৈন্য দল সবসময়ই ছিল এবং আছে। সে সবসময়ই যুদ্ধ করে এসেছে সেইসব অন্ত দিয়ে যা যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রয়োজনীয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যাপ্ত বেতন দেওয়া সম্ভব, ততক্ষণ পর্যন্ত বেতন ভোগী সৈন্যদলের সাহায্যেই সে লড়ে এসেছে। কিন্তু যখন আঘাতাগের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে — সেই মুহূর্তে বিজয়ের জন্য জাতির রক্ত ঢালতে সে কসুর করেনি। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে এ সংগ্রাম করার ইচ্ছা, একগুঁয়ে মনস্থিরতা এবং নির্দয় সামরিক ব্যবহার একভাবে বজায় রেখেছে।

এ অসংগতিপূর্ণ ধ্যান ধারণা ধীরে ধীরে কিন্তু যত্নের সঙ্গে জার্মান জীবনের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে গেছে। এ অবমূল্যায়নের জন্য আমাদের ভাল মতই জরিমানা দিতে হয়েছে; এ প্রবঞ্চনা এত গভীরে যে ইংরেজদের আমরা ধূর্ত ব্যবসায়ী হিসেবে ঘৃণাই করে এসেছি; এবং ব্যক্তিগতভাবে ধরে নিয়েছি এরা অবিষ্মাস্যভাবে অতি নিচু ধাপের কাপুরষ। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের ইতিহাসের গর্বিত শিশুকরা তাদের ছাত্রদের কাছে এ সত্য কখনই উদ্ঘাটিত করেনি যে উধূমাত্র প্রতারণা আর জোচুরি দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত এতবড় একটা সম্রাজ্য কখনই গড়ে তোলা সম্ভব নয়। যে কয়েকজনের চোখে পড়েছিল এ সত্য, হয় তারা চূপ করে থেকেছে, নয় এড়িয়ে গেছে। আমি শ্পষ্ট অরণে আনতে পারি আমার কয়েকজন সহকর্মীর মুখাবয়ব, যখন তারা যুদ্ধক্ষেত্রে গোরা সৈন্যদলের প্রতাপ দেখে বোকার মত পরস্পরের মুখ নিয়োক্ষণ করেছে। কয়েকদিন যুদ্ধের পর আমাদের সৈন্যরা উপলব্ধি করে যে এ ক্ষটগুলো ঠিক তাদের মত নয়, যা জার্মানরা এতদিন ধরে বলে এসেছে বা ব্যাপারক বর্ণনাকারীর পর পত্রিকায় এবং সরকারি ইন্স্টারারে প্রকাশ করেছে।

এ সময়েই আমি প্রথম এ বিভিন্ন ধরনের প্রচার ব্যবস্থাগুলোর যোগ্যতা বিচার করি।

এ মিথ্যা প্রকাশ, যারা বুঝিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য সাধন করে। ইংরেজদের প্রতি এ ব্যঙ্গ, যা মিথ্যা হলেও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাণিজ্য দ্বারা যে পৃথিবী জয় সত্ত্ব সেই ধারণার সহায়ক হয়েছিল। ইংরেজরা যেভাবে সফল হয়েছে, আমাদের সাফল্যাও সেইভাবে আসবে। আমাদের অনেক বেশি সাধুতা এবং স্বাধীনতা তথাকথিত বিশ্বাসঘাতক ইংরেজদের থেকে অনেক বড় সম্পদ যা আমাদের পক্ষের শক্ত হতিয়ার। সুতরাং ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ছোট ছেট জাতের মহান্বৃতি এবং শক্তিশালী জাতিবর্গের অবস্থা আমাদের পক্ষে অর্জন করা খুব সহজেই হবে।

আমরা উপলক্ষি করিনি, যে আমাদের সাধুতা অন্যদের আমাদের প্রতি বিরূপ করে তুলেছে, কারণ আমরা নিজেরাই এটাতে বিশ্বাস করিনি। বাকি পৃথিবীটা আমাদের ব্যবহারকে ধূর্ত প্রবন্ধনাপূর্ণ ব্যবহারের প্রকাশ বলে ধরে নেয়; কিন্তু যখন বিপ্লব আসে তখন বিশ্বে তারা দেখে যে আমাদের মানসিক ভাবধারা আন্তরিকভাবপূর্ণ হলেও নিমুজ্জিতার সীমার বাইরে।

একবার যদি আমরা বুঝতে সক্ষম হই যে শাস্তিপূর্ণ উপায়ে বাণিজ্য দ্বারা পৃথিবী জয়ের কল্পনা করত্বানি নিরর্থক, তবে আমরা স্পষ্ট অন্য বিষয় ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রীর নিষ্ফলতাও উপলক্ষি করতে পারব। কি অবস্থায় এ মৈত্রী গড়ে তোলা হয়েছিল? অঙ্গীয়ার সঙ্গে মৈত্রীতে, এমন কি ইউরোপেও আমাদের পক্ষে সীমান্ত বাড়ানো সম্ভব হয়নি। এ সত্যটাই ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রীর ভেতরকার দুর্বলতা। একজন বিসমার্ক তার নিজের কিছু প্রয়োজনের বদলে অন্য জিনিস ব্যবহার করতে সক্ষম, কিন্তু তার কদর্য উত্তরাধিকারীদের পক্ষে এটা কখনই সম্ভব নয়, এবং সর্বোপরি বিসমার্ক যে ভিত্তের উপর ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রী গড়ে তুলেছিল, তার যখন আর কোন অঙ্গীয়াই নেই।

বিসমার্কের সময়ে তবু অঙ্গীয়াকে জার্মান রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা চলত; কিন্তু ধীরে ধীরে সার্বজনীন ভোটাধিকার পর্ব শুরু হওয়ার পর দেশটা সংসদীয় হট্টগোলের জায়গায় পরিণত হয়, যেখানে জার্মানদের কঠিন্তর কদাচিত্ত শোনা যেত।

জাতিগত নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অঙ্গীয়ার সঙ্গে এ মৈত্রী সর্বনাশ। একটা নতুন শ্বাত মহাশক্তি জার্মান সম্রাজ্যের সীমান্ত বরাবর জেগে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ এ শক্তির জার্মান সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা রাশিয়ার থেকে ভিন্ন প্রকৃতি। এ মৈত্রী তাই শূন্যগর্ত এবং দুর্বল হতে বাধ্য; কারণ এর সদস্যরা তাদের ক্ষমতা হারিয়ে একে একে সরকারি অফিসগুলো থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর কাছাকাছি অঙ্গীয়ার সঙ্গে এ মৈত্রীর সম্পর্কটা ঠিক অঙ্গীয়া আর ইতালির মৈত্রী সম্পর্কের পর্যায় এসে দাঁড়ায়।

এখানেও একমাত্র একটাই বিকল্প ছিল; হয় হাবুসবুর্গ রাজতন্ত্রকে সমর্থন জানানো, না হয় অঙ্গীয়াতে জার্মানির নির্যাতনের প্রতিবাদ করা। কিন্তু বিশেষভাবে বলতে গেলে কেউ যদি এ পথ ধরে এগোয়, শেষপর্যন্ত তা গিয়ে শেষ হবে প্রকাশ সংঘর্ষে।

মনস্ত্বের দিক থেকেও এ ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রীর মূল উদ্দেশ্য আন্তরক্ষার ব্যবস্থাহাস করা। অথচ অপরপক্ষে এ ধরনের মৈত্রীর উদ্দেশ্যই হল পরম্পরের শক্তি সংযোজন করা, যে দল যত বাড়বে ততই তা বাস্তবে লক্ষ্য বস্তুর প্রতি সম্প্রসারণ হওয়া উচিত। এখানেও সর্বক্ষেত্রের মত সংরক্ষণে শক্তির প্রকাশ নয়, আক্রমণই হল সত্যিকারের শক্তির পরিচয়।

এ সত্য অন্যান্যরা উপলক্ষি করলেও তথাকথিত সংসদীয় সদস্যরা দুর্ভাগ্যবশত তা বুঝতে সক্ষম হয়নি। ১৯১২ সালের প্রথমপাদে লুডেনডোর্ফে যে সামরিক বাহিনীর কর্ণেল এবং অফিসার ছিল, একটা শ্বারকলিপিতে মৈত্রীর এ দুর্বল দিকটাকে তারা তুলে ধরে। কিন্তু রাষ্ট্রনেতারা সেই দলিলের কোন রকম গুরুত্ব দেয় না। সাধারণভাবে ঘনে হয়, এ ধারণা মানুষদের কাছে প্রযোজ্য, কিন্তু উন্নততর প্রজাতি যারা কুটনীতিজ্ঞ নামে পরিচিত, তাদের ক্ষেত্রে এ ধারণা অচল।

জার্মানির ভাগ্য বলতে হবে যে ১৯১৪ সালের যুদ্ধ সোজাসুজি এ কাবণ্যে অঙ্গীয়ার সঙ্গে বাধে যার জন্য হাবুসবুর্গ এ যুক্তে অংশ নিতে বাধ্য হয়; যদি এ যুক্তের শিকড় অন্যবক্ষ হত

জার্মানিকে তার নিজের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে একা ফেলে দিত। হাবুসবুর্গ কখনই এমন কোন যুদ্ধে নিজেকে জড়াত না বা অংশ নিতে রাজী হত না যার শিকড় জার্মানিতে; অথবা যে যুদ্ধের জন্য জার্মানি দায়ী। এক্ষেত্রে যেসব অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, অস্ত্রিয়াও সেই পথেই যেত। সোজা কথা বলতে গেলে, যদি জার্মানিকে নিজের কোন কারণে যুদ্ধে নামতে হত তবে অস্ত্রিয়া তার নিজের স্বার্থরক্ষায় অর্থাৎ যাতে কোনরকম বিপ্লব না বাঁধে, তার জন্য যুদ্ধ আবশ্যের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে নিরপেক্ষ রাখত।

শ্বাভেরা জার্মানিকে সাহায্যের অনুমতি দেওয়ার চেয়ে ১৯১৪ সালেই এ দ্বৈত রাজতন্ত্রকে গুঁড়িয়ে দিত; কিন্তু সেই সময়ে অতি অল্প সংখ্যক মুষ্টিমেয় লোকই বুবতে পেরেছিল এ দানুবিয়ান রাজতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রীর বিপদ।

প্রথমত অস্ত্রিয়ার শক্তসংখ্যা অনেক ছিল যারা সাথে এ জীর্ণ শীর্ণ রাষ্ট্রটাকে পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে দখল করার তালে ছিল; সুতরাং এরা ধীরে ধীরে জার্মানির প্রতি একধরনের তৌর ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করে। কারণ জার্মানি হল এ দ্বৈত রাজতন্ত্র তেওঁে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ার পথের একমাত্র বাধা। এ দ্বৈত রাজতন্ত্র লওভগ হয়ে পড়ুক এটাই ওদের আশা এবং এ ব্যাপারে তাদের তৌর শৃঙ্খলা ছিল। ওদের ধারণা গড়ে ওঠে যে বার্লিনের মধ্যে দিয়েই একমাত্র ডিয়েনাতে যাওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, এ নীতি গ্রহণ করে জার্মানিকে অন্যান্যদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ার সবচেয়ে ভাল সুযোগ নষ্ট করে। এসব সংজ্ঞাবনার বদলে যে কেউ অনুভব করতে পারত জার্মানির সঙ্গে রাশিয়া, এমনকি ইতালি ও সম্পর্কের একটা টানাপোড়েন চলেছে। এবং এসব সঙ্গেও এটা সত্যি যে অস্ত্রিয়ার প্রতি রোমের মনোভাব বিদ্বেষ ভাবাপূর্ণ হলেও, জার্মানির প্রতি তাদের ধারণা বৰুৱপূর্ণ ছিল। এ শক্ত পক্ষীয় মনোভাব প্রতিটি ইতালিয়ানের ভেতরেই সুষ্ঠু অবস্থায় ছিল, এবং যে কোন ছুতানাতায় তা ব্যাপকভাবে ঝুঁপ নিত।

বাণিজ্য এবং শিল্প নীতি গ্রহণ করায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোনপ্রকার ইচ্ছেই কারোর মধ্যে ছিল না। একমাত্র জার্মান এবং রাশিয়া, এ দেশের শক্তরাই এ অবস্থায় তেতরে যুদ্ধ বাঁধাবার জন্য সক্রিয় ছিল। সত্যি বলতে কি, একমাত্র ইহুদী এবং মার্কসীষ্টরাই উত্তেজিত করার চেষ্টা করত।

তৃতীয়ত, এ মৈত্রী নিরাপত্তার পক্ষে একটা চিরস্থায়ী বিপদ হয়ে দেখা দেয়। যে কোন বৃহৎ শক্তি যারা বিসমার্ক সাম্রাজ্যের প্রতি শক্তি ভাবাপন্ন ছিল তাদের পক্ষে সেই রাষ্ট্রগুলোর সৈন্য সমাবেশ করা সহজ ছিল, কারণ অস্ত্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলে জার্মানকে লুণ্ঠন করার সুযোগ পাওয়া যাবে — স্বেফ প্রলোভনে লুক হয়ে।

অস্ত্রিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপের পূর্ব দেশগুলোকে একত্রিত করা কিছুমাত্র কঠিন কাজ ছিল না, বিশেষ করে রাশিয়া আর ইতালিকে। রাজা এডোয়ার্ডের নেতৃত্বে পৃথিবীর যেসব দেশ সম্মেলনে যোগ দেয়, তা কখনই সত্যে পরিণত হত না, যদি না জার্মানির যিত্র অস্ত্রিয়া তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা প্রলুক্ত না করত। এ সত্যটাই একমাত্র সংবর্ধ করে তুলেছিল এতগুলো রকমারি রাষ্ট্রের পাঁচ মিশেলি, যাদের স্বার্থ একটা বিন্দু থেকে নানাদিকে বিচ্ছুরিত, যা তাদের সবাই মিলে একটা সৈন্যশৈলী সুসংবন্ধ করতে সাহায্য করেছে। প্রতিটি সদস্য কল্পনা করছে অস্ত্রিয়ার খরচায় নিজেদের ধনী করতে পারবে যদি তারা জার্মান আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। তুর্কী পর্যন্ত এ দুর্ভাগ্যজনক মৈত্রীর মৌন সমর্থকের দলে ডিডে জার্মানির বিপদটাকে বাড়িয়ে খুব বিপজ্জনক সীমায় নিয়ে গেছে।

ইহুদী আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা এ টোপ স্রেফ জার্মানিকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে অস্ত্রিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। কারণ অন্যান্য দেশের মত জার্মানি ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে কখনই তাদের নেতৃত্বকে মেনে নেয়ানি।

এ উপায়েই অনেকগুলো রাষ্ট্রকে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছিল যাতে অস্তপক্ষে দলে ভারী হওয়া যায়, যা দৈহিক সংঘর্ষের শিখ বিশিষ্ট সীগ্রামীডের* সঙ্গে কাজে লাগবে।

হাবুসবুর্গ রাজতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্কে অস্ত্রিয়া থাকাকালীন আমি অত্যন্ত ঘৃণা করতাম এবং ব্যাপারটা গভীরভাবে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল; নিজের সঙ্গে অবিরত বোৰাপড়ার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আমি এ উপসংহারে আসি যা আগে বলেছি।

যে ছেউ গোষ্ঠীর মধ্যে আমি ঘোরাফেরা করতাম, সেখানেও আমি আমার মনোভাব গোপন করিনি যে এমন একটা রাষ্ট্রের সঙ্গে এ দুর্ভাগ্যজনক চুক্তি, শুধু দুঃখ কষ্ট পাওয়ার জন্যই যার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। যদি জার্মান তার থেকে মুক্ত না হয়, তবে তার ভাগ্যে মহাদুর্ঘটনা ডেকে আনবে। আমি এক মুহূর্তের জন্যও সেই অভিমত থেকে সরে দাঢ়াই নি। এমন কি বিশ্বযুদ্ধের বড় যখন কার্যকারণের জাহাজটাকে ভগ্নাবশেষ করে দিয়ে তার কার্যক্ষমতা প্রায় শেষ করে এনে তার জায়গায় নিয়েছে অন্ধ উৎসাহ, এমন কি সেই গোষ্ঠীর মধ্যেও শীতল এবং শক্ত বিষয়ের প্রতি বস্তুতাত্ত্বিক চিন্তাধারা আন্দোলিত হতে শুরু করেছে। ট্রেকের মধ্যেও এ সমস্যাগুলোর অবতারণা হলেই আমি বেশ উচ্চস্তরেই আমার মতামত তুলে ধরতাম। আমার অভিমত ছিল যে জার্মানি যদি হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের সঙ্গে তার সম্পর্কচ্ছেদ করে, তবে তার ক্ষতি কিছু হবে না, বরং শক্ত করবে। লক্ষ লক্ষ জার্মান শিরস্ত্রাণ পরোচিল একটা দুর্নির্ণয়ন্ত্রিত রাজবংশকে রক্ষা করার জন্য নয়, জার্মানদের পরিআশের জন্য।

যুদ্ধের আগে একদল জার্মানের অস্ত্রিয়ার সঙ্গে জার্মানির এ মৈত্রী সম্পর্কে সামান্য সংশয় ছিল; মাঝে মাঝে জার্মান গোড়া গোষ্ঠী এ মৈত্রীর ওপর বেশি আত্মবিশ্বাস রাখার বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করত। কিন্তু অন্য অন্য উপদেশাবলীর মত এটাকেও হাওয়ায় ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। সাধারণের ধারণা হল পৃথিবী জয়টা সমুচিত, তাতে আত্মত্যাগ নামমাত্র, কিন্তু সাফল্য প্রচণ্ড।

আবার একবার অদীক্ষিত মানুষগুলোর করার কিছু ছিল না, শুধু সোজা ধ্বংসের দিকে হেঁটে চলা ছাড়া এবং তাদের প্রিয়জনকে একই কাজ করতে প্রলুক্ত করত, যেমন করে ইন্দুরগুলো হ্যামলিনের বাঁশীওয়ালাকে অনুসরণ করেছিল।

আমরা যদি গভীরভাবে ব্যাপারটাকে পর্যালোচনা করি যা পৃথিবী জয়ের অনর্থক কল্পনা এতগুলো লোকের কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে, যে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে পৃথিবী জয় সম্ভব, এবং জাতির চরম লক্ষ্য এটাই হওয়া উচিত। আমরা খুঁজে দেখলে দেখতে পাব যে এটা দেহ মনের ব্যাধি থেকে উৎপন্ন যা জার্মান রাজনৈতিক চিন্তার দেহটাতে অনুপবেশ করেছিল।

প্রযুক্তি বিজ্ঞানের জার্মানিতে বিজয় এবং জার্মান শিল্পের চমৎকার প্রগতি এবং সমৃদ্ধি বাণিজ্য আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছিল যে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়ে ওঠার পক্ষে এগুলো পূর্ব-আবশ্যক।

* কার্লাইলের রূপকথায় দর্জিত, শিখবিশিষ্ট সীগ্রামীড়।

উপরত্ব নির্দিষ্ট গোটাকয়েক গোষ্ঠী তত্ত্বটার অনুভূতি সম্পর্কে প্রকাশ করতে শুরু করে যে একটা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এসব অঙ্গুত্ব ব্যাপারের ওপরেই নির্ভরশীল। সর্বোপরি অর্থনৈতিক স্বার্থ দেখার জন্য একটা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান করা উচিত। সুতরাং তারা এ অভিমতেই আসে যে অর্থনৈতিক গঠনশীলের ওপর বাস্ত্র নির্ভরশীল। এ ব্যাপারটাকে গৌরবাবিল করে দেখা এবং বলিষ্ঠ আর, স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয়।

এখন সত্য হল যে একটা রাষ্ট্রের বক্তৃগতভাবে কোন অর্থনৈতিক ধ্যান ধারণা বা প্রগতির ব্যাপারে করণীয় কিছু নেই। এটা পরম্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দলের থেকে উদ্ভূত কোন আঁট-সঁট ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কোন সীমাবদ্ধ পরিসীমা। রাষ্ট্র হল বেঁচে থাকা প্রাণীদের একটা সামাজিক ব্যবস্থা যা গোষ্ঠীর শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার প্রতিপালন করে থাকে, এবং সময়েচিত আয়োজন দ্বারা সে সেইসব জাতি বা শাখার শুধু অস্তিত্বই বজায় রাখে না; লালন পালনও করে। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আরো কয়েকটা সহায়ক পথের মত একটা পথ মাত্র। কিন্তু তাই বলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপই রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য বা মেরুদণ্ড নয়, যদি তা না মিথ্যা এবং অতিপ্রাকৃত কোন বস্তুর ওপরে তার ভিত্তি হয়ে থাকে। এবং এটাই ব্যাখ্যা করার পক্ষে যথেষ্ট যে এ কারণেই কোন রাষ্ট্রকে কোন নির্দিষ্ট সীমান্তের ভেতরে থাকতেই হবে, এমন কোন কারণ নেই যা রাষ্ট্রের উন্নতির একটা কারণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ শর্ত হল অত্যাবশ্যক তাদের কাছে যারা তাদের জাতিবর্গকে তাদের সত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেবে তাদের শিল্পের মাধ্যমে, এর অর্থ হল তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট।

যে সব লোক তাদের পথ থেকে গোপনে সরে গিয়ে অন্যের রাজনৈতিক দেহে পরগাছার মত অপরের দ্বারা বিজেতুর কাজ করিয়ে নেয় বিভিন্ন রকমের ভাগ করে, তারা যে রাষ্ট্র গড়বে সেই রাষ্ট্র কোন নির্দিষ্ট সীমার প্রয়োজন নেই। এটা বিশেষ করে কোন পরগাছা জাতির ক্ষেত্রে প্রয়োজন, বর্তমান সময়ে যারা মনুষ্যত্বের সততার দিকটার দোহাই পাড়ে; আমি অবশ্য সেই ইহুদীদের সম্পর্কে বলছি।

ইহুদী রাষ্ট্র কখনই একটা সীমার মধ্যে ছিল না। এটা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী ছড়ানো, কোথাও কোন সীমান্ত ছাড়া। সব সময়ই তাদের সদস্যরা বিশেষভাবে একটা জাতির থেকেই এসেছে। সেই কারণেই ইহুদীরা সর্বদা রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র তৈরি করেছে। একটা প্রধান প্রতিভাশীল কৌশল হল যা সব সময় অভিসন্ধিমূলক, ইহুদীরা তাদের রাষ্ট্র নামক জাহাজটাকে সব সময় ধর্মের ধর্জা উড়িয়ে নিয়ে গেছে, কারণ বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস সম্পর্কে আর্যদের বিশ্বাস অপরিসীম। কিন্তু এ কারুক্যার্যময় আইনের অর্থ আর কিছুই নয়, এ মতবাদের আড়ালে নিজেদের অর্থাৎ ইহুদী জাতির সংরক্ষণ। সুতরাং এ আইন তাদের সমাজবিজ্ঞান, রাজনৈতি, অর্থনৈতিক বিজ্ঞান, সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে শুধু লক্ষ্যে পৌঁছবার নিমিস্ত।

একটা প্রজাতির নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি হল তাদের সামাজিক সংগঠন করার প্রাথমিক কারণ।

সুতরাং রাষ্ট্র হল জাতিগত যাত্রিক গঠন, অর্থনৈতিক কোন সংস্থা নয়। এ দুটি বিষয়ের প্রথমে, এত বেশি যে ব্যাপারটা ধারণার অভীত যা আসাদের সমকালীন রাষ্ট্রনেতারা বোঝে না তারা এখন করে যে রাষ্ট্র একটা অর্থনৈতিক গঠনশীলীর ওপরে নির্ভরশীল, কিন্তু

সত্য ব্যাপার হল যে এটা উদ্ভৃত হয়েছে প্রজাতি এবং জাতিবর্গের সংরক্ষণের চেষ্টা থেকে।
কিন্তু এ শুণগুলো সব সময়েই কাব্য সংকৃতির ওপরে নির্ভরশীল, বাণিজ্যিক অহমিকায় নয়।
প্রজাতিদের সংরক্ষণের জন্য সর্বাঙ্গে প্রয়োজন একক ব্যক্তিত্বের আঘাত্যাগ। কবির নিচের
কথাগুলোর মানেই হল :

যদি তোমার জীবনটাকে পণ না কর,
তবে তুমি তোমার জীবনটাকে জয় করতে পারবে না।

শিলার : ভ্যালেনটাইন।

একক ব্যক্তিত্বের অভিত্বের আঘাত্যাগ জাতির রক্ষায় অতি প্রয়োজনীয়। সুতরাং এটা হল
জাতি স্থাপনে এবং সংরক্ষণের অতীব প্রয়োজনীয় একটা শর্ত, যা সমন্বয়ীয় এবং একই
জাতীয় চরিত্রের ওপরে নির্ভরশীল এবং একই বিষয়গুলো রক্ষণের নিমিত্ত যে কোন মূল্য দিতে
স্থির সংকল্পে অবিচল থাকা দরকার। যে সব লোকেরা তাদের নিজেদের সীমান্তের ভেতরে
বসবাস করে তারা স্বত্বাবতই এ কারণে তাদের বিশ্বাসধাতকতা এবং ছলচাতুরীর দিকটাই
উন্নত করে, যদি না আমরা স্বীকার করি যে এ চরিত্র তাদের সহজাত এবং রাজনৈতিক ধরন
ধারণের ওপর এত পরিবর্তন নির্ভর করে যা এ পরগাছা জাতির সহজাত অভিব্যক্তি।

রাষ্ট্রের প্রথম অবস্থায় মানুষের চরিত্রের এ বীরত্বপূর্ণ দিকটায় অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়, যা
আমি আগে বলেছি। এবং যারা এ অভিত্বরক্ষার সংগ্রামে প্রার্জিত হয়, অর্থাৎ যারা অধীনতা
স্বীকার করে নেয়, আজ হোক কাল হোক তাদের অদৃশ্য হয়ে যেতেই হবে, এবং একই পথের
পথিক তাদেরও হতে হবে যারা সংকৃতি ফেঁতে বলিষ্ঠতা না দেখিয়ে অভিত্বরক্ষার সংগ্রামে
নামবে বা অহমিকার বৃথা চর্চায় মনোনিবেশ করবে। এসব ফেঁতে প্রার্জয়ের কারণ বুদ্ধিমত্তার
অভাবের জন্য নয়, সাহস এবং দৃঢ় সংকল্পের অভাবের জন্যই এটা হয়ে থাকে। এ
ব্যাপারটাকে গোপন করার জন্য মানুষের অনুভূতি শক্তি বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা
হয়।

রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি কখনই অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না। উপরত্বু,
অর্থনৈতির সঙ্গে এর সম্পর্ক অতি অল্প বা নেই বললেই চলে। এবং এটা সুস্পষ্ট যে রাষ্ট্রের
অন্তর্ভুক্তি শক্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের একত্রে বিল খুব কমই থাকে। এর অনেক
উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যখন দেখা যায় অর্থনৈতিক প্রগতি সত্ত্বেও রাষ্ট্র ধর্মসের মুখে
এগিয়ে চলেছে। মানুষের সামাজিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নতির সময়ে রাষ্ট্রের শক্তি ও সর্বোচ্চ
হওয়া উচিত। বরং উল্টো হওয়াই বিচিত্র।

বিশেষ করে এটা বোঝা অত্যন্ত কষ্টকর যে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ এবং
সংস্কৃত করা সম্ভব এ বিশ্বাসের প্রচলন হয়, যদিও ইতিহাস এর বিরুদ্ধেই বাবে বাবে রায়
দিয়েছে। ক্রশিয়ার ইতিহাসই পরিজ্ঞানভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে নৈতিক চালই একটা রাষ্ট্র
গঠন করে, এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপারে কোন ভূমিকা নেই। এ নৈতিক
সীমাবদ্ধতার মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নতি করা সম্ভব এবং তা ফুলে ফেঁপে ওঠে যতদিন না পর্যন্ত
সৃজনশীল রাজনৈতিক ক্ষমতা হাস পায়। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক গঠনশৈলীও ভেঙে
পড়ে, যা আমাদের চোখের সামনে ভয়াবহভাবে ঘটে চলেছে। মনুষ্য জাতির বস্তুতাত্ত্বিক

উন্নতি বলিষ্ঠ নৈতিকতার ছায়াতেই একমাত্র বেড়ে ওঠা সত্ত্ব। যে মুহূর্তে তাদের জীবনের প্রাথমিক ধ্যান ধারণা হিসেবে গণ্য করা হবে, সেই মুহূর্তেই 'তা' তাদের অস্তিত্বটাকেই ধ্বসিয়ে দেয়।

যখনই জার্মানির রাজনৈতিক শক্তি বিশেষভাবে শক্তিশালী ছিল, তখনই অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে। কিন্তু যখনই মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক অবস্থা প্রধানতম স্থান নিয়েছে, তখনই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলোকে ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের ভিত্তি ধ্বসে পড়ে পেছনে পেছনে অর্থনৈতিক ধ্বংসও ডেকে এনেছে।

আমরা যদি সৃষ্টি এবং সংরক্ষণের জন্য কি কি প্রয়োজন, এ প্রশ্নটাকে বিবেচনা করি, তাহলে দেখতে পাব :

কর্মক্ষমতা আর সবার উন্নতির জন্য একক ব্যক্তিত্বের আগ্রহ্যাগ — এ গুণগুলোর মধ্যে অর্থনৈতির কোন সম্পর্কই নেই। একথা অতি সত্য, বৈষয়িক কোন উন্নতির জন্য মানুষ আগ্রহ্যাগ করে না। অন্য কথায় সে তার আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারে, কিন্তু ব্যবসার জন্য নয়। জনসাধারণের মনস্তত্ত্বের চমকপ্রদ দিকটা যা ইংরেজরা মহাযুদ্ধের সময়ে তুলে ধরেছিল, আমরা মনে হয় এর চেয়ে ভাল করে সাধারণের মনস্তত্ত্ব আর কেউ বুঝতে পারে নি। আমরা যুদ্ধ করেছিলাম কুটির জন্য; কিন্তু ইংরেজ ঘোষণা করে যে এটা তাদের মুক্তিযুদ্ধ। এবং তাও তাদের নিজেদের মুক্তির জন্য নয়। তারা তাদের ছেটে জাতির মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে চলেছে। জার্মানরা ইংরেজদের এ দৃষ্টায় হেসেছিল, এবং বলতে বাধা নেই মনে মনে কুন্তুও কম হয়নি। কিন্তু এভাবে তারা প্রমাণ করে দিয়েছিল যে আমাদের কূটনীতিজ্ঞদের মধ্যেও রাজনৈতিক সচেতনতা যুদ্ধের আগেই কত কমে গিয়েছিল, এ সব তথ্যকথিত কূটনীতিজ্ঞদের বিদ্যুমাত্র ধারণাও ছিল না যে কী শক্তি মানুষকে বেছায় এবং দৃঢ় সংকলনে মৃত্যুর মুখোমুখি এমে দাঁড় করিয়েছে।

১৯১৪ সালে যুদ্ধে যখন জার্মানরা বিশ্বাস করত যে তারা একটা আদর্শের জন্য যুদ্ধ করছে, ততদিন পর্যন্ত তারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেছে। যেইমাত্র বলা হয়েছে যে তারা দৈনন্দিন কুটির তাগিদায় যুদ্ধ করছে, তক্ষুনি তারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে সরে দাঁড়িয়েছে।

ধূর্ত রাষ্ট্রনেতারা এ পরিবর্তিত অনুভূতিতে বিশ্বাসাভূত হয়ে পড়ে। তারা একথাটা কখনই বুঝে উঠতে পারেনি যে যখন মানুষকে নিছক বস্তুতাত্ত্বিক কারণে ডাকা হবে, তখন তারা আপাপ চেষ্টা করবে মৃত্যু এড়িয়ে যেতে; মৃত্যু এবং বৈষয়িক ফলশক্তির উপভোগ পরম্পর বিরোধী ধারণা। এমন কি দুর্বলতম মহিলা নায়িকা হয়ে দাঁড়াবে যদি তার সন্তানের জীবন বিপজ্জনক অবস্থায় এসে দাঁড়ায়। সর্ব যুগে দেশ, জাতি এবং রাষ্ট্রকে রক্ষা করার তীব্র ইচ্ছাই মানুষকে তার শক্তির অন্তরে মুখোমুখি দাঁড় করায়।

নিচের ব্যাপারগুলোকে সত্য বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে যা সব সময় ভাল বলে প্রতিপন্থ হয়েছে :

একটা রাষ্ট্রে অভ্যন্তরে কখনই বাণিজ্যিক কারণে হয় না। এমন কি শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যিক সেবাতেও নহ। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের কারণ হল একটা গোষ্ঠীর প্রতিপালনের সহজাত প্রবৃত্তির থেকে। এ সহজাত প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি বীরত্ব ব্যঙ্গক বা ছল-চাহুরী পূর্ণ, যা-ই হোক না কেন। প্রথম অবস্থায় আমাদের রাষ্ট্র ছিল আর্য রাষ্ট্র; যার ভিত্তি কর্মের আদর্শে এবং সাংস্কৃতিক প্রসারণের ওপরে নির্ভরশীল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, আমাদের রাষ্ট্রে ইহুদীদের পরগাছা উপনিবেশে

নুপাত্তিরিত হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে অর্থনৈতিক স্বার্থ জাতি প্রীতি এবং সংস্কৃতির ওপরে প্রভৃতি বিশ্রার করে, তাঁলোক বা রাষ্ট্র শার ভেতরেই হোক না কেন, এ অর্থনৈতিক স্বার্থ এসব কারণগুলোকে আল্গা করে দিয়ে পরাত্ত এবং অত্যাচার ডেকে আনে।

যুদ্ধের পূর্বে জার্মানিতে এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে জার্মানির পৃথিবী জয় একমাত্র বাণিজ্যিক এবং উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমেই সুভব যা সত্ত্বকারের রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য অর্থাৎ জাতির সংরক্ষণ এবং অভ্যন্তর সেই লক্ষ্যেই বোগাক্ত হয়ে পড়ে। সংকল্প, দূরদৃষ্টি, ও বাস্তবতার দ্রুত অবনতি হতে পুরু করে। যে গুণগুলো রাষ্ট্রের সঠিক উন্নতির প্রধান সোপান। মহাযুদ্ধ এবং এর ফলাফল এ গুণগুলোকে একেবারে দেউলিয়া করে ছাড়ে।

যারা ব্যাপারটাকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেনি, তাদের কাছে জার্মানদের মনোভাব বিশেষভাবে অদ্বৰ্যীয় হেঁয়ালী বলে মনে হয়েছে। সর্বোপরি, জার্মানি নিজেই একটা সম্রাজ্যের সুন্দর উদাহরণ যা সম্পূর্ণ রূপে ক্ষমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। প্রশিয়া, যা নাকি জার্মান সম্রাজ্যের উৎপাদনক্ষম কোষ বলে পরিগণিত, তৈরি হয়েছিল নায়কোচিত কার্যকল্প দ্বারা। অর্থনৈতিক বা ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর ভিত্তি করে নয়। এবং সম্মাট নিজে এ নেতৃত্বের চমৎকার যোগ্য ব্যক্তি, যে নেতৃত্বে ক্ষমতার নীতি এবং সামরিক শৌর্য বীর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

তবে সেই একই জার্মানদের রাজনৈতিক সহজাত প্রকৃতির এটাটা অধঃপতন হল কি করে? এটা শুধু একটা একক ব্যাপারের ওপর নির্ভর করে এ অবক্ষয়িত অবস্থায় এসে পৌঁছায় নি, দেহমনের ব্যাধি দ্বারা উৎপন্ন রোগাদির অসংখ্য লক্ষণ প্রচণ্ডভাবে রাজনৈতিক দেহে ফুটে উঠেছিল। যা জাতির দেহটাকেই কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছিল বিষাক্ত ঘায়ের মত। মনে হচ্ছিল কেউ যেন অলঙ্কে এ নায়কোচিত দেহের বক্তে রহস্যজনক হাতে কোন বিষাক্ত তরল পদার্থ চুকিয়ে দিয়েছে, যা ব্যগ্ন হয়ে পড়েছে সর্বত্র। এবং ধীরে ধীরে ডেকে এনেছে শরীরের এ পঙ্গুতা, যার জন্য নিজেদের সংরক্ষণের সহজাত প্রবৃত্তিটাই হারিয়ে ফেলেছে।

১৯১২—১৪ সালে আমি এ সমস্যাগুলো নিয়ে নিত্য নিজের মনে তোলপাড় করতাম, যার সঙ্গে এ ত্রি-পাঞ্চিক মৈত্রী এবং অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কটাকে সম্মাট অনুসরণ করত। আবার আমি এ মতে উপস্থিত হই যে এ হেঁয়ালীর একমাত্র কারণ হল সেই শক্তির প্রভাব যার সঙ্গে আমার পরিচয় ভিয়েনাতে। যদিও তা' আমি অন্য ধরনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি। যে শক্তির কথা আমি বলেছি তা' হল মার্কসীয় শিক্ষা। সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি — সমগ্র জাতির মধ্যে যার পরিবাস্তি।

আমি আবার দ্বিতীয়বার জীবনে এ বিধ্বংসী শিক্ষার গভীরভাবে বিশ্বেষণ করি। এবারে অবশ্য আমি আমার নিত্যকারের পরিবেশ এবং প্রভাব মুক্ত হয়ে বিশ্বেষণের তাগিদায় প্রশ্নটাকে বিচার বিবেচনা করিনি। বরং জার্মানির রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপার স্যাপারগুলোর ওপরেই আমার পর্যবেক্ষণ সীমাবদ্ধ রেখেছি। এ নতুন পৃথিবীর তত্ত্বের দিকটা যানসিক কোদাল দিয়ে খনন করতে গিয়ে আমি এ শিক্ষানীতির সুস্পষ্ট ফলাফল দেখতে পাই, মার্কসীয় নীতির তাত্ত্বিক দিকটার সঙ্গে আজকের ঘটা সংস্কৃতি, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলোর তুলনা করি।

আমার জীবনে প্রথম আমি এ মহামারীর পরাজয়ের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি।

বিস্মার্কের অপূর্ব আইন প্রণয়ন প্রণালী অনুধাবন করি; এর ধ্যান ধারণা, প্রয়োগ এবং ফলাফল। ধীরে ধীরে আমার নিজস্ব মতামতের একটা দৃঢ় ভিত্তি গড়ে উঠে, যা পাথরের ন্যায় দৃঢ়; যে কারণে ভবিষ্যতে সাধারণ সমস্যাগুলোর জন্য আর আমাকে মন পরিবর্তন করতে হয় নি। এর সঙ্গে সঙ্গে আবার আমি মার্কিস্ট এবং ইত্নীজাতির ভেতরকার সম্পর্কটা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করি।

আমার ভিয়েনায় প্রবাসের দিনগুলোতে জার্মানিকে আমি দেখতাম শান্ত বিশাল প্রতিমূর্তি বিশেষ। তবু মাঝে মাঝেই প্রচণ্ডরকমের সন্দেহ এবং অবিশ্বাস আমাকে অস্তির করে তুলত। নিজের মনে মনে এবং ছেট যে গোষ্ঠীর সঙ্গে আমি মিশতাম, জার্মান বৈদেশিক নীতি নিয়ে তাদের সঙ্গে আমি পর্যালোচনা করতাম এবং আমার চিন্তাধারায় মার্কিসিস্টদের অবিশ্বাস্য আল্গা পথে তাদের প্রতি ব্যবহার করা হত; যদিও তখন জার্মানির এটা একটা মূল সমস্যা ছিল। আমি বুঝতে পারি না এ চরম বিপদের মধ্যে কি করে তারা বন্ধ চক্ষুবিশ্বত হোঁচ্ট খেত, যার প্রতিক্রিয়া ছিল আবশ্যক যদি প্রকাশ্যে ঘোষিত মার্কসীয় নীতি বাস্তবে রূপায়িত করা হত; এমনকি সেদিন, অত শীঘ্র আমি আমাকে ঘিরে থাকা লোকদের সতর্ক করে দিয়েছিলাম, আমি বৃহত্তর দশককেও তাই করেছি যে এ সমস্ত শান্ত করা স্নোগান হল অলস এবং বিফল : আমাদের কিছু হবে না। এ একই ধরনের রোগের সংক্রমণে ইতিমধ্যেই বিরাট একটা সম্ভায়কে ধ্বংস করে দিয়েছে। যে আইন সমস্ত মানবজাতিকে দাসে পরিণত করে, তার বাইরে কি জার্মানি যেতে পারবে?

১৯১৩-১৯১৪ সালে গ্রথম আমি আমার মতামত বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ব্যক্ত করি; যার মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এখন ন্যাশনাল স্যোশালিস্ট মুভ্যেন্টের সদস্য। কিভাবে জার্মান জাতি তার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা পেতে পারে তা' নির্ভর করছে কিভাবে মার্কসীয় মতবাদকে নির্মল করা যাবে।

আমি বিশ্বাস করি ত্রি-পাঞ্চিক মৈত্রীর সর্বনাশকর কার্যকলাপ হল মার্কসীয় শিক্ষার আংশিক প্রতিক্রিয়া; এ নীতি সবার অলঙ্কৃত্যে বলিষ্ঠ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। যারা ঘন এ চিন্তাধারায় নিজেদের কলুষিত করেছে, তারা এ সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির খেকে উদ্ভুত বিপদ এবং তাদের উদ্দেশ্যটাকে ধরতে পারেনি; যদিও তা' তারও আগে সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত ছিল,— যা মাঝে মাঝে জাতির অস্তিত্বটাকেই বিনষ্ট করে টুকরো টুকরো করে দিতে উদ্যত হয়েছে। কখনো কখনো তিকিংসার সাহায্যে রোগের লক্ষণগুলোকে তারা দ্বা করবার চেষ্টা করেছে, যা তাদের ধারণায় হল মূল কারণ। কিন্তু কেউ প্রকৃত রোগের কারণ বা তার শিকড়টাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করেনি। এ পথে মার্কিসের নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও কোন ফল না পেয়ে তারা স্বেফ হাতুড়ে বদিয়ার মলম দিয়ে রোগ সারাবার প্রচেষ্টায় নেমেছে।

মহাযুদ্ধ

আমার ঘোবনের কোলাহলপূর্ণ দিনগুলোতে কোন কিছুই আমার উদ্দাম চেতনাকে এত বেশি সঁ্যাতসেঁতে করে দিত না, একমাত্র একটা চিন্তা ছাড়া; সেটা হল— আমি এমন একটা সময়ে জনগৃহণ করেছিলাম যখন নাকি পৃথিবী সুনিশ্চিতভাবে ঠিক করে ফেলেছে যে খাতির ধন্দির আর তৈরি করা চলে না। ব্যতিক্রম হিসাবে স্থান দেখানো হবে একমাত্র ব্যবসায়ী

এবং মাত্রের আধিক্যদের। এতহাসক কর্ম সম্পাদনের ঘড় ইতিমধ্যেই বরাবরের মত থিতিয়ে এসেছে এতটা পরিমাণে যে ভবিষ্যৎ মনে হচ্ছে সঁপে দিয়েছে জাতিদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবন্ধিতায়, যার থেকে তাকে পুনরুদ্ধার বা সংশোধন করা অসম্ভব। এর সহজ সরল অর্থ হল পরম্পরের সাহায্যে পরম্পরাকে শঠতাপূর্ণ প্রতারণা, আত্মরক্ষার্থে ও শক্তির আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারটাই যেন এর বাইরে। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি দেশকে মনে হচ্ছিল এক একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, জোর করে সীমান্ত বাড়ানো আর খদ্দেরের পরম্পরের প্রতি রেয়াত্ যে কোন চুতান্তায় ব্যাপারটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এবং এর আনুসঙ্গিক পদার্থ হিসাবে উচু গলায় গোলমাল অবশ্যই অনুপকারীরা করে চলেছিল। এ ব্যাপারটা নির্দিষ্ট খাতে স্থিরভাবে দিনে দিনে বরাবরের মত বেড়েই চলেছিল। জনসাধারণের অনুমোদন পেয়ে শেষমেষ এটা সমস্ত পৃথিবীটাকে সুবিশাল এক মনিহারী দোকানে পরিণত করে চলেছে। এ দোকানের দেউরিতে সারি সারি আবক্ষ মূর্তি সাজানো যা এ মুনাফাখোরদের অমরত্বের সঙ্গে মিলানো, যারা নিজেদের ব্যবসার ফ্রেন্টে অত্যন্ত ধূর্ত এবং সেইসব শাসকশৈলীর কর্মচারী যারা নিজেদের অত্যন্ত নির্দোষ বলে জনসাধারণের কাছে নিজেদের তুলে ধরেছে। বিক্রয়রত মানুষগুলো হচ্ছে ইংরেজ এবং শাসনকর্ম চালিয়ে যাওয়া লোকগুলো হল জার্মান। কিন্তু ইহুদীরা তাদের উৎসর্গ করবে এমন ব্যবসাতে যা লাভজনক না হলেও তা' হতে হবে এক মালিকের; কারণ তারা প্রকাশে সব সময় চিক্কার করবে যে তারা একেবারেই লাভ করছে না, আর তাদের পকেট থেকেই গুণাগার দিতে হচ্ছে সব সময়। উপরন্তু বিদেশী ভাষায় তাদের জ্ঞান থাকায় এ বাড়তি সুবিধেটুকুও তারা পেয়ে থাকে।

আমি কেন আরো একশ বছর আগে জন্ম নিলাম না? আমি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতাম। স্বাধীনতা-যুদ্ধের কোন এক সময়ে যখন ব্যবসায়ী না হলেও মানুষকে কিছু মূল্য দেওয়া হত।

এভাবে আমি নিজেকেই ভাগ্যহীন বলে ভাবতাম যে দুর্ভাগ্যের কারণেই আমার এ পৃথিবীতে উপস্থিতি এত দেরিতে হয়েছে এবং একথা ভাবতেও আমার বিরক্তি লাগত যে আমার জীবনটা আমাকে শান্তিপূর্ণ এবং আদেশ মেনে চলে কাটাতে হবে। ছেলে হিসাবে আমি যা-ই হই না কেন, শান্তিবাদী ছিলাম না এবং নিজেকে সেই ধরনের তৈরি করার সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা অসারে পরিণত হয়।

তখন দূর দিগন্তে বুম্বর যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ইঠাং সংবাদপত্রে তা' পড়তাম এবং প্রায় সব টেলিফোম এবং সরকারি ইন্তাহারগুলোকে গোঢাসে গিলতাম। সবচেয়ে বেশি আনন্দ লাগত যে দূর থেকে হলেও এ যুদ্ধের আমিও একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

যখন রুশ-জাপানী যুদ্ধ শুরু হয়, তখন আমার বয়সও যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি নিজের মধ্যেও বিচার বোধটা তীক্ষ্ণ হয়েছে। জাতীয় কারণেই আলোচনার সময়ে অন্যমি জাপানীদের পক্ষ নিতাম। রাশিয়ানদের পরাজয় যে অস্ত্রিয়ায় শান্তাজিমের প্রতি সংজোরে মুষ্টাঘাত।

ইতিমধ্যে বহু বছর কেটে গেছে যখন আমি মিউনিকে আসি। এখন আমি উপলক্ষ্য করতে পারি যে আগে যা বিশ্বাস করতাম, যা হল অবক্ষয়ী দেহমনের দ্বারা উৎপন্ন ব্যাধি, যা ঝড়ের পূর্বের শান্ত অবস্থা বজায় রেখেছিল। আমার ভিয়েনার দিনগুলোয় বল্কান্রা সেই গুমোট ক্ষণিক বিরতির মুঠোয় ধরা পড়েছিল, যা অশনি সংকেতের পূর্ব লক্ষণই প্রদর্শন

করেছে। এখানে সেখানে মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমক দেখা যেত; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা নৈরাশ্যের অঙ্কারে অতি শীত্র মিলিয়ে যেত। এরপরেই বল্কানের যুদ্ধ বেঁধে ওঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রধান অতিথিরূপে প্রচণ্ড ঘূর্ণিযায় প্রবল উত্তেজনাময় ইউরোপকে ঝটিকাগতিতে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এ অতিরিক্ত শান্ত অবস্থায় মানুষ নিজেকে নির্যাতিত এবং ভাবী অমঙ্গলের সৃচনা দেখতে পায়। এর তীব্রতা এত বেশি যে আসন্ন আকস্মিক দুর্ঘটনার ধারণাটা একটা অসহিষ্ণু আশায় পরিবর্তিত হয়। তাদের আশা ছিল যে ইংশ্রে তাদের ভাগ্যের বর্গাটাকে নিষ্যয়ই এবার আলগা করে দেবেন এতখানি যে সেই ভাগ্যকে কোন ঘটনাই আর দমন করতে পারবে না। ঠিক এ সময়ে বেশ বড় রকমের একটা বিদ্যুৎ চমক হঠাত এসে পৃথিবীটাকে চমকে দেয়। বড় ওঠে এবং স্বর্গের বজ্র নির্ঘোমের সঙ্গে মিশে যায় মহাযুদ্ধের কামানের গর্জন ধ্বনি।

আর্চ ডিউক ফ্রানজ ফার্দিনান্দের হত্যা সংবাদ যখন মিউনিকে এসে পৌছায়, — আমি সারাটাদিন বাড়িতেই বসে থাকি এবং সত্যি বলতে কি সমস্ত ব্যাপারটাকেই আমি ঠিক অনুধাবন করতে পারি নি। প্রথমে আমি আশংকা করেছিলাম যে কোন অস্ত্রিয়ান জার্মান ছাত্র হয়ত গুলিটা ছুঁড়েছে। হাবুসবুর্গ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শ্বাভদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ কার্যবলীতে তার ঘৃণায়িশ্বিত ক্রোধ সহের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই আর সে নিজেকে দমন করতে পারেন। দেশের ভেতরকার শক্তদের কাছ থেকে জার্মান লোকগুলোকে মুক্ত করার জন্যই হয়ত বা সে এ পথ বেছে নিয়েছে। এ ভুলের মাঝেলের গুনাগুরটা কী দিতে হবে তা সহজেই কল্পনা করা যায়। এটা আবার নতুন নির্যাতনের একটা চেটকেই ডেকে নিয়ে আসবে এবং পৃথিবীর সামনে তা সঠিক বলেই বিবেচিত হবে। কিন্তু অন্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সেই গুণ্ডাতকের নাম জানতে পারি, তাদের পরিচিতি ছিল শ্বাভ হিসেবে। আমি এক হতবৃদ্ধিকর অনমনীয় প্রতিহিংসার অবস্থা অনুমান করি, — যা ভাগ্য তাকে নিয়ে যেতে কৃতসংকল্প। শ্বাভদের প্রিয়তম বৰু শ্বাভ দেশপ্রেমিকের গুলিতেই বিদ্ধ হয়েছে।

তখনকার ভিয়েনার সরকারের পক্ষে তখন অন্যায় সেই দিনের প্রচলিত ধারা অনুসারে যে চৱমপত্র দেওয়া হয়েছিল তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। একই ঘটনার এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর অন্য কোন সরকারই বিকল্প কোন অবস্থা গ্রহণ করতে পারত না। অস্ত্রিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে এক নির্দয় শক্ত সদা সর্বদা উত্তেজনার খোরাক এ দৈত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জুগিয়ে চলেছে নিয়মিত বিরতিতে; এবং সে বিরতি ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে। এ অধ্যবসায়ের সঙ্গে এখনো কিছুতেই সাম্রাজ্য ধংস না হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত থামত না। অস্ত্রিয়াতে আশা ছিল বৃক্ষ সম্মাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেই মুহূর্তটা এগিয়ে আসবে। একবার এটা করতে পারলেই রাজতন্ত্রের পক্ষে আর কোনৰকম শক্ত প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত রাষ্ট্র ফ্রানসিস যোসেপের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে সাধারণ বিরাট জনতার চোখে এ বৃক্ষ এবং শুন্দাস্পদ ব্যক্তিত্বের মৃত্যু সম্মাটের মৃত্যুরই তুল্য। সত্যি বলতে কি শুভ নীতির এ কৌশল হল অস্ত্রিয়ান রাষ্ট্র যাতে এ ধারণা পোষণ করে যে সম্মাটের বিরল প্রতিভা এবং আর্চ্যজনক ঘটনাবলীর জন্যই এ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের চাটুকারিতাই হাবুসবুর্গের পছন্দ ছিল। বিশেষত এর সঙ্গে সম্মাটের সতিকারের কার্যকলাপের ক্রোন সম্পর্কই ছিল না। এ আরোপিত গৌরবের নিচেকার অঙ্কারে সাবধানে লুকিয়ে রাখা যন্ত্রণাটাকে আর কেউ খুঁজে বার করতে চেষ্টা

করেনি। একটা সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল, মনে হয় ইচ্ছে করেই। যে সম্ভাট যত বেশি পরিমাণে তার শাসনকার্যে পদস্থ কর্মচারীদের ওপর নির্ভর করেছে, ততই তারা আরো বেশি করে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ত্রাট' বলে তাকে তুলে ধরেছে; কিন্তু তাগ্য যখন দরজায় এসে আগত করে তার বাজেরে দাবি জানিয়েছে, তখনই আকস্মিক মহা দুর্ঘটনা নেমে এসেছে।

সেই যুদ্ধ এবং শান্তাস্পদকে বাদ দিয়ে কি অঙ্গুয়ার সাম্রাজ্যকে কল্পনায় আনা যায়? তা হলে সঙ্গে সঙ্গে কি মারিয়া থেরেমার বিপর্যয় আবার সংঘটিত হবে না?

ভিয়েনার সরকারি বিভাগের পক্ষে সত্যি এটা অন্যায় যে তারাই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে দেশকে যুদ্ধে নামিয়েছিল, যা হয়ত বা প্রতিরোধ করা অসম্ভব ছিল না। যুদ্ধ অবশ্যই বাঁধত, তবে দু'এক বছর এটাকে পেছনো গেলেও যেতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জার্মান বা অঙ্গুয়ার কুটনীতিজ্ঞরা কেউ-ই সেই চরম দিনের হিসেবটা করতে পারেনি; সে কারণেই তাদের মুঠাঘাতও হয়েছে চরম সময়ে।

না। যাদের এ যুদ্ধে নামার ইচ্ছে ছিল, তাদের এর ফলাফল বহনে অঙ্গীকার করলে চলবে কেন? এর ফলাফল নিশ্চিতভাবেই হল অঙ্গুয়াকে উৎসর্গ করা। এবং যদি যুদ্ধ, যুদ্ধ হিসেবেও না এসে পড়ত, — তবু সমস্ত জাতিসমূহ একসঙ্গে মিলে আমাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ত, যা হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যকে খও খও করে তবে ছাড়ত। সেক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের ঠিক করতে হতো আমরা হাবুসবুর্গের পাশে এসে দাঁড়াব, নাকি দূরে সরে থাকব হাতজোড় করে দর্শকের মত, যাতে ভাগ্য তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যেতে পারে।

আজকে যারা আজকের অমঙ্গলের জন্য সরব এবং তাদের জ্ঞানের আড়ম্বর যুদ্ধের কারণ দর্শাতে ব্যস্ত, — সেই লোকগুলোর সহযোগীতাই এ সাংঘাতিক যুদ্ধের প্রতি দেশ ধাবিত হয়েছিল।

কয়েক যুগ ধরেই জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ধূর্ত এবং নিচতার সঙ্গে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আলোড়ন তুলে আসছে। কিন্তু জার্মান সেন্টার পার্টি, যাদের দৃষ্টিভাসীর শেষ কথা হল ধর্ম; তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অঙ্গুয়া রাষ্ট্রকে সর্বপ্রথম করার, — যেখান থেকে জার্মান নীতি মোড় নিয়েছে।

এ পরিগতির মূর্খতার জন্য এখনো হয় নি। যা এসেছে, তা আসতে বাধা; এবং কোন কিছুই ইতো তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। জার্মান সরকারের ভুল হল, একমাত্র শান্তিরক্ষার কারণে যে সমস্ত সুযোগগুলো তাদের স্বপক্ষে ছিল তারও সুযোগ তারা নেয় নি। শুধু পৃথিবী ব্যাপী শান্তির জন্য মৈত্রীর ফাঁদে পা বাঢ়িয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সম্মিলিত শক্তির্বর্গের শিকার হয়েছে — যারা জার্মানির এ শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টায় বিরোধী ছিল, তারা আটঘাট বেঁধে যুদ্ধকে দেকে নিয়ে এসেছে।

যদি তৎকালীন ভিয়েনা সরকার তাদের চরমপত্র এতটা তীব্র শর্তাবলী সম্বলিত নাও করত, তবু সেই পরিস্থিতির খুব একটা হেরফের হত বলে মনে হয় না। কিন্তু তা জনসাধারণের ঘৃণামশ্বিত ক্রোধ জাগিয়ে তুলত। কারণ সাধারণ জনতার চোখে এ চরমপত্র এমন কিছু নিষ্ঠুর বা অতিরিক্ত ছিল না। যারা আজকে এ সত্যটাকে অঙ্গীকার করে, তারা হয় নির্বোধ নয় দুর্বল শৃতিশক্তি সম্পন্ন অথবা ইচ্ছে করেই মিথ্যার বেসাতি করা মানুষ।

১৯১৪ সালের যুদ্ধ কোন মতেই জনগণের উপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় নি; সত্যি বলতে কি জনসাধারণই এটা চেয়েছিল।

সাধারণের ভেতরের অনিচ্ছিতাকে একেবাবে শেষ করার ধারণার বশবর্তী হয়েই এ চিন্তা করা হয়েছিল। এবং এ সত্যের আলোকে উন্মুক্ত হয়েই দুই লক্ষ জার্মান যুবা ষ্টেচায় এ রঙে নিজেদের রাঙিয়েছে এবং তারা এ সত্যের জন্য তাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত উৎসর্গ করতে রাজী ছিল।

আমার কাছে এ মুহূর্তগুলো যৌবনের দিনগুলোয় আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া দুর্দশার বোঝাটার মুক্তির সময় এনে দিয়েছিল। আজকে আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে সেই মুহূর্তে আমি উৎসাহের বন্যায় তেসে গিয়েছিলাম এবং আমার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল। ইশ্বরকে ধন্যবাদ আমাকে আজ পর্যন্ত সে ভার লাঘবের জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন।

এ মুক্তিযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে অসমকরণভাবে ভেঙে পড়েছিল। যে মুহূর্ত থেকে ভাগ্য জাহাজের হাল ধরেছে, জনসাধারণের ভেতরে এ জনমত গড়ে উঠেছে যে অস্ত্রিয়া অথবা সারভিয়ার ভাগ্য তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে। কিন্তু জার্মান জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।

অবশেষে অনেক বছরের অক্ষত্রের পরে লোকে পরিষ্কারভাবে ভবিষ্যতটাকে দেখতে পায়।

সুতরাং মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাপা স্বরে পরিবর্তে অতিরিক্ত উত্তেজনার প্রাবল্য দেখা দেয়; কারণ এ উল্লাস নিছক বয়ে যাওয়া হঠাতে উন্মুক্ততা ছিল না। পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাটা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে কারোর সরিশেষ ধারণা ছিল না কতদিন ধরে এ যুদ্ধ চলবে। লোকে স্বপ্ন দেখত সৈন্যরা বড়দিনে ঘরে ফিরে আসবে এবং শান্তির সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম আবার শুরু করবে।

মানব জাতির চরিত্র হল সে যা বিশ্বাস করে তা-ই আশা করে এবং তার ওপরে পরিপূর্ণ আস্থা রাখে। জনতার এ আচ্ছন্ন করা অনুভূতি ধীরে ধীরে চিরস্মৃতী অনিচ্ছিতায় অবসন্ন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে জনসাধারণ যে ব্যাপারগুলোয় বিশেষভাবে জড়িত। সুতরাং কেউ ভাবে নি যে অস্ত্রিয়া সারভিয়ার সংঘর্ষ কুলঙ্গীতে তোলা থাকবে। সেই জন্যই তারা মৌলিক কোন হিসেব নিকেশ আশা করেনি। সেই লক্ষ লক্ষ ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম।

মেইমাত্র সারভিয়া অত্যাচারের সংবাদ এসে মিউনিকে পৌছায়, — আমার মনের আকাশে তৎক্ষণাৎ দুর্টো চিন্তা তেসে উঠে: প্রথমত, যুদ্ধ অনিবার্য এবং দ্বিতীয়ত, হাবুসবুর্গ এবাব তার মৈত্রী সংযে ষাক্ষরের সম্মান দিতে বাধ্য। আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিলাম যে মৈত্রীর বক্সনের দরকান একদিন জার্মানিকেও যুদ্ধে নামতে হবে এবং প্রথম ধাক্কা তাকেই সামলাতে হবে, অস্ত্রিয়াকে নয়। এ আকস্মিক ঘটনায় আমার মনে হয়েছিল অস্ত্রিয়া তার ঘরোয়া রাজনীতির জন্য মৈত্রীর পক্ষে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু বর্তমানে সে বিপদ কেটে গেছে। পুরনো রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছে সংগ্রামে লিঙ্গ হতে। ষ্টেচায় হোক আর অনিছাতেই হোক।

এ সংঘর্ষ সম্পর্কে আমার নিজের ধ্যান ধারণা সহজ এবং স্পষ্ট ছিল। আমার বিশ্বাস এ সংঘর্ষ অস্ত্রিয়ার সারভিয়াকে সন্তুষ্টির জন্য নয়; বরং জার্মানির নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নাই যেন বড় হয়ে উঠেছে — জার্মান নীতির শুধু মুক্তির প্রশ্ন এটা নয়, — ভবিষ্যতের প্রশ্নও এ সংঘর্ষের সঙ্গে জড়িত।

বিসমার্কের অসমাপ্ত কাজ এবাব শেষ করার পালা। আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা বহু নায়কোচিত যুদ্ধে উইসেনবুর্গ থেকে উরু করে সেদান এবং প্যারিতে যে রক্তক্ষয় করেছে, তার

উপযুক্ত হতে হবে আজকের যুবক জার্মানদের। এবং এ সংগ্রামে যদি জার্মানরা জয়ী হতে পারে, তবে আবার জার্মান জাত জাতি হিসেবে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতিদের সারিতে গিয়ে দাঁড়াবে। একমাত্র তখনই জার্মান স্ম্যাট তাকে শান্তির ক্ষেত্রে অগ্রতিদৃষ্টি বলে দাবি করতে পারে। এবং এ শান্তিরক্ষার জন্য তাদের দৈনন্দিন রুটির বরাদ্দও আর হিসেব করে করতে হবে না।

বালক এবং একজন যুবা হিসেবে আমি প্রায়ই এমন কোন ঘটনা খুঁজে বেড়াতাম যার মাধ্যমে আমার জাতীয়তাবাদী উৎসাহ যে উভে যায়নি তা দেখাতে পারি। জয়ের উন্নাসকে আমার যেন মাঝে মাঝে মনে হত প্রশ্নয়দানকারী পাপী, যদিও এ ধরনের অনুভূতির কোন কারণ দর্শনে আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ এ জয়খনিতে তাদেরই অধিকার, যাদের ভেতরে নাটকীয়তা নেই বা যেখানে ইশ্বর জাতিকে সত্যের গন্তব্যে নিয়ে যেতে আদিষ্ট এবং মানুষকে কি তার সেই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে? লক্ষ লক্ষ মানুষের মত আমিও এ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতির আনন্দে আনন্দিত ছিলাম। প্রায়ই আমি গান গেয়ে উঠতাম — জার্মান-দেশ হল সবার ওপরে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ‘হাইন’ অর্থাৎ ‘জয় হোক’ বলে চিৎকার করতাম। সে সব অনুভূতির সত্যতা নিরূপণের জন্য প্রায়ই আমি অতীতের শৃতি বোমছন্দ করে ইশ্বরের বিচারশালায় উপস্থিত হতাম।

প্রশ্ন থেকেই একটা জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট ছিল যে যুদ্ধ বাঁধলেই, যা আমার কাছে অবশ্যজ্ঞাবী বলে মনে হয়, আমার বইগুলো তৎক্ষণাত ঠেলে একপাশে সরিয়ে রেখে দেব। আমি আরো অনুভব করি যে আমার জ্ঞানগা হল সেখানে, যেখান থেকে আমি আমার অন্তরের আহ্বান শুনতে পাচ্ছি।

প্রধানত রাজনৈতিক কারণেই আমি অস্ত্রিয়া ছেড়েছিলাম। এর থেকে কি বেশি বিচারশক্তি সম্পন্ন হতে পারে যা আমার রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা পরিবেশ অনুযায়ী ঘোষিত হতে পারে। এখন সেই যুদ্ধেই বেঁধে গেল। হাবুসবুর্গের হয়ে যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না, কিন্তু আমার জ্ঞাতিবর্গ এবং স্ম্যাটের জন্য মৃত্যুকেও আমি পরোয়া করি না।

৩ আগস্ট, ১৯১৪ সালে আমি মহানুভব রাজা তৃতীয় লুইডভিগের কাছে ব্যাডেরিয়ার 'সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করে একটা দরখাস্ত করি। তখনকার দিনে স্ম্যাটই ছিলেন সর্বেসর্বা। এবং দূ'একদিনের ভেতরে উত্তরও পেয়ে যাই যে আমার প্রার্থনা মঙ্গল করেছে। আমি উত্তরটা পেয়ে কম্পিত হাতে খুলি এবং আজ তা তাষার দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব যে আমি যখন পড়ে দেখি আমাকে ব্যাডেরিয়ার সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি যে যুব আনন্দিত হয়েছিলাম তাতে সন্দেহ নেই। কয়েকদিনের মধ্যে আমি সেই পোশাক গায়ে চড়াই, যা পরবর্তী ছ' বছরে আর আমি খুলে রাখিনি।

আমার পক্ষে যা, সব জার্মানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, জীবনের সবচেয়ে শ্রণীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়। সেই সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, পেছনের ফেলে আসা শৃতির টুকরোগুলো সব বিশ্বাসির গর্তে লীন হয়ে আসে। সত্ত্ব গর্বে আমি সেই দিনগুলোর দিকে ফিরে চাই, বিশেষ করে আমরা যখন সেই উল্লেখযোগ্য ঘটনার দশম বর্ষে পদার্পণের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার সেই যুদ্ধের প্রথম কয়েক সপ্তাহের শৃতি সব সময় শরণে আসে, যখন ভাগ্য আমাকে সেই নায়কেচিত্ত সংগ্রামে জাতির মধ্যে ঠাই দিয়েছিল।

আমার মনের সামনে যখন দৃশ্যপটগুলো খোলা হয়, তখন মনে হয় যেন তা গতকালের ঘটনা। আমার মানস চোখে ভেসে ওঠে সেই দৃশ্যটা, যখন আমি আমার যুবক সহকর্মীদের সঙ্গে কৃত্বাওয়াজে রত এবং সেটা সীমাত্ত ছাড়ার শেষ দিন পর্যন্ত আমরা করে এসেছি।

অন্য সবার মত একটা চিন্তাই আমাকে ভাবিয়ে তুলতো, তাহল আমাদের সীমাত্তের যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছতে যদি দেরি হয়ে যায়। মাঝে মাঝে এ চিন্তা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলত এবং প্রতিটি বিজয় ঘোষণা আমাকে তিক্তার স্বাদ এনে দিত, যেটা পরবর্তী বিজয় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকটা বেড়ে যেত।

অবশেষে সেই দিনটা উপস্থিত হল যখন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য মিউনিক ছাড়লাম। জীবনে এ প্রথম আমি রাইন নদী দেখলাম; যখন আমরা পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হচ্ছি সেই ঐতিহাসিক নদী চিরাচরিত এবং উদ্যত শক্তির গ্রাস থেকে রক্ষা করার সংকল্পে। সূর্যের প্রথম রশ্মি হালকা কুয়াশা ভেদ করে মাটিতে পড়েছে এবং আমাদের সমুদ্রে নীদরভালন্ডের প্রতিমূর্তি প্রকটিত, সৈন্যবর্তি ট্রেনটাই গেয়ে ওঠে, — রাইনের তীরে জেগে উঠলাম। আমি অনুভব করতে পারি যে আমার হস্তয় যেন সে উচ্ছ্঵াস আর ধরে রাখতে পারছে না।

এবং তারপরেই এসে উপস্থিত হল ভিজে আর স্যাতসেকে একটা রাত। সারাটা রাত আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম, কুয়াশা ভেদ করে যেইমাত্র প্রথম সূর্যরশ্মি আমাদের সামনে এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপরে সশব্দে বোমা ফাটার শব্দ। বোমা গোলা আমাদের মধ্যেই এসে পড়তে লাগল এবং তা ভিজে মাটির ওপরে ছ্রাকার। কিন্তু সেই বোমা গোলার ধোঁয়া অপসারিত হওয়ার আগেই দুশো কষ্টের সম্মিলিত এক জয়ধ্বনি। এটা মৃত্যুকে আলিঙ্গনের অভিব্যক্তি। তারপরেই শুরু হয় শুলির শিস্ম্বনি আর কামানের গর্জন, যোদ্ধাদের চিংকার চেঁচামোচি আর সমবেত কষ্টের গান। জুর হলে যেমন ঢোক টাটায়, তেমনি টাটাছে, তবু আমরা এগিয়ে চলেছি। দ্রুতগতিতে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি এসে পৌছাই। পেছনে বীট পালং আর ঘাসের প্রান্তর। সতৰ গানের সূর আমাদের বহুদূরে নিয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে সেই গানের সূর নিকটতর হতে শুরু হয়। প্রতিটি সৈন্যদলের থেকে উথিত হচ্ছে সেই গানের সূর।

সেই গানের সূর ক্রমশই এগিয়ে আসতে থাকে, উথিত হতে শুরু করে প্রতিটি সৈনিকের কঠ থেকে। এবং মৃত্যু যখন আমাদের দলের সর্বব্যাপী ধূঃস করতে উদ্যত, তখনে আমরা পাশের লোকের উদ্দেশ্যে গেয়ে চলেছি : জার্মান, প্রিয় জার্মান দেশ আমরা সবচেয়ে ওপরে, পৃথিবীর সমস্ত দেশের উর্দ্ধে।

চারদিন যুদ্ধক্ষেত্রের একটা খানায় কাটিয়ে আমরা ফিরে আসি। এমন কি আমাদের পদক্ষেপও আর আগের মত দীর্ঘ পড়ে না। সতের বছর বয়স্ক বালকদের যেন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ বলে মনে হয়। এ উল্লিখিত সৈন্যদের কারোরই সমরশিক্ষার পরিপূর্ণতা ছিল না। কিন্তু আমরা অভিজ্ঞ সৈন্যদের মত যরতে জানতাম।

এটা মাত্র আরও এবং এ জিনিসগুলোকেই আমরা বছরের পর বছর করে নিয়ে গেছি। ভাবপ্রবল যুদ্ধের উৎসাহের বদলে একটা তীব্র ভীতি তখন জড়িয়ে ধরেছে। উৎসাহ তারপর ধীরে ধীরে কমে আসে এবং আরঙ্গের প্রচণ্ড বকমের উৎসাহটা নিতে গিয়ে সব সময় একটা মৃত্যুভয়ের ছায়া সর্বত্র দেখতে থাকি। এমন একটা সময় আসে, যখন পরম্পরের মধ্যে

তর্ক বেঁধে যায় একটা প্রশ্ন নিয়ে, কর্তব্যের আহ্বান বড়, নাকি আত্মরক্ষা; এবং আমাকেও সেই তর্কের মধ্য দিয়েই চলতে হয়েছে। মৃত্যু তখন সর্বত্র তার প্রার্থনা জানিয়ে চলেছে, একটা নায়হীন কাঠিন্য যাকে বলে বিদ্রোহআক মনোভাব দুর্বল শরীরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং আপ্রাণ চেষ্টা করে সহজাত জ্ঞান বলে অভিহিত হতে। কিন্তু বাস্তবে এটা আর কিছুই নয় — ভয়; যা ব্যক্তিগতভাবে সকলকেই আকর্ষণ করে বসেছিল। যত অধিক সংখ্যক কঠুন্দের পরিণামদর্শিতার কথা ভেবে নিজেদের মনোবল বাড়াবার কথা ভাবি, তত বেশি তার আবেদন নিবেদন স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়, প্রতিরোধ শক্তিও বেড়ে ওঠে। শেষে একসময় অন্তর্দ্বন্দ্ব শেষ হয় এবং কর্তব্যের আহ্বানে বিজয়ী হয়। ১৯১৫-১৬ সালের পুরো শীতটাই আমাকে এ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়েছে। ইচ্ছাক্ষণি শেষমেষ প্রভৃতি বিস্তার করে। প্রথমদিকে আমি এ সংগ্রাম হাসিমুথেই করেছি, বর্তমানে কিন্তু আমার মধ্যে এক শাস্তিভাব আর স্থির সংকল্প এসেছে এবং যা আমার মনের সহ্যস্ত্রির পরিধিও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। ভাগ্য সংভবত এবার তার শেষ পরীক্ষায় হাজিরা দেওয়ার কথা বলতে শুরু করেছে, অবশ্যই আমার মানসিক দৃঢ়তা এবং যৌক্তিকতাকে বাদ দিয়ে। যুবক হেছাসেবকরা বর্তমানে অভিজ্ঞ সৈনিকে পরিষত হয়েছে।

এ একই ধরনের পরিবর্তন সমস্ত সৈন্যদলের মধ্যেই আসে। অবিরত সংগ্রাম এটাকে অভিজ্ঞ এবং শুধু দৃঢ়তা করেনি, শক্তি করেছিল; যার জন্য এটা দৃঢ় বন্ধ এবং ভয়হীন চিত্তে তার প্রতিটি কার্যকলাপের সম্মুখীন হতে পেরেছে।

একমাত্র বর্তমানেই সেই সৈন্যদলকে বিচার করা সম্ভব। দুর্দিন বছর ক্রমাগত সংঘর্ষের পর, এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আরেক যুদ্ধক্ষেত্রে, উন্নত সৈন্যদল এবং অন্তর্শ্রেণির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে, অনাহার এবং ক্লান্তি ক্রেশের শেষ সীমায় পৌছে, সময় এসেছে যখন একজন সৈনিক তার ব্যক্তিগত সংঘর্ষের মূল্য বুঝতে সক্ষম।

আগামী এক হাজার বছরেও মহাযুদ্ধের জার্মান সৈন্যদের বীরত্ব তারা শব্দে আনবে এবং তখন ধূসুর অতীত থেকে জেগে ওঠা ওমর দৃষ্টি কখনই স্বীকার করবে না। যে এ শিরঢ্রাগণুলো কখনো ভয়ে সংকুচিত হয়েছে বা প্রটোভাবে ভয়ে কথা বলেনি। যতদিন পর্যন্ত জার্মান জাতির অস্তিত্ব থাকবে, তারা এভাবে গর্ববোধ করবে যে এরা তাদের পূর্ব-পুরুষের সন্তান।

আমি তখন ছিলাম, একজন সৈনিক, তাই অথবা রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিনি। এর আরো একটা কারণ হল সময়ও তখন ঠিক এর স্বপক্ষে ছিল না। আমি এখনো পর্যন্ত বিশ্বাস করি যে সাধারণ একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছেলে আজকের শ্রেষ্ঠসন্তানের চেয়েও অনেক বেশি দেশের সেবা করেছে। আমি অবশ্য শ্রেষ্ঠ সন্তান বলতে গণতান্ত্রিক সদস্যদের বোঝাতে চাইছি। সেইসব তুচ্ছ লোকগুলোর প্রতি আমার তীব্র ঘৃণার একমাত্র কারণ হল, সেই দিনগুলোয় ভাল লোকগুলোর যা বলার থাকত তা শক্রের মুখের ওপরেই বলত এবং তা বলতে অপারগ থাকলে মুখ বন্ধ করে তাদের কর্তব্য অন্য কিছুতে নিয়োজিত করত। আমি এ রাজনৈতিক বিশারদদের মনে মনে ঘৃণা করতাম এবং আমার যদি কোন উপায় থাকত তবে আমি তাদের নিয়ে একটা শ্রমিক দল তৈরি করতাম যা নাকি তাদের নিজেদের ভেতরের টগবগে সুযোগের প্রতীক্ষাটাকে প্রস্তুতিত হতে সাহায্য করে তাদের হস্যকে পরিপূর্ণ করে দিত; সৎ এবং ভাল মানুষেরা তাহলে এদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হত না।

সেইদিনগুলোয় আমি রাজনীতিকে কোনরকম উৎসুক্তি দিতাম না। কিন্তু তা নতুন বিদ্যু অভিযন্তার ব্যাপারে আমার মতামত প্রকাশ না করে পারিনি, যা শুধু জাতির স্বার্থেই আঘাত হানেনি, তা' বিশেষ করে সৈনিকদের স্বার্থেরও পরিপন্থী। এর মধ্যে দুটো বিষয়ে আমার প্রচণ্ড রকমের উদ্বিগ্নতা ছিল, যা আমার ধারণায় আমাদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক।

আমাদের প্রথম পরপর বিজয়গুলির অব্যহত পরেই সংবাদপত্রের একটা বিশেষ গোষ্ঠী জনসাধারণের উৎসাহের আওনে ফেঁটা ফেঁটা ঠাণ্ডা জল ফেলতে থাকে। প্রথমদিকে বেশি লোকের নজরে ব্যাপারটা আসেনি। সৎ উদ্দেশ্যের ছফ্টবেশে এবং নকল উদ্বিগ্নিতার ভাণ দেখিয়েই করা হয়েছে। জনসাধারণকে বোঝানো হয়েছে যে জয়ের বিয়ট জয়োৎসব ঠিক এ জায়গাতে সমীচীন নয়। আর শ্রেষ্ঠ একটা জাতির পক্ষে এটা সাজে না। জার্মান সৈনিকের সহিষ্ণুতা এবং শৌর্য হল মেনে নেওয়া সত্য, যার জন্য জয়োৎসবের এ সশস্ত্র বিদ্রিঘণের কোন প্রয়োজনীয়তাও নেই। উপরন্তু, বিদেশীরা জয়ের এ অভিযন্তাকে কিভাবে নেবে? এ জাতিব জয়োত্ত্বাসের চেয়ে শান্ত এবং ভদ্র উপায়ে জয়ের বিহিংপ্রকাশকে কি তারা আরো ভালভাবে গ্রহণ করবে না? সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রগুলো এ কথাও প্রচারিত করতে শুরু করে যে, জার্মানদের উচিত শ্বরণে রাখা যে যুদ্ধ আমাদের কাজ নয়, সুতরাং জাতিকে ডেকে তাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়াটা আমাদের পক্ষে কিছু লজ্জাকর নয়। এ কারণেই আমাদের সৈনিকদের এ সম্মুজ্জ্বল কাজকে কোনরকমেই অশোভনীয় বিজয়োৎসবের মাধ্যমে কলংকিত করাটা উচিত হবে না। কারণ বিহিংপ্রথিবী কিছুতেই ব্যাপারটাকে বুঝে উঠতে পারবে না। উপরন্তু, সত্ত্বাকারের একজন নায়ক নিশ্চৃপ বিনয়ের সঙ্গে তার কাজ করে এবং ভুলেও যায়, এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর কিসে! মোটামুটি এ ছিল তাদের সতর্কতার উপসংহার।

এসব লোকগুলোর কান ধরে খামচে টেনে এন গলারদড়ির ফাঁস পরানোর পরিবর্তে, যাতে জাতির এ বিজয়োৎসবে ভাঁটা না পড়ে, এ সমস্ত তথ্যকথিত নাইটদের কলমকে তুলে ধরাই হয়েছিল, যা ক্রমাগত এ বিজয়োৎসবকে 'অশোভনীয়' এবং 'মর্যাদাহানিকর' বলে চিরকার করেছে।

সম্ভবতএকজনেরও এ ধারণা ছিল না যে একবার যদি গুণ উৎসাহ কোনরকমে নিভে যায়, তবে তাকে আর কোনক্রমেই আবার প্রজ্ঞালিত করা সম্ভব নয়, যখন প্রয়োজন পড়বে।

এ উৎসাহও এক প্রকারের সুরাম্ভতা এবং তা স্বার্থে রাখা উচিত। এ ধরনের উদাহরণ অভাবে কি করে এতবড় একটা যুদ্ধকে সহ্য করা সম্ভব, যা নাকি মনুষ্যত্বের পরিমাপে একটা জাতির পক্ষে বিরাট অক্রূত পরিশ্রম করার চাহিদার অপেক্ষা রাখে।

বিশাল জনতার মনস্তত্ত্ব আমি খুব ভালভাবেই বুঝতে পারতাম এবং জানতাম এসব ক্ষেত্রে মহান রুচিজ্ঞান আওনকে বাতাসের সাহায্যে বাড়িয়ে তুলে লোহাকে গরম রাখতে সমর্থ হবে না। আমার কাছে এটা ভুল যে জনসাধারণের উৎসাহটাকে আরো উঁচু ধার্ম তুলে ধরা হয়নি।

সুতরাং আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না, কেন এ ধরনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ জনসাধারণের উৎসাহকে ভিজিয়ে দেওয়ার নীতি।

আরেকটা ব্যাপার যা আমাকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল, তা হল মার্কসীয় মতবাদকে যেভাবে গ্রহণ এবং শুন্দা করা হয়েছিল, আমি ভেবেছিলাম এর কারণ হল মার্কসীয় প্রেগ

সম্পর্কে এদের ধারণা ছিল কত অল্প। সবাই বিশ্বাস করত যে দলীয় মতপার্থক্য যুদ্ধের সময়ে দূর করার প্রচেষ্টাই মার্কসীজিমকে এত নরম আর উদার হিসেবে জনসাধারণের কাছে প্রতিফলিত করেছিল।

কিন্তু এখানে তো দলের কোন প্রশ্নই নেই। এখানে হল সেই মতবাদের প্রশ্ন যা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল শুধুমাত্র একটা উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থাৎ মানবজাতিকে ধ্রংসের দিকে টেনে নিতে। এ মতবাদের অভিযায়টাকে কেউ বুঝতে পারেনি কারণ আমাদের ইহুদী দলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ প্রশ্ন কখনো উত্থাপন করেনি; এবং আমাদের উদ্ধৃত আমলা অফিসাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট তালিকার বাইরের কিছু পড়াশুনা করতে রাজী নয়। তাই এ শক্তিশালী বিদ্রোহের স্রোত তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান বলে সমাজে পরিগণিত,—তারা কখনো প্রসন্ন দৃষ্টিতে এদিকটায় নজর দেয়নি। এ কারণেই রাষ্ট্রীয় সংগঠন সবসময়েই ব্যক্তিগত মালিকানার সংগঠনের পেছনে খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলেছে। এ ভুদ্রস্পন্দায়ের উদ্দেশ্যে একথাই বলা চলে যে, তাদের মতামত হল : যা আমরা জানি না,— তা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজনও নেই। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে জার্মান শ্রমিকেরা মার্কসবাদের ধার যেমনে দাঁড়ায়। এটাই হল বিরাট একটা ভূল। যখন সেই দুর্ভাগ্যের মূহূর্তগুলো এসে উপস্থিত হয়, তখন প্লেগের কবলে পড়ে জার্মান শ্রমিকেরা নড়ে ওঠে। নইলে সংগ্রামের জন্য না ছিল তারা ইচ্ছুক, না ছিল তাদের প্রস্তুতি। এবং জনসাধারণের মূর্খামী ও যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল যে কারণে তারা মার্কসবাদ জাতীয় নীতি বলে কল্পনা করত। এটা হল আরো একটু উপর্যুক্ত উদাহরণ অর্থাৎ যারা তাদ্বিক তারা মার্কসবাদ শিক্ষার প্রচলিত ধারাটাকে ব্যক্তিগত দেখেনি। যদি তারা খতিয়ে দেখত, তবে এ ধরনের ভূল কিছুতেই হওয়া সম্ভব ছিল না।

মার্কসবাদ, যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে সমস্ত অ-ইহুদী ব্রাঞ্চে ধ্রংস করা। ১৯১৪ সালে এটা প্রত্যক্ষ হয় যে কিভাবে জার্মান শ্রমিকবৃন্দকে উচ্চ গ্লায় তিরক্ষার করা হয়েছে, যা জাতীয় উৎসাহের থেকে উৎসাহিত হয়ে পিতৃভূমির সঙ্গে মিশে গেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সেই শীঘ্রতাপূর্ণ ধোঁয়ার পর্দা কুখ্যাত জাতীয় বিশ্বসংঘাতকর্তার হাঙ্কা হাওয়ায় মিলিয়ে আসে, এবং হঠাতে ইহুদী পদস্থ ব্যক্তিরা তাদের নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত বোধ করে। সেই মূর্খ এবং পাগলের কোনৱকম পদচিহ্ন রেখে যায়নি; যা গত সাত বছর ধরে জার্মানদের শরীরে রোগের বীজ ছড়িয়ে আসছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, জার্মান শ্রমিকদের পক্ষে এটা অত্যন্ত অমঙ্গল সূচক ছিল। যে মুহূর্তে নেতারা উপলক্ষ্মি করতে পারে যে বিপদ সামনে উপস্থিত যা তাদের টেনে নিচে নামাবে, তারা প্রবৰ্ধনের টুপিটা তাদের কানের ওপর টেনে ভুলে দেয় যাতে তাদের কেউ চিনতে না পারে। তারা প্রকৃত ঘটনার প্রদর্শনকারী প্রহসনের অভিনেতার তৃতীয় গ্রহণ করে যেন জাতিয় অভ্যুত্থানের প্রধান দায়িত্ব তাদের ওপরেই ন্যস্ত।

আমার মনে হয় জনসাধারণের আপদ ইহুদী দলের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য কাজ শুরু করার সময় এসে গেছে। যে কোনৱকম ফলাফলের মুখ্যাবুধি তৈরি রেখেই ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাতে জনসাধারণের ভাগ্য কাঁটাগাছের ঝোপে ভর্তি জসলেই পড়ুক বা প্রতিবাদই করুক। আগস্ট ১৮১৪ সালের এক ধাক্কায় শূন্যগর্ত ইতরগুলো আন্তর্জাতিক সমন্বয়ে জার্মান শ্রমিকদের মাথাগুলোকে গুড়িয়ে দিয়েছিল, কয়েক সপ্তাহ পরে, — নিজেদের কানে এ নির্বুদ্ধিতার কথা শোনার পরিবর্তে। আমেরিকার তৈরি, বোমাগোলার

আওয়াজে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়, মাথার ওপরে মুহূর্হুর্হ ফাটা এসব বোমাগোলাকে আন্তর্জাতিক সহকর্মী প্রতীতির প্রতীক বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে সেই জার্মান শ্রমিকেরা জাতির জন্য রাস্তা আবার আবিষ্কার করেছে, যে কোন সরকারের এটা কর্তব্য — অবশ্যই যে সরকার তাদের লোকদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, — এ সুযোগে এসবের নির্দয়ভাবে মূলোৎপাটন করা, যা কিছু জাতির উৎসাহকে অবদমিত করার চেষ্টা করবে।

সুতরাং বিষাক্ত এ সাপেরা আবার তাদের কাজ শুরু করে। এবার অবশ্য আগের চেয়ে আরো বেশি সতর্ক হয়ে, তবে আরো ধ্রংসাঞ্চক উপায়ে। যখন সৎ লোকেরা বঙ্গুত্ত পুনঃস্থাপনের প্রচেষ্টায় রত, ঠিক সেই মুহূর্তে মিথ্যা শপথকারী এসব অপরাধীরা একটা বিদ্রোহের জন্য তৈরি হচ্ছে।

ইভাবতই আমার মনে তখন দিখা, কোন পথটাকে ঠিক সেই সময়ে বেছে নেওয়া উচিত; কিন্তু এর ফলাফলের যে এতটা ধ্রংসাঞ্চক হবে তা ভাবিনি।

তবে তাইলে তখন কি করা উচিত? এ সম্বন্ধে চক্রের নেতাদের ধরে চালান দিয়ে জেলে পুরে জাতিকে এদের হাত থেকে মুক্ত করা? সামরিক ব্যবস্থার সাহায্যে এদের একেবারে নির্মূল করে দেওয়া উচিত ছিল। দলবাজী বিলুপ্ত এবং পার্লামেন্টকে প্রয়োজনে বন্দুকের নলের সামনে ধরে তার জ্ঞানবৃদ্ধি ফিরিয়ে আনা উচিত ছিল। এর চেয়ে আরো ভাল ব্যবস্থা হত যদি পার্লামেন্টকে ভেঙ্গে দেওয়া হত। এখন যেমন গণতন্ত্র যে কোনও দলকে ইচ্ছে মত ভেঙে দেয়। কিন্তু সে দিনগুলোতে এ কাজের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি ছিল। কারণ জাতির অস্তিত্বই তখন চরমভাবে বিপন্ন। অবশ্য এ ধরনের উপদেশ একটা প্রশংসনীয় তুলতে বাধ্য : যদ্বের সাহায্যে কি আদর্শের মূলোৎপাটন করা সম্ভব? সার্বজনীন একটা মতবাদকে কি গায়ের জোরে আক্রমণ করা যায়?

সেই সময় এ প্রশ্নটাকে আমি আমার নিজের মনে বার বার জিজ্ঞাসা করেছি। একই ধরনের সমস্যাকে বিশ্বেষণ করে, ইতিহাস থেকে তার নজীর নিয়ে, বিশেষ করে ধর্মের থেকে যাদের উৎপত্তি, আমি নিচের মতামতগুলোর উপস্থিত হই :

আদর্শ, দার্শনিক মতবাদ এবং কোন সংগ্রাম যার ভিত্তি ধর্মের মাটিতে প্রোথিত, সত্য মিথ্যে যা-ই হোক না কেন, শক্তি দ্বারা তার মূলচেদ করা একটা নির্দিষ্ট অবস্থার পর সম্ভব নয়, একমাত্র একটা পদ্ধতিতেই তা' সম্বৰ সেটা হল : এ শক্তি যদি কোন নতুন আদর্শ বা মতবাদের জননকেন্দ্রকে নির্দয়ভাবে নির্মূল করা যায়, এমন কি সেই আদর্শের ধর্জা ধরে থাকা শেষ মানুষটা অথবা সেই আদর্শের প্রচলিত ধারাটাকে মুছে দিতে হবে, নইলে তা' সব সময়েই চেষ্টা করবে, পেছনে একটা ধারা রেখে যাওয়ার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর ফলাফল হল রাষ্ট্রকে বর্জন করা, তা সাময়িক বা চিরস্থায়ী হোক, রাষ্ট্রের সৌজন্যের পেছনে রাজনৈতিক রহস্য থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞতা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে এ সম্মূলোৎপাটন রক্তস্নাবী পদ্ধতিতে কিছু ভাল লোককে এ নির্যাতিত শাসনব্যবস্থায় নিগৃহীত হতে হয়। সত্যি বলতে কি প্রতিটি নির্যাতন যার পেছনে কোন প্রেরণা নেই, তা' নীতির দিক থেকে অন্যায় এবং তার দ্বারা কিছুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ মানব সত্তানকে আমরা হারাই, এর পরিমাণ সময় সময় এতই বেশি হয়ে দাঁড়ায় যে নির্যাতনটাকে অন্যায় বলে মনে হয়। অনেক ব্যক্তির কাছেই এটা নিছক বিরুদ্ধপক্ষকে দমন করার প্রবণতা, প্রতিটি ব্যাপারেই তারা চেষ্টা করে নির্দয়ভাবে শক্তির দ্বারা বিনাশ করতে।

এভাবে নির্যাতন যত বেড়ে চলে, নির্যাতনের মতবাদটাও তত বৃদ্ধি পায়। নতুন মতবাদের মাধ্যমে এ ব্যবস্থার বিনাশ সম্ভব। কিন্তু এ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এ পদ্ধতির জন্য আমরা জাতির বা রাষ্ট্রের কিছু সংখ্যক শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারাব এবং সে রক্তও তখন প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হবে, কারণ এ ধরনের আংশিক বা সামগ্রিক পরিষ্কার করার কাজে জাতির শক্তি নিঃশেষের মুখোযুথি এসে দাঁড়াবে। এ ধরনের নীতি সব সময়ই নির্বর্থকভাব্য পর্যবসিত হয় যদি তরুণ থেকে এ মতবাদ ছেট্ট গুণীর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে।

এসব কারণে এসব ক্ষেত্রে অন্যান্য বৃদ্ধির মত এ মতবাদকে ভূমিষ্ঠ অবস্থাতেই নির্মূল করা সম্ভব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়ে চলে। বয়সের সঙ্গে এর ভেতরে ঠাই নেয় নব্য যুবকেরা — তবে অন্যরূপে এবং অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে।

সুতরাং এ সত্য প্রতিষ্ঠিত যে কোন মতবাদকে নির্মূল করার প্রচেষ্টা, যদি সে প্রচেষ্টার ধর্মীয় কোন ভিত্তিভূমি না থাকে এবং শুধু মতবাদই নয়, — সে ধরনের দল বা পার্টিকে যা এসব মতবাদের দ্বারা সৃষ্টি, অনেক ক্ষেত্রেই উন্টো ফল প্রাপ্তি যোগ ঘটে থাকে। এবং সেগুলো হয় নিচের কারণে :

সে মতবাদ বিশ্বারের মুখোযুথি যখন নিছক শক্তির প্রয়োগ হয়, তখন সে শক্তি প্রয়োগ ক্রমাগত এবং একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হওয়া উচিত। এর মানে গিয়ে দাঁড়ায়, কোন মতবাদকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে ক্রমাগত এবং সমানুপাতিক কোন পদ্ধতির প্রয়োজন। সেই মূহূর্তে দ্বিধা দেখা দেবে, এবং সহ্য ক্ষমতার হেরফেরের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে শুধুমাত্র সেই মতবাদই যে প্রথর হয়ে উঠবে, তাঁনয়, কিন্তু প্রতিটি নির্যাতন নতুন নতুন সমর্থক জোটাবে যারা এ পদ্ধতিতে নির্যাতিত। পুরনো কর্মীরা আরো তিক্ত হয়ে উঠবে যার দ্বারা এ পদ্ধতিতে নির্যাতিত এবং তাদের মৈত্রীবৃদ্ধেরা আরো বেশি শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তাই শক্তি যখন প্রয়োগ করা হয়, সাফল্য নির্ভর করে সেই শক্তির ভারসাম্যাতার ওপরে। এ অধ্যাবসায় হল আর কিছুই নয়, নির্দিষ্ট ধর্মীয় মতবাদ। শক্তির প্রতিটি রূপ যার পেছনে ধর্মের দোহাই থাকে না, তা' এলোমেলো এবং অনির্দিষ্ট হতে বাধ্য। এ ধরনের শক্তির ক্ষেত্রে দেখা যাবে স্থিরতার অভাব, একমাত্র বিশ্বজনীন মতবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যা শ্রেষ্ঠতম হওয়ার পথে চলেছে। ব্যক্তিগত উৎসাহের বহিঃপ্রকাশ হল এ ধরনের শক্তি; সুতরাং সময়ের এবং মানুষের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যার হাতে এর ভার পড়েছে তার চরিত্র এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে এরও পরিবর্তন ঘটে থাকে।

কিন্তু এটার সম্পর্কে আরো কিছু বলার আছে। প্রতিটি বিশ্বজনীন মতবাদ, — ধর্মীয় বা রাজনৈতিক যা-ই হোক না কেন — অনেক সময়েই আরও বা শেষ কোথায় তা ধরা মুক্তিল হয়ে পড়ে, বিরুদ্ধে মতবাদের নেতৃত্বাচক আদর্শের জন্য যত না সংঘর্ষ লাগে, তার চেয়ে অনেক বেশি হয় তার নিজস্ব আদর্শের ইতিবাচক ধ্যান ধারণার কারণে। এ সংঘর্ষের মূল কারণ হল আক্রমণে আঘাতক্ষণে নয়। আর একটা সুবিধে হল এর বহুতাত্ত্বিকটা কোথায় তা বোঝা যায়, কারণ এ বহুতাত্ত্বিকতাই হল এর নিজস্ব আদর্শ। বিপরীতভাবে এটা বলা দুর্ক কখন নেতৃত্বাচক উদ্দেশ্য বিরুদ্ধপক্ষের মতবাদকে ধ্বংস করতে অগ্রসর হবে এবং কার্য সম্পাদন করবে। এ একমাত্র কারণে বিশ্বজনীন মতবাদ হল চরিত্রের দিক থেকে আক্রমণাত্মক, যার ছক নির্দিষ্ট এবং প্রচণ্ড শক্তিশালী ও চরিত্রগতভাবে স্থির; বিশেষ করে যে মৰ্বজনীন মতবাদ আঘাতক্ষণের জন্যই

ব্যবহৃত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না এর ব্যবহারকারীরা উপযুক্ত এবং নতুন ধর্মীয় মতবাদের প্রচারক বলে প্রতিপন্থ হচ্ছে।

সংক্ষেপে নিচের ব্যাপারগুলোকে মনে রাখতে হবে : সর্বজনীন মতবাদের বিরুদ্ধে শক্তি নিয়োজিত প্রতিটি যুদ্ধ নিষ্ফলতায় পরিবেশিত হবে, যদি সেই সংঘর্ষ আত্মক্ষণ ধরনের এবং নতুন কোন ধর্মীয় মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। একমাত্র বিশ্বজনীন দুটো মতবাদের তেজের দৈহিক শক্তি ক্রমাগত এবং নির্দয়তার সঙ্গে সম্পাদন করা যায়, যা শেষপর্যন্ত নিজের দিকের পাল্লা ভারী করবে। মার্কিসবাদের সংঘর্ষে পরাজয়ের কারণ এখানেই।

এ কারণেই বিসমার্কের সমাজ বিরুদ্ধ আইন ব্যৰ্থতায় পর্যবসিত হয়, এবং যা ভবিষ্যতেও ব্যৰ্থ হতে বাধ্য। নতুন কোন সার্বজনীন মতবাদের ভিতই ছিল না যার উন্নতির ও অগ্রসরতার দরুন এ সংঘর্ষকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। বলা যেতে পারে শাসকবৃন্দ বা আইনকানুন বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত শাসনব্যবস্থার ভিত্তিভূমি যার থেকে জীবন মৃত্যুর যুদ্ধের শক্তি আহরণ করা সম্ভব। যা একমাত্র উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী পঞ্চিত মূর্বদের চিংকারেই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

এর প্রধান কারণ হল, এর পেছনে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধর্মীয় কারণ ছিল না যার জন্য বিসমার্ক ব্যৰ্থ হয়েছিলেন তার সামাজিক আইনগুলোর বিচার এবং মনে নেওয়ার জন্য এমন কোন গোষ্ঠীর কাছে যারা নিজেরাই মার্কিসবাদের ফল বিশেষ। এভাবে সেই লৌহ সমাট যখন তার নিজের ভাগ্যকে মার্কিসত্বের মধ্যবিত্তশৈলীর গণতন্ত্রের দিকে চালনা করে, তখন পুরো ব্যাপারটাই একটা হাস্যকর পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। সে বাগানের পরিচর্যার জন্য তার উদ্দেশ্য থেকে সরে আসে। কিন্তু এটা হল সার্বজনীন মতবাদের বিষফলতার কারণ যা একদা মানুমকে আকর্ষণ করেছিল এবং যে ভিত্তিভূমি থেকে তাকে বিভাড়িত করা হয়েছিল। এভাবে বিসমার্কের প্রচার পদ্ধতির ফলাফলটা সত্যাই বিলাপের কারণ।

যতই আমি তৎকালীন সরকারের সোশ্যাল ডেমোক্রাসির প্রতি মনোভাব পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করি, ঠিক যা মার্কিসবাদের বিরুদ্ধে সমিতিবদ্ধ হবে, ততই আমি বেশ করে উপলক্ষ করি যে এ মতবাদের বদলে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কোন মতবাদ থাকা উচিত। যদি সোশ্যাল ডেমোক্রাসিকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়, তবে তার পরিবর্তে জনসাধারণকে কি উপহার দেওয়া হবে? এমন একটা আদোলনের অতিতু বর্তমানে নেই যা বিরাট এ কর্মীদলকে আকর্ষণ করতে পারে। এদের অবস্থা নেতৃত্ব ছাড়া— যে নেতৃত্বের অপেক্ষায় এ কর্মীদল অপেক্ষারত। এটা একটা বোকার মত কল্পনা যে আন্তর্জাতিক গোড়ার দল যারা এতদিন ধরে শ্রেণী সংগ্রামে যুদ্ধ, অবিলম্বে তারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মিলাবে, অথবা আরো একটা শ্রেণী সংঘ গড়বে। এ সংঘগুলোকে আপাতদণ্ডিতে যতই অসন্তোষের চোখে দেখা হোক— একথা অশীকার করার উপায় নেই যে, এ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তারা এ শ্রেণীর পার্থক্যকে সামাজিক জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ বলে পরিগণিত হত, যদি এটা রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের অসুবিধার সৃষ্টি করত। এ সত্যকে যদি তারা অশীকার করে, তবে তারা শুধু অপরিগামদশীই নয়, মিথ্যাভাষণেও পাঁচ বটে।

বিশেষভাবে বলতে হয়, সবাব বোঝা উচিত যে জনসাধারণকে তারা যতটা বোকা মনে করে, প্রত্যক্ষারের তারা ততটা বোকা নয় — এ সত্যটাকে রক্ষা করা। রাজনৈতিক ব্যাপারে

এটা প্রায়ই মনে হয়ে থাকে যে অনুভব শক্তি জনসাধারণের বৃদ্ধিমত্তার চেয়ে অনেক প্রথর। যদিও মতামতের দিক থেকে বলা হয়ে থাকে যে অনুভূতি শক্তির জন্যই আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ওরা এত বোকা — এ যুক্তি খওনো যায় যদি আমরা এ সত্যটাকে বিবেচনা করি যে শান্তিবাদী গণতন্ত্র ও কম দুর্বল নয়। যদিও এরা সমস্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের থেকে সমর্থক আহরণ করে থাকে, যতদিন পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ নাগরিক সোশ্যাল ডেমোক্রাসির সংবাদপত্র যা বলছে তা গোগাসে গিলবে।

সবারই সতর্কভাবে এ বিপরীত সত্যকে বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে এ শ্রেণী সংঘামের সঙ্গে আদর্শের কোন সম্পর্ক নেই, যদিও নির্বাচনের সময়ে এ মাদকতাই ওষুধ হিসেবে কাজ করে। আমাদের এ বিশাল জনতা এ শ্রেণী বিষয়ে ভীষণ জেদী। এটা কাব্যের দিবাস্পন্দন দেখা নয়, এ হল সত্যিকারের বাস্তব অবস্থা। এ মনোবৃত্তি শুধু আমাদের তথাকথিত বৃদ্ধিমান শ্রেণীর মানসিক ধারার পরিচয়ই বহন করে না। এটা ও প্রমাণ করে তারা যে পরিবেশে মার্কস নামক প্রেগটা বেড়ে চলেছে তা' অনুধাবন করতেও অক্ষম; কারণ মার্কসতত্ত্ব আমরা যা হারিয়েছি তা পুনরুদ্ধার করতে কখনই সক্ষম হবে না।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংগঠন — এ নামে যারা নিজেদের পরিচিতি দিয়েছে — কখনই নিম্নশ্রেণীর ওপরে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না বা তাদের ধারণাটাকে বদলাতে পারবে না। তার কারণ দুটো পৃথিবী ঠিক বিপরীতভাবে দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে। এর একটা অংশ প্রাকৃতিক আর অপর অংশ কৃতিম উপায়ে দ্বি-খণ্ডিত। এ দুই পক্ষেরই কিছু চিন্তাধারা এক, এবং সেটা হল পরম্পরার সঙ্গে পরম্পরার সংঘর্ষ। কিছু এ ধরনের সংঘর্ষ নবীনরাই জয়ী হবে, অর্থাৎ মার্কসবাদ।

১৯১৪ সালে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির বিরুদ্ধে সংঘর্ষটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু বাস্তবে কোন পরিবর্তনের জন্য করে এ সংঘর্ষ শেষ হবে, তা নিয়ে দ্বিধা দেখা দেয়। সে জায়গায় জেগে উঠে একটা শূন্যতা।

যুদ্ধের অনেক আগেই আমার ধারণা ছিল, যে কারণে তৎকালীন কোন রাজনৈতিক দলেই যোগ দেইনি। যুদ্ধের সময়ে আমার আরও দৃঢ় হয় যে সচরাচর পথে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির বিরুদ্ধাচারণ অসম্ভব; কারণ তার জন্য এ রকম একটা দলের প্রয়োজন যা শুধু সংসদীয় দল নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি। কিন্তু সেরকম কোন দল তখন ছিল না।

আমার অন্তর্গত সহকর্মীদের সঙ্গে এ বাপারটা নিয়ে আমি প্রায়ই আলোচনায় বসতাম। এবং এ সময়েই আমি স্থির প্রত্যয় হই যে ভবিষ্যত জীবনে আমাকে রাজনীতির আসরে ঢুকতে হবে। আমি মাঝে মাঝেই বন্ধুদের যা প্রতিশ্রুতি দিতাম সেটাই আমাকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে যুদ্ধের পরে। অবশ্যই আমার পেশাগত কাজের পাশাপাশি; এবং এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে এ পথ আমি অনেক চিন্তা-ভাবনার পরেই বেছে নিয়েছিলাম।

যুদ্ধের প্রচারকার্য

রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গতিপথ নীরিষ্ণণ করতে গিয়ে আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করত এর সংঘবন্ধ প্রচারকার্যের সঙ্গীব দিকটা। মার্কসবাদীরা খুব ভালভাবেই জানত এ যন্ত্র কী করে বাজাতে হয়, এবং বাস্তবক্ষেত্রে তার সঠিক প্রয়োগ। শীত্র আমি উপর্যুক্ত করি যে, সঠিক সংঘবন্ধ প্রচারকার্যটা শিল্পের পর্যায়ে পড়ে এবং এ শিল্প আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের

কাছে একেবার অজানা । লুইগারের সময়ে খ্রিস্টান — সোশ্যালিস্ট পার্টি একমাত্র এ যন্ত্রের কিছুটা প্রয়োগ করে, এবং তাদের সাফল্যের জন্য তারা যথেষ্ট পরিমাণে এর কাছে ঝীলী ।

যুদ্ধের সময়েই একমাত্র আমরা বুঝতে পারি যে সংঘবন্ধ প্রচারকার্য নির্দিষ্ট নীতিতে চালিয়ে গেলে তাতে কী প্রচণ্ড সাফল্য আসে । কিন্তু এবারও দুর্ভাগ্যবশত ব্যাপারটাকে অন্যদিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, আমাদের দিকের প্রচারকার্য যেভাবে করা উচিত ছিল — বাস্তবে করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক নিকৃতভাবে । জার্মান খবরাখবর পদ্ধতি এবারেও পরিপূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল — যে কারণে প্রতিটি সৈনিক ব্যর্থ হতে বাধ্য — এবং সেটাই আমাকে সংঘবন্ধ প্রচারকার্য চালাবার ব্যবস্থার সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আগ্রহী করে তোলে । আমার এ বিষয়ে বাস্তব শিক্ষা নেওয়ার প্রচুর সুযোগও ছিল । যদিও দুর্ভাগ্যবশত সেই শিক্ষা খুব ভাল মত দিয়েছিল আমাদের শক্ররা । আমাদের দিকের দুর্বল দিকটা শক্ররা খুব ভালভাবে ব্যবহার করেছিল এবং সেই ব্যবহারটা এত সার্থকভাবে রূপায়িত যে, যে কেউ অন্তত এ ব্যাপারে তাদের প্রচণ্ড রকমের প্রতিভাধর বলে স্থীকার করতে দ্বিধা করবে না । শক্রদের সেই প্রচারকার্যের থেকেই আমি প্রশংসনীয়ভাবে আমাদের করণীয় কাজকে খুঁজে পাই । এর থেকে যে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন, — দুর্ভাগ্যবশত আমাদের পক্ষের তথাকথিত প্রতিভাধরদের সেদিকে কোন আকর্ষণই করেনি । তারা হল এ সবের উর্কে — এসব শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে অনেক বেশি ধূর্ত । যাহোক, তাদের এ শিক্ষার কোন সৎ উদ্দেশ্যই ছিল না ।

আমাদের তরফে কি কোনরকম সংঘবন্ধ প্রচার কার্যের ব্যবস্থা ছিল? দুঃখের সঙ্গে তার উত্তরটা হল নেতিবাচক । এবং যা কিছু এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, তা' এতই অপ্রতুল এবং ভুলে ভরা যে তা প্রয়োজন মেটাবার পরিবর্তে ক্ষতিই করেছে বেশি । সংক্ষেপে পুরো ব্যবস্থাটাই ছিল অপ্রতুল । মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও সমস্ত ব্যাপারটাই ভুলে ভর্তি । যারাই মনোযোগের সঙ্গে জার্মান প্রচার কার্যের ব্যবস্থাটাকে অনুধাবন করেছে, তাদের বিচারে এ মতামত প্রকাশ পেয়েছে, আমাদের জনসাধারণের এমন কি এটার মূল প্রশ্নেও পরিষ্কার কোন ধারণা ছিল না ।

প্রচারকার্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও বটে । এর সম্পর্কে শেষের বিন্দুর মূল্যায়ণ ধরে এবং কি উদ্দেশ্যে এটা করা হচ্ছে — সেই উদ্দেশ্যটা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণাও থাকা চাই ।

এটাকে এভাবে সংঘবন্ধ করতে হবে, যাতে এর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে উপনীত হতে তা সাহায্য করবে, এবং একথা স্থীরূপ যে এর উদ্দেশ্য অনুসারে এর কর্মপদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়ে যাবে । এবং প্রচারকার্যের চরিত্রও সে ভাবেই গঠিত হওয়া উচিত ।

যুদ্ধের সময়ে আমরা যে কারণের জন্য লড়াই করেছিলাম তা যে শুধু গহণ্ড ছিল তাই নয়, মানুষ যে কারণে কার্যশক্তি প্রয়োগ করতে পারে, সে কারণের জন্যই আমরা যুদ্ধ করেছিলাম । আমরা যদ্ব করেছিলাম আমাদের দেশের স্বাধীনতা এবং মুক্তির জন্য; আমাদের ভবিষ্যত মঙ্গলের এবং নিরাপত্তার প্রতিরে, জাতির সম্মানের জন্য — বিতর্ক্যূলক সমস্ত মতামত সত্ত্বেও ; একথা অনৰ্থীকার্য যে এ সম্মানের অস্তিত্ব বাস্তবে ছিল না, যার অস্তিত্বের প্রয়োজন অনন্ধিকার্য — যে জাতির সম্মান নেই, আজ হোক কাল হোক সে তার স্বাধীনতা এবং মুক্তি হারাবেই । এ ব্যাপারটা ঘট্টে উচ্চ বিচারকর্মের পদ্ধতির পথ ধরে, কাপুরুষের

দলের স্বাধীনতার কোন দাবি-ই নেই। যে দাস, তার আবার সম্মান কিসের। সে সম্মানের উল্লেখটাই তার পক্ষে পরিহাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

জার্মানি যুক্তে নেমেছিল তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। সুতরাং যুক্তের প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল যাতে যুক্ত করার উৎসাহটাকে বর্দ্ধিত করা এবং সে যুক্তে জয়ের পথ প্রশংসন করা যায়।

কিন্তু যখন জাতিরা তাদের অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে সংগ্রামে রত, — যখন অস্তিত্ব থাকবে কি থাকবে না, এ প্রশ্নের উত্তর অপেক্ষা করছে, — তখন সব রকমের মনুষ্যত্ব এবং বৃচি ইত্যাদি বিষয়গুলো একপাশে সরিয়ে রেখে দেওয়াই যুক্তি সংগত। কারণ এসব আদর্শের অস্তিত্ব মানুষের সৃজনশীল চিন্তায় যা তার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। প্রকৃতি তাদের খৌজও রাখে না। উপরন্তু খুব কম বা অল্প সংখ্যক জাতির এ চারিত্বিক বৈশিষ্ট্য থাকে। মানবতা এবং বৃচি বিজ্ঞান বিষয়ক আদর্শগুলো পৃথিবীর জনবসতির সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতিও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যারা এর সৃষ্টিকর্তা এবং রক্ষক।

যখন জাতি তার অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে রত, তখন এসব আদর্শ হল দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাবনা। যে মহুর্তে জাতি যুক্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে — তখন এগুলো শুধু জাতির মনের জোরেই কমিয়ে দেবে; সুতরাং এসব চিন্তা-ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। এমাত্র এটাই দৃশ্যমান যার দ্বারা সংগ্রামে রত একটা জাতিকে বিচার করা যায়।

মানুষের অনুভূতি সম্পর্কে মন্টেকের অভিযাত হল যুক্তের সময় যাদেয়ে অপ্রয়োজনীয় হল যত সত্ত্বে সম্ভব মত ছির এবং যত নির্দেশভাবে যুক্ত করা হয় — সেটাই হয় মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড় পরিচয়। যখন কেউ এর উত্তরে ঝুঁটিবিজ্ঞান ইত্যাদি বড় বড় কথা বলে, তখন তার একটাই উত্তর দেওয়া সম্ভব। যুক্তের সময়ে অস্তিত্বরক্ষাটাই হল সবচেয়ে বড়, তখন অন্য কোন বিষয়ের কথা উল্লেখ করাই উচিত নয়। দাসত্বের জোয়াল হল যা সব সময় কাঁধে চেপে বসে থাকে। এটাই হল মানুষের জীবনের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা যা তাকে একরকম বাধ্য হয়েই সহ্য করতে হয়।

সোয়াবিঙ্গ* ক্ষয়শীলেরা কি জার্মানির আজকের ভাগ্য সম্পর্কে আশাবাদী? অবশ্য কেউই এ প্রশ্নটাকে ইহুদীদের সঙ্গে আলোচনা করতে বলতে বলবে না, কারণ তারা হল আজকের তথাকথিত সাংস্কৃতির সুগন্ধের আবিষ্কারক। তাদের অস্তিত্বই হল ইংৰেজের সৃষ্টির সবচেয়ে দেহধারী ব্যক্তিক্রম।

যুক্তের সময় এসব আদর্শ যা সুন্দর এবং মানসিকগুণে সমৃদ্ধ তার কোন স্থান নেই। তারা যুক্তের প্রচারকার্যের উপযুক্ত মানবশিল্প নয়।

যুক্ত চলাকালে প্রচারকার্য হল সেই যুক্তের শেষকথা। এবং এ সমাপ্তি হয় জার্মান জার্মান অস্তিত্বরক্ষা ও শেষ দর্শায়। সুতরাং প্রচারকার্যের প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য এ দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা উচিত। সবচেয়ে নিষ্ঠুর অস্ত্রই হল এক্ষেত্রে সবচেয়ে মানবীয়তার শুণে শমৃক্ষ, অবশ্য যদি তারা সেই যুক্ত দ্রুত শেষ করতে সাহায্য করে। এবং সেইসব পদ্ধতিই সুন্দর এবং সম্মানীয় যা জাতির গৌরব এবং স্বাধীনতা বরাদ্য রাখে। সম্ভবত এ মনোভাব নিয়েই এ জীবন-মৃত্যু যুক্তের প্রচারকার্য চালানো উচিত।

* সোয়াবিঙ্গ হল মিউনিকেপ শিল্পীদের আঙ্গনা, যাতে তাদের ছবি আঁকার স্টুডিও আর পড়াশোনা জায়গা — দিশেয় করে যায়াবর শিল্পীদের।

যদি এ জিনিসগুলোই তাদের শাসকবর্গকে বলা হয়, — এবং তারা যদি বুঝতে পারে তবে যুদ্ধের প্রচারকার্য কি ধরনের এবং কোথায় হবে এ নিয়ে অস্ত্র হিসেবে এটাকে ব্যবহার আর দিখা দেখা দেবে না।

কারণ এ প্রচারকার্য আর কিছুই নয় একটা বিশেষ অস্ত্র, যারা এর সঠিক ব্যবহার জানে তাদের হাতে এ অস্ত্রই ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল এর চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে : প্রচারকার্য কাদের উদ্দেশ্যে চালানো উচিত?

প্রচারকার্যের লক্ষ্য হওয়া উচিত সুবিশাল জনতা। বৃক্ষজীবি সম্প্রদায় অথবা যাদের আজকে বনিজীবি বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। — তাদের কাছে নিছক প্রচারকার্য চলে না; তাদের জন্য প্রয়োজন এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। তবে প্রচারকার্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ, যেমন ক্ষীণ শিল্পকলার সঙ্গে আচীরণপত্রের — এর সংবাদ বহনের ক্ষমতার দিকটার বিবেচনায় আচীরণপত্রের বিজ্ঞাপনে শিল্পীর দক্ষতার প্রকাশ হল তার বেখায় রঙের দৈর্ঘ্যে কত লোককে তা আকর্ষণ করে। যত বেশি লোক আসে— আচীরণপত্রের বিজ্ঞাপন তত ভাল বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। যদি জনসাধারণকে এটা আকর্ষণ করে থাকে,— তবু কিছুতেই এটাকে শিল্পের পর্যায়ে ফেলা যায় না। আচীরণপত্র শিল্প প্রদর্শনীতে শিল্পের বিকল্প কথনই নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং যারা শিল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে উৎসুখ, তাদের আচীরণপত্র দিয়ে ইচ্ছা পূরণ করা সত্ত্বে নয়, তারজন্য অন্য কিছুর দরকার। সত্যিকথা বলতে কি, এ উদ্দেশ্য প্রদর্শনী গ্যালারীতে মোরাফেরা করার কোন অর্থই হয় না। শিল্পের ছাদের প্রতিটি প্রদর্শিত ছবি খুঁটিয়ে দেখা উচিত, যাতে ধীরে ধীরে তার ভেতর একটা বিচার শক্তি গড়ে ওঠে। ব্যাপারটা প্রচারকার্যের ব্যাপারও একই।

প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য কোন এক ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়, জনসাধারণের বিশেষ কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হল এর কাজ; একমাত্র এ পথেই তা জনসাধারণের ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়া সত্ত্ব।

এখানে প্রচারকার্যের শিল্প কুশলতা এত পরিষ্কার এবং জোর করে মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া যায়, যা তাদের মনে একটা বিশেষ মতবাদের বিষয়টার বাস্তবতা সম্পর্কে গড়ে দেয়ে, তার প্রয়োজনীয়তা এবং চারিত্রিক দিকটার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা তার উপলক্ষ করতে পারে।

যেহেতু এ শিল্প এখানেই শেষ নয়, কারণ এর উদ্দেশ্য হল আচীরণপত্রের বিজ্ঞাপনের মত; যার দ্বারা সুবিশাল জনসাধারণকে আকর্ষণ করা হয়। ব্যক্তিগত কোন একজনের জন্যে নয়, যে ইতিমধ্যে বিষয়টা সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়ে বসে আছে। অথবা বিষয়টাকে বস্তুতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিচার করে একটা ধারণায় উপনীত হতে চায় — কারণ প্রচারকার্যের উদ্দেশ্যই সেটা নয়। এর আবেদন হওয়া উচিত জনসাধারণের অনুভূতির কাছে, বিচারবৃক্ষের কাছে নয়।

সমস্তরকম প্রচারকার্য জনপ্রিয় উপায়ে পরিবেশন করা উচিত এবং এর বৃক্ষমতার দিকটাও এমনভাবে ঠিক করা উচিত যা অপেক্ষাকৃত কম বৃক্ষসম্পন্ন জনসাধারণকে ছুঁতে পাবে এবং এদের উদ্দেশ্যাই তো প্রচারকার্য চালানো। সুতরাং এর বৃক্ষমতার দিকটা এমন কী যাতে সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে এটা পৌছতে পারে। যখন একটা পুরো

জাতিকে এর আওতায় আনা প্রয়োজন, বিশেষ করে যুদ্ধের প্রচারকার্যের সময়ে, তখন উচ্চ বৃদ্ধিমতাসম্পন্ন নেতাকে এড়াবার জন্য এত বেশি মনযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ একটা দল সবসময়ই থাকে যারা সাধারণের চেয়ে অধিক যুক্তিসম্পন্ন।

যত বেশি বৈজ্ঞানিক প্রচলিত ধারায় এবং যত বেশি পরিমাণে তা' জনতার অনুভূতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত করা হবে, তত চৰম সাফল্য আসবে। প্রচারকার্যের সত্ত্বিকারের মূল্যায়ন এতেই নিহিত, ছোট বৃদ্ধিমতা বা শিল্পপ্রেমিক গভীতে নয়।

প্রচারকার্যের শৈল্পিক দিকটা হল — যার দ্বারা এটা জনসাধারণের কল্পনার দিকটা তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে জাগাতে পারে। এর মনস্তত্ত্বের দিকটার গড়ন এমনভাবে হওয়া উচিত যা জাতীয় স্তরে গিয়ে আবেদন জানাতে সক্ষম হয়। এ ব্যাপারটাই আমাদের মধ্যে যাদের বৃদ্ধি একেবারে উচ্চস্তরের তারা বুঝতে পারে না, এটাই হল তাদের মানসিক গর্ব বা জড়তার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

একবার যদি আমরা বুঝতে সক্ষম হই যে এ প্রচারকার্যের প্রবৃত্তিজনক শক্তি কত টীব্র জনসাধারণের ভেতরে, তবে নিচের ফলাফলগুলো আমরা প্রত্যক্ষ করব :

প্রচারকার্যের সংগঠন এবং প্রচার এমনভাবে হওয়া উচিত নয় যে এটা মনে হবে বহু প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সমর্থনে গঠিত।

জনসাধারণের ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত পরিসীমিত; এবং তাদের বোঝার ক্ষমতাও দুর্বল। অপরদিকে, তারা যে কোন ব্যাপারে দ্রুত ত্বরণ যায়। এরকম ক্ষেত্রে, সমস্ত প্রকার কার্যকরী প্রচারকার্যের গভী কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এবং যার বহিঃপ্রকাশ হবে বাঁধা ধরা ছকে। এ শ্লোগান ক্রমাগত আবৃত্তি করে যেতে হবে, — যতক্ষণ না পর্যন্ত শেষ মানুষটা এর আওতায় আসে। যদি এ আদর্শকে ত্বরণ বা প্রচারকার্যকে বিমূর্ত এবং সাধারণভাবে উপস্থিত করা হয়, তবে তা' কোন কাজেই আসবে না — কারণ জনসাধারণ তা' বুঝতে বা মনের ভেতরে ধরে রাখতে সক্ষম হবে না — যে উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে। সুতরাং সংবাদের পরিবাণি অনুসারে ধরন-ধারণ, পরিকল্পনা নির্ধারিত করা উচিত, যাতে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এটা প্রচণ্ড রকমের কার্যকরী হতে পারে।

কিন্তু এ শিল্প এখানেই শেষ নয়। কারণ এর উদ্দেশ্য হল একেবারে সেই বিজ্ঞাপনের প্রাচীরপত্রের মত, যার কাজ হল জনতাকে আকর্ষণ করা এবং যাদের ইতিমধ্যেই ব্যাপারটা সম্পর্কে একটি ধারণা সুসংগঠিত হয়েছে বা যারা ইতিমধ্যেই এর বস্তুতাত্ত্বিক দিকটার প্রতি আকৃষ্ট তাদের জ্ঞান বিতরণ — কারণ প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য তা নয়; এ প্রচারকার্যের আবেদন হবে জনতার অনুভূতির কাছে, বিচার বৃদ্ধির নিকটে নয়।

সমস্ত রকমের প্রচারকার্য জনপ্রিয় উপায়ে পরিবেশন করা উচিত। এবং এর বৃদ্ধিমতার দিকটা এমন হওয়া উচিত যাতে সাধারণ বৃদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন লোকদের এটা আকৃষ্ট করতে পারে। কিন্তু তার বৃদ্ধিমতার কিছুটা এমন হওয়া চাই যাতে অতি অল্প বৃদ্ধি সম্পন্ন জনতাও এটাকে উপলক্ষি করতে পারে; যাদের উদ্দেশ্যে এ প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে। যখন পুরো একটা জাতিকে অখণ্ডভাবে এ প্রচারকার্যের ভেতরে আনার প্রয়োজন, যেটা বিশেষ করে যুদ্ধের প্রচারকার্যের আবশ্যক হয়ে পড়ে, তখন উচ্চ বৃদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন লোকদের এর আওতার বাইরের রাখাৰ জন্য অত বেশি সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রচারকার্যের এ বৈজ্ঞানিক প্রচলিত ধারার এবং যত বেশি পরিমাণে এটা জনসাধারণের অনুভূতিকে লক্ষ্য করে প্রচারিত করা হবে, — এর সাফল্যও তত চূড়ান্ত হবে। প্রচারকার্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার এ-ই হল চরম মূল্য। মুষ্টিমেয় শিল্পী বা বৃক্ষিবৃত্তিসম্পন্ন জনসাধারণের অনুমোদন নয়।

প্রচারকার্যের শৈল্পিক দিকটা হল জনসাধারণের ঘুমিয়ে থাকা কল্পনার সূক্ষ্ম দিকটাকে আবেদন দ্বারা জাগিয়ে তোলা; তার জন্য মনন্তরের সেই বিশেষ দিকটাকে খুজে বার করা দরকার, যা জাতির জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করতে সমর্থ হবে, শুধু আমাদের মধ্যে তীক্ষ্ম বৃক্ষিসম্পন্ন, তাদের জন্য নয়। কারণ এ সচেতন বৃক্ষিসম্পন্নতা আর কিছুই নয়, নিজেদের সম্পর্কে গর্ব অথবা মানসিক জড়ত্বার লক্ষণ।

একবার যদি আমরা বুঝতে পারি যে এ প্রচারকার্যের প্রবৃত্তিজনক ক্ষমতা জনতার মধ্যে কতখানি সুদূর প্রসারী, তবে নিচের শিক্ষাগুলো তা থেকে পেতে পারি :

প্রচারকার্যের সংগঠন বা পরিচালন এমন হওয়া উচিত নয় যাতে এটা অনেক প্রকারের বৈজ্ঞানিক অন্তর্শত্রের সমন্বয়ে গঠিত বলে মনে হয়।

জনসাধারণের ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; এবং তাদের বোঝার ক্ষমতাও দুর্বল। অপরদিকে তাদের শৃঙ্খিশক্তি প্রচওরকমের কম থাকাকারণেন্দ্রন তারা সবকিছুই দ্রুত ভুলে যায়। এ কারণে সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এবং সেগুলোকে যতখানি সুভব একই প্রকারে পুনরাবৃত্তি করা উচিত। এসব ধৰ্মনি ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ ব্যক্তিটি এ প্রচারকার্যের উদ্দেশ্যের কজায় এসে ধরা দেয়। এ আদর্শ ভূলে গেলে এ প্রচারকার্যের সমস্ত রকম উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কারণ জনসাধারণের পক্ষে তাকে যা বলা হয়েছে তা হজম করা বা মনে রাখা সুভব হয়ে উঠবে না। সুতরাং প্রচারকার্যের গুরুত্ব বুঝে নিয়ে তাকে এমনভাবে প্রচার করা উচিত যাতে জনসাধারণের মনন্তরের দিকটাকে এটা সম্পূর্ণভাবে আকর্ষণ করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, শক্রদের মূল্যায়ণ ব্যাপারক উপায়ে করা ভূল, যা অন্ত্রিয়ায় জার্মানদের পত্রিকাগুলো প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছিল। এ আদর্শগত দিকটাই হল ভূল; কারণ যখন তারা শুক্রের সময় শক্রের মুখোযুথি দাঁড়ায়, তখন আমাদের সৈন্যদের ধ্যান-ধারণা আলাদা ছিল ওদের সম্পর্কে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ওই ভূলের মাঝেল বিধানসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যখন জার্মান সৈন্যরা বুঝতে পারে যে তাদের বিরোধী পক্ষের সৈন্যরা যথেষ্ট পরিমাণে সুশিক্ষিত, তখন তারা উপলক্ষ করে যে ভূল সংবাদ দ্বারা তাদের প্রতারণা করা হয়েছে। তাই তাদের সংগ্রাম শক্তিকে উন্মুক্ত এবং শক্তিশালী করে তোলার চেয়ে এ সংবাদের কার্যকারীতা বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সমস্ত উৎসাহটা ভেঙে পড়ে।

অপরদিকে বৃটিশ এবং আমেরিকান যুদ্ধের প্রচারকার্যের মনন্তরের দিকটা যথেষ্ট পরিমাণে অভিজ্ঞ ছিল। জার্মান সৈন্যদের বর্বর এবং হণ্ডের মত নিষ্ঠুরভাবে ত্বক্তি করে তাদের নিজেদের সৈন্যদের যুদ্ধের বর্বরতা এবং নির্দয়তার বিরুদ্ধে সুযোগ্য করে ভুলেছিল। যার জন্য তাদের মধ্যে যিথ্যা স্বপ্ন বলতে কিছু ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব ভয়াবহ অন্তরে মুখোযুথি তাদের হতে হয়েছে — তার সংবাদ নিজেদের সরকারের মাধ্যমে আগেই তারা পেয়েছে। সুতরাং সরকারের সততায় তারা আরো অধিক পরিমাণে আস্তা রেখেছে। এ প্রকারে তাদের প্রচও ক্রোধ এবং ঘৃণা এ কৃখ্যাত বিরুদ্ধপক্ষের সৈন্যদের ওপর গিয়ে পড়েছে।

জার্মান যুক্তিক্রম যে ভয়াবহ ফলাফল হয়েছে, যা তাদের কাছে জার্মানদের এ ইণ এবং বৰ্বর রূপেই প্রতিফলিত হয়েছে, যেটা সরকারের প্রচারকার্যের মাধ্যমে তাদের আগে থেকেই জানা ছিল। অপরদিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীভাবের কারণে তাদের অন্তে যে ভয়াবহতা সৃষ্টির পক্ষে সক্ষম তা' মিথ্যা। দুর্ভাগ্যবশতঃ, জার্মানদের ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টোটা ঘটেছে — যারা শেষ পর্যন্ত ঘরের সংবাদকে দলবাজী আৰ প্রতারণা বলে বাতিল কৱে দিয়েছে। এ ধৰনের ফলাফল সম্ভব হয়েছিল কাৰণ দেশেৰ সরকাৰ এ প্রচারকার্যকে গৰ্দত মন্তিকেৰে বেশি মূল্য দেয়নি এবং তাদেৰ ধাৰণাই ছিল না যে প্রচারকার্যেৰ জন্য নিপূণ বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰয়োজন যা খুজে বেৰ কৱতে হয়।

কিভাবে প্রচারকার্য চালাতে নেই — জার্মান যুদ্ধেৰ প্রচারকার্য হল তাৰ অতুলনীয় উদাহৰণ এবং মনস্তত্ত্বেৰ দিক থেকে এটা একটা চৱম ব্যৰ্থতাৰ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিতও বটে।

তবে যাদেৰ চোখ খোলা ছিল, তাৰা শক্রদেৱ নিকট এ বিষয়ে অনেক জ্ঞান অৰ্জনেৰ সুযোগ পেয়েছিল; যাদেৰ ইন্দ্ৰিয় গ্ৰাহকৰূপ তখনো কঠিন হয়ে ওঠেনি এবং যারা সুনীৰ্ধ সাড়ে চার বছৰ ধৰে শক্রেৰ প্রচারকার্যেৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৱেছিল।

সবচেয়ে দুঃখেৰ বিষয় আমাদেৰ লোকেৱা প্রচারকার্যে সেই প্ৰথম কাৰণগুলোই বুৰতে পাৰেনি, যা প্ৰতিটি প্রচারকার্যেৰ পৰিৰ্পৰ্ণতাৰ জন্য প্ৰয়োজন। বিশেষ কৱে প্ৰচাৰিত প্ৰতিটি সমস্যাৰ শুধু একদিকটাকেই তুলে ধৰতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে এত বিস্তৰ ভুল কৱা হয়েছে যুদ্ধেৰ শুৱৰ থেকেই যে সন্দেহাতীতভাৱে এ বোকামী আমাদেৰ লোকেৱা ঘৰ্মামীকে সৱাসিৰ প্ৰমাণ কৱে।

উদাহৰণস্বৰূপ বলা যেতে পাৰে, — কয়েকটি নতুন ধৰনেৰ সাবানেৰ বিজ্ঞাপনেৰ অভিপ্ৰায়েৰ জন্য আমৱা যে প্ৰাচীৰপত্ৰেৰ ব্যবহাৰ কৱে থাকি, তাতে বিশেষ কৱে সাবানেৰ চমৎকাৰ দিকটা অবশ্যই তুলনামূলকভাৱে অন্য ছাপ মাৰা সাবানেৰ থেকে তুলে ধৰা হয়ে থাকে না? এ বিষয়ে আমৱা সবাই একমত হৰ; এবং রাজনৈতিক প্ৰচারকাৰ্যও ঠিক এক ধাৰাতে চলে। প্ৰচারকার্যেৰ লক্ষ্য সত্যকে সোজাসুজি উদ্দৃষ্টিত কৱা নয়, কাৰণ তা তো' অপৰ পক্ষেৰ দিকে যাবে — আপাতদৃষ্টিতে যা তত্ত্বেৰ দিক থেকে বিচাৰ হয়ে থাকে। এটা শুধু সত্যেৰ সেই দিকটাকেই প্ৰকাশ কৱবে যা নিজেদেৱ স্বার্থ রক্ষায় সাহায্য কৱবে।

কে যুদ্ধেৰ উদ্দোঢ়া, এ প্ৰশ্নেৰ আলোচনায় যাওয়াটা হল গোড়াতেই ভুল এবং সেইসঙ্গে একক জার্মানিৰ ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দেওয়াটাও উচিত নয় — এটাকে প্ৰমাণ কৱতে যাওয়াটাও বোকামী। কোনৱকম আলোচনা ছাড়াই যুদ্ধ শুৱৰ কৱাৰ পুৱো দোষটা শক্রেৰ ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া উচিত।

এবং এ অৰ্ধ-সত্যেৰ পৰিণতিটা কি? সাধাৰণ সুবিশাল জনতা কুটনীতিজ্ঞ বা অধ্যাপক নয় যে জনসাধাৰণেৰ ব্যবহাৰত্ব সম্পর্কে তাদেৱ জ্ঞান থাকবে। তাদেৱ মধ্যে এমন জ্ঞানও নেই যাৰ দ্বাৰা তাৰা নিৰ্দিষ্ট মতামত গঠন কৱতে পাৰে। কিন্তু এ উলমলে মানব সন্তানৱা ক্ৰমাগত এক আদৰ্শ থেকে, আৱেক আদৰ্শে দোল খায়। যেইমাত্ৰ আমাদেৱ নিজেদেৱ প্ৰচারকাৰ্য কিছুমাত্ৰ আভাস দেয় যে শক্রপক্ষেৰও কিছুটা বিচাৰবোধ আছে, তৎক্ষণাৎ আমাদেৱ নিজেদেৱ বিচাৰবোধ সম্পর্কেই প্ৰশ্ন উঠিবে। শক্রপক্ষেৰ শেষ কোথায় বা কোথা থেকেই বা আমাদেৱ দোষেৰ শুৱৰ হয়েছে — এ পাৰ্থক্য বিচাৰ কৱাৰ মত ক্ষমতা জনসাধাৰণেৰ নেই; এসব বিষয়গুলোতে তাৰা সন্দেহেৱ দোলায় দোলে এবং অবিশ্বাসী হয়ে

পড়ে। বিশেষ করে শক্রু যেখানে তাদের উপদেষ্টাদের ঘাড়ে ভুলের বোৰা চাপিয়ে দেয়। শক্রুদের প্রচারকার্য যে কথাগুলো বলেছিল, এ ব্যাপারে তার চেয়ে আর বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে, যা সমানুপাতিক এবং ভারসাম্যের দিক থেকে আমাদের প্রচারের থেকে অনেক বেশি উন্নত এবং এগুলোই আমাদের জনসাধারণকে ক্ষিণ করে তোলে, প্রত্যেক শক্রুপক্ষের ওপর অন্যায় করা হচ্ছে বলে ভাবে। এমন কি এ ধারণা এত প্রবল হয়ে ওঠে যে আমাদের জাতির এবং দেশের ধর্মসের বিনিয়োগে তাদের মনোভাব বদলায় না।

হ্বভাবতই জনসাধারণ সত্যের এদিকটাতে একেবারেই সচেতন ছিল না। এমন কি তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা বিষয়বস্তুটাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে কখনই বিচার করে দেখেনি।

জাতির মধ্যকার বিরাট একটা অংশ চারিত্বিক দিক থেকে স্বীজনোচিত ছিল এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাবালুতার দ্বারা পরিচালিত, তীক্ষ্ণ যুক্তির স্থান সেখানে কোথায়! এ ভাবালুতা কিন্তু জটিল মানসিকতার জন্য নয়। এটা প্রচও রকমের প্রভেদবুদ্ধিসম্পন্নও নয়। কিন্তু শুধু ভালবাসা বা ঘৃণার প্রতি ইতিবাচক ও নৈতিবাচক ধ্যান ধারণা, যেটা নির্ভুল এবং ভুল, সত্য এবং মিথ্যায় মিশ্রিত। এ ধ্যান ধারণার অর্ধেকটা এরকম, বাকি অর্ধেকটা কিন্তু সেরকম নয়। ইংরেজদের প্রচারকার্য বিশেষ করে এ দিকটাকে চমৎকারভাবে বুঝেছিল এবং সে কারণে অত সুন্দরভাবে তা ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োগেও সমর্থ হয়েছিল।

তারা ব্যাপারটায় কোনরকম দ্বিধার মনোভাব নিয়ে এগোয়নি। যে কারণে কারোর মনে কোনরকম সন্দেহেরও উদ্বেক হয়নি।

জনসাধারণের এ ভাবালুকতার দিকটা যে তারা কত চমৎকারভাবে বুঝতে পেরেছিল তার একটা অসাধারণ উদাহরণ হল— তারা শক্রুপক্ষকে যেভাবে বীভৎস এবং নির্দয় বলে চিত্রিত করেছিল— বাস্তবে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের বর্ণনার সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা হ্রবহ খাপ দেয়ে গিয়েছিল। সেই কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সৈন্যদের একতাবন্ধতা আরো বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়,— যা চরম পরাজয়ের ক্ষেত্রেও বজায় ছিল। উপরত্ব, কাঠের তৈরি যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্রবিশেষের মত তারা তাদের শক্রু অর্ধাং জ্ঞানদের চিত্রিত করেছিল। ওদের প্রচারকার্যে যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব যাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে,— যা শুধু নির্দয় বা নিছক মিথ্যাতে পূর্ণ ছিল না, যেভাবে গাণিতিক ছকে বেঁধে তা' জনসাধারণের কাছে উপস্থাপনা করা হয়েছিল, জনতা পরিপূর্ণভাবেই তা' বিশ্বাস করেছিল। কারণ জনসাধারণের ভাবালুতা সব সময়েই শেষ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। এবং সেই কারণেই এ নিছক মিথ্যাকেও তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।

এ প্রচারকার্যের কার্যকারীতা এত সুন্দর এবং তীক্ষ্ণতার সঙ্গে হয়েছিল যে শুধু যুদ্ধের সুনীর্ধ সাড়ে চার বছর নয়, আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের লোকদের মননশীলতা এবং বিময়ের প্রতি একাগ্রতা তা অনেক পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছে।

আমাদের প্রচারকার্য যে একই রকমের সফলতা লাভ করতে পারেনি, তার জন্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ আমাদের প্রচারকার্যের দ্বিধার ভাবের মধ্যেই সে ব্যর্থতার বীজ ছিল। এবং বিষয়বস্তুর অসারত্বই তা জনসাধারণকে মনপ্রাণ দিয়ে সত্য বলে গহণ করতে দেয়নি। একমাত্র আমাদের লক্ষ্যশূন্য রাষ্ট্রনেতারা কল্পনা করত যে তাদের শাস্তিবাদীতার আশা উপচে পড়ে এ ধরনের উৎসাহের মূলে জল দিয়ে মানুষকে তার দেশের জন্য মৃত্যুর জন্য পর্যন্ত অনুপ্রাণিত করবে।

সুতরাং আমাদের সৃষ্টি বিষয়বস্তু যে ওধু অসার ছিল তা-ই নয়, ক্ষতিজনকও বটে।

এসব প্রচারকার্যের সঙ্গে যত বেশি প্রতিভাবান ব্যক্তিকেই জড়ো করা হোক না কেন, নিচেকার আদর্শগুলোকে এ সুরে বাঁধতে না পারলে তার কোন অর্থ-ই হবে না। প্রচারকার্যের গভী বিশেষ কয়েকটা চিন্তাধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত, এবং বারে বারে তাই পুনরাবৃত্তি সাপেক্ষ; এখানে, — অন্যান্য অসংখ্য ক্ষেত্রের মত দৈর্ঘ্যই হল প্রথম এবং সর্বোত্তম সোপান সাফল্য লাভ করার পক্ষে।

বিশেষ করে প্রচারকার্যের ক্ষেত্রে, মার্জিত ঝুঁটি এবং উজ্জ্বল বুদ্ধিমত্তাকে কখনই সামনে স্থান দেওয়াটা উচিত হবে না। কারণ এ গুণগুলো থাকলে তারা সত্যিকারের প্রচারকার্যের গুণগুলোর স্বীকৃতকে সাহিত্যাশ্রয়ী করে তা' চায়ের আসরের উপযোগী করে তুলবে। জনতার দ্বিতীয় শ্রেণী সম্পর্কে একটা ধারণাকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে: সাধারণ ব্যাপারগুলো তাদের মধ্যে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে না। তাই তারা নিত্য নতুন উত্তেজনার ঘোরাকের জন্য সর্বদা উদ্যোগ হয়ে ঘুড়ে বেড়ায়।

এসব লোকেরা সব বিষয়েই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ঝুঁক্ত এবং আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। তাই তারা সর্বদাই কোনরকম পরিবর্তন চায়; এবং সেই পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের নিকটজনদের বোকাশী থেকে নিজেদের দূরে রাখতে ব্যস্ত থাকে। এমন ভাবসাব করে যে পুরো ব্যাপারটা তারা একাই বোঝে। তথাকথিত উজ্জ্বল বুদ্ধিমন্ত্রাই হল প্রচারকার্যের প্রথম এবং প্রধান সমালোচক। নিপুণভাবে বলতে গেলে তাদের ভাবধারাই এ ব্যাপারে বিশেষভাবে দায়ী। কারণ তাদের কাছে পুরো ব্যাপারটাকে আদিম বলে মনে হয়। তারা সবসময়েই নতুন কিছু খোঁজে ফিরে। এজন্যেই তারা জনতাকে সুপরিকল্পিত উপায়ে অনুপ্রাণিত করার যে কোনরকম পুনরাবৃত্তি সহ্য করে না। যে মুহূর্তে প্রচারকার্য তাদের ঝুঁটিস্থত হয়, সে মুহূর্তে তা অসংলগ্ন হয়ে টুকরো আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এ তথাকথিত ভদ্রসম্প্রদায়ের মনতৃষ্ণি এবং নানা ধরনের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনা এ প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য নয়। এর সর্বপ্রধান কাজ হল জনসাধারণকে ব্রহ্মতে আনা যাদের ধীরবুদ্ধির জন্য যে কোন জিনিস বুঝতে যথেষ্ট সময় নিয়ে থাকে; একমাত্র ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি সহ্য করার জন্য এই জনসাধারণের স্মৃতিতে ব্যাপারটা খোদাই করে দিতে পারে।

প্রচারকার্যের প্রতিটি বার্তার ব্যাখ্যার শেষ সেই একবিন্দুতে; অবশ্য সামনের চিংকারগুলো বিভিন্ন ধরনের এবং রকমারী দৃষ্টিকোণ থেকে করা একমাত্র এ উপায়ে প্রচারকার্যের দৃঢ়বন্ধন এবং গতিময়তা প্রকাশ পাওয়া সম্ভব।

এ পদ্ধতি ধরে এবং তাঁতে লেগে থেকে দৃঢ়তা এবং সংক্ষিপ্ত উপায়ে এগিয়ে গেলেই শেষে সাফল্য আসতে বাধা। এরই পুরুষার্থকল সে হঠাৎ এবং অবিশ্বাস্য ধরনের সাফল্যের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হবে।

যে কোন বিজ্ঞাপনের, তা' রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক যা-ই হোক না কেন তার সাফল্য নির্ভর করে ক্রমাগত এবং কতখানি ধৈর্যের সঙ্গে তা সম্পাদিত হয়েছে।

এ ব্যাপারেও আমাদের শক্তিরা প্রচারকার্যের সংঘবন্ধতার চমৎকার উদাহরণ স্থাপন করে। এটা মাত্র কয়েকটা বিষয়বস্তু ঘিরে ছিল — যা বিশাল জনসাধারণের উপযোগী এবং ব্যাপারগুলোকে পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছিল ধৈর্যের সঙ্গে একবার যখন বিষয়গুলো এবং যেতাবে তাদের উপস্থাপনা করা হচ্ছে তা পৃথিবী স্বীকার করে নেয়, তখন জনসাধারণই তাতে দৃঢ়

সংলগ্ন হয়ে লেগে থাকে। হ্যাঁ, সমস্ত যুদ্ধকাল ধরে। প্রথম দৃষ্টিতে এটাকে বোকায়ী বলে মনে হলেও পরে মনে হবে সমস্ত ব্যাপারটাই বিরক্তি উৎপাদক; কিন্তু শেষে সবাই বিশ্বাস করবে।

কিন্তু ব্রিটিশ ব্যাপারটায় আরো বেশি কিছু বুঝত। এ অশৰীরী অঙ্গের সাফল্য জনসাধারণের ভেতরে কত গভীরে, এবং কখন তা সময় মত টেনে বার করতে হবে যাতে একটা বিশাল খরচের বিরাট অংশ উদ্ধার করা যায়।

ইংল্যান্ডে প্রচারকার্যকে প্রথম শ্রেণীর হাতিয়ার বলে গণ্য করা হয়, অথচ আমাদের দেশে বেকার রাজনীতিজ্ঞদের কাছে এটা হল শেষ আশার আশ্রয় এবং কর্তব্য পরাজ্য বাস্তির কাছে এটা হল আঁটসাট ও উষ্ণ ধরনের নায়কোচিত কাজকর্ম।

সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখলে ব্যাপারটার ফলাফল দাঁড়িয়েছিল নেতৃত্বাচক।

রাষ্ট্রবিপ্লব

১৯১৫ সালে শক্রী আমাদের সৈন্যদের মধ্যে প্রচারকার্য শুরু করে। ১৯১৬ সাল থেকে ক্রমাগত এটার বিস্তার হতে থাকে, এবং ১৯১৮ সালের শুরুতে এটা ফুলে ফেঁপে বন্যার আকার ধারণ করে। এখন কোন একজনের পক্ষে এ ধর্মাত্মরিতের কাজের সুদূর প্রসারী ফলফলের ধাপ বেয়ে বেয়ে এগনো সহজ। ধীরে ধীরে আমাদের সৈন্যরা শক্তপক্ষ যেভাবে চায়, ঠিক সেইভাবে চিন্তা করতে শুরু করে। জার্মানদের পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করার জন্য কোনরকম প্রচারকার্যের ব্যবস্থা ছিল না।

জার্মান সৈন্যধ্যক্ষরা মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ভুল করত যদি তারা মানসিক শিক্ষা দেওয়ার কাজে হাত দিত। নিশ্চিত ফলপ্রদ ব্যাপার হিসেবে এটা ঘরোয়া নীতি। কারণ তারাই এ'তে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম যারা চার বছর ধরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয়ে বীরের মত অশেষ কষ্টব্য করেছে। কিন্তু তখন আমাদের দেশের লোকেরা কি করেছিল? এটা কি বুদ্ধিমত্তার অভাব নাকি বিশ্বাস না থাকার দরুণ এ অসাফল্য?

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি; মারণে নদীর দক্ষিণ তীর থেকে পশ্চাদ-অপসারণের পর জার্মান সংবাদপত্র যে নীতি গ্রহণ করেছিল তা' এত মোটা এবং অপদার্থ বোকার মত ছিল যে আমি নিজেকেই নিজে প্রশংস করতাম এবং যা দিনের পর দিন আমাকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। এটা কি সত্য যে আমাদের মধ্যে সত্যিকারের সাহসী বলতে কি কেউ-ই ছিল না, যে এ ধরনের পেছন থেকে ছুরি মারার হাত থেকে আমাদের নায়কোচিত সৈন্যদের রক্ষা করতে পারে!

১৯১৪ সালের সে দিনগুলোতে ফ্রাসে কি হয়েছিল, যখন আমাদের সৈন্যদল সে দেশ আক্রমণ করে একের পর এক যুদ্ধে জিতে এগিয়ে চলেছিল? ইতালির কি হয়েছিল—যখন তাদের সৈন্যদল ইজানো ফ্রন্টে বিপর্কি? ১৯১৮ সালের বসন্তকালে ফ্রাসে আবার কি হয়েছিল— যখন জার্মান সৈন্যদল ফ্রাসের সৈন্যদের হাতিয়ে দিয়ে মূল ঘাঁটিগুলোকে ঝড়ের গতিতে দখল করে বসেছিল এবং দূর পাল্লার জার্মান কামান সমানে পারীর ওপরে গোলাবর্ষণ করে চলেছিল?

কী করে এসব সৈন্যদলের মাথা উঁচু করা সাহস এবং জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস একটা ফুৎকারে নির্ভিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

କିଭାବେ ତାଦେର ପ୍ରଚାରକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣକେ ମଚେତନ କରାର ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ଧତିଟାକେ କାଜେ ନା ଲାଗିଯେ ଯୁଦ୍ଧେ ନିଚିତ ଜୟୀ ସୈନ୍ୟଦେର ମାଥାର ଓପରେ ଖଡ଼ଗାଘାତ ହେନେଛିଲ ।

ଇତିହାସେ ଆମାଦେର ଲୋକେରା ସେଇ ଜାୟଗାୟ କି କରଛିଲ? କିଛୁଇ ନଯ । ବାରେ ବାରେ ଆମି ରୋଷାରିତ ଏବଂ ଦ୍ରଦ୍ଧ ହୟେ ପଡ଼େଛିଲାମ, ବିଶେଷ କରେ ଶେଷର ଦିକେର ସଂବାଦପତ୍ରଗୁଲୋ ପଡ଼େ ଯା'ତେ ବିଭାଗିତ ବର୍ଣନା ଦେଓୟା ଛିଲ କିଭାବେ ତା ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସୈନ୍ୟଦେର ମଧ୍ୟେ ଜଡ଼ତା ଜାଗିଯେ ତୁଲେ ନିଧନ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଯେ ଚଲେଛେ । ଏ ଚିତ୍ତାଯ ଯତ୍ରଣବିନ୍ଦ ହୟେଛି ଯେ ଜାର୍ମାନଦେର ପ୍ରଚାରକାର୍ଯ୍ୟର ଭାବ ଯଦି ଆମାର ହାତେ ଥାକତ, (ଏସବ ଅନୁପ୍ରୟୁକ୍ତ ଅପରାଧୀ ବିଶେଷ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଦୂର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀଦେର ହାତେ ନା ଥିକେ), ତବେ ହୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଟାଇ ଅନ୍ୟରକମ ହତ ।

ସେଇ ମାସଗୁଲୋତେ ଆମି ଅନୁଭବ କରେଛିଲାମ ଯେ ଆମାକେ ସୀମାତେ ଯୁଦ୍ଧରତ ରେଖେ ଭାଗ୍ୟ ଆମାର ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ଖୋଲା ଖେଲେଛେ; ଏବଂ ମେଖାନେ ଦୌଡ଼ିଯେ ଆମାକେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଯେ ଯେତେ ହଚ୍ଛେ, ମେଖାନେ ଏକଟା ନିଶ୍ଚୋ ବା ଯେ କାରୋର ଗୁଲି ଏସେ ଆମାକେ ଇହକାଳେର ମତ ଶ୍ରଦ୍ଧ କରେ ଦିତେ ପାରେ, ଅର୍ଥ ପିତୃଭୂମିର ଜନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାୟଗାତେ ଅନେକ ବେଶି କାଜ କରତେ ମନ୍ଦମ । ଆମାର ନିଜେରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରଚାରକାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାପାରଟା ଆମି ସାଫଲ୍ୟେର ମସେ ପରିଚାଳନା କରତେ ପାରି ।

କିନ୍ତୁ ଆମାର ପରିଚିତ ବଲତେ ତୋ କିଛୁ ଛିଲ ନା, ଆଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୈନ୍ୟର ମଧ୍ୟେ ଆମି ସାଧାରଣ ଏକଜନ ସୈନିକ ମାତ୍ର । ସୂତରାଂ ଆମାର ପକ୍ଷେ ଚପଚାପ ମୁଖ ବନ୍ଦ ରେଖେ ଆମାକେ ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରତେ ଦିଯେଛେ ମେଟା କରେ ଯାଓୟାଇ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ।

୧୯୧୫ ସାଲେର ଶୀଘ୍ରେ ଆମାଦେର ପରିବାଯ ଶକ୍ତିପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଚୀରପତ୍ର ପଡ଼େ; ତାଦେର ପାଇସ ସବଇ ଏକ ଧାରେ ଗଲା । ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମିକେଇ ଯା କିଛୁ ଏକଟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଗଲଟା ହଲ ଜାର୍ମାନିର ଦୂଃଖ ଦିନେ ଦିନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସଞ୍ଚାରନାଟାଓ ମଲିନ ହୟେ ଆସିଛେ । ଘରେର ଲୋକଦେର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ତୀର୍ତ୍ତ ହୟେ ଉଠିଛେ; କିନ୍ତୁ ସାମରିକ କର୍ତ୍ତ୍ଵକ୍ଷ ଏବଂ କାଇଜାରେର ଜନ୍ୟ ତା ବୋଧାର ଉପାୟ ନେଇ । ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଜାନତ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜାର୍ମାନ ଜନସାଧାରଣର ଜନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୟନି, ହୟେଛେ କାଇଜାରେର ଇଚ୍ଛାଯ । ତାର ଜନ୍ୟ ଜାର୍ମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାୟୀ ନଯ । ଦାୟୀ ଯଦି କାଉକେ କରତେ ହୟ ତବେ ସେ ହଲ କାଇଜାର; ଏବଂ ଯତଦିନ ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ଶାନ୍ତିର ଏ ଶକ୍ତି କାଇଜାରକେ ଦୂର କରା ହେବେ — ତତଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଆସାର କୋନ ଉପାୟଇ ନେଇ ।

କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହଲେଇ ଉଦାର ଏବଂ ଗଣତାତ୍ତ୍ଵିକ ଦେଶଗୁଲୋ ଜାର୍ମାନିକେ ବକ୍ତୁ ହିସେବେ ପୃଥିବୀତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନେର କାଜେ ସହ୍ୟୋଗୀ କରେ ନେବେ । ଏ କାଜଟା କରା ହେବେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକଶ୍ୟାର ସାମରିକ ବାହିନୀ ଶେଷମେତେ ସମୂଲେ ଧର୍ମସ ହେବେ ।

ଏସବ ବକ୍ତବ୍ୟକେ ସଚିତ୍ରିତ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରାର ଜନ୍ୟ, ସେଇସବ ପ୍ରାଚୀରପତ୍ରେର ପ୍ରାୟଇ 'ବାଡ଼ିର ଚିଠି' ଥାକତ — ଯେତୁଲୋ ଶକ୍ତିପକ୍ଷର ପ୍ରଚାରକାର୍ଯ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରମାଣେର ସହାୟକ ସ୍ଵରୂପ । ସତି ବଲତେ କି, ଏତ ସବ ପ୍ରଯାସ ଦେଖେ ଆମରା ହାସତାମ । ପ୍ରାଚୀରପତ୍ରଗୁଲୋ ପଡ଼େ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଲୟେ ପାଠିଯେ ଦିତାମ, ତାରପରେ ପୁରୋ ବ୍ୟାପାରଟାଇ ଭୁଲେ ଯେତାମ — ଯତଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଲ ଏକଟା ହାଁଓଯା ଆବାର ପରିବାର ଭେତରେ ପ୍ରବାହିତ ନା ହତ । ଏସବ ପ୍ରାଚୀରପତ୍ରଗୁଲୋ ବିଶେଷ କରେ ବିମାନ ଥେକେ ଫେଲା ହତ ଏବଂ ତାର ଜନ୍ୟ ବିଶେଷ ଧରନେର ବିମାନେର ବ୍ୟବହାର କରା ହତ ।

ଏ ପ୍ରଚାରକାର୍ଯ୍ୟର ଏକଟା ମୁଖ୍ୟବ୍ୟବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମକଥିଦ । ବ୍ୟାଭେରିଯାନ ସୈନ୍ୟଦିଲେର ଭେତରେ ପ୍ରକଶଦେର ବିରକ୍ତ ଗଡ଼େ ତୋଳାର ତ୍ରମାଗତ ଏକଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଲି; ପ୍ରକଶି ଏବଂ ପ୍ରକଶିଯାର ସୈନ୍ୟରାଇ ନାକି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବୀଧାବାର ଏବଂ ଏଟାକେ ଜିଇୟେ ରାଖାର ଜନ୍ୟ ମଲତ ଦାୟୀ । ଏବଂ

সে কারণেই শক্রপক্ষের ব্যাভেরিয়ার সৈন্যদলের প্রতি কোনরকম বিরুপতা নেই। কিন্তু তাদের সাহায্য করারও কোন পথ খোলা ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রশিয়ানদের স্বার্থবক্ষা করে চলছে এবং আগুন থেকে তাদের জন্য বাদাম তোলার কাজে নিযুক্ত।

এ ক্রমাগত প্রচারকার্যের ফলাফল ১৯১৫ সালে আমাদের সৈন্যদের ওপর সুদূর প্রসারী হয়। ব্যাভেরিয়ার সৈন্যদের মধ্যে প্রশিয়ার বিরুদ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্ষেপ দানা বেঁধে ওঠে। কিন্তু যারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, তারা এর কোনরকম প্রতিবাদ করতে সচেষ্ট হয়নি। পুরো ব্যাপারটা একটা ভয়ঙ্কর রকমের অপরাধ বিশেষ। কারণ তৎক্ষণাৎ বা পরে শুধুমাত্র প্রশিয়ানদের কপালেই লাঙ্ঘনা জোটে না, সমস্ত জার্মান জাতিকেই সেই দুর্ভাগ্যের অংশ বাধ্য হয়ে বরণ করে নিতে হয়।

এভাবে ১৯১৬ সালের পর থেকে শক্রপক্ষের প্রচারকার্য অভাবনীয় সফলতা লাভ করতে শুরু করে।

ঠিক এভাবে সৈনিকদের বাড়ি থেকে যেসব চিঠিপত্রাদি আসতে থাকে তার ফলাফল হয় সুদূর প্রসারী। সমস্ত ব্যাপারটা এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে শক্রপক্ষের আর এভাবে প্রচারপত্র ছড়ানোর প্রয়োজন পড়ে না; এবং ঘদের থেকে সাধারণ সৈনিকদের ওপর আসা চাপ কমাতে মুখ্য শাসকবর্গ কয়েকটা মাঝুলী সতর্কবাণী উচ্চারণ করা ছাড়া আর কিছুই করেনি। বাড়ির থেকে সেন্টিমেন্টাল বো-দের লেখা চিঠির মাধ্যমে বয়ে আনা বিষ সমস্ত সীমাটাকে বিষাক্ত করে তোলে। একবারও তারা ভাবেনি যে এর দ্বারা শক্রপক্ষের জয়ের পথই প্রশঞ্চ করা হচ্ছে বা তাদের নিজেদের পুরুষদের কাজ প্রলুব্ধ এবং দিনে কষ্টকর হয়ে উঠছে। জার্মান অদ্রমহিলাদের লেখা এসব বোকা চিঠিগুলোর মূল্য শ'য়ে শ'য়ে বা হাজারে হাজারে প্রাণের বিনিময়ে দিতে হয়।

এভাবে ১৯১৬ সালে বেশ কিছু হতভাগ্যজনক ঘটনাবনীর প্রকাশ পায়। সমস্ত সীমাটাই গোমরাতে থাকে, অনেক বিষয়েই অসন্তোষে ফেটে পড়ে, — যার বিশেরভাগই ন্যায় ছিল। একদিকে যখন এরা ক্ষুধার্ত এবং রোগঘন্ট, বাড়িতে আঘাতযুজন চরম দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছে, ঠিক তখন অপর একদল মহোৎসব এবং পালনোৎসবে মস্ত। হ্যাঁ, এমন কি সীমাত্তের অবস্থাও একই প্রকার। যা হওয়াটা কোন রকমেই উচিত হয়নি।

এমন কি যুদ্ধের প্রারম্ভেই সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষের প্রবণতা ছিল; কিন্তু সমালোচনার ধোঁয়াটা নিজেদের ভেতরের গভীরেই সীমাবদ্ধ থাকায় তা আর বাইরে প্রকাশের সুযোগ পায়নি। যে এ মুহূর্তে বন্য মোরগের মত বিড় বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করত, সেই মুহূর্ত কয়েক পরে সেই অসন্তোষ চাপা দিয়ে নিচুপে তার কর্তব্যের জায়গায় ফিরে যেত; যেন সবাকিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে। যে সৈন্যদল কিছুক্ষণ আগে অসন্তোষে ফেটে পড়েছে, পরের মুহূর্তে সে পরিষ্কার বসে দাঁত মুখ কামড়ে আক্রমণ চালিয়েছে, যেন জার্মানির ভাগ্য কয়েক শ'গজ কর্দমাক্ত এবং বোমাবিদ্ধ মাটির উপরেই নির্ভর করছে। গৌরবোজ্জ্বল সেই পুরনো সৈন্যদল তখনো পরিষ্কা আঁকড়ে পড়ে আছে। আমার নিজের ভাগ্যের হঠাৎ পরিবর্তন আমাকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করায় যে সেখান থেকে আমি এ পুরনো সৈন্যদল এবং সদ্য বাড়ি থেকে আসা সৈনিকদলের পার্থক্য বুঝতে পারি। ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি আমি যে সৈন্যদলে ছিলাম, সে দলটাকে শেষে যুদ্ধের জন্য পাঠানো হয়। আমাদের কাছে এটাই ছিল সত্যিকারের রীতিমত ভারী যুদ্ধ— যেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের এ ধারণাই হয় যে, এটাকে যুদ্ধক্ষেত্র না বলে প্রকৃত নরক আখ্যা দেওয়াটাই সঠিক।

যদিও সংগ্রহের পর সঙ্গাহ ধরে অবিরত বোমাবর্ষণের মুখে আমরা স্থির অঞ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকি, এ বোমাবর্ষণের ফলে সামান্য যেটুকু জায়গা আমাদের বাধ্য হয়ে পরিত্যাগ করে পিছু হটতে হয়েছে, পরেই আবার দখলও নিয়েছি; যা আর কখনো তাদের আওতায় যায়নি। ১৯১৬ সালের ৭ অক্টোবর আমি আহত হই এবং নেহাত ভাগের জোরে নিজেদের শিবিরে সে আহত অবস্থায় ফিরে আসতে পারি। আমাকে সাহায্যকারী ট্রেনে জার্মানিতে ফেরত পাঠাবার আদেশ আসে।

প্রায় দু'বছর হয়ে গেল আমি বাড়ি ছেড়ে এসেছি; এ পরিবেশে মাত্র দু'টো বছরকে অনন্তকাল বলে মনে হয়। আমি চেষ্টা করেও স্বত্ত্বতে আনতে পারি না জার্মান লোকেরা সৈনিকের পোশাক ছাড়া দেখতে কি বকম। হারমিসের হাসপাতালে এসে কর্মরতা এক নার্সের গলার স্বর শুনে আমি চমকে উঠি, সে আমার কাছে শুয়ে থাকা একজন আহতের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। দু'বছর! এ সুনীর্ধ দু'বছর পরে জার্মান মেয়ের গলার স্বর শুনতে গেলাম।

সেই রিলিফ ট্রেন যত জার্মান সীমান্তের নিকটবর্তী হতে থাকে, তত বেশি চাঞ্চল্য জেগে ওঠে আমাদের ভেতরে। যে পথ ধরে দু'বছর আগে একজন যুবক কর্মী হিসেবে গেছি, সে পথগুলো যেন আমাদের কাছে অতি চেনা — ব্রাসেল্স, লোভেন, লিগে; এবং শেষ পর্যন্ত আমরা যেন আমাদের জার্মান ভূমি চিনতে পারি।

১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে আমাদের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল যখন আমরা এ সীমান্তকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাই। বর্তমানে বৈংশব্দতা এবং সুগভীর আবেগ মনের ভেতরে সবচেয়ে বেশি মাথা উঁচু করে আছে। প্রত্যেকেই তার নিজের ভাগ্যকে ধ্যানবাদ জানায় কারণ যে ভূখণ্ডের জন্যে আমরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলাম, সে ভূখণ্ড আবার আমরা দেখতে পেয়েছি এবং প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারছিলাম না। সীমান্তে যুদ্ধে যাওয়ার প্রায় দ্বিতীয় বার্ষিকীতে আমি বার্লিনের কাছে চীলিংসের হাসপাতালে ভর্তি হই।

কি বিরাট পরিবর্তন! সোমের কদমার্ত যুদ্ধক্ষেত্রের থেকে এ ধরনের বাড়ির ধৰণে সাদা বিছানায়। এ বাড়িতে ঢোকার সময়ে প্রত্যেকেই দ্বিদ্বা আসে। একমাত্র ধীরে ধীরে সবাই এ নতুন পৃথিবীতে আবার অভ্যন্ত হয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যবশত সেখানে আরো কতকগুলো বিষয় ছিল যার জন্য এ নতুন জগত আমাদের অতি পরিচিত জগতের থেকে কিছুটা আলাদা ঠেকেছিল।

সীমান্তে সৈনিকদের সে উৎসাহ এখানে একান্তভাবেই অনুপস্থিত। আমাই প্রথম এমন কতগুলো বিষয়ের বিরোধিতা করি যা সীমান্তে কারোর এতদিন জানা ছিল না। বিশেষ করে নিজের কাপুরুষত্ব নিয়ে অহংকার করা। যদিও সীমান্তে অভাব অভিযোগের খামতি ছিল না, তবু আন্দোলন এবং এ অবাধ্যতা ও কাপুরুষতাকে অন্যের কাছে বিরাটভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টাও ছিল না। না, সীমান্তে একজন কাপুরুষ কাপুরুষই ছিল, তার বেশি কিছু নয়। বিশেষ করে তার ভয়টাই অন্যের ভেতরে সংক্রমিত হত। যেমন নায়কচিত্ত কারোর কাজকর্ম তাকে ঘিরে সবার প্রশংসা কাঢ়ত। কিন্তু এখানে, এ হাসপাতালে পুরো ব্যাপারটাই অন্যরকমের। গলা উঁচু আন্দোলনকারীরা সত্যিকারের ভাল সৈনিকদের নিয়ে ঠাট্টা পরিহাস করত এবং দৰ্বল হাঁটু বিশিষ্ট কাপুরুষদের গৌরবের ঢঙে রাঙানোই ছিল এদের কাজ। কয়েকটা বিচিত্র মানুষ ছিল এ নিম্নুক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা। তাদের মধ্যে একজন তো হাসপাতালে আঁশার ঝণ্টা

চালাকি করে কিভাবে কাঁটা তারে নিজের হাত কেটেছে তার বর্ণনা দিতেই ব্যস্ত । যদিও তার ক্ষত অত্যন্ত সামান্য, কিন্তু তার ধরন-ধারণে মনে ইচ্ছিল সে এখানে দীর্ঘদিন ধরেই আছে এবং অনন্তকাল ধরেই থাকবে । কোনৰকম শঠতার দ্বারা নিচ্ছয়ই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে । এ সর্বনাশাত্মক উদাহরণের ধৃষ্টতা এত প্রচণ্ড রকমের ছিল যে তার অসাধুতাকে সে সাহসের অভিযোগ বলে বর্ণনা দিত যা নাকী সেই সাহসী সৈনিক যে মৃত্যুবরণ করেছে তার চেয়েও অনেক উচু । অনেকেই এসব কথাবার্তা চুপচাপ শুনত, কিন্তু বেশিরভাগই তার কথায় সায় দিত ।

ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এটা অসহ যে, এ রকমের রাজদ্রোহাত্মক একজন আন্দোলনকারীকে এ ধরনের একটা প্রতিষ্ঠানে থাকতে দেওয়া হয়েছে । কিন্তু কি করার আছে? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও নিচ্ছয়ই জানে লোকটা কে? সত্যি কথা বলতে কি, তারা জানত । তবু এ বিষয়ে তারা কিছু করেনি ।

যেমন্ত চলাফেরা করতে সক্ষম হই, আমি বার্লিন বেড়াবার জন্য ছুটি মঞ্জুর করাই ।

সর্বত্র তিঙ্গ চাহিদার ছাপ । লক্ষ লক্ষ কাপুরুষে ভর্তি শহরগুলো অনাহারে কাত্রাছে । বিভিন্ন হোটেলে, বিশ্বামাগারে একই ধরনের আলোচনা— যা আমাদের হাসপাতালে চলছে । দেখে শুনে আমার এ ধারণাই হয় যে আন্দোলনকারীরা ইচ্ছে করেই এককভাবে এসব জায়গায় জড়িয়ে পড়েছে যাতে তাদের মতামতটাকে সবার সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয় ।

কিন্তু মিউনিকের অবস্থা এর চেয়েও অনেক বেশি খারাপ । আমাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর সেখনকার সংরক্ষিত সৈন্যবাহিনীতে পাঠানো হয় । আমার চোখে মিউনিককে যেন অচেনা অজানা একটা শহর বলে মনে হয় । যেখানে যাওয়া যায় সে একই অভিযোগ । অসন্তোষ আর ক্রোধ । এরজন্য অবশ্য কিছু পরিমাণে দায়ী হল অসামরিক অফিসাররা । তারা অপটু অনভিজ্ঞ হাতে সৈন্যদের সঙ্গে ব্যবহার করেছে । তারা কোনদিন যুদ্ধক্ষেত্র দেখেনি এবং সে কারণেই যথাযোগ্যভাবে পুরনো সৈন্যদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা তাদের জানা ছিল না । স্বাভাবিকভাবেই এসব পুরনো সৈন্যদের মধ্যে চারিত্রিক দিক থেকে নির্দিষ্ট কিছু জিমিস উপস্থিত হয়, যা তারা পরিখার মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পেয়েছিল । এ সংরক্ষিত বাহিনীর পদস্থ কর্মচারীদের পক্ষে তা উপলক্ষ্য করা সম্ভব ছিল না, অথচ যারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়মিত সৈন্যদের সঙ্গে থেকেছে তারা তা বুঝতে পারত; সূতরাং সেই কারণে সে অনেক বেশি সম্মান পেত । এ যোগ্যতা থেকে সংরক্ষিত বাহিনীর অসামরিক পদস্থ কর্মচারীরা বঞ্চিত ।

সীমান্তের কর্মরত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এ ব্যাপারটাকে বুঝতে পারলেও সংরক্ষিত বাহিনীর কর্মচারীরা ঠিক ব্যাপারটাকে অনুধাবন করে উঠতে পারত না । সূতরাং সাধারণ সৈনিকদের আচারে এ পার্শ্বক্য তাদের চাখে বিরাট হয়ে ধরা দিত । কিন্তু এসব ছাড়াও সাধারণভাবে উৎসাহ বলতে কিছু ছিল না । এক কথায় শোচনীয় অবস্থা । এড়িয়ে যাওয়ার কলাকৌশলটাকেই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ বলে ভাবা হত; আর কাজের প্রতি একাধিতা ওদের ভাষায় দুর্বলতা বা গোড়ামী ছাড়া কিছু নয় । সরকারি অফিসগুলো ইহুদী কর্মচারীতে ঠাসা ছিল । কমবেশী প্রতিটি কেরানী ইহুদী এবং বলতে গেলে প্রতিটি ইহুদীই ছিল কেরানী । আমি এ বিবাট পছন্দ করা গোষ্ঠী দেখে অবাক হয়ে যেতাম, প্রকৃত সৈনিকদের মধ্যে যাদের উপস্থিতি নেহাত নগণ্য ।

ব্যবসায় জগতের অবস্থা আরো ভয়াবহ। এখানে এককথায় ইহুদীদের ওপর পুরো দেশটা প্রচণ্ড রকমের নির্ভরশীল। জোকের মত তারা জাতির শরীর থেকে ধীরে ধীরে রক্ষণ শুধে নিছে। যুদ্ধের সময় সুসংগঠিত কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে সমস্ত রকমের জাতীয় ব্যবসার দম বন্ধ করা অবস্থা। যাতে কোনরকম ব্যবসাই মুক্তভাবে না করা যায়।

সব কিছুকে কেন্দ্রীভূত করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং ১৯১৬-১৭ সালের প্রথম ভাগে বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত উৎপাদন ইহুদীদের অর্থনৈতির কুক্ষিগত ছিল।

তবে কার বিরুদ্ধে জনসাধারণের এ ক্ষেত্রে? আমি যেন মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলাম যে সেদিন সমাগত, যা আকস্মিক বিপদ তেকে আনবে। যদি না সময় মত এর বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া না হয়।

যখন ইহুদীরা সমস্ত জাতিকে বিনষ্ট করতে উদ্যত, গুদামঘরের চাবি পকেটে পুরেছে; প্রশিয়ানদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিক্ষেত্রে ইঙ্গন জোগাছে; এবং সীমান্তে এ বিষাক্ত প্রচারকার্যের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না; এমন কি দেশের ভেতরেও তার প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নেই। কেউ-ই তখনে বুবাতে সক্ষম নয় যে প্রশিয়ার ধ্বংস ব্যাডেরিয়ার মুক্তি বা উন্নতি এনে দিতে পারে না। উপরতু, একের ধ্বংস অপরকেও সেখানে টেনে নামাবে।

এসব ব্যাপারগুলো আমাকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। কারণ এতে সেই ইহুদীদের চালাকি, জনসাধারণের চিন্তাধারার খাতটাকে তাদের ওপর থেকে অন্যদিকে বইয়ে দেবার প্রয়াস। যখন প্রশিয়ান আর ব্যাডেরিয়ানরা সামান্য বিষয় নিয়ে পরম্পর ঝগড়া বিবাদে রত, ইহুদীরা সে সুযোগে চোখের সামনে দিয়েই তাদের উপজীবিকা ছিনিয়ে নেয়। প্রশিয়ানরা যখন ব্যাডেরিয়ানদের গালাগাল দিতে রত, ঠিক তখনই ইহুদীরা এক সাজানো বিপ্লব বাঁধিয়ে দিয়ে প্রশিয়া আর ব্যাডেরিয়া দুটোকেই একসঙ্গে ধ্বংস করে।

একই জার্মান জাতির মধ্যে পরম্পরের এ সামান্য বিষয় নিয়ে এ ঘৃণিত ঝগড়া আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না; যার থেকে আমার মনে হয় সীমান্তে ফিরে যাওয়াটাই ভাল। সে কারণে মিউনিক পৌছেই আমি চাকরিতে যোগ দেই। ১৯১৭ সালের মার্চের গোড়ার দিকে আমি সীমান্তে আমার পুরনো সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করি।

১৯১৭ সালের শেষাব্দী আমার মনে হয় যেন সীমান্তে আমার হতাশার দিনগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। রাশিয়ার ধ্বংসের পর আমাদের সৈন্যবাহিনী তাদের আশা এবং সাহস ফিরে পায়। সবার একই ধারণা হয় যে মুক্ত আমাদের স্বপক্ষেই শেষ হবে। আমরা যেন আবার গলা ছেড়ে গান গাইতে পারব। দাঁড়কাকগুলো তাদের কর্কশ চিংকার বন্ধ করেছে। পিচ্ছুমির ভবিষ্যতের প্রতি আশা আবার প্রবল হয়ে ওঠে।

১৯১৬ সালের শরৎকালে ইতালিয়ানদের ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত চমৎকার হয়। কারণ এ বিজয় এটাই প্রয়াণ করে যে রাশিয়া ছাড়াও অন্য সীমান্ত তহমছ করে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। এ উৎসাহজনক চিন্তাই সীমান্তের লক্ষ লক্ষ লোকের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তারা উৎসাহের সঙ্গে ১৯১৮ সালের বসন্তকালের দিকে তাকিয়ে থাকে। কারণ তখন শত্রুরা যে চৰম হতাশায় ভুগছে এ সত্যটা প্রকট হয়ে পড়েছে। শীতকালে সীমান্তটা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি শাস্ত্রৱপ্ত ধারণ করে। কিন্তু তা' হল বড়ের আগের শাস্ত্র অবস্থা, শুন্কতা।

ঠিক যখন শেষ আঘারক্ষার প্রচও রকমের প্রস্তুতি চলেছে, যা কিনা এ যুদ্ধের শেষ টেনে আনবে, যার জন্য অন্তহীন যানবাহনের সারী মানুষ আর গোলাবারুদ বয়ে আনছে সীমাত্তে এবং সৈন্যরা শেষ ও প্রচও আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে, ঠিক তখনই এ যুদ্ধের সময়ে জার্মানি সাংঘাতিক রকমের এক বিশ্বাসযাতকতার সম্মুখীন হয়।

জার্মানিকে কিছুতেই যুদ্ধে জিততে দেওয়া হবে না। ঠিক যে মুহূর্তে বিজয়লক্ষ্মী জার্মানির গলায় মালা পরাতে উদ্যত, তখনই এমন একটা ষড়যন্ত্র করা হয়; একটা প্রচও মুঠাঘাতে জার্মানিকে শয়াশায়ী করে দিয়ে বিজয় থেকে তাকে অনেক দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। গোলাবারুদ এবং অন্তর্শ্রের কারখানায় পূর্ণ হরতালের ব্যবস্থা করা হয়।

এ ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য যদি সফল হত তবে জার্মান সীমাত্ত ধ্বংস হয়ে পড়ত এবং তোরভার্ক অর্থাৎ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ইচ্ছে জার্মানি যেন কিছুতেই যুদ্ধে জিততে না পারে, পূর্ণ হত। গোলাবারুদের অভাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সীমাত্ত ভেঙে পড়ত, আঘাসংরক্ষণের কাজও থেমে যেত; এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীভাব বজায় থাকত। তখন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা জার্মানির অর্থনীতিকে পরিচালনা করার সুযোগ পেত — এর মূল উদ্দেশ্যই ছিল জাতীয় অর্থনীতি ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে আন্তর্জাতিক ধনতত্ত্ব ব্যবস্থাকে তার জায়গায় কায়েম করা। এবং এ উদ্দেশ্য সত্যি বলতে কি পূর্ণও হয়ে যেত, তারজন্য একদিকের বিশ্বাস প্রবণতা আর অপরদিকের বিশ্বাসযাতকতাকে ধন্যবাদ।

যাহোক বিস্ফোরক উৎপাদনের কারখানাগুলোর ধর্মঘট শেষপর্যন্ত যা আশা করা গিয়েছিল সেই সাফল্য আনতে পারেনি। বিশেষ করে সীমাত্তে গোলাবারুদের অভাব সৃষ্টি করা। কারণ এ ধর্মঘট সৈন্যবাহিনীকে গোলা বারুদের অভাবে সামগ্রিক ধ্বংস ডেকে আনার পক্ষে অতি অল্পদিন ধরে চলেছিল, যা আগে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু নৈতিক দিক থেকে প্রচেরকম ক্ষতি যে হয়েছিল তা' অবীকার করার উপায় নেই।

প্রথমত দেশের লোক যদি জয় না চায়, তবে কিসের জন্য এ সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করে চলেছে? কার জন্য এ আঘাত্যাগ আর অসীম কষ্ট এবা সহ্য করছে? যখন দেশের ভেতরে লোকেরা ধর্মঘট করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, তখনো কি সৈন্যরা যুদ্ধ করে যাবে?

১৯১৭—১৮ সালের শীতকালটা এ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীর আকাশে কালো মেঘ ঝুলে রয়েছে। প্রায় চার বছর ধরে ক্রমাগত জার্মানির ওপরে আক্রমণের পর আক্রমণ চালানো হয়েছে, তবু তাদের পক্ষে জার্মানিকে মাটিতে শোওয়ানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যে তাদের ঠেলে দূরে সরিয়ে রেখেছে, — এক হাতে তার নিজেকে রক্ষার নিমিত্ত ঢাল ধরা, অপর হাতে শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তরোয়াল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ শক্তিরা এক সময় ধ্বংস হয়, এখন তার পশ্চিমের সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার জন্য হাত মুক্ত। অবশ্য এ কাজের জন্য বক্তের নদী বয়ে গেছে, তবু তার দু'হাত এখন মুক্ত, সুতরাং এক হাতে ঢাল আর অপরহাতে অসি ধরে সে এখন পশ্চিম সীমাত্তে যুদ্ধ চালাবার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত এবং যেহেতু শক্তিরা জার্মানির আঘারক্ষণ ভেঙে তছনছ করতে পারেনি, তাই জার্মানিই এখন তাদের প্রতি আক্রমণ করতে শুরু করে। জার্মানির এ জয়ের সংস্কারণ কাহে শক্তিরা ভয়ে কেঁপে ওঠে।

প্যারিস এবং লন্ডনে একের পর এক সম্মেলন শুরু হয়। এমন কি শক্তিদের প্রচারকার্যও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। জার্মানির জয়ের আর কোন আশা নেই, — এ প্রচার চালানো আর আগের মত এত সহজ হয় না। একটা শুক্রতা সীমাত্তে বিগাজ করে। এমন কি সেই শুক্রতা

ওধু জার্মান সৈন্যদের মধ্যে নয়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৈনিকদের মধ্যেও তার ছায়া পড়ে। তাদের প্রভূদের প্রগলততা হঠাতে বঙ্গ হয়। নেমে আসে বিরক্তিকর সত্ত্বের সকাল। জার্মান সৈন্য সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা ততদিনে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বর্তমানে তাদের অভিযত হল, এ হল এমন এক ধরনের বোকা সমাণি যার ধ্রংস অনিবার্য। কিন্তু বাস্তবে দেখে সে বোকারাই রাশিয়ানদের মৈত্রী ভেঙে এগিয়ে গেছে। পূর্বদিকের আস্তরক্ষণ নীতি, যা নাকি জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির কারণে জারী করেছিল, এখন স্টেই অপরপক্ষের চোখে কলাকৌশল বলে ধরা দেয়। তিন বছর ধরে জার্মানরা রাশিয়ার সীমান্তে বোপোড় ঢেউয়ে ঢলেছে, কিন্তু লাভ বলতে কিছুই হ্যানি। এ নিষ্ফল কাজকর্ম ফেলে সবাই মুখ সিটকেছে; কারণ তখন সকলেরই ধারণা ভবিষ্যতে কেবল সৈন্য সংখ্যার জোরেই রাশিয়া এ যুদ্ধে জিতে যাবে। রক্ত ঝরতে ঝরতে জার্মানি ক্ষয়ে যাবে। এবং ঘটনাবলীও এ আশাকেই সমর্থন করেছিল।

১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বরের দিনগুলোতে ট্যানেনবার্গের যুদ্ধের পর যখন প্রথম রাশিয়ার অনন্ত যুদ্ধবন্দীর সারি জার্মানির ভেতরে ঢোকে, তখন মনে হয়েছিল এর সম্ভবত আর শেষ নেই; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল একজন সৈনিক মারা গেলেই তার জায়গায় আরেকজন প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। এ বিশাল স্বাক্ষরের জাবের কাছে এত বিশাল পরিমাণে সৈন্য মজুত যে মনে হয় এ সৈন্যবহিনী অক্ষয়; নতুন নতুন শুরু যেন সেই যুদ্ধ দলের হোতার কাছে সর্বদাই প্রস্তুত।

এ দীর্ঘ প্রতিবন্ধিতায় জার্মানি আর কতক্ষণ বুঝতে পারবে? এখনো পর্যন্ত সেই চরম দিন এসে উপস্থিত হ্যানি, যখন জার্মানি শেষ যুদ্ধে জয়ী হবে। কিন্তু তখনো তো সেই শেষ যুদ্ধের জন্য রাশিয়ার কাছে প্রচুর সৈন্য মজুত থাকবে। এবং তারপরে? যন্ত্যত্বের পরিমাপে জার্মানির ওপরে রাশিয়ার বিজয় হয়ত বা দেরি হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন পরে হলেও তা আসবে।

রাশিয়াকে ধিরে যে আশা জাল গড়ে উঠেছিল, তা' এখন অস্তিত্ব। যে মৈত্রী এত প্রচুর পরিমাণে বক্তৃত্ব করেছে, তাদের পরম্পরের স্বার্থের ভাগীর নিঃশেষিত। নির্দিয় শক্তির সামনে তারা তুষিতে শয়াগ্রহণ করেছে। ভয়বিস্রূততা এবং হতাশা মৈত্রী রাষ্ট্রের সৈন্যদের মধ্যে তার খাবা প্রসারিত করেছে; এতদিন যারা একটা অন্ধ বিশ্বাসের মোহে আচ্ছন্ন ছিল, তারা এখন আগত বস্তুতে ভয় করছে। কারণ তারা বুঝেছে যাত্র কিছু পরিমাণে শক্তি পরিচয়ের সীমান্তে সংগঠিত করা সম্ভবেও তারা জার্মানদের পরাজিত করতে পারেনি, সেক্ষেত্রে কী করে এ বিশাল সৈন্যসম্ভাবকে পরাজিত করা সম্ভব যেখানে এ অবাক করা দেশের বীরবৃন্দ প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য পদ্ধিম সীমান্তে জড় হচ্ছে।

দক্ষিণ খেরোলের ঘটনাবলীর ছায়া যেন এখানে প্রতিফলিত। জেনারেল ক্যাডেনা'র প্রেতেরা যেন হঠাতে এখানে এসে জড় হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৈন্যদের মুখে তার ছায়া সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। যুদ্ধ জয়ের আশা চেয়ে হেরে যাওয়ার আশঙ্কাটাই এখন প্রকট।

সে হঠাতে রাত্রিগুলোতে, যখন প্রত্যেকেই প্রায় শুনতে পেত জার্মান সৈন্যদের এগিয়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া এবং কম্পিতবক্ষে অপেক্ষা করত সেই দিনটার জন্য, হঠাতে যেন একটা চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি জার্মানিতে জুলে ওঠে এবং তার রশ্মিতে শক্তি সীমান্তের বোমা বর্ষণে বিধ্বন্ত জমিগুলোকে দেখিয়ে দেয়।

যখন জার্মান সৈন্যবাহিনী প্রচও রকমের আক্রমণ চালাবার আদেশ পেয়েছে, ঠিক তখনই জার্মানিতে সর্বাঞ্চক ধর্মঘটি হয়।

প্রথমে তা সারা পৃথিবী হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। সে হতবুদ্ধিকর অবস্থার ঘোর কাটলে শক্ররা আবার প্রচারকার্যে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে, এবং শেষ মুহূর্তে তাদের ওপর শিকারী বাজের মত ঝাপিয়ে পড়ে। হঠাৎ একটা উপায়ের রশ্মি নজরে আসে, যার দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৈন্যদের ডুবে যাওয়া আঘাতিক্ষাস আবার খুঁজে পায়। জয়ের সভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আগামী ঘটনাগুলোর সম্পর্কে অমঙ্গলের পূর্বাভাস এখন একটা দৃঢ় সঙ্কলের নিষ্ঠয়তায় ধরা দেয়। যে সব সৈন্য-বাহিনীকে জার্মান আক্রমণের প্রচওতা সহ্য করতে হয়েছে, যে আক্রমণের প্রচওতা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা গেছে, তারাই এখন শেষ বিচারের রায়ে উদ্দীপিত যে জার্মান ধৃষ্টতার জন্য নয়, বরং অপরপক্ষে আঘাতক্ষণের মহিষ্যুতারই জয় অবশ্যিক। এখন শুধু জার্মানদের তরফ থেকে বেছে নেওয়া কারা জয়ী হবে। কারণ পিতৃভূমিতে তারা বিপ্লব করতে ভালবাসে, জয়ী হতে নয়।

ব্রিটিশ, ফরাসী এবং আমেরিকান সংবাদপত্রগুলো এ বিশ্বস্টাই তাদের পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় আর সুচারুরপে এ প্রচার ব্যবস্থাকে হাজির করা হয় সীমান্তে, তাদের নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীর সামনে।

জার্মানিতে বিপ্লব শুরু হয়েছে, সুতরাং মিত্রশক্তির জয় অনিবার্য! এটাই হল পাউল আর টমির আহ্বা ফিরিয়ে এনে তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড় করানোর সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ। আমাদের রাইফেল এবং মেশিনগান আবার আগুন ঝরাতে শুরু করে; কিন্তু তা' ভয় বিহুল শক্রদের মধ্যে আশক্ষার সৃষ্টি করে না।

গোলাবার্মদের কারখানায় ধর্মঘটের এ হল ফলাফল। শক্র দেশগুলোতে জয়ের বিশ্বাস এভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যা ধীরে ধীরে তাদের হাত শক্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মিত্রাণ্তরগুলোর হতাশার ভাবও কেটে যায়। এ ধর্মঘটের ফলে হাজার হাজার জার্মান সৈন্য প্রাণ হারায়। কিন্তু এ ঘৃণ্য কুর্কমের প্ররোচকরা যারা এ ভীরু ধর্মঘট সুসংবন্ধ করেছিল, তারা ছিল এ বিপ্লবের হোতা।

প্রথমে অপ্রত্যক্ষভাবে মনে হয়েছিল জার্মান সৈন্যদের এসব ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া তারা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবে। এখানে প্রতিরোধের সময়ে শক্রপক্ষের চারিত্রিক দিক থেকে সৈনিকদের সংর্বশালী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়। তার জায়গায় স্থান নেয় যুক্তে জেতার এক ভয়ানক প্রতিজ্ঞা। কারণ মানুষের বিচারের মানদণ্ডে যদি পঞ্চম সীমান্তে জার্মান আক্রমণটাকে কয়েকটা মাস রোখা যায়, তবেই যুক্তে জয় অবশ্যিক। মিত্রপক্ষের সংসদও এ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সমর্থন করে বিরাট একটা আঙ প্রচারকার্যের জন্য ব্যয় অনুমোদন করে, যার উদ্দেশ্য ছিল জার্মানির আভ্যন্তরিক শক্তিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা।

এটা আমার ভাগ্যই বলতে হবে যে প্রথম দুটো এবং শেষবারের প্রচও আক্রমণে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলাম। এসব ঘটনাবলী আমার জীবনে প্রচও বিষয়ের ছায়া ফেলে, — বিশ্বয়কর। কারণ শেষবারের মত যুদ্ধ তার আঘাতক্ষণ নীতি ছেড়ে দিয়ে আক্রমণাঞ্চক চরিত্র বেছে নেয়, ১৯১৪ সালে যা করা হয়েছিল। জার্মান সৈন্যদের পরিখার বুক থেকে আঘাসের নিষ্পত্তি বেরিয়ে আসে এবং তিন বছরের দীর্ঘ ধৈর্যের পরে তারা যেন ডোওয়া চড়ে নয়বে উপস্থিত হয়; হিসেব চুকোবার দিন সমাপ্ত। আবার সেই কামলিঙ্গু বিজয়োৎসবের

জয়ধ্বনি বিজয়ী সৈন্যদের কঠ থেকে বেরিয়ে আসে। জয়কে তারা অমর সম্মানের সঙ্গে কষ্টলগ্ন করতে শেষ পর্যন্ত সমর্থ হয়েছে। আবার সেই দেশপ্রেমের সঙ্গীতগুলো সরবে গাওয়া শুরু হয়, এ যেন তাদের অভিহীন স্বর্ণের দিকের রাস্তা, এবং শেষবারের মত ইঁধুর তার অকৃতজ্ঞ সন্তানদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি হাসে।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, শুমাট একটা আবহাওয়া যেন সীমান্তকে ঘিরে ধরে। দেশের অভ্যন্তরে তখন প্রস্পরের সঙ্গে ঝগড়া চলছে। কিন্তু কী নিয়ে? আমরা যতটুকু শুনতে পেরেছি তাঁতে মনে হয় সীমান্তের বিভিন্ন সৈন্যদলের বকমারী বিষয়ে ঘিরে এ ঝগড়া দানা বেঁধে উঠেছে, যুদ্ধটা একটা হাসির ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। একমাত্র হঠকারী লোকেরাই এখনো জয়ের আশা রাখে। এ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার স্বপক্ষে এখন আর জনতা নেই; একমাত্র পুঁজিবাদ এবং স্ম্যাটই তাদের নিজেদের স্বার্থে এটাকে বয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক। এ ধরনের চিন্তাধারাই দেশের অভ্যন্তর থেকে সীমান্তে ভেসে আসত আর আলোড়িত হত।

প্রথম প্রথম এ গুজব সামান্যই হয়েছিল। সার্বজনীন মত প্রকাশের মূল্য আমাদের কাছে কতটুকু? এর জন্যেই কি গত চার বছর ধরে আমরা যুদ্ধ করে চলেছি? এটা হল আমাদের বীরদের কবর থেকে ভীরুর মত অপহরণ করা, যে মহৎ কারণে তারা আজ ভূমিশয়্যায় শায়িত, তার দাম আর কতটুকু! আমাদের সৈন্যরা ফ্লানডার্সে শ্লোগান তুলেছিল যে ‘সার্বজনীন মতপ্রকাশ চিরজীবী হোক’— তারা আবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। কিন্তু ক্রমিত সুরে গেয়ে ওঠে, পৃথিবীতে জার্মানি হল সকলের ওপর। নিচু স্বর হলেও উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিবর্তন ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা এ সার্বজনীন মত প্রকাশের জন্য চিংকার করছিল, যখন এরা যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়ায়, তারা কিন্তু তখন এতে অনুপস্থিত। এ সব রাজনৈতিক ইতর প্রাণীগুলো সীমান্তে আমাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। সে দিনগুলোতে যেখানে দলে দলে সৎ জার্মানদের জয়ায়েত, সে জয়ায়েত এ তথাকথিত অদ্বিতীয় থেকে আসা মুষ্টিমেয় সংসদ সদস্যদের দেখা মিলত।

পুরনো সৈন্যদল যারা সীমান্তে যুদ্ধরত, তারা এ নতুন অন্তর্সভার যা যেসার্স অ্যাবাটি, সাইডম্যান, ব্যর্থ, লীভলেন্ট এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে আসত, একেবারেই পছন্দ করত না। আমরা বুঝতে পারতাম না কেন? হঠাতে এসব কর্তব্যে পরাজয়ে ব্যক্তিরা সমস্ত শাসন ক্ষমতাকে নিজের বলে অন্যায় দাবি জানাতে তৎপর হয়ে ওঠে— যাদের সৈনিকদের প্রতি বিন্দুমাত্র আহ্বা নেই।

গোড়া থেকেই আমার নিজের ব্যক্তিগত মতামত স্থির ছিল। আমি অন্যের থেকে বেশি এ রাজনৈতিক নেতাদের চক্রকে অনুসরণ করে এসেছি; যারা বাববার বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে। আমি অনেক আগেই উপলক্ষ করেছি যে এ কুক্যাত নাবিকদের কাছে জাতির স্বার্থের ভূমিকা অতিশয় নগণ্য। তারা তাদের নিজেদের পকেট ভর্তি করার ধান্দাতেই এসব কাজকর্ম করে চলেছে। আমার অভিমত হল, সেজা এদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ তারা শাস্তিকেই বলি দিতে উদ্যত, এবং প্রয়োজন বোধে যত্ন করে জার্মানিকে পরাজিত করতেও এদের বিন্দুমাত্র দিধা নেই; অবশ্যই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। তাদের ইচ্ছাপূরণ করার অর্থ হল শ্রমিক হৃণীর স্বার্থকে একদল চোরের স্বার্থের বিনিময়ে জলাঞ্জলী দেওয়া। তাদের ইচ্ছাকে সমর্থন জানানোর মানে হল জার্মানিকে উৎসর্গ করা।

সৈন্যদলের গরিষ্ঠতাগ এ মতামতই পোষণ করত। কিন্তু নতুন সৈন্য যা বদলী হিসেবে দেশ থেকে আসছে তা' দ্রুতগতিতে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর হতে থাকে। ব্যাপারটা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ায়, যখন এ নতুন সৈন্যদের আগমন দলের শক্তিবৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, যুদ্ধ করার ক্ষমতাটাকেই কমিয়ে দিতে থাকে। নতুন সংগ্রহ করা যুবক সৈন্যদের বেশিরভাগই হল অপদার্থ। অনেক সময়ে এটা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে যে তারা এ একই জাতির সন্তান-যারা ইতিস্ম ঘিরে রক্তক্ষয়ী সংথামে একদিন ঘেতেছিল।

আগস্ট সেক্টেবরের এ নৈতিকতার খূল্য আরো বেশি দ্রুতগতিতে নিম্নগামী হয়। যদিও শক্রপক্ষের আক্রমণ আমাদের আগেকার আঘাতরক্ষণমূলক যুদ্ধের সঙ্গে কোনরকম তুলনাই চলে না। এ আক্রমণের তুলনায় লোমের এবং ফ্লার্ডার্সের বীভৎৎ যুদ্ধের ছবি এখনো আমাদের স্মৃতিতে জেগে রয়েছে।

সেক্টেবরের শেষে আমরা তৃতীয়বার সে জায়গাগুলো দখল করি। যা আমরা যখন নতুন বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেনাবাহিনীতে ঢুকেছিলাম, তখন ঝটিকাগতিতে দখল করেছিলাম। কী সুন্দর স্মৃতি!

এখানেই আমাদের যুদ্ধ হয়; সেটা হল ১৯১৪ সালের অক্টোবর এবং নভেম্বর মাস। হৃদয়ে দেশের প্রতি প্রজ্ঞালিত ভালবাসা এবং কঠে গান নিয়ে আমাদের তরুণ সেনাদল এগিয়ে চলে দুর্বার গতিতে। যেন তারা নাচের আসরে যোগ দিতে চলেছে। রক্তের ধারা এ ধারণাতেই তারা ঢেলে দেয় যে তা পিতৃভূমির স্থাবিনতারক্ষার এবং অর্জনের কাজে লাগছে।

১৯১৭ সালে দ্বিতীয়বারের মত সেখানে পদার্পণ করি, যেটাকে আমরা পবিত্রভূমি বলে এতদিন গণ্য করে এসেছি। এখানেই সেইসব শ্রেষ্ঠ সহকর্মীরা শায়িত, বয়সের দিক থেকে যারা মাত্র বালক অবস্থা পেরিয়ে এসেছে, সেইসব সৈন্য যারা উজ্জ্বল চোখে বুকভরা দেশপ্রেম নিয়ে মৃত্যুর দিকে ধেয়ে গেছে।

আমাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ, সে সৈন্যদলে গোড়ার থেকেই ছিল। আবেগে আপুত হয়ে পড়ি সেই পবিত্রভূমিতে দাঁড়িয়ে, যেখানে দাঁড়িয়ে একদিন আমরা শপথ নিয়েছিলাম যে মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে কর্তব্যে অবিচল থাকব। তিন বছর আগে সৈন্যদল ঝটিকা গতিতে আক্রমণ করে এ জায়গাটা দখল করেছিল। এখন আবার তাদের ডাক পড়েছে নির্দয় সংঘর্ষের মুখে এটাকে রক্ষা করার।

কিন্তু সপ্তাহ ধরে পদাতিক বাহিনীর বোমা বর্ষণের সাহায্যে ইংরেজ ফ্লার্ডার্সে তাদের আঘাতরক্ষণমূলক ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গড়ে তোলে। মনে হয় যেন মৃত আঘাগুলো আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেনাবাহিনী কাদার তলায় তুবতে থাকে। বোমার আঘাতে ছিন্ন বিছিন্ন তরু পালানো বা ডয় পাওয়ার কোন চিহ্ন তাদের মধ্যে নেই। শুধু দিনের পর দিন তারা সংখ্যায় কমে যেতে থাকে। অবশেষে বৃটিশ তাদের আক্রমণ শুরু করে ৩১শে জুলাই, ১৯১৭ সালে।

আগস্টের শুরুতে আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, পুরো সৈন্যবাহিনী তখন কমতে কমতে কয়েকটা দলে এসে ঠেকেছে মাত্র, যারা তখনো কাদা কামড়ে পড়ে রয়েছে, তাদের অবস্থা ভূত প্রেতের মত। মানুষ বলে চেনা যায় না।

১৯১৮ সালের শরৎকালে আমরা তৃতীয় বারের মত সেই ভূমির ওপরে এসে দাঁড়ালাম, যা আমরা বাড়ের গতিতে ১৯১৪ সালে দখল করেছিলাম। কোমিনস্ গ্রাম; যেটা আগে

আমাদের যুদ্ধের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে, এখন সেটাই হয়ে দাঢ়ায় বণিকের। যদিও সে গ্রামের চারিদিকের প্রবর্তন অতি নগণ্যই হয়েছে, তবু মানুষগুলো যেন বদলে গেছে একবারেই। এখন তারা রাজনীতি চর্চা করে। সব জায়গার মত এখানেও দেশের তেওরকার হাওয়া এসে বিষ ছড়িয়েছে। যুবকরা তো এতে পুরোপুরি ভুবেছে। কারণ তারা এখানে এসেছে সোজা দেশ থেকে।

অক্টোবর ১৩-১৪ই রাতে বৃটিশরা ইউপ্রাসের দক্ষিণ সীমান্তে গ্যাসের সাহায্যে আগ্রামণ শুরু করে। তারা হলদে গ্যাস ব্যবহার করেছিল যা আমাদের কাছে নিতান্তই অজ্ঞানা, অন্ততপক্ষে এ বিষয়ে আমাদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। আমার ভাগ্যই যেন সেই রাতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের নিমিত্ত নির্দিষ্ট ছিল। ভারতিক্রে দক্ষিণে একটা পাহাড়ের মাথায়, ১৩ই অক্টোবরের সন্ধিয়া, আমরা গ্যাস বোমার আঘাতে প্রচও রকমের বিপর্যস্ত হই। প্রায় সারাটা রাত ধরেই এক নাগাড়ে এ বোমাবর্ষ চলেছিল। মাঝ রাত বরাবর আমাদের মধ্যে বেশ ক'জন মাটিতে লাফিয়ে পড়ে; কিছু আহত, বাকিরা চিরদিনের জন্য ভূমিতে শুয়ে পড়ে। সকালের দিকে আমিও চোখে ব্যথা অনুভব করি। প্রতি পনের মিনিটে ব্যথাটা যেন উত্তোলন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং সকাল সাতটাৰ সময় আমার চোখে ডয়ঙ্গুর জালা ধরে যখন আমি শেষবারের মত পেছনে ঝুকে শেষ গুলিটা শক্তি দিকে ছুঁড়ি। আমার ভাগ্যই আমাকে এ যুদ্ধে টেনে এনেছে। কয়েক ঘন্টা পরে আমার চোখ দুটো যেন জুলত কয়লার মত জুলতে থাকে, এবং চারিদিকের দৃশ্যমান সবকিছু আমার কাছে তখন অন্ধকার।

আমাকে পোমেরিনা পেস্তওয়াক হাসপাতালে পাঠানো হয়, যেখানে আমি প্রথম এ বিপ্লবের কথা শনতে পাই।

দীর্ঘদিন ধরেই হাওয়ায় কিছু ভাসছিল, যা ঠিক স্পষ্ট নয়, কিন্তু অপ্রীতিকর। লোকেরা তখন কানাকানি শুরু করেছে যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কিছু একটা ঘটতে চলেছে, যদিও আমি কল্পনাতে আনতে পারিনি যে ব্যাপারটা সঠিক কিনা। প্রথমে ভেবেছি গত বসন্তের মত কোন ধর্মঘট হয়ত বা ঘটতে যাচ্ছে। নৌ-বাহিনী থেকে ক্রমাগত অপ্রীতিকর গুজব আসছে, যা নাকি তখন ফুলে ফেঁপে বিস্ফেরিত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু আমার যেন মনে হল পুরো ঘটনাটাই কয়েকটা নিঃসন্দেশ যুবকের প্রয়োদের ব্যাপার। এটা সত্যি যে হাসপাতালে সবাই এ যুদ্ধের সমাপ্তি নিয়ে কথাবার্তা বলছে, এবং তারা আশা করছে যে এত তাড়াতাড়ি ফয়সালা হয়ে যাবে। আমার পক্ষে তখন সংবাদপত্র পড়া সম্ভব নয়।

নভেম্বরে সেই উদ্ধিগ্নিতা আরো বৃদ্ধি পায়। এবং একদিন আমাদের ওপর সর্বনাশ বিধ্বংস নেমে আসে; হ্যাঁ, কেননকম সতর্কতা ছাড়াই। নাবিকেরা মোটৱ লরীতে ভর্তি হয়ে এসে আমাদের বিদ্রোহ করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। আমাদের জাতির সেই ‘স্বাধীনতা, সুন্দর এবং আয়ৰ্মাণ্যদার’ যুদ্ধে কয়েকটা ইহুদী ছেলে সে দলের নেতা। এদের মধ্যে একটাকেও সীমান্তে কর্মরত অবস্থায় দেখা যায়নি। হাসপাতালের মাধ্যমে যৌন ব্যবিধিগত বলে পূর্বদেশীয় এ তিনজনকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে তাদের ছেঁড়া লাল কাপড়ের টুকরোটাকে পতাকা হিসেবে তারা উড়াচ্ছে।

কয়েকদিন পরে আগের থেকে অনেক সুস্থ বোধ করি। চোখের গোলকে সেই আগেকার ব্যথাটা কমে আসে। ক্রমে ক্রমে আমাকে ঘিরে থাকা চারিদিকের পরিবেশগুলোর উপর থেকে

ঝাপসা ভাবটা সরে যায়। এখন আমি তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম। কিন্তু আবার কোন নক্ষা প্রস্তুত করতে পারব এ জীবনে এটা আমি আশাই করতে পারিনি। যাহোক প্রয়োজনের ঘটা যখন উপস্থিত, তখন আমি আরোগ্যের পথে চলেছি।

আমার প্রথমে ধারণা হয়েছিল যে এ প্রচণ্ড রকমের উদ্ধিগ্নতা সাময়িক ব্যাপার। আমি এ ধারণাটা আমার সহকর্মীদের ভেতরেও ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে হাসপাতালে আমার ব্যাডেরিয়ার সহকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে এতে সায় দিয়েছে। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তাদের বৌক কিন্তু বিপ্লবের দিকে। আমি কল্পনাতেও আনতে পারি না যে মিউনিকও এ পাগলামীতে মেতে উঠেছে। কারণ আমার ধারণায় ভিটেলস্বায়রের প্রতি বিশ্বস্ততা কয়েকটা ইহুদীর ইচ্ছা থেকে অনেক বেশি। সুতরাং আমি ভাবতেই পারি না এটা নিছকই ‘নৌ-বিদ্রোহ’ এবং কয়েকদিনের মধ্যেই এটা চাপা পড়ে যাবে।

অন্ত কিছুদিনের মধ্যে আমি জীবনের সবচেয়ে স্তুতি করা খবর পেলাম। গুজবটা ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমাকে বলা হয়, যে ব্যাপারটাকে আমি এতদিন স্থানীয় একটা ঘটনা বলে ভেবে এসেছি সেটা তা নয়। এটা হল সর্বাত্মক একটা বিপ্লব। এর সঙ্গে সীমান্ত থেকে এ সংবাদও আসে যে তারা আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছুক। এ জিনিস কি কখনো সম্ভব!

১০ই নভেম্বর স্থানীয় ধর্ম্যাজক হাসপাতাল পরিদর্শনে আসে, যার উদ্দেশ্য ছিল ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দেওয়া; এবং এভাবেই আমরা পুরো ঘটনাটা জানতে পারি।

এ বক্তৃতা শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে যেন জুরের মত আমার শরীরে শিহরণ খেলে যায়। সেই বৃন্দায়াজক যেন আবেগে কাপছে, যখন সে আমাদের জানায় যে হোয়েন বোলায়েন আর রাজকীয় মুকুট পরবে না, কারণ পিতৃত্বমি এখন গণতান্ত্রিক দেশ; আমরা সবাই যেন সর্বশক্তিমান দুর্ঘরের কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন এ নতুন ব্যবস্থার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, এবং আগামী দিনগুলোয় দেশবাসীকে যেন পরিত্যাগ না করেন। সংবাদটা ঘোষণার সময়ে সে সংক্ষেপে রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। পোমেরিনা থেকে ফ্রশিয়া পর্যন্ত। বলতে গেলে পিতৃত্বমি জার্মানির প্রতি যেভাবে সে তার কর্তব্য করে গেছে, তার জন্য — এরপরেই সে কাঁদতে শুরু করে। সেই জায়গায় জয়ায়েত মানুষগুলোর ওপর একটা গভীর হতাশা নেমে আসে। আমার দৃঢ় ধারণা একটা চোখের অস্তিত্বও সেখানে ছিল না, যার থেকে অঙ্গ না ঝরেছে। আমার কথা বলতে গেলে বলতে হয় আমি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছিলাম, যখন সেই বৃন্দ ধর্ম্যাজক আবার বলতে শুরু করে যে আমাদের এ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে এখন ছেদ টান উচিত। কারণ এ যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি, এবং আমরা বর্তমানে বিজয়ীর দয়ার ওপরে নির্ভরশীল। পিতৃত্বমিকে এর জন্য ভবিষ্যতে অনেক বড় বোৰা বহন করতে হবে। আমাদের এখন যুদ্ধ বিরতির শর্তগুলোকে মেনে নিয়ে আগেকার শক্তির মহস্তের ওপরে নির্ভর করতে হবে। আমি যখন আমার ঘরে ফিরে আসি, তখন যেন আমার চারিদিকে অক্ষকার ঘিরে ধরেছে। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। যন্ত্রণা ভরা মাথাটাকে আমি বালিশ আর কস্তলের মধ্যে সজোরে ঢেপে ধরি।

আমি আমার মা'র কবরের পাশে যেদিন দাঁড়িয়েছিলাম, তারপরে আর কাঁদিনি। আমার ভাগ্য যত আমার প্রতি বাল্যকালের দিনগুলোয় নিষ্ঠুর নির্মম হয়ে উঠেছে, আমার মানসিক জোরও যেন ততই বেড়ে গেছে। মনে হয়েছে ইস্পাতের যত শক্তি। যুক্তের এ বছরগুলোতে যখন মৃত্যু এসে আমার নিকটতম বক্তৃ এবং সত্যিকারের সহকর্মীকে ছিনিয়ে নিয়েছে, তখনো

তার বিরুদ্ধে অভিযোগের একটা কথাও উচ্চারণ করা আমার মনে হয়েছে চরম পাপ। তারা কি জার্মানির জন্য মরেনি? এবং যুদ্ধের এ ভয়ঙ্কর শেষ কয়েকটা দিনে, যখন বিষাক্ত গ্যাস আমাকে গিলতে উদ্যত, চোখের তেতরে বাসা বেঁধেছে, চিরদিনের মত অঙ্কত্বের তয় আমাকে ঘিরে ধরেছে। কিন্তু হৃদয়ের বাণী বেরিয়ে এসেছে,— হতভাগ্য সহকর্মীরা, তোমরা কি নেকড়ের মত চিঠ্কার করবে যখন হাজার হাজার অন্যান্যরা তোমাদের চেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে? সুতরাং এ দুর্ভাগ্যকে আমি মনে নিলাম, কারণ ততদিনে আমি বুঝতে পেরেছি এটাই একমাত্র খোলা পথ — এবং একটা জাতির দুর্ভাগ্যের কাছে বাক্তিগত কারো দৃঢ়ত্বের কোন মূল্যই নেই।

সুতরাং সমস্ত কিছুই নিফফল হয়ে দাঢ়ায়। সমস্ত আচ্ছাদিসর্গ এবং ক্লেশ, ক্ষুধা এবং তৎক্ষণায় মাসের পর মাস দিন ধাপনের গ্রানি, ঘট্টার পর ঘট্টা মৃত্যুর মুখে দাঢ়িয়ে থাকারও কোন মূল্য নেই। কর্তব্যকার্যে সাড়া দিয়ে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে তাদের কথা চিন্তা কর — যারা হাজারে হাজারে হৃদয় দিয়ে তাদের পিতৃভূমিকে ভালবেসেছিল, কিন্তু তারা আর কখনই ফিরে আসেনি। কেউ তাদের কবরটাকেও খোলেনি যাতে সেইসব বীরদের আস্থা যা কাদা এবং রক্তের মধ্যে ছিটিয়ে আছে সেগুলো যেন স্বদেশে বাড়িতে ফিরে আসতে পারে, এবং যারা এ ঘৃণ্য বিশ্বাসমাত্করণ অংশ নিয়েছে, তাদের ওপরে উৎকর্তৃত্বে প্রতিশোধ নিতে পারে। এর জন্যই কি সৈন্যরা ১৯১৪ সালের আগস্টে এবং সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে মারা গিয়েছিল? এ কারণেই কি যুব দল সেই বছরের শরৎকালে পুরনো সৈন্যদলের অনুবর্তী হয়েছিল? এর জন্যই কি সতরো বছর বয়স্ক ছেলেরা ফ্লার্ডার্সের মাটিতে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছিল? এ কি হল জার্মান মেয়েদের পুরুষ? যারা ভারী হৃদয়ে তাদের ছেলেদের উদ্দেশ্যে ‘গুরু বিদায়’ জানিয়েছিল; তারা তো আর কোনদিনই ফিরে আসেনি। এসব-ই কি করা হয়েছিল একদল জঘন্য অপরাধীদের হাতে পিতৃভূমিকে তুলে দেবার জন্য?

এর জন্যই কি জার্মান সৈন্যরা উত্তাপে ক্লিষ্ট এবং অক্ষ করা বরফের ঝড়ের মধ্যে যুদ্ধ করেছিল, সহ্য করেছিল অসহ্য ক্ষুধা, তৎক্ষণাৎ আর প্রচওরকমের শৈতায়, বিনিদ্র রাত আর সুনীর্ধ পদযাত্রা? এর জন্যই কি অবিশ্বাস বোমাবর্ষণের নরক-দমবন্ধ করা গ্যাসের আক্রমণে কখনো টলেনি বা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায়নি? শক্তদের হাত থেকে পিতৃভূমির রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে সোজা হয়ে দাঢ়িয়ে যুদ্ধ করেছে? নিশ্চিতরপেই এসব বীরেরা সমাধির ওপরে নিচের উৎকীর্ণ লিপি পাবার দাবি রাখে :

পথিক, তুমি যখন জার্মানিতে আসবে, দেশে ফিরে গিয়ে তোমার দেশবাসীকে বল,—
আমরা এখনো শয়ে আছি। যারা পিতৃভূমির সঙ্গে একাত্ম এবং নিশ্চিতরপে তাদের কর্তব্যকর্ম করেছে।

কিন্তু এ উৎসর্গতাকেই আমরা কি একমাত্র বিবেচনা করব? জার্মানি কি এ অতীতের একটা দেশের মত এত কম মূল্যবান? ইতিহাসের তার প্রতি কি কোন কর্তব্য নেই? আমরা কি এখনো পর্যন্ত শুধু অতীতের গৌরবের অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব? আমরা আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে আমাদের কাজের কি যুক্তি রাখব? এরা হল একদল জঘন্য ধরনের ভ্রষ্ট অপরাধীর দল।

আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি (উপ্পুত্তি করে হলেও) এ বীভৎস ঘটনার কিছু খবরাখবর সংগ্রহ করার। যত বেশি খবরাখবর জোগাড় করি, তত বেশি আমার মাথা রাগে আর লজ্জায়

জুলতে থাকে। যে চোখের ব্যথায় আমি কষ্ট পেয়েছি, তার তুলনায় এ ট্র্যাজিডিকে কি আমি আখ্যা দেব?

এ দিনগুলো বহন করা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে রাতটা কাটানোই যেন অত্যন্ত কষ্টকর; শক্রদের দয়ার ওপরে বেঁচে থাকার ধারণাটা একমাত্র মূর্খ এবং অপরাধী মিথ্যাবাদীরা সঠিক বলে ভাবলেও। সেই রাতগুলোয় আমার ঘৃণা যেন আরো তীব্র হয়ে ওঠে, বিশেষ করে সে ঘৃণার চরমতম প্রকাশ ঘটে সেইসব জঘন্য অপরাধীদের প্রতি।

সে দিনগুলোতে আমার ভাগ্যও যেন আমার কাছে শ্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। পরিবেশ আমাকে বাধ্য করে আমার ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করতে, যা আমাকে রীতিমত উদ্বিগ্ন করে তোলে। এ ভিত্তিভূমির ওপরে কোন কিছু গড়ে তোলার প্রচেষ্টাটাই কি হাস্যকর নয়? অবশ্যে আমার মনে হয় এটাই হল অনিবার্য — যা ঘটেছে, যা আমি অনেক আগেই ভয়ের সঙ্গে ত্বেবেছিলাম, যদিও তা মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করিনি।

স্ম্যাট দ্বিতীয় উইলিয়ামই হল প্রথম যে কমিউনিস্ট নেতাদের দিকে বক্সুভূর হাত প্রসারিত করেছিল। তারা একহাতে রাজার হাত ধরেছে, অপর হাতে কোমরে গৌঁজা ছুরি খুঁজেছে।

ইহুদীদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আমার কোন উপায়ই ছিল না। তাদের ব্যাপারে উদ্দেশ্যটা হল, — ‘হয় অথবা নয়’।

আমার তরফে তখন আমি নিজের মনটাকে স্থির করি যে আমি বাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেব।

নভেম্বরের শেষাশেষি আমি মিউনিকে ফিরে আসি। আমার বাহিনীর কার্যালয়ে যাই, যা বর্তমানে সৈনিক সমিতির হাতে। পুরো ব্যাপারটা দেখতে গেলে শাসনব্যবস্থা যথেষ্ট অপ্রীতিকর। সুতরাং আমি আমার মনটাকে স্থির করে দেবি যে যত সত্ত্ব সম্ভব আমি সৈন্যবাহিনী ছেড়ে যাব। আমার বিধুত যুদ্ধ সহকর্মী আরনেট শিডের সঙ্গে আমি ট্রাউন্স্টাইল এবং সেখানে ক্যাপ না ওঠা পর্যন্ত অবস্থান করি। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে আবার আমরা মিউনিকে ফিরে আসি।

সেখানকার পরিস্থিতি অপরিবর্তনশীল নয়। তা’ যেন বিপ্লবের দিকে দুর্নির্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। আইজ্জনারের মৃত্যু একমাত্র এ অহগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল, এবং শেষ পর্যন্ত দ্বৈরাতন্ত্রে সমিতিকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করেছিল, অথবা, আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে এটা ছিল ইহুদী রাষ্ট্রপুঞ্জের নেতৃত্ব, যা বিশ্বাসঘাতকতারই নামাত্মক! কিন্তু এটাই ছিল (যারা এ বিপ্লবের পতন করেছিল) তাদের চরম লক্ষ্য।

মানসিকতার সেই সন্ধিক্ষণে আমার মনের মধ্যে অনেক বকমের পরিকল্পনা ঘোরাফেরো করছিল। সেই দিনগুলো আমি অবিরত চিন্তা করে কাটিয়েছি যে ঠিক কী করা যেতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রতিটি পরিকল্পনাই পরিত্যক্ত হয়েছে, কারণ নগ্ন সত্য হল আমি জনজীবনে একাত্মভাবেই অপরিচিত। সুতরাং যে কোন বিষয়কে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রথম আবশ্যক জিনিসটাই আমার মধ্যে ছিল না। আমি কেন তৎকালীন কোন দলের নাম লেখাইনি তার কারণ পরে আমি ব্যাখ্যা করব।

নতুন সেভিয়েত বিপ্লব তখন মিউনিকের হাওয়ায় ছড়িয়েছে, আমার প্রথম কাজ হল সেই কেন্দ্রীয় সমিতির অনিষ্টকর চিন্তাভাবনাগুলোকে আকর্ষণ করা। ১৯১৯ সালের ২৭শে

এখিলের সকালে আমাৎ গ্রেণ্টার হওয়ার কথা। কিন্তু যে তিনজনকে আমাকে গ্রেণ্টারের জন্য পাঠোনো হয়েছিল তাদের সাহস ছিল না আমার রাইফেলের মুখোমুখি হওয়ার এবং সেই কারণেই তারা উপস্থিত হয়েই সরে পড়েছিল।

মিউনিকের মুক্তির কয়েকদিন পরে আমার ওপর আদেশ আসে তদন্ত কমিশনের সামনে আমাকে উপস্থিত হতে হবে; সেই তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল দ্বিতীয় পদাতিক সৈন্যবাহিনীর বিপ্রবাস্ক কাজকর্মের বিশ্লেষণের জন্য।

এটাই হল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার প্রথম আক্রমণ। কয়েক সপ্তাহ বাদে আবার আমার ওপরে আদেশ আসে যে সৈন্যবাহিনীর অন্যান্য সৈনিকদের সঙ্গে আমাকে একটা বক্তৃতামালায় যোগ দিতে হবে। এ বক্তৃতামালার আয়োজনের কারণ হল কিছু নির্দিষ্ট আদর্শ বারবার উচ্চারণ করে সৈনিকদের মনের মধ্যে ঢাকিয়ে দেওয়া। আমার পক্ষে এ হল একটা সুযোগ যার দ্বারা বিভিন্ন সৈনিকদের সঙ্গে আমি মিলিত হতে পারব, যাদের চিন্তাধারা একই খাতে বইছে এবং যাদের সত্যিকারের পরিস্থিতিটা সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে পারি। আমরা সবাই প্রায় একই ধারণার বশবর্তী ছিলাম যে জার্মানিকে আসন্ন ধর্ষণের হাত থেকে কিছুতেই বাঁচানো সম্ভব নয়; বিশেষ করে নতেহরের বিশ্বাসযাতকদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায়ই নেই, — কেন্দ্র এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা হল সেই কৃত্যাত নতেহরের বিশ্বাসযাতক। যে বিপুল ক্ষতি হয়ে গেছে, তার পূরণ করা জাতির মধ্যবিত্ত সম্পদায়ের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমাদের সেই ছোট গোষ্ঠীতে আমরা সবাই একটা নতুন দল গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চালাই। সবচেয়ে যে আদর্শগুলো এ দল গঠনের ব্যাপারে প্রাধান্য পায়, সেগুলোকে ঘিরে পরে জার্মান লেবার পার্টি স্থাপন করা হয়েছিল। এ নতুন আন্দোলনের নামকরণের ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করি যাতে এটা বিশাল জনসাধারণের হৃদয়ে আবেদন জানাতে পারে, কারণ তা না হলে আমাদের সবরকম প্রচেষ্টাই নিষ্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে। এবং সেই কারণেই অনেক ভেবেচিত্তে আমরা নতুন দলের নামকরণ করেছিলাম। ‘সোশ্যাল রেভুলুসনারী পার্টি’। বিশেষ করে আমাদের নতুন দলের সামাজিক চিন্তাধারা সত্যিকারের বৈপ্লাবিক ছিল।

কিন্তু এর পেছনে আরো কিছু প্রাথমিক কারণ ছিল। আমার ছেটবেলায় যেসব অর্থনৈতিক কারণগুলোয় ভুগেছি, সেগুলোর উদ্বৃত্ত মূলত সামাজিক সমস্যাগুলো থেকে, প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে।

পরবর্তীকালে এ ধ্যান-ধারণাগুলোই আরো বেশ বিস্তৃতি লাভ করেছিল যখন আমি ত্রিপাক্ষিক সমিলিত জার্মান-নীতির কথা বিশেষভাবে অনুধাবন করি। এ নীতির জন্যই জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থার ভ্রান্ত মূল্যায়ন সম্ভব হয়েছিল। কারণ ভবিষ্যতে জার্মান জনসাধারণের অবস্থিতির ভূল ধারণার থেকেই এ ভ্রান্ত অর্থনৈতির জন্য হয়েছিল। এসব ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে ছিল যে পুঁজি তা হল শ্রমিকদের শ্রমের ফসল এবং একান্তভাবেই শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন এবং শ্রমিকদের মতই এটাও মানুষের কার্যক্ষমতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বা গতিরোধ করতে সক্ষম। সুতরাং জাতির স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে, এ পুঁজির রহস্য দেশের মহসূ, বিশালত্ব, শক্তির ওপরে নির্ভর করে। এক কথায় এটা জাতির ওপরেই নির্ভরশীল এবং সে কারণে দেশের স্বাধীনতাই একমাত্র এ সম্পদকে জাতির স্বার্থে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে আঘাতক্ষা এবং উন্নতির জন্য।

এ আদর্শগুলো মেনে চললে সম্পদের প্রতি দেশের মনোভাব মহজ এবং সরল হয়ে ওঠে। এর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত যে সম্পদ পুরোপুরি দেশের অঙ্গীষ্ঠিসাধক হবে এবং নিজস্ব কোন ক্ষমতাই থাকবে না যার দ্বারা সে জাতিকে শাসন করতে পারে। সুতরাং এর কার্যকারিতা দুটো বিষয়বস্তুর ওপরে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। একদিকে যেমন সে জাতিকে শক্তিশালী এবং মুক্ত অর্থনীতি দেবে, অন্যদিকে শুধুমাত্রের দাবিশুলোকে বক্ষ করবে।

আগে আমি এত স্পষ্টভাবে সম্পদের পার্থক্য, যা নাকি স্বেচ্ছা পৃজনশীল শুধুমাত্রের উৎপাদন, তা' স্বীকার করে নিইনি। এবং যার অস্তিত্ব ও গতি-প্রকৃতি হল নিছক অগ্রণীতিক অনুধ্যানের ফলাফল। এখানে আমি সত্যিকারের আমার মনকে তাড়া দিয়ে সেইদিকে চালনা করি, যে শক্তির এতদিন আমার মধ্যে অভাব ছিল।

এ প্রয়োজনীয় শক্তি জোগান দেয় একজন, তায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি আগেই উল্লেখ করেছি। তার নাম হল গটিকিং ফেডার।

জীবনে প্রথমবার আমি স্টক এক্সচেণ্ডে সম্পদ এবং যে সম্পন্ন ব্যবকর্জের ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে — সে সম্পর্কে খনি। ফেডারের প্রথম বক্তৃতা তখনই আমার মন্ত্রিকে একটা ধারণা প্রবাহ খেলে যায়, যা একটা নতুন দল গঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যিক।

আমার মনে হয় ফেডারের মেধা একদিকে প্রেরণ নির্দয়, অপরদিকে তেমনি স্পষ্টতায় ভরা, অস্ততপক্ষে যেভাবে ফেডার স্টক এক্সচেণ্ডের অত্যুত্তম সম্পদের ক্ষেত্রে চরিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল, যার থেকে এটুকু পরিকল্পনা যে এ সম্পন্ন দেয় সুন্দর ওপরে নির্ভরশীল। বিশেষ করে গোড়ার প্রশ্নে তার বক্তৃতা এও জ্ঞানযুক্ত এবং গভীর যে যারা তাকে সমালোচনা করেছিল, তারাও তার বক্তৃতাকে ভাল না বেসে পারেন। কিন্তু তাদের সন্দেহ ছিল যে এটাকে কাজে লাগানো সম্ভব কিম। যদিও অন্যান্যরা এটাকে দুর্বল বলে ভেবেছিল, কিন্তু আমার কাছে এটাই ছিল ফেডারের শিক্ষণের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ।

যে সব তত্ত্ব তাত্ত্বিকেরা লোকের সামনে তুলে ধরে, সেগুলোকে বাস্তবে কি করে রূপায়ন করতে হবে তা' বলে দেওয়া তাদের কাজ নয়। তার কাজ হল সমস্যাটার মুখোমুখি হওয়া; সুতরাং তার লক্ষ্য থাকবে সমাপ্তিতে, কোন পথ বেয়ে গিয়ে তা সমাপ্তিতে উপস্থিত হবে তাতে নয়। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হল আদর্শটা নির্ভুল কিনা। এটাকে রূপায়িত করা সম্ভব কি অসম্ভব, সেটা আলাদা প্রশ্ন। যে মানুষের কাজ কোন নীতি বা আদর্শ বাত্তানো, তাকে ব্যন্ত রেখে সেটাকে সুবিধাজনকভাবে বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব কিনা—এ দিকটাই। এর সত্যাসত্ত্বের দিকটা তার বক্তব্য বিষয়ও নয়; যা নাকি দৈনন্দিন ব্যাপারে আলো দেখিয়ে মানুষকে তার অভীষ্ট পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যে কোন ব্যক্তি একটা বিপ্লবের ছক আঁকে কীভাবে লক্ষ্য পৌঁছাতে হবে ভেবে। বাকিটা হল রাজনৈতিক নেতাদের কাজ। সুতরাং তাত্ত্বিকের কাজ হল চিরসত্যগুলোকে দেখিয়ে দেওয়া, আর রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব সেই সত্যগুলোকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া।

সেই তাত্ত্বিকের মহান দিক হল তার চিন্তাধারায় কর্তব্যানি সত্য উপস্থিত হতে পারে বিমূর্তক্রপে। এবং অপরদিকে কর্তব্য হল সেই সত্যকে বাস্তবায়িত করা এবং তাত্ত্বিকের তত্ত্ব কর্তব্যানি সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তা' নির্ধারণ করা, এ মহত্ত্বাই রাজনৈতিক নেতাদের সাফল্য এবং উদ্যম এনে দেয়; যা তাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। কিন্তু রাজনৈতিক দার্শনিকদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান কখনই সম্ভব নয়। কারণ মানুষের চিন্তাধারা সেই

সত্যটাকেই গ্রহণ করে সমাণ্ডিটাকে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ দেখতে পারে। যদিও সে কোনদিনই পরিপূর্ণ সমাণ্ডিতে পৌছতে পারবে না, কারণ মানুষের চরিত্র হল দুর্বল এবং অপরিপূর্ণতায় ভরা। সেই বিমূর্ত আদর্শগুলো যত পরিপূর্ণ হবে, তা শক্তিশালী হলেও বাস্তবে তার রূপায়ন তত্ত্বান্বিত অসম্ভব। অন্ততপক্ষে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই আদর্শ রূপায়নের ভার মানুষের ওপরে থাকে। রাজনৈতিক দার্শনিকের সাফল্য বাস্তবে তার পরিকল্পনা কতদুর সফলতা লাভ করেছে তার ওপর নয়; বরং তা' নির্ভর করে তাঁতে কতখানি সত্য উদ্ভাসিত এবং মানুষের উন্নতিকল্পে কতটুকু উদ্যম সেই আদর্শে রয়েছে। এটা যদি অন্যরকম হত, তবে ধর্মের সুষ্ঠার শ্রেষ্ঠ মানব সন্তান বলে কথনোই সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবেও বাস্তবে রূপায়ন সুষ্ঠার ইচ্ছার এতটুকু অংশও নয়, যা সন্তুষ্ট উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু এর পরিপূর্ণতা হল মানুষের সভ্যতার এবং নৈতিকতার উন্নতির প্রয়াসে।

রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং বাস্তবসম্মত রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে প্রচণ্ড ফারাকের কারণ হল একই মানুষের মধ্যে এ দুই গুণের সমন্বয়ের অভাব। বিশেষ করে ছোট ধরনের সফল রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য; যাদের কার্যধারা থেরে থাকে সম্পূর্ণ সবকিছুকেই সফল করে তোলা; বিসমার্ক বিনীতভাবে যাদের রাজনৈতিক শিল্পী বলে আখ্যা দিয়েছে। এ ধরনের রাজনীতিজ্ঞরা যদি মহান আদর্শগুলোকে পাশ কাটাতে পারে, তবে তাদের সাফল্য সহজে আসবে। এসব কারণে এ ধরনের সাফল্য খুব একটা উপকারে আসে না এবং ক্ষণস্থায়ী হয়। এমন কি লেখকের মৃত্যুর আগেই তা বিলীনও হয়ে যায়। বিশেষভাবে বলতে গেলে রাজনৈতিক নেতাদের কাজ বর্তমান কালের জন্য নয়; কারণ তাদের তৎক্ষণিক সাফল্যমানেই হল বিরাট সমস্যাগুলোকে পাশ কাটিয়ে দেওয়া, যে সমস্যা এবং আদর্শগুলোর মূল্যায়ণ ভবিষ্যতে হবে।

নৈতিকতার আদর্শকে ভবিষ্যতের পথে অধ্যাবসায়ের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ লাভজনক নয় এবং সর্বোপরি যে এ কাজ করে এবং এ পথ বেয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাকে জনসাধারণ খুব কম সময়েই সঠিকভাবে বুঝতে পারে। কারণ তাদের কাছে বীয়ার এবং দুধ অনেক বেশি প্ররোচনামূলক, ভবিষ্যতের কোন দূরদর্শী পরিকল্পনার চেয়ে। এ পরিকল্পনার শুভ দিকটা একমাত্র ভবিষ্যতের গভেই নিহিত এবং তার ফলাফল উত্তর পুরামেরাই ভোগ করতে পারে; এবং উত্তর পুরুষদের জন্যই এ পরিকল্পনার বীজ বপন করা হয়ে থাকে।

কোন নির্দিষ্ট অহঙ্কারের জন্য, যে অহঙ্কারের সঙ্গে মুখ্যামীর রক্তের যোগাযোগ রয়েছে; সেই কারণে রাজনৈতিক নেতারা বিশেষ করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা পরিহার করে চলে, যার বাস্তব প্রয়োগ বাস্তবিকপক্ষে কষ্টকর। তার জন্য যাতে তাকে জনসাধারণের জনপ্রিয়তা হারাতে না হয়, তাই এসব রাজনৈতিক নেতাদের সাফল্য এবং প্রয়োজন একাত্তভাবেই সমর্কলীন। ভবিষ্যতে এদের কোন সাফল্য থাকে না। কিন্তু এ ব্যাপারটা সংকীর্ণমানদের কোন চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটাতে পারে না, কারণ তারা তো বর্তমানের সাফল্য নিয়েই সন্তুষ্ট।

সংগঠনী শক্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক দার্শনিকদের জায়গা একটু ভিন্ন বক্তব্যের। তাদের কাজের প্রয়োজনীয়তা ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে হবে। যার জন্য প্রায়ই তাকে শুনতে হয় সে ব্যাপার। রাজনৈতিক নেতাদের সাফল্য হল সভ্যব্যতার শিল্পকে করায়ে করা। রাজনৈতিক কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা, যাদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে তারা দৈশ্বর্যকে

সন্তুষ্ট করতে পারে, কারণ তাদের ইচ্ছা এবং অসম্ভবতার সম্ভব করার প্রবল ইচ্ছা, তারা সবসময় সমকালীন খ্যাতিকে অধীকার করে; কিন্তু তাদের আদর্শ যদি অমর হয় তবে উভয় পুরুষরা তাদের স্বীকৃতি দেয়।

মানব সভ্যতার এ সুবিশাল বিস্তৃতিতে এটা কদাচিং হয়ে থাকে যখন রাজনৈতিক তাত্ত্বিক এবং নেতা — এ দুই গুণের সমন্বয় একজনের মধ্যে দেখা যায়। যত বেশি এ উভয় গুণের সমন্বয় দেখা যাবে, তত বেশি সেই রাজনৈতিক নেতাকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এ ধরনের লোকেরা তাদের শ্রম সংকীর্ণমানের জন্য করে না; তার লক্ষ্যে পৌছাবার পথ ওধূমাত্র কয়েক জনেই বুঝতে পারে। তার জীবন পৃথকভাবে ভালবাসা এবং ঘৃণার সমন্বয়; সমকালীনদের প্রতিবাদ, যারা সেই মানুষটিকে বুঝতে অক্ষম, তাদের সংঘর্ষ হয় ভবিষ্যত পুরুষদের স্বীকৃতির সঙ্গে, কারণ সে তো তাদের জনাই কাজ করে যায়।

যে মানুষ ভবিষ্যত পুরুষদের জন্য যত বেশি পরিমাণে কাজ করে, সমকালীনরা তাকে ঠিক ততখানি কম স্বীকৃতি দেয়। সে কারণে তার সংগ্রামের পথটাও কঠোর হয়ে ওঠে এবং সাফল্যও ঠিক তত পরিমাণে কম পায়। শতাদ্দীর পরিমাপে, যারা তাদের জীবনের শেষ প্রান্তে এ ধরনের আশীর্বাদ ধন্য হয়, তারা জীবনের সায়াহকালে হয়ত বা খ্যাতির এতটুকু পূর্বাভাস পেলেও পেতে পারে। কারণ ইতিহাসের পাতায় তো তারা ম্যারাথন দৌড়ীবীর বলে চিহ্নিত; সমকালীন খ্যাতির মুকুট জোটে মৃত্যুপথযাত্রী এসব নায়কদের কপালে একেবারে শেষ মুহূর্তে।

তারাই হল মহান নায়ক যারা নাকি তাদের আদর্শ এবং সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরত সংগ্রাম করে চলে, যদিও সমকাল তাদের স্বীকৃতি দেয় না। তারা হল সেই ধরনের মানুষ যাদের শৃতি ভবিষ্যত পুরুষদের হন্দয় আলোকিত করবে। সেই সময় ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষ এসব মহান নেতা যারা সমকালীন সমাজের স্বীকৃতি পায়ানি, তাদের ক্ষতিপূরণ করার জন্য উদ্ঘৰীব হয়ে ওঠে। এদের জীবন, আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতি তখন প্রচণ্ড শুন্দা এবং ভালবাসার সঙ্গে সামনে থাকে।

এ দলে সত্যি বলতে গেলে শুধু মহান রন্ধ্র নেতারাই পড়ে না, বড় বড় সমাজ সংস্কারকাও এ দলভুক্ত। ফেডারিক প্রেট ছাড়াও এমন মানুষ হল মার্টিন লুথার এবং রিচার্ড ভাগনার।

আমি যখন গট্টফিল্ড ফেডারের প্রথম বক্তৃতা 'সুদ-দাসত্বের অবলম্বন' শনি, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এখানেই জার্মান ভবিষ্যত বংশধরদের মনুষ্যজ্ঞানের অতীত সত্য লুকিয়ে আছে।

টক এক্সচেঞ্জ সম্পদকে যদি জাতির অর্থনৈতিক জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়, তবেই জার্মান ব্যবসাকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত করা সম্ভব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটার প্রতিও নজর রাখতে হবে যাতে জার্মান অর্থনীতির ওপরে কোন আক্রমণ করা না হয়, কারণ তা'হলে জাতির স্বাধীনতার ভিত্তিমিটাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম জার্মানিতে কি চলেছে। ফেডারের বক্তৃতায় আমি আগামী সংগ্রামে শ্রেণীবদ্ধ কানুকে যেন শুনতে পাই।

ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক পরিগাম সম্পর্কে সমন্ত রকমের ধ্যান-ধারণা যা সুদ সম্পদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে—এ চিন্তাধারাটাই ভুল। কারণ প্রথম অর্থনৈতিক নীতিগুলো এতদিন পর্যন্ত

জার্মান জাতির স্বার্থে সাংঘাতিক রকমের ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের জাতির অস্তিত্বরক্ষার স্বার্থে যে ধরনের মনোভাব গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যা বিশেষজ্ঞরা দিয়েছিল, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে রেলওয়ে লাইন বসাবার ব্যাপার। সেই শুদ্ধাঙ্গদ দলের সদস্যরা যে আশঙ্কা করেছিল, তা' সঠিকভাবে কেউ-ই উপলক্ষ্মী করতে পারেন। যারা এ বাস্তীয় অশ্঵ের নতুন কম্পার্টমেন্টে চড়েছিল, তারা মাথা ঘোরার পীড়ায় ভোগেন। যারা দেখেছে তারাও অসুস্থ হয়নি এবং বিজ্ঞাপনপত্রের অস্থায়ী কাঠের ফলকগুলো, যেগুলো নতুন আবিষ্কারকে লুকাবার জন্য দাঁড় করানো হয়েছে, শেষমেষ সেগুলোকে নামিয়ে নেওয়া হয়। একমাত্র অক্ষ যারা এবং যাদের দৃষ্টিশক্তিও অন্ধকারময়, তারাই তথাকথিত বিশেষজ্ঞ হিসেবে রয়ে গেছে। ব্যাপারটা সর্বদাই এরকম।

দ্বিতীয়ত এ ব্যাপারটাকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে কোন আদর্শ বিপদের কারণ হতে পারে যদি এটাকে সমাপ্তি বলে ধরে নেওয়া হয়; যখন সত্যিকারের এটা শেষ নয়। আমার এবং সমস্ত সত্যিকারের জাতীয়তাবাদীদের কাছে মতবাদ বলতে মাত্র একটাই, — জনসাধারণ এবং পিতৃভূমি।

এখন একান্ত প্রয়োজন হল আমাদের অস্তিত্বরক্ষার জন্য সংযোগ এবং আমাদের জাতের লোক বৃক্ষ; এদের সন্তানদের সন্তা বজায় রাখা এবং আমাদের জাতিকে অবিমিশ্র করে রাখা। পিতৃভূমির স্বাধীনতা যাতে বজায় থাকে তার দিকে নজর দেওয়া, অর্থাৎ আমাদের লোকদের ওপর স্রষ্টা যে কর্তব্য চাপিয়ে দিয়েছে তার যাতে তার সমাধান করতে পারে।

সমস্ত রকম আদর্শ এবং আদর্শবাদীতা, সমস্ত রকমের নীতি এবং জ্ঞানের লক্ষ্য হল এ সমাপ্তিতে পৌছানো। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সবকিছু পরীক্ষা করা উচিত এবং তারপর সেগুলোকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ বা বাতিল করা সংগত। এভাবে একটা তত্ত্ব শৃঙ্খল ধর্ম মতে যাতে পরিণত না হয়; কারণ সেগুলোকে তো জীবনের প্রাত্যক্ষিক কাজকর্মে কাজে লাগাতে হবে।

গটফেডে ফেডারের মতামত শুনে আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় বিষয়টার গভীরে যাওয়ার এবং আমাদের অনুপ্রাণিত করে এমনভাবে প্রশ্নটাকে দেখায় যা আমি আগে তাবিনি বা সেই ধ্যানধারণার সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না।

আমি আবার পড়তে শুরু করি এবং এভাবে প্রথম আমি সঠিকভাবে বুঝতে পারি সে ইহুদী কার্লমার্কসের উদ্দেশ্য এবং জীবন। তার নেবা 'দাস ক্যাপিটেল' বইটার উদ্দেশ্য আমার কাছে শ্পষ্ট হয়ে ধৰা দেয়। সে আলোতে আমি এখন পরিষ্কার বুঝতে পারি জাতীয় অর্থনৈতির বিরুদ্ধে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সংগ্রামটা। এ হল আন্তর্জাতিক এবং টক এক্সচেঞ্জের সম্পন্নের নেতৃত্ব পাওয়ার যোগ্য।

আমার জীবনের অন্যান্য দিকে এ বক্তৃতার প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবেই পড়েছিল।

একদিন বিতর্কে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি আমার নাম লেখালাম। সেই বিতর্কে অংশগ্রহণকারী আরেকজন ভেবেছিল যে সে ইহুদীদের জন্য তৈরি বর্ণাটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেবে; সেই কারণে সে তাদের পক্ষ অবলম্বন করে দীর্ঘ এক আলোচনায় থবেশ করে; এটাকে বিরোধিতা করার জন্যই আমি উঠে দাঁড়াই। সংখ্যাগরিষ্ঠ উপস্থিত সং্ক্ষেপে আমার দৃষ্টিভঙ্গিকেই সমর্থন জন্মায়। এর ফলে মিউনিকে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীতে আমি ইন্ট্রাক্সন অফিসারের পদ পাই, মাত্র ক'দিন পরেই।

সে সময়ের সৈন্যদলের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব ছিল। এরা তখন সৈনিক সমিতির নেতৃত্বের পরের অবস্থার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একমাত্র সর্তরভাবে এবং ধীরে ধীরে নতুন একটা সামরিক শৃঙ্খলাবোধ এবং বাধ্যতা, ষেষপ্রণেদিত বাধ্যতার জায়গায় চাপিয়ে দিতে পারলে, যাকে কৃট আইজনারের বিশ্বজ্ঞল বাহিনীকে যে আদর্শ সামরিক শৃঙ্খলাবোধ ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল, তা' সম্ভব। সৈনিকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী এবং দেশপ্রেমিকের শিক্ষা ও অনুভূতি জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন। এ দু'টোই হল আমার ভবিষ্যত কর্মপদ্ধা।

আমি আমার কাজ শুন্দি এবং স্বর্ণমের সঙ্গে হাতে তুলে নিলাম। এবাবে আমার বিরাট শ্রেতাদের কাছে বক্তৃতা দেবার সুযোগ আসে। আমি নিশ্চিত হই, যেটা আগে মাত্র অনুভূতির স্তরে ছিল, সেই বক্তৃতা দেওয়ার একটা সহজাত ক্ষমতা আমার ভেতরে আছে। আমার গলা স্বর প্রক্ষেপণ এতই চমৎকার যে সবাই আমার বক্তৃতা স্পষ্ট শুনতে পারে। অন্ততপক্ষে ছেট ঘরে সমবেত সৈনিকদের তো কোন অসুবিধাই হবার কথা নয়।

এ কাজের চেয়ে পৃথিবীতে আর কোন কাজই আমাকে এতখানি সুখী করতে পারত না; সামরিক বাহিনী ছেড়ে দেওয়ার আগে আমার কর্তব্য এমন একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতি করতে পেরে আমি আনন্দিত, যে প্রতিষ্ঠানটা আমার হৃদয়ের সবচেয়ে কাছাকাছি, — হ্যাঁ, সেই সামরিক বাহিনী।

আমি বলতে পেরে সুখী যে আমার দেওয়া বক্তৃতাগুলো সফল হয়েছিল। আমার বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে আমার দেশবাসীকে তাদের লোকদের এবং পিতৃভূমির কাছাকাছি নিয়ে আসতে পেরেছি।

আমি সৈন্যবাহিনীকে জাতীয়করণ করি; যার দ্বারা সামরিক বাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

এখানেও আমি আবার বেশ কিছু সহকর্মীর সাক্ষাৎ পাই, যাদের চিন্তাধারার সঙ্গে আমার চিন্তাধারা অভিন্ন। এবং সে কারণে তারা আমার দলে এসে ভেড়ে এবং আমরা নতুন একটা আন্দোলন গড়ে তুলি।

জার্মান শ্রমিক দল

একদিন হঠাতে আমার ওপরে আদেশ আসে একটা সংঘ যাকে আপাতদৃষ্টিতে রাজনৈতিক দল বলে মনে হয়, তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে খৌজব্যবর নেওয়ার। এরা নিজেদের বলত 'দ্য জার্মান লেবোর পার্টি' এবং শীঘ্ৰই তারা একটা মিটিং ডাকছে যাতে গটফিল্ড বক্তৃতা দেবে। আমার ওপরে আদেশ হল সেই মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে এবং পরিস্থিতির বিশদ বিবরণ জানতে।

যে রহস্যময়তার চোখে সৈন্যবাহিনীর কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোকে দেখত তা ভালভাবেই জানতাম। বিপ্লব সৈন্যবাহিনীকে রাজনৈতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু যারা এ সুযোগ নিয়েছে, অভিজ্ঞতা বলতে তাদের নেহাত-ই থুব কম ছিল। কিন্তু যতদিন না পর্যন্ত কেন্দ্র এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অনিষ্টাভরে জোর করে বুঝতে পেরেছে যে, সৈনিকদের সহানুভূতি বিপ্লবের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিকে গেছে এবং জাতির ভোট দেওয়ার অধিকার এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ বক্তৃ করেনি।

সত্তি বলতে কি কেন্দ্র এবং মার্কসবাদের এ নীতি রীতিমত শিক্ষাপ্রদ; কারণ তারা যদি ভোটাধিকার থর্ব না করত — যা বিপ্লবের পথে সৈন্যবাহিনীর রাজনৈতিক দাবি বলে স্বীকৃত; যে সরকার ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কয়েক বছরে তাকে উপড়ে ফেলে দিত তাতে জাতির অসমান ও দুর্দশা আরো বেশি দীর্ঘায়িত হত। সেই সময় সৈন্য এবং জাতির মধ্যে সম্পর্কটা ছিল রক্ষণাবেক্ষণ পিশাচের মত, যার কাজ হল অঙ্গেমন্তো বজায় রাখা। কিন্তু এটাও সত্তি যে তথাকথিত জাতীয় দল অত্যুৎসাহের সঙ্গে অপরাধী মনোবৃত্তির মনোভাব সম্পর্ক লোকদের নির্বাচিত করেছিল, যারা ১৯১৮ সালের বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়ে সৈন্যবাহিনীকে জাতির জাগরণের ক্ষেত্রে একটা অবেজো যন্ত্রে পরিণত করেছে। এবং এ সত্যটাকে একদল সহজে প্রতারিত মানুষ মেনেও নেয়ে।

বুর্জুয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোভাব জমে নিয়ে এমন পাথরের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা মনে মনে সত্তিই বিশ্বাস করতে শুরু করে যে সৈন্যবাহিনী আবার নিজেদের জায়গাতেই ফিরে আসবে, যা নাকি জার্মান শৌর্যবীর্যের দুর্গ আঢ়ার বলে পরিগণিত।

এ সময় কেন্ট্রীয় দল এবং মার্কসবাদীরা জাতীয়তাবাদীর বিষাক্ত দাঁতগুলো তুলতে ব্যস্ত। তাছাড়া সৈন্যবাহিনী একটা বৃহত্তর পুলিশ দলে পরিণত হবে তাদের সামরিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে; এবং তা'হলে তো বহিঃক্ষেত্রে সঙ্গে যুদ্ধ করাই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পরের ঘটনাবলী দ্বারা এর সত্যাসত্য যথেষ্টে পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক নেতারা কি বিশ্বাস করেছিল যে, আমাদের সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি জাতীয়তাবাদীতার পথে নয়, অন্যদিকে? সম্ভব এ বিশ্বাসই তাদের মধ্যে ছিল। কারণ যুদ্ধের সময়ে তো তারা প্রকৃত সৈন্য ছিল না, ছিল একদল বাচাল। অন্য কথায় বলা যেতে পারে, তারা ছিল সংস্দীয় সদস্য এবং যে কারণে সাধারণ জনসাধারণের হৃদয়-সম্পর্কে এতটুকু খৌজখবর রাখত না। যারা অতীতের শৃতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত এবং সর্বদা শৱণ করত যে একদা তারা সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক বলে পরিগণিত ছিল।

আমি স্থির করি যে এ মিটিংয়ে যোগদান করতেই হবে, যা নাকি আমার কাছে একেবারেই অজানা। আমি যখন ভূতপূর্ব স্টারনেকার পানশালার অতিথি ঘরে হাজির হই, যা এখন আমাদের কাছে ঐতিহাসিক একটা বস্তু বলে পরিগণিত — দেৰি কুড়ি পঁচিশজন লোক উপস্থিত, বেশিরভাগই সমাজের নিচু শ্রেণি থেকে আসা।

ফেডারের বক্তৃতার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে আমার আগেই পরিচিতি ছিল; কারণ আমি যে তার বক্তৃতা আগেই শুনেছি তা তো বলেছি। সুতরাং সজ্ঞটার পর্যবেক্ষণের কাজে আমি মনোনিবেশ করি।

এদের সম্পর্কে আমার ধারণা খারাপ হয় না, আবার ভালও হয়নি। আমার মনে হয় সেই সময় ভুইফোড় অনেক সম্মতির মধ্যে এটাও একটা। সেই দিনগুলোতে প্রত্যেকেই এক একটা নতুন দল গড়তে চাইত। অর্থাৎ যে সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে ভীতশুন্দাৰ বা তথ্যকার দিনের দলগুলো সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং এ সম্ভগুলো যেমন হঠাতে রাতারাতি গজিয়ে উঠত, তেমনি নিম্নে মিলিয়েও যেত; আর কোন প্রতিক্রিয়া কোথাও অনুভব করত না। সত্তি বলতে কি এসব সম্মতির প্রতিষ্ঠাতাদের বিদ্যুমাত্র ধারণা ছিল না যে অসংখ্য লোককে একত্রিত করে সম্মতি সমিতি প্রতিষ্ঠার অর্থ কি বা আন্দোলন বলতে ব্যাপারটা কি বোঝায়। সুতরাং এসব ভুইফোড়দের সম্ভগুলো রাতারাতি অদৃশ্য হত। তাদের পরিষ্কারি প্রয়োজন সম্পর্কে কোন ধ্যান-ধারণাই ছিল না।

ঘণ্টা দু'য়েক ওদের কার্যবিবরণী শোনার পর জার্মান লেবার পার্টি সম্পর্কে আমার ধারণা খুব একটা বদলায় না। ফেডার শেষমেষ তার বক্তৃতা সাপ্ত করলে পরে আমি সূর্খী হই। আমার ততক্ষণে যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ হয়ে গিয়েছিল এবং যখন আমি প্রায় উঠতে উদ্যত, তখনই ঘোষণা করা হয় — যে কেউ এর ওপর খোলা বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারে। এটা শুনে আমি সেখানে থাকাটাই স্থির করি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার ধারণা হয়, বিতর্কটা প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলো ছেড়ে দিয়ে অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ নিয়েই যেন বেশি মেতে উঠেছে, তখনই হঠাৎ ‘অধ্যাপক’ কথা বলতে শুরু করে। তার বক্তৃতার মুখবন্ধই হয়, ফেডার মেসব বিষয়ে বলেছিল তা’তে সন্দেহ প্রকাশ করে। এবং ফেডার তার প্রত্যন্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকটি ‘তত্ত্বের গভীরে’ বলে আলোচনার মোড় ঘোরায়। কিন্তু এর আগে তার বক্তব্য ছিল যে ব্যাভারিয়া প্রশিয়া ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য এ নতুন দলটির প্রধান পরিকল্পনা নেওয়া উচিত। এবং একান্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে এ মানুষটি বলে যে জার্মানি-অস্ট্রিয়ার উচিত ব্যাভেরিয়ার সঙ্গে সংযুক্তি, তবেই শাস্তি আরো ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সে আরো একটা অবিবেচকের মত বক্তব্য রাখে, এ সময়ে আমি কিছু বলার জন্য সভার অনুমতি প্রার্থনা করি এবং সেই শিক্ষিত লোকটিকে আমার চিত্তাধারা ব্যাখ্যা করি। ফলে সেই সম্মানিত ব্যক্তিটি যে শেষ বক্তৃতা করেছিল চারুক খাওয়া থেকি কুকুরের মত, তার জায়গা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চুপে পলায়ন করে। আমি যখন আমার বক্তব্য রাখছিলাম, শ্রোতারা একমুখ বিশ্বে নিয়ে আমার বক্তব্য শুনছিল। ঠিক যখন আমি সভাকে শুভরাত জানিয়ে বিদায় নিতে উদ্যত, একজন লোক সত্ত্ব আমার কাছে এসে নিজের পরিচয় দেয়। আমি তার নামটা সঠিক ধরতে পারিনি; কিন্তু সে আমার হাতে একটা ছোট্ট বই ধরিয়ে দেয়, যা নাকি হল একটা রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন, এবং সে আমাকে সবিনয়ে অনুরোধ করে সেটা পড়ার জন্য।

সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটাতে আমি খুশি-ই হই; কারণ এ রাস্তায় সংঘের উদ্দেশ্য বুঝতে অনেক বেশি সাহায্য হবে; যার জন্য ক্লাস্তিক মিটিংগুলোতে উপস্থিত হবার প্রয়োজন নেই। উপরন্তু লোকটাকে সাধারণ মজুরের মত দেখতে বলে আমার মনের ওপর ভাল একটা ছাপ রেখে যায়। এরপর আমি সভাগৃহ ছেড়ে যাই।

সেই সময়ে আমি বিভায় পদাতিক বাহিনীর একটা ব্যারাকে থাকতাম। আমার ছোট ঘরটাতে তখনে বিপুরের ছাপ আমাকে বিরক্ত করে তুলত। দিনের বেলাতে তো বেশিরভাগ সময় বাইরে বাইরে কাটাতাম, একচল্লিশ মন্দিরের হাঙ্কা পদাতিক বাহিনীর কোয়ার্টারে অথবা অন্য কোথাও বক্তৃতা শোনার ধারায়, যা নাকি সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হত। বসবাস উপলক্ষে শুধুমাত্র রাতটাই আমি আমার কোয়ার্টারে কাটাতাম। যেহেতু ভোর পাঁচটাতে আমার ঘূম ভেঙে যেত সেইজন্য বাকি সময়টা আমি নেংটি ইন্দুরগুলো যে ঘরময় ছুটাচুটি করত, তাদের দেখেই কাটাতাম। একখণ্ড রুটির শক্ত টুকরো বা গুঁড়ো মেবেতে ছড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, ছোট্ট প্রাণীগুলো সেই খাবারের চারপাশে খেলা করছে, এবং তীব্র আনন্দে তাদের কাছে উপাদেয় খাবার খাচ্ছে। আবার ঘূম না আসাতে হঠাৎ আমার সেই ছোট্ট রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ে যায়, যেটা নাকি একজন শ্রমিক মিটিংয়ে দিয়েছিল। ছোট্ট বইটার লেখকও সেই বইটাতে বর্ণনা দিয়েছে কেমন করে সে গলার থেকে মার্কসবাদের শৃঙ্খলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর শব্দ দ্বারা সাজানো ট্রেড ইউনিয়নকেও। এবং তারপরেই সে জাতীয়তাবাদী আদর্শে ফিরে এসেছে।

সেই কারণেই বইটার নাম রেখেছে ‘আমার রাজনৈতিক জাগরণ’; বিজ্ঞাপনটা পড়ার প্রথম মুহূর্ত থেকেই আমার মনকে টানে এবং শেষ পর্যন্ত সেই উৎসাহ সমভাবে বজায় থাকে। যে পদ্ধতির বর্ণনা এখানে রয়েছে, দশবছর আগের আমার অভিজ্ঞতাও একই রকমের। অবচেতনা মনে আমার নিজের অভিজ্ঞতা যেন নড়ে চড়ে ওঠে। সেইদিন আমি যা পড়েছি তা বারবার আমার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি মনস্থির করি যে ব্যাপারটায় আর মনোযোগ দেব না। প্রায় সঙ্গাহখানেক পরে আমি একটা পোষ্টকার্ড পাই, এবং বিস্ময়ে পড়ে দেখি যে আমাকে জার্মান লেবার পার্টির সদস্যভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। আমাকে অনুরোধ করা হয়েছিল যোগাযোগ করতে এবং পরের বুধবারের পার্টিকমিটির মিটিংয়ে যোগদানের জন্য।

এভাবে সভা করার ব্যাপারটা আমাকে কিছুটা হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই; এবং আমি তেবেই পাইনি যে ব্যাপারটাতে রাগ করব নাকি হাসব। কেননা তখন পর্যন্ত বর্তমান কোন পার্টির সভা হওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। বরং নিজের একটা পার্টি গড়ে তোলবার দিকেই আমার ঝোক ছিল। এ ধরনের নিমত্তণ আমি কখনো কল্পনাতেও আনতে পারিনি।

আমি প্রায় একটা উন্নত লিখে ফেলেছিলাম; কিন্তু কৌতুকের দরুণ উন্নত না দিয়ে সেই মিটিংয়ে নির্দিষ্ট দিনে যোগ দেওয়াটাই মনস্থির করি। যাতে ব্যক্তিগতভাবে এদের কাছে আমার আদর্শগুলোকে তুলে ধরতে পারি।

অবশ্যে বুধবার এল। যে ওঁড়িখানায় এ মিটিংয়ের বন্দোবস্ত হয়েছিল, সেটা হল হেরেনস্ট্রানের ‘আল্টে রোজেনবাড়’, যাতে হঠাত ছাড়া খদ্দের সচরাচর চুকত না। ১৯১৯ সালে এটা কোন আর্থর্জনক ব্যাপার নয়। যখন বিলগুলো বেশ উচ্চ অক্ষের আসত যদিও ভাগ দেখানো হত এমন কিছু নয়; কিন্তু খদ্দেরদের পক্ষে তা’ লোভনীয় নয়। যাহোক, এ রেস্তোরাঁর নাম আমি আগে কখনো শনিনি।

প্রায় অন্ধকার—খদ্দেরদের বসার ঘর দিয়ে ঢুকে, সেখানে অবশ্য একটা খদ্দেরও বসে নেই, পাশের ঘরে যাওয়ার দরজা হাতড়াই; এবং দরজা খুলে দেখি সেখানেই সভা বসেছে। গ্যাসের মলিন আলোর নিচে জনা চারেক লোক একটা টেবিল ঘিরে বসে। তার মধ্যে একজন সেই বিজ্ঞাপনপত্রের লেখক। সে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সাদারে জার্মান পার্টির একজন নতুন সদস্য হিসেবে বরণ করে।

সত্যি বলতে কি যখন শুনলাম দলের প্রেসিডেন্ট তখনো এসে পৌঁছায়নি, একটু নিরদ্যম হয়ে পড়ি। যাহোক মনে মনে তৎক্ষণাত স্থির করে ফেলি যে সে এসে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে প্রকাশ করব না। শেষে একসময় প্রেসিডেন্টের আবির্ভাব হয়। স্টারনেকার ওঁড়িখানার মিটিংয়ে, যেখানে ফেডার বক্তৃতা দিয়েছিল এবং যে চেয়ারম্যানের পদ অধিকার করেছিল, এ সেই ব্যক্তি।

আমার কৌতুহল জেগে ওঠে এবং সাধারে অপেক্ষা করি কি হতে যাচ্ছে তা' দেখার জন্য। আমি তখন সেই নামগুলো এবং ভদ্রলোকদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পাই, এ দলে যারা সর্বেসর্বা। দেশব্যাপি দলের প্রেসিডেন্ট হল মিস্টার হেরার আর মিউনিক জেলা পার্টির প্রেসিডেন্ট হল এন্ট্রন ড্রেসেকলার।

আগের দিনের সত্তার কার্য বিবরণী পড়া হয় এবং ভোটে তা যথাসময়ে গৃহীতও হয়। এরপরে আসে কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট। সমিতির সবগুলু মোট তহবিল হল সাত মার্ক পঞ্চাশ ফেনিগ্। (তখনকার ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় তিরিশ টাকার মত।) সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কোষাধ্যক্ষ তার মতামত ব্যক্ত করে যে সমিতির সভ্যদের ওপর তার পূর্ণ আস্থা বিদ্যমান। এটা ও সত্তার কার্য বিবরণীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপরে আসে চেয়ারম্যান যেসব পত্রাদির উত্তর ইতিমধ্যে দিয়েছে, সেইগুলো পড়া হয়। প্রথমে কীল থেকে আসা একটা চিঠি, এর পরেরটা ডুসেলডর্ফের, শেষেরটা এসেছে শহর বার্লিন থেকে। তিনটে চিঠির উত্তরই যথাযথ দেওয়া হয়েছে বলে সমিতির অনুমোদন লাভ করে; এরপরে পড়া হয় সদ্য আসা চিঠিগুলো। বার্লিন, কীল এবং ডুসেলডর্ফ থেকে আসা। ভাবভঙ্গিতে বোঝা যায় এ চিঠিগুলো আসাতে সবাই খুব খুশি। কারণ এ চিঠিগুলো আসাতে প্রমাণিত হয় যে জার্মান লেবার পার্টি সাধারণের জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। কিন্তু তারপর? তারপরে আসে সদ্য আসা চিঠিগুলোর কি উত্তর দেওয়া হবে, তার ওপর লম্বা-বিতর্ক।

ব্যাপারটা দৃঃখ্যজনক। দলবেঁধে আড়ডা মারার এটা হল নিকৃষ্টতম একটা উদাহরণ। আর আমাকে কিনা এ ধরনের একটা সমিতির সভ্য হতে হবে?

নতুন সভ্য সংংখ্যার ব্যাপারটাও আলোচিত হয় — এককথায় বলা যায় সমস্ত আলোচনাটার উদ্দেশ্যাই হল আমাকে কিভাবে ফাঁদে ফেলা যায়।

আমি এবার প্রশ্ন করতে শুরু করি। কিন্তু অটিবেই বুঝতে পারি কয়েকটা ভাল আদর্শ ছাড়া এদের কোন পরিকল্পনা নেই। বিজ্ঞাপনপত্র নেই, ছাপা বলতে কিছুই নেই। মেঘারশিপের কার্ড, এমন কি দলের রবার স্ট্যাম্পও নেই। আছে শুধু বিশ্বাস আর কিছু ভাল কাজ করার ইচ্ছা।

আমার আর হাসি আসে না। এসব কিসের জন্য করা হচ্ছে এসব হচ্ছে হতবুদ্ধিতা আর চরম নৈরাশ্যের চিহ্ন যা প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোই গায়ে সেঁটে বসে আছে। তাদের কোন পরিকল্পিত দৃষ্টিক্ষি নেই। যে অনুভূতির দ্বারা প্রবৃত্ত হয়ে এ কয়েকটা যুবক ছেলে এ কাজে নেমেছে, ওপর থেকে তা' হাস্যকর দেখালেও অন্তরের প্রেরণাই তাদের বলেছে, — স্বতঃপ্রযোগিত হলেও সজানে — সমস্ত দলীয় শক্তি যেভাবে বর্তমানে নিয়োজিত, তা ঠিক এমন ধরনের শক্তি অবশ্যই নয় যা জার্মান জাতিকে পুনরুদ্ধার করতে পারে বা অতীতে জার্মানরা জাতির যে ক্ষতিসাধন করেছে, জাতির অর্তক্ষমতা দখল করে তা' সারানো সম্ভব নয়। আমি তাড়াতাড়ি আদর্শগুলোর ওপরে চোখ বুলিয়ে নেই, যে আদর্শগুলোকে ভিত্তি করে পার্টি গড়া হয়েছে। একটা টাইপ করা কাগজে লিষ্টটা ছাপানো। এখানেও আবার আমি বুঝতে পারি যে এরা আকুল হয়ে কিছু খুঁজে চলেছে, কিন্তু কার সঙ্গে যে সংগ্রাম করে চলেছে তার কোন চিহ্ন এতে নেই। যে অনুভূতির দ্বারা এরা চালিত হচ্ছে, আমি তা' উপলব্ধি করতে পারি। এটা যে আন্দোলনের পথের সক্ষান করে চলেছে, তাকে দলের ওপরে ঠাঁই দিতে হবে এবং শুধু শব্দের মালা গাঁথলেই হবে না।

সর্কেজবেলায় যখন আমি আমার ব্যারাকে ফিরে আসি, ততক্ষণে সমিতিটা সম্পর্কে আমি একটা নির্দিষ্ট ধারণা করে ফেলেছি এবং জীবনে একটা কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হই। এ দলে যোগাদান করবো, নাকি একে অস্বীকার করবো?

বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে আমার প্রতিটি চিন্তাধারা এ দলে সভ্য হিসেবে যোগদান করতে বাঁধা দিতে থাকে। কিন্তু আমার অনুভূতিগুলো আমাকে জ্ঞালাতন করতে শুরু করে। যত বেশি আমি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে এ সজ্ঞটায় যোগদান করা কতখানি নির্বর্থক, তত বেশি আমার অনুভূতি সেদিকেই বুঁকে পড়ে। এ দিনগুলো আমার অস্থিরভাবেই কাটে।

আমি এর স্বপক্ষে এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলো নিজের মনের মধ্যে আলোচনা করতে শুরু করি। দীর্ঘদিন ধরেই স্থির করেছি যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করব। এবং এটা আমার কাছে জলের মত পরিকার যে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিতে হলে আমি কোন একটা আন্দোলনের মাধ্যমেই তা করব। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত মনের ভেতরে সত্যিকারের কোন তাড়না এ সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য অনুভব করিনি। আমি সেই দলের লোক নই, যারা নতুন কিছু লোভে আজ একটা কিছু করে, আবার কালই তার থেকে সরে দাঁড়ায়। কারণ তার জন্য আমার সব স্বপ্নগুলো বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন, অথবা একেবারেই শুরু না করা উচিত। কেননা আমি জানতাম যদি একবার অভিমত দেই, তবে সেই মতামত আমাকে সারাজীবনের জন্য বেঁধে ফেলবে, যার থেকে ফেরার আর কোন পথ নেই। আমার পক্ষে আলস্য করে সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়, যা কিছু করব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং গভীর আগ্রহের সঙ্গেই তা' সম্পাদনা করব। আমার মনের মধ্যে এমনিতেই যারা সবকিছু করতে এগিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত সমাপ্তিতে পৌঁছায় না, তাদের প্রতি গভীর অনীহা বর্তমান। এ তথাকথিত সব বিষয়ের পণ্ডিতদের আমি ঘৃণা করি এবং এটাও আমার ধারণা যে এদের পক্ষে কোন রকম কাজ না করে চৃপচাপ থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তাগ্য আমার আগামী রাস্তার প্রতি অগ্রণি নির্দেশ করে। আমি কখনই বৃহৎ কোন দলে নাম লেখাব না; কারণটা পরে বিভাগিত বলছি, এ হাস্যকর ছেট্টি সমিতিটা, সঙ্গে মুষ্টিমেয় সদস্য নিয়ে আমার ধারণায় প্রস্তরবৎ অস্থি পিঙ্গরে পরিণত হবে না এবং এখানে সম্ভবত ব্যক্তিগতভাবে কোন কাজ দেখানোর বা করার সুযোগ পাওয়া যাবে। যেহেতু আন্দোলনটা এখনো ছেট্টি গভীর ভেতরে আবদ্ধ, সুতরাং সেখানে এখনো সক্রিয় কোন কাজ করা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু এর অবয়ব গঠনের। আন্দোলনটার চরিত্র গঠন করা যাবে। কি লক্ষ্য এবং কোন রাস্তায় গিয়ে সেই সমাপ্তিতে নিয়ে যাওয়া যায়, — এ জিনিসগুলো বড় কোন পার্টিতে গিয়ে স্থির করা সম্ভব নয়।

যত আমি চিন্তা করি তত যেন আমার মনে হতে থাকে যে জাতির পুনরুদ্ধানের জন্য এটাকে যন্ত্র হিসেবে চমৎকার ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু কোন সংসদীয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে এ কাজ করা কখনই সম্ভব নয়। তারা কতগুলো সেকেলে ধ্যান-ধারণাকে আঁকড়ে ধরে বসে আছে। অথবা নতুন কোন শাসন প্রণালীকে সমর্থনের জন্য উদ্বীব। এখানে বর্তমানে যা প্রয়োজন তাঁ'ল সর্বজন স্থীরূপ একটা মতবাদ, ভোটের জন্য কানুনভরা আবেদন নয়।

কিন্তু চিন্তা করা এক জিনিস আর সেই চিন্তাধারাকে রূপ দেওয়া আরেক জিনিস; পরের অংশটা সত্যাই কষ্টকর। কি কি শুণ থাকলে এ ধরনের চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব?

সত্য বলতে কি আমি গরীব, এবং রুজি রোজগার বলতেও আমার কিছু ছিল না; তাই আমার ধারণায় বাস্তব দৃঢ়-কষ্টগুলোকে আমি সহজেই বহন করতে পারব। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হল যে আমি একেবারেই অপরিচিত। আমি হলাম সেই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে

একজন, ভাগ্যের জোরেই যারা টিকে আছে, বা টিকে থাকার অধিকার হারিয়েছে। পরের দরজার প্রতিবেশীরও যার অস্তিত্ব অজানা। আরেকটা ব্যাপারে অসুবিধে দেখা দেয় যে আমি নিয়মিত স্কুলে পড়াশুনা করিনি।

তথাকথিত বুদ্ধিমানের এখন পর্যন্ত অশেষ অহঙ্কারের সঙ্গে তাদের দিকে তাকায়, যাদের স্কুলের প্রশংসাপত্র নেই এবং যথেচ্ছ জ্ঞান তারা তাকে দিয়ে চলে। একটা মানুষ কি করতে পারে, সেই প্রশ্ন তারা কখনো জিজ্ঞাসা করে না; বরং তাদের যত জিজ্ঞাসা তাহল সে কতদূর পড়াশুনা করেছে, সেই প্রশ্নকে ঘিরে। তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা স্কুল কলেজের প্রশংসাপত্র সাঁটা ক্ষীণ দুর্বল মানুষকে সত্যিকারের সক্ষম ব্যক্তির থেকে অনেক উঁচুতে স্থান দেয়, কারণ সে ব্যক্তির গায়ে চিত্রবিচ্ছিন্ন করা প্রশংসাপত্র সাঁটা। সুতরাং আমার কাছে সহজেই অনুমেয় এ শিক্ষিত লোকেরা আমাকে কি চোখে দেখবে এবং এখানেও আমি ভুল করেছিলাম। কারণ আমার ধারণায় বেশির ভাগ লোকই ভাল; কিন্তু বাস্তবের শীতল আলোতে আমার এ ধারণা ভেঙে চুমার হয়ে যায়। কারণ তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ব্যক্তিক্রম এবং বোধগম্য। আমি কিছুদিনের মধ্যে এদের ভেতরকার পার্থক্যটা বুঝতে শিখি, যারা সর্বদা স্কুলের দেওয়ালের সঙ্গে সাঁটা এবং যাদের ভবিষ্যতে বাস্তব জ্ঞানের সভাবনা আছে।

অনেক চিত্ত-ভাবনার পরে আমি এ মতামত নেওয়ার জন্য মনস্তির করি।

এটা ছিল আমার পক্ষে চূড়ান্ত রকমের একটা মতামত নেওয়ার পালা। কারণ এদিক থেকে ভবিষ্যতে আর মুখ ফেরানো সম্ভব নয়।

এ ভেবে আমি জার্মান লেবার পার্টির সদস্য হবার তালিকাভুক্তির জন্য স্বীকৃতি জানাই এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সাময়িক সদস্যভুক্তির সার্টিফিকেট পেয়ে যাই। আমার ক্রমসংখ্যা নির্দিষ্ট হয় সাত।

দ্বিতীয় রাইখের বিপর্যয়ের কারণ

পতনের গভীরতার পরিমাপ হল তার আসল জায়গার উচ্চতার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার বিয়োগাক্ষ। একটা জাতির এবং রাষ্ট্রের পতনের পরিমাণের ক্ষেত্রেও এ কথাটা সত্য। স্থানের উচ্চতার পরিমাপ, অথবা সোজাসুজি বলতে গেলে বলতে হয় অবরোহণের পূর্বে তার সবচেয়ে উচ্চস্থানে অবস্থানের অক্ষটা।

যা সবচেয়ে উচ্চ জায়গায় একদা আরোহণ করেছিল, সেখান থেকেই পতন বা বিপর্যয়ই প্রত্যক্ষফদর্শীদের সবচেয়ে বিশ্বাস্যকর লাগে। দ্বিতীয় রাইখের বিপর্যয় তাদের উদ্ভ্রান্ত করেছিল যারা এটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত এবং এর পতনকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিল। কারণ এ রাইখ এত উচ্চ জায়গা থেকে অবরোহণ করে যা কল্পনাতেও আনা যায় না। আর এ পতন জাতি এবং দেশের চরম দুর্দশা আর লাঞ্ছনা ডেকে এনেছিল।

দ্বিতীয় রাইখের প্রতা এত উজ্জ্বল আর প্রথর ছিল যে সমগ্র জাতি এ জন্য গৌরববোধ করত। পর পর অনেক অসমতল যুদ্ধ জয়ের পর, সম্মাট সেইসব যুদ্ধ বিজয়ী নায়কদের পুত্র এবং প্রপৌত্রদের হাতে এমন এক পুরক্ষার তুলে দিয়েছিলেন, যা অকল্পনীয়। তারা অবশ্য এ বিষয়ে সচেতন বা অচেতন ছিল সেটা কোন কাজের কথা নয়। যাই হোক সমগ্র জার্মান জাতি এটা অনুভব করত যে এ পুরক্ষার ধারাবাহিকভাবে কতগুলো আলোচনার মাধ্যমে আসেনি। এ রাষ্ট্রের সংস্থাপনা হয়েছে অন্যভাবে, যা নাকি আলোচনার মাধ্যমের চেয়ে অনেক মহৎ। এ

রাষ্ট্রের যখন ভিত্তি প্রস্তুত স্থাপন করা হয়, তখন সংসদীয় গুণগুনানির মধুর সঙ্গীত একে সঙ্গ দেয়নি। বরং প্যারীকে ঘিরে যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল, সেই সঙ্গীতের মধ্যেই হয়েছে এর অভিষেক। এ পথ বেয়েই রাষ্ট্রনেতারা অভ্যর্থিত হয়েছিল সমগ্র জাতির কাছে। ভবিষ্যতে রাইখেরও প্রতিষ্ঠা এখনেই। এর মাধ্যমেই রাজকীয় মুকুট মাথায় উঠেছিল। বিসমার্কের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়নি কতগুলো বিশ্বাসঘাতক আর কর্তব্যে অবহেলা করা লোকের দ্বারা। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সত্যিকারের সৈনিক দিয়ে — যারা রক্ত ঢেলে সীমান্তে সংগ্রাম করেছে। এ অবাক করা জন্ম এবং পবিত্রতার দীক্ষিত আগুন দ্বিতীয় সম্রাট সম্পর্কে ধর্মাঙ্কে আঞ্চলিক সর্বাঙ্গীয় মুকুট তুলে দিয়েছিল, যার ঐতিহাসিক গৌরব অল্প কয়েকটা পুরনো রাষ্ট্রেরই অধিকারে ছিল।

কী তীব্র গতিতে এ আরোহণ ক্রিয়া শুরু হয়েছিল। স্বাধিনতা দেশের মধ্যে জীবিকার গ্যারান্টি দিয়েছিল। জাতি লোকসংখ্যার দিক থেকেও বেড়ে চলেছিল এবং জাগতিক সম্পদেরও সমৃদ্ধি হচ্ছিল। রাষ্ট্রের সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে জাতির সম্মানেরও নিরাপত্তা ছিল এবং সৈন্যবাহিনীর দ্বারা তা' সুরক্ষিত ছিল; এটাই ছিল নতুন রাইখ আর পুরনো জার্মান জাতির পার্থক্য।

কিন্তু দ্বিতীয় সম্রাটের এবং জার্মান জাতির পতন এত সুগভীর হয়েছিল যে সবাই একেবারে হতবুদ্ধি অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল। এবং যার অবশ্য়াবী প্রতিচ্ছায়া জনসাধারণের চোখে ধরা দিয়েছিল। সবকিছু দেখে মনে হয় সম্রাট এত উচুতে গিয়ে পৌঁছেছিল যে সাধারণ লোকে তা চিন্তার মধ্যেই আনতে পারেন। বর্তমান দিনের তুলনায় গৌরবের সেই দিনগুলো কান্নানিক এবং অবাস্তব বলেই মনে হয়। এসব মনে রাখলে আমরা বুঝতে পারব কেন লোকেরা এত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। যখন তারা সম্মুদ্রের সঙ্গে অতীতটাকে চিন্তা করত, তখন পতনের লক্ষণগুলো নিশ্চয়ই তাদের নজর এড়িয়ে গেছে, যেগুলো নিশ্চয়ই কোন একপ্রকার অবয়বে ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে উপস্থিত ছিল। অবশ্যই এ কথাগুলো তাদের ক্ষেত্রে সত্য, জার্মানি যাদের কাছে শুধুমাত্র বাসস্থান বা জীবিকা আহরণের ক্ষেত্রমাত্র ছিল না। তাদের পক্ষেই একমাত্র বর্তমান অবস্থা প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে বোধ হবে। আর অন্যদের চোখে এটা হবে নীরবে এতদিন ধরে তারা যে ইচ্ছে করে এসেছে, সেই ইচ্ছাপূরণ।

ভবিষ্যতের বিপর্যয়ের লক্ষণ বলে নিশ্চয়ই সেই দিনগুলোতে অনুভূত হয়েছে, যদিও খুবই অল্প সংখ্যক লোক এ রহস্যভূদের চেষ্টা করেছে। কিন্তু বর্তমানে অন্যকিছুর চেয়ে সেই লক্ষণগুলোই খুঁজে বার করার অত্যধিক প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শারীরিক রোগ নির্ণয় যেমন তখনই সম্ভব, যখন তার লক্ষণগুলো ধরা যায়; তেমনি রাজনৈতির ক্ষেত্রেও এটা একই বকমের সত্য। বাইরের ফুটে ওঠা রোগের কারণগুলো খুঁজে বার করা ভেতরের কারণগুলোর থেকে যেমন সহজ, কারণ সেগুলো সোজাসূজি চোখকে আকর্ষণ করে। এ কারণেই অনেকে বাইরের লক্ষণগুলো দেখে রোগ নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছিল। এবং বলাবাহ্য তারা ব্যর্থও যে হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সতি বলতে কি অনেক সময়েই তারা চেষ্টা করে এ অস্তনিহিত কারণগুলোর অস্তিত্ব এড়িয়ে যেতে। এবং এ কারণেই আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোক অর্থনৈতিক দুর্দশাই এ পতনের মূল কারণ বলে ধরে নিয়েছিল। প্রত্যেকেই তার অংশের দায়টুকু বহন করতে হয়েছে এবং সেই কারণে অর্থনৈতিক দুর্ঘটনাই বর্তমানের শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী বলে ভেবেছে। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক

অধঃপতনই এ বিপর্যয়ের কারণ। অনেকেরই এ দুই জিনিস বোঝার ক্ষমতা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অনুভূতি এবং বোঝার মত জ্ঞান থাকে না।

এ জন্যই জার্মানির পতনকে জনসাধারণের বিরাট গোষ্ঠী কিসের জন্য মেনে নিয়েছিল তা বোঝা যায়। কিন্তু এর চেয়ে সত্য হল বুদ্ধিমান গোষ্ঠীও জার্মানির এ পতনের কারণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় বলে ধরে নিয়েছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা ধারণা করেছিল এর আরোগ্য সত্ত্ব একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতিতে। আমার মতে এ কারণেই জার্মানির কোনরকম উন্নতি সাধিত হয়নি। কোন উন্নতিই সত্ত্ব নয় যতক্ষণ না জাতি বুঝতে পারছে যে অর্থনৈতিক চেতনা জাতির উন্নতির দ্বিতীয় বা তৃতীয় শরণের বিষয়। এবং জাতির উন্নতির মূল কারণ হল রাজনৈতিক, নৈতিকতা এবং সম্প্রদায়গত কারণগুলো। একমাত্র বর্তমানের শয়তানগুলোকে বোঝা সত্ত্ব, যখন এ কারণগুলো উপলব্ধি করা যাবে এবং তখনই তার রোগ নিরাময়ের প্রতিশোধের ও খুঁজে বার করা সত্ত্ব হবে।

সূতরাং জার্মানির পতনের রহস্যটা তেদে করা অতীব প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে এ বিপর্যয়কে যদি অতিক্রম করতে রাজনৈতিক কোন আন্দোলন আরও করতে হয়, তবে এটা জানা থাকা তো অতি আবশ্যিক।

জার্মানির টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে অতীতকে বিশ্লেষণ করার সময় সতর্ক থাকার প্রয়োজন এ কারণে যে বাইরের রোগের লক্ষণগুলো যেন আমাদের প্রতারণা করতে না পারে। কারণ সেগুলোই আমাদের চোখে প্রথমে ধরা পড়ে অব্যক্ত কারণগুলোকে আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে।

অত্যন্ত সহজবোধ্য বলে এবং সেই কারণে বেশিরভাগ লোকের বর্তমানের দুর্দশা মেনে নেওয়া কারণগুলো হল যুদ্ধের পরাজয়। এবং সত্যি বলতে কি এটাই বর্তমান দুর্ভাগ্যের মূল কারণ। সত্ত্বত অনেকেই এটা মনপ্রাপ্ত থেকে বিশ্বাস করে থাকে। আবার অনেকে সচেতন মনে এবং ইচ্ছে করে মিথ্যা জেনেও বিশ্বাস করার ভাণ করে। বিশেষ করে সরকারি ঢাকনাবিহীন ভাগার যারা লুটে থাক্কে, তাদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বিপ্লবের অবতারণা বারে বারে জনতাকে বুঝিয়েছে যে যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, জনসাধারণের কাছে তার কোন মূল্য নেই। উপরন্তু তারা এক হয়ে বলেছে ধনীরা হল এ মহাযুদ্ধের জয়লাভের স্বপক্ষে। সাধারণ জার্মান নাগরিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর কোন উৎসাহ-ই নেই এ ব্যাপারে, যুদ্ধের ফলাফল যাহোক না কেন। সত্যি করে বলতে গেলে, এ অবতারণা নিশ্চিত হয়ে বলেছে যে জার্মানির পতনের কোন সম্ভাবনা নেই, বরং উন্নতির সম্ভাবনাই সমধিক। একবার যদি সামরিক ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া যায় তবে জার্মানির পুনরুত্থান অবশ্যাঙ্গী। এ চক্র কি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীর গানে চারিদিক মুখরিত করে এ রক্ত পিপাসু যুদ্ধের অপরাধ জার্মানির কাঁধে চাপিয়ে দেয়নি? এ ব্যাখ্যা ছাড়া কি তারা এ তত্ত্ব প্রকাশ করতে পারত যে সামরিক পরাজয়ের কোন প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক জগতে দেখা দেবে না, বিশেষ করে জার্মানদের ক্ষেত্রে? পুরো বিপ্লবটাকে কি তোজ পানোৎসবে পরিষ্ঠিত করে জার্মানদের অগ্রগতি ব্যাহত করা হয়নি, যাতে দেশে এবং বিদেশে জার্মানি বিজয়ীর সম্মান না পায়। মিথ্যাবাদী প্রতারকের দল, এটা কি সত্যি বলিনি?

এ ধরনের ধৃষ্টাতা যা নিছক ইঙ্গী সৈন্যদের পরাজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, এবং তাই হল জার্মানদের পরাজয়ের কারণ। বাস্তবিকপক্ষে বার্লিন ভোরওয়ার্থ ছিল রাজন্দোহের প্রধান

হোতা; তারাই সে সময়ে লিখেছিল যে জার্মান সৈন্যদের বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরতে দেওয়া হবে না। এবং এসব সত্ত্বেও তারা আমাদের সামরিক পরাজয়ের জন্য দোষারোপ করে।

এ সব মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে কোনরকম বিভক্তে যাওয়া অনর্থক। যারা এ মুহূর্তে যা বলে পরের মুহূর্তেই 'তা' অঙ্গীকার করে। এদের সম্পর্কে আমি আর কোন শব্দ ব্যয় করব না। কারণ তোতা পাখির মত অনেক চিত্তাহীন লোক আছে যাদের এটাই হল কাজ। এবং যারা এ কাজ করবে কোন খারাপ মতলব ছাড়াই। কিন্তু আমি যে পর্যবেক্ষণ করেছি 'তা' হল আমাদের সংগ্রামীদের জন্য; কারণ তারা তো কার্যক্ষেত্রে দেখতে পারে এ মুহূর্তে যা বলছে, পরের মুহূর্তেই 'তা' তুলছে এবং নিজের মত করে সেই কথাটা ঘোরাছে।

যুদ্ধে পরাজয়ই যে জার্মানির পতনের কারণ তার উত্তর ঠিক মত নিচে দেওয়া হল।

এটা সত্য যে যুদ্ধে পরাজয় জার্মানির ভবিষ্যতের ওপর দৃঢ়ঘজনক বিরাট একটা আঘাত হচ্ছেছিল। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়টাই এর একমাত্র কারণ নয়। বরং অন্য কারণের ফলাফল হল এটা। এ জীবন মৃত্যু সংগ্রামের বিপর্যয়কর সমাপ্তি হল আকশিক ট্রেন দুর্ঘটনার মত; সুতৰাং যাদের ব্রহ্ম এবং সোজাসুজি চিত্তাক্ষমতা আছে, তাদের পক্ষে ব্যাপারটা বোধগম্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তেমন লোকও বর্তমান ছিল, যারা সেই ভয়ানক মুহূর্তে তাদের চিত্তাক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছিল। এবং বাকিরা প্রথমে সত্যটাকে বোঝার চেষ্টা করেছে, তারপর পুরো ব্যাপারটাকে অঙ্গীকার করে বসেছে। অন্যান্যরা তাদের গুণ বাসনা চরিতার্থের পর বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে দেখেছে যে পুরো ব্যাপারটাই ঘটেছে তাদের যৌথ সশ্রেণী। এরাই হল এ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। এবং যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যই কারণ নয়। যদিও তারা এখন সমস্ত বিপর্যয়ের জন্য যুদ্ধ পরাজয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিচ্ছে। সত্য বলতে কি, তাদের কার্যের ফলাফল হল যুদ্ধে পরাজয়। এবং তাদের বর্তমানে দোষারোপের কেন্দ্র খারাপ নেতৃত্ব মোটেই এর জন্য দায়ী নয়। আমাদের শক্তিরা একেবারেই কাপুরুষ ছিল না। তারা এটাও জানত কি করে বীরের মতন মৃত্যুবরণ করতে হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই তারা জার্মানিকে পিছু হচ্ছিয়ে দিয়েছিল; দুনিয়ার অন্তর্শ্বের কারখানা এবং গুদাম তাদের ব্যবহারের জন্য মজুদ ছিল; যার দ্বারা সামরিক ক্ষয়ক্ষতি তৎক্ষণাত পূরণ করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে সারা পৃথিবী বীকার করে নিয়েছে যে সুদীর্ঘ চার বছর ধরে জার্মানির জয় সমানুপাত হারে সম্ভব হয়েছে একমাত্র নেতৃত্বের দরুণ, সৈন্যদের বীরত্ব তো এর সঙ্গে আছেই। যা কিন্তু কমতি ছিল তা পূরণ করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়; এবং তা-ই স্বাভাবিক। তাই সেই সৈন্যদের বিপর্যয় আমাদের দুর্দশার কারণ নয়। এটা হল অন্য দোষগুলোর ফলাফল। এবং এগুলোই পতনটাকে আরো গভীরে টেনে নামিয়েছে; যা খোলা চোখে স্পষ্ট দেখা সম্ভব। এ সত্যিকারের কারণগুলো নিচে এভাবে দেখানো যেতে পারে :

সামরিক পরাজয় কি জাতি এবং দেশকে এভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে? যখন এটা দুর্ভাগ্যজনক কোন দৃঢ়ের ফলাফল হয়? বাস্তবিকপক্ষে একটা যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য কি একটা জাতি ধৰ্মস হয় এবং সেটাই কি একমাত্র কারণ হতে পারে?

এর উত্তর সংক্ষেপে দিতে গেলে বলতে হয়, অর্তদেশীয় ক্ষয়ই সামরিক পরাজয়ের কারণ। এবং তার সঙ্গে কাপুরুষতা, চরিত্রাহীনতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা তো আছেই। এ কারণগুলো যদি সামরিক পরাজয়ের কারণ না হয়, তবে সামরিক পরাজয় জাতির পুনরুত্থানের সাহায্য করে এবং জাতিকে উন্নতির ওপরে তরে ক্ষেপন করে। সামরিক পরাজয়

জাতির জীবনে কবরের স্মৃতি নয়। ইতিহাস খুঁজলে এ কথার যথার্থতার উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যাবে।

দূর্ভাগ্যজনকভাবে জার্মানির সামরিক পরাজয় আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা নয়। এটা হল চিত্তা-ভাবনা করে পাওয়া শাস্তি যা হল গিয়ে এ ব্যাপারের চিরতন্ত্র প্রতিদান। এ পরাজয়ের আমাদের প্রয়োজন ছিল। কারণ এটা বাইরের কারণগুলো ত্যাগ করে ভেতরের কারণগুলোকে বিশ্লেষণ করতে শেখাবে। যদিও তারা প্রত্যক্ষ, কিন্তু বেশিরভাগ লোকই তা' স্বীকার করে নেয়নি। যারা উটপাখির পত্থা অবলম্বন করেছে, যা দেখতে চায় শুধুমাত্র সেটাই দেখেছে।

জার্মানির লোকেরা যখন এ পরাজয় মেনে নিয়েছিল তখন যে লক্ষণগুলো জার্মানির গণজীবনে ফুটে উঠেছিল, আমরা এবার সেগুলোকে পরীক্ষা করে দেখি। এটা কি সত্যি নয় যে অনেকেই পিতৃভূমির দুর্বাগ্যে লজ্জাজনকভাবে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল? যদি তাদের ইচ্ছায় এ প্রতিশোধ না নেওয়া হয়ে থাকে, তবে এ ব্যাপারে কে এত উৎসাহী হবে? তেমন লোকও কি তাদের মধ্যে ছিল না, যারা এ বলে অহংকার করত যে তারাই সীমান্তকে দুর্বল করে দিয়ে জার্মানির এ বিপর্যয় ডেকে আনতে সাহায্য করেছে? সুতরাং শক্ররা এ অসমান আমাদের কাঁধের ওপর চাপিয়ে দেয়নি, বরং আমাদের দেশবাসীই তা' ডেকে এনেছে। তার জন্য যদি তারা পরে দুর্ভোগ বহন করে, তবে তা' কি অনুপযুক্ত? পৃথিবীর ইতিহাস মন্ত্র করলেও কি এমন একটা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে দেশবাসী নিজেদের যুদ্ধপরাধী বলে গণ্য করেছে — সজ্ঞানে এবং ব্যাপারটা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও!

না, এর আর পুনরাবৃত্তি নয়। ভেতাবে জার্মান জাতি এ পরাজয়বরণ করেছে, আমাদের কাছে এটা প্রত্যক্ষ যে সত্যিকারের কারণ অন্য কোথাও সামরিক পরাজয়ের দরুণ কয়েকটা সীমান্ত হারানো বা আস্ত্রক্ষা না করতে পারা নিশ্চয়ই নয়। যদি সীমান্ত হারানোর জন্য এ বিপর্যয় আসত, তবে জার্মান জাতি তা' সম্পূর্ণরূপে অন্যভাবে ব্যাপারটাকে এহণ করত। তারা এই দূর্ভাগ্যকে দৃঢ়ভাবে দাঁতে চেপে থাকত, অথবা দৃংশ্যে ভারাক্রান্ত অবস্থায় ভেঙে পড়ত। শক্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষে এবং উন্নততায় তাদের হৃদয় ভরে উঠত। হঠাতে ঘটনার প্রবাহে অথবা ভাগ্যের আদেশে যাদের কপালে বিজয়-তিলক পড়েছে, এবং সেক্ষেত্রে জাতি রোমের ব্যবস্থাপক সভার* অনুসরণে পরাজিত সৈন্যদের বরণ করত ও তাদের ধন্যবাদ জানাত উৎসর্গতার জন্য। এবং আরো অনুরোধ জানাত স্ম্যাটের প্রতি যেন তারা আনুগত্যতা না হারায়। এমন কি শতর্হীন আস্তমর্পণ ও স্বাক্ষরিত হত আদেলিত না হয়ে স্থিরভাবে, যখন হৃদয় মথিত হত চরম প্রতিহিংসার তাড়নায়।

* ৩৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সীনেনিয়ন গলরা আলিয়ার যুদ্ধে রোমান সৈন্যদের সম্পূর্ণ পরাজিত করে এবং শহর রোমে প্রবেশ করে দেখে শহরটা মুকুত্যি প্রায়, শুধু ব্যবস্থাপক সভার সদস্যারা সংগ্রহে অপেক্ষা করছে। যাদের আশা নিজেদের উৎসর্গ করে হলেও দেশকে রক্ষা করা। সদস্যারা আদেশ দেয় তাদের হাতির দাঁতের চেয়ারগুলো মন্দিরের সামনে রাখতে, এবং এরপর তারা যে যার চেয়ারে বসে; চেয়ারের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রেখে বিজয়ী সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করে। লিবির ভাষায়, গলরা যখন শহরে ঢোকে, দেখে মাননীয় সদস্যার চেয়ারে উপবিষ্ট। একদল অবতার যেন তাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। শৰ্গ থেকে নেমে এসেছে শহর রোম রক্ষার নিমিত্তে। মহৎ উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই; যদিও আক্রমণকারীদের হাত থেকে এর দ্বারা শহর রক্ষা করা যায়নি। তবু গৱর্বতীদের পক্ষে এটা একটা মহৎ উদাহরণ।

এ হল সামরিক পরাজয়ের সত্যিকারের অভ্যর্থনার নমুনা, যা নাকি ভাগ্যের আদেশে আরোপিত; যেখানে উল্লাস বা নাচ গানের অবকাশ থাকত না। থাকত না কাপুরুষদের অহংকার, আর পরাজিতদের সম্মান দেখানোর তো কোন প্রশঁসই আসে না। সীমান্ত ফেরা সৈন্যদের উপহাস করাও হত না। এবং তাদের মানসম্মানও খুলায় ছুঁড়ে ফেলা হত না। কিন্তু সবচেয়ে বড় হল, সেই লজ্জাকর পরিস্থিতি বৃটিশ অফিসার কর্নেল রেপিটনকে প্রবৃত্ত করত না জার্মানির প্রতি উপক্ষামিশ্রিত অবজ্ঞা ছুঁড়ে দিয়ে বলতে, যে প্রতি তিনজন জার্মানের একজন হল বিশ্বাসঘাতক। না, এক্ষেত্রে এ রোগ প্রকৃত বন্যার রূপ কিছুতেই নিতে পারত না; যার জন্য গত পাঁচছয় ধরে বর্হিংগতের কাছে প্রতিটি সম্মানের পদচিহ্ন মুছে গেছে।

এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে জার্মানি টুকরো হয়ে যাওয়ার জন্যই যে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল তা' কত বড় মিথ্যা। সামরিক পরাজয় হয়েছিল ধারাবাহিক ঘটনাগুলোর দ্বারা সৃষ্টি ব্যাধির জন্য এবং যার সক্রিয়তা যুদ্ধের পূর্বেই জার্মান জাতির গায়ে ফুটে ওঠে। যে যুদ্ধকেই আকস্মিক দৃঘটনা বলা চলে, যা দিবালোকের মত লোকের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল যে ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবনে নৈতিকতা করখানি বিষ বাস্পের ধোয়ায় আচ্ছন্ন এবং আত্মবন্ধনতার অধৎপতন হয়েছে। এগুলোই হল প্রাথমিক কারণ যা নাকি বহুদিন ধরেই জাতির এবং স্ম্বাটের ভেতরে গোড়ায় সৃঙ্খল কেটে চলেছে।

কিন্তু ইহুদীরা তাদের মিথ্যা এবং সংগ্রামশীল সহকর্মীদের নিয়েই পড়ে থাকে। মার্কসবাদীরা সমন্ব দোষ সেই লোকটার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, যে একা অতি মানবের লৌহ কঠিন ইচ্ছা এবং অদম্য উৎসাহ নিয়ে জাতিকে সেই দৃঘটনা এবং লজ্জাকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল। মহাযুদ্ধের পরাজয়ের দায়ভাগ লুডেনডোর্ফের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তারা নৈতিক অস্ত্রটা (যা নাকি শক্রদের পক্ষে বিপদজনক) দূরে সরিয়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকদের পিতৃভূমির প্রতি বিচারের পথ প্রস্তুত করে দেয়। ওসৰগুলোর পেছনের উদ্দেশ্যটা হল — যেটা সর্বত্বাবে সত্য, যদিও এটা হল একটা বিরাট বড় মিথ্যা যে পেছনে একটা মহৎ শক্তি কাজ করে যাচ্ছে। কারণ সাধারণ জনতার বিরাট একটা অংশকে তাদের অনুভূতির স্তরকে ভুল বোঝানো সম্ভব, কিন্তু 'তা' সচেতনে বা সজ্ঞানে সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের এ মানসিক অবস্থাতে তারা বিরাট মিথ্যার কাছে যত সহজে বলি হয়, ছোটখাটো মিথ্যার কাছে ততটা নয়। কারণ জীবনের প্রসঙ্গে তারা ছোটখাটো মিথ্যা বলেই থাকে। কিন্তু তাদের জীবনে বড় মিথ্যার কোন স্থান নেই। প্রকাও মিথ্যা তাদের কাছে মাথা তুলতেও সক্ষম হয় না, এবং তাদের পক্ষে একটা অবিশ্বাস্য যে অন্য কেউ সত্যটাকে বিকৃত করার ধৃষ্টান্ত রাখে। তাদের মন সব সময়ই সন্দেহের দোলায় দোলে যে এর পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে। বিরাট মিথ্যা সব সময় পেছনে একটা ছাপ রেখে যায়। এবং সেই ছাপ মুছে ফেলে দিলেও নিশ্চিহ্ন হয় না; এটা পৃথিবীর সমন্ব মিথ্যাবাদী বিশেষজ্ঞদের জানা। বিশেষ করে মিথ্যার বেসাতি নিয়ে যাদের নিয়ত ঘরসংস্থার, তারা ভাল করেই জানে কি করে মিথ্যাটাকে জঘন্যতম উপায়ে ব্যবহার করতে হয়।

শরণাত্মীত কাল হতে ইহুদীরা অন্যান্যদের থেকে খুব ভাল করে জানে কি করে মিথ্যা এবং মিথ্যা অপবাদকে চরমভাবে কাজে লাগাতে হয়। তাদের নিজেদের অস্তিত্বই কি চরম মিথ্যার ওপরে নয়? বলা হয়ে থাকে তারা ধৰ্মীয় জাতি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেখতে গেলে আদৌ কি ইহুদীরা একটা জাতি? এবং তা' যদি সত্য হয় তবে কি জাতি? মানবজাতি যে

মহান চিত্তান্বায়কের জন্য দিয়েছিল ইহুদীদের সম্পর্কে তার বিবৃতি সর্বাংশে সত্য। সোপেনহাওয়ার ইহুদীদের বলত ‘মিথ্যাবাদীর চরম শুরু’। যারা এ বিবৃতির সত্যাসত্য দিকটাকে অনুধাবন করে না বা বিশ্বাস করতে চায় না, তাদের পক্ষে সত্য প্রতিষ্ঠা করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

আমাদের জার্মান জাতির পরম সৌভাগ্য বলব যে এ চরম দুর্দশার দিনগুলোর হঠাতে ঘটনাচক্রে ছেদ পড়ে এবং তা’ ভয়ানক বিপর্যয়ে পরিবর্তিত হয়। যদি ব্যাপারটা ধীর গতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলত, আল্টে হলেও জাতি নিশ্চিত ধর্মসের গর্ভে নিষ্কেপিত হত। রোগটা ও হত দীর্ঘস্থায়ী; যেখানে রোগটা কঠিন হওয়াতে বাইরের সবার চোখে ধৰা পড়ে গেছে; এটা কোন দুর্ঘটনা নয় যে মানুষ কালো প্লেগ রাজরোগের চেয়ে তাড়াতাড়ি নিরাময় করতে শিখেছে। কারণ প্রথমটা মৃত্যুর ভয়াল রূপ ধরে আসে, যা দেখে সমগ্র মানবজাতি শিউরে উঠে; আর অন্যটি আসে কপটার ভাগ করে। প্রথমটা চৰম ভয় ধরিয়ে দেয়, অন্যটা তেতরে গোপনে কাজ করে চলে। ফলাফল হল, মানুষ প্রথমটার বিরুদ্ধে ভয়ানকভাবে ভয় পেয়ে গিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করে, অপরদিকে রাজরোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা অনেক দুর্বলতার। এভাবে মানুষ প্লেগকে নির্মূল করতে সক্ষম হলেও রাজরোগ নির্মূল করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

জাতির জীবনে রোগের ক্ষেত্রেও এটা সর্বাংশে সত্য। যতদিন না পর্যত এ রোগ বিপর্যয়-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, জনসাধারণ এতে অভ্যন্ত হয়ে পড়ে বশবর্তী হয়ে যায়। তখন ভাগোর একটা ধাক্কায়, যদিও সেটা তিক্ত — ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয় ধীর গতিতে তা হ্রাস পাবে, নাকি বলির জন্য উৎসর্গীকৃত মানুষগুলোকে সেই রোগের শেষ পর্যায়ে এনে দাঁড় করাবে। বেশির ভাগ এ আকর্ষিক দুর্ঘটনা তৎক্ষণাত্ম সারানো না গেলেও দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু এক্ষেত্রেও সর্বপ্রথমে প্রয়োজন ভেতরকার গুপ্ত কারণটাকে টেনে বার করা যা থেকে এ রোগের উৎপত্তি।

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্নটা হল মূল কারণ থেকে যে পরিবেশে এটা বেড়ে উঠেছে তাকে আলাদা করা। আর যতদিন পর্যন্ত এ রোগের জীবাণু দেহে থেকে যায়, ততদিন পর্যন্ত এটাকে রোগ মুক্ত করা সত্যই কষ্টকর। দীর্ঘদিন ধরে থাকায় এটা দেহের একটা অঙ্গ বিশেষ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময়েই দেখা যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষাক্ত বীজ জাতির একটা অঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে, তখন কিছুতেই এটাকে মুক্ত করা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন এটাকে প্রয়োজনীয় একটা শয়তান বলে ধরে নেওয়া হয়। সুতরাং এ বিদেশী জীবাণু শরীরের ভেতর থেকে ঝুঁজে বের করার প্রচেষ্টা থেকেই মানুষ বিরত থাকে।

যুক্ত পূর্বের দীর্ঘ শাস্তির দিনগুলোতে এ শয়তানের উপস্থিতি নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু একবার বা দু'বারের বেশি তাদের ঝুঁজে বার করার কোন প্রচেষ্টাই হয়নি। এখানেও আবার সেই অর্থনৈতিক অবস্থাটাই নজরে এসেছে যা নাকি সহজে দৃশ্যমান। অপর যে শয়তানগুলো নীরবে দেহের অভ্যন্তরে আঘাতগোপন করে আছে তার চেয়ে।

ক্ষয়রোগের অনেকগুলো চিহ্নই সেদিন বর্তমান ছিল যার ওপরে বিশেষভাবে চিত্তা করাটা উচিত ছিল। অর্থনৈতিক দুরবস্থা সম্পর্কে নিচের কথাগুলো বলা যায় :

যুদ্ধের আগে বিপুল পরিমাণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে অর্থনৈতিক উন্নতির চেয়ে দৈনন্দিন কৃটি জোগাড়ের সমস্যাটাই বড় হয়ে ওঠে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যারা এজন্য দায়ী, তাদের মাথায় কিছুতেই সঠিক সমাধানটা আসে না; তাই তারা সন্তান বাজীমাং করার রাস্তাটাই বেছে নেয়। নতুন সীমান্ত দখলের ধারণাটাকে পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে এদের ব্যবসার তালে দুনিয়া জয়ের প্রচেষ্টাটাকেই শেষমেষ ক্ষতিকারক শিল্পকেন্দ্রীক করে তুলেছিল।

তার সর্বপ্রথম এবং প্রধান ভয়াবহ ফলাফল হল কৃষিজীবী সম্প্রদায়কে দুর্বল করে দেওয়া।

ধনী এবং দরিদ্রের পার্থক্যটা এতই প্রকট হয়ে পড়ে যে সেটা চোখে পড়ার মত। বিলাসিতা এবং দরিদ্রতার এত ঘৰ্ষণযোগ্য সহাবস্থান যে তার ফলাফল শোচনীয় হতে বাধ্য। অভাব এবং বেকারত্ব আশ্চর্যজনক খেলা দেখাতে শুরু করে, যার পরিণতি চরম অসন্তোষ এবং পরম্পরের তত্ত্বাত্মক। তার ফল হয় জনসাধারণ রাজনীতিতে বিভিন্নমূর্খী হয়ে পড়ে। ব্যবসায়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অসন্তোষও বেড়ে চলে। ব্যাপারটা এমন এক জায়গায় এসে ঠেকে যে আর চলতে পারে না, সকলেরই মনে এ ধারণাটা জন্মায়। যদিও কারোরই ধারণা ছিল না যে সত্যিকারের কি ঘটতে যাচ্ছে।

ছড়িয়ে থাকা অসন্তোষ যে জনজীবনে কত গভীরে পৌছেছিল এগুলোই হল তার টিপিক্যাল এবং দৃশ্যমান চিহ্ন।

শিল্পই দেশকে চালনা করতে শুরু করে এবং অর্থ ইশ্বরের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটা দখল করে এমনভাবে বসে যে তা দিয়ে শুধু যে যাইছে করা সম্ভব তা নয়, সবাই তার কাছে মাথা নত করতেও বাধ্য হয়। স্বর্গের ইশ্বর যেন পুরনো দিনের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে তার জায়গা কুবেরের জন্য ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হয়। এভাবেই চরম অধঃপতনের দিন ঘনিয়ে আসে যা প্রকৃতই জাতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তৎকালীন অবস্থা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল যখন জাতির ভাগে প্রশংসাটা জোটা উচিত। কারণ দৃশ্যময়ের লগু তখন ঘনায়মান। জার্মানির উচিত ছিল তরবারীর দ্বারা কৃটি জোগাড় করা, যাতে সে তার প্রয়োজনীয় কৃটি পেতে পারে।

দুর্ভাগ্যবশত অর্থের এ প্রাধান্য জাতির প্রত্যেক অংশের স্বীকৃতি পায়, যার বিরোধীতা করা একান্তভাবেই উচিত ছিল। মহামান্য কাইজার একটা ভুল করেছিল যখন তার উক্তপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে এ সমস্ত কুবেরদের জায়গা করে দেয়ে। স্বীকৃতভাবে যদিও ক্ষমা চেয়েই বলতে বাধ্য হচ্ছে যে এমন কি বিসমার্ক পর্যন্ত এ ব্যাপারটার বিপদ বুঝতে সক্ষম হয়নি। বাস্তবে সব আদর্শগুলোকে অর্থের পরিমাপে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়। কারণ এটা তো পরিষ্কার যে এ রাস্তায় হাঁটতে অর্থের নিকট তরবারীর স্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে।

অর্থনৈতিক বিলি ব্যবস্থা যুদ্ধে চেয়ে অনেক সহজ। সুতরাং কাছাকাছি ইহুদী ব্রাকের সংস্পর্শে আসা কোন সত্যিকারের বীর বা রাষ্ট্রনেতার পক্ষে আর আশ্চর্যের কি আছে! সত্যিকারের প্রতিভা কখনই সন্তা হাততালি চায় না; সুতরাং এটাই তো স্বাভাবিক যে সে তা' ধন্যবাদের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করবে।

অর্থনৈতিক চরম সংকট ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত স্থার্থটাকে বড় করে তুলে পুরো অর্থনীতিটাকেই ঘোথবদ্ধ কোম্পানিগুলোর হাতে সঁপে দেয়।

এভাবে অসৎ প্রতারকদের হাতে শ্রমিকদের জীবনজুয়ার পাশা হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা ভয়াবহভাবে বেড়ে ওঠে। অর্থনৈতিকচক্র জয়ের পথে ঘোরে এবং ধীরে হলেও জাতীয় জীবন পরিচালিত করতে শুরু করে।

যুদ্ধের আগেই ঘোরাল পথে শেয়ার কেনাবেচায় জার্মান অর্থনীতির ওপর আন্তর্জাতিক স্পষ্ট ছাপ মেরে দিয়েছিল। এটা সত্ত্ব যে কয়েকজন জার্মান শিল্পতি বিপদের চাকাটা উন্টোভাবে ঘোরাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষমেষ যখন সমবেতভাবে অর্থনীতিকে কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা প্রবলতর হয়ে ওঠে মার্কসবাদের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরদের দ্বারা, তখন তারা একরকম বাধ্য হয়েই সরে আসে।

জার্মান ভাবি শিল্পের ওপর ক্রমাগত যুদ্ধই হল মার্কসবাদীরা যে জার্মান অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিকতার রূপ দিতে চেয়েছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু শেষে এটাকে সাফল্যের চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি যখন মার্কসবাদীরা বিপ্লবে জেতে। এ কথাগুলো লেখার সময়ে, বিশেষ করে আমার মনে হয়েছে জার্মান রেলওয়ের ওপর যে আক্রমণ করা হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদীর খপ্পরে গিয়ে পড়ে। এভাবে ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল ডেমোক্রাসি' আবার তাদের লক্ষ্য পথে চূড়ান্তভাবে এগিয়ে চলে।

জার্মান জাতিকে কতখানি পরিমাণে বেনিয়ং করে তোলা হয়েছিল, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল যুদ্ধ শেষে জার্মান শিল্পতিদের একজন মন্ত্রণ করেছিল যে ব্যবসাই একমাত্র শক্তি যার দ্বারা আবার জার্মান জাতির পুনর্গঠন সম্ভব। এ অনর্থক কথাগুলো বলা হয়েছিল ফ্রাঙ যখন মনুষ্যত্বের পরিমাপে লোক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যস্ত; এটা বলার অর্থ হল যে জাতীয় জীবনে আদর্শের চেয়ে টাকার মূল্য অনেক বেশি। 'স্টাইনস্ যা পৃথিবীব্যাপি রেডিওর মাধ্যমে বলেছিল তা' এক চরম অবিশ্বাস্য সন্দেহের দোলায় পুরো জাতিকে দোলায়। মতামতটাকে তৎক্ষণাত্ম গ্রহণ করে তারা উদ্দেশ্যটাকে বাচাল এবং মতলববাজের দল প্রধান উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করতে শুরু করে — যে ভাগ্য রাষ্ট্রনেতাদের বিপ্লবের পরে জার্মানিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

শ্ফয়িত জার্মানির সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল যুদ্ধের আগে কাজ অর্দেক করার অভ্যাস। এর ফলাফল হল অনিচ্ছিয়তা, যা জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিদিষ্ট একটা কাপুরুষতাকে প্রশংস্য দিয়ে ফলাফলে পৌছেছিল এক একটা কারণে। এবং শেষ পর্যন্ত এসব পীড়া শিক্ষাপদ্ধতিকে সম্পর্কিতে গ্রাস করে।

আক যুদ্ধের জার্মান শিক্ষা ব্যবস্থায় কথাগুলো বিরাট গলতি ছিল। এক, সীমাবদ্ধতা ছিল পুরোপুরি জ্ঞান নির্ভর এবং প্রত্যক্ষ কাজে লাগতে পারে সেদিকে নজরই দেওয়া হয়নি। তার চেয়েও অনেক কম নজর দেওয়া হয়েছিল ব্যক্তিগত চরিত্র গড়ায়; যতখানি সম্ভব শিক্ষার এ বিশেষ দিকটাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবং দায়িত্বজ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও বিচার ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে এ শিক্ষা একেবারেই সাহায্য করে না। তার ফলে যে সব লোক এ শিক্ষা ব্যবস্থায় তৈরি হয়, তারা হল আদবকায়দা আর ভাবাবেগ সর্বস্ব। যুদ্ধের আগে জার্মানদের আদবকায়দা আর ভাবাবেগ সর্বস্বজাত বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। জার্মানদের লোকে ভালবাসত কারণ তাদের ব্যবহার করা চলত বলে। কিন্তু তাদের চারিত্রিক এ দুর্বলতার দরুণ সম্মান বলতে কিছু পেত না। যাদের এ রহস্যের গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র জার্মানরাই সর্বপ্রথম তাদের জাতীয়তা ত্যাগ করে নিজ ভূমে পরদেশীর মত বসবাস করতে

গুরু করে। এবং তখন সমস্ত পৃথিবীতে একটা কথা অতি প্রচলিত ছিল যে, একটা টুপি হাতে করে যে কেউ সময় দেশটার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে পারে।

এ ধরনের সামাজিক শিষ্টাচার বিপর্যয় ডেকে আনে, বিশেষ করে যখন নির্দেশ আসে মহামান্য রাজার উপস্থিতিতে কতগুলো বিশেষ শিষ্টাচার দেখাতে হবে। এ নির্দেশ হল আদব-কায়দা পরম্পর বিরোধী হতে পারব না, এবং মহামান্য স্মাট যা পছন্দ করেন সেই ধরনের আদব-কায়দাই মেনে চলতে হবে।

এটা হল পরিষার ব্যাপার যে মর্যাদার মূল্য দিতে হবে, যে আদব-কায়দা শুধু লক্ষ্য সাধনের জন্য তা' বরদাস্ত করা হবে না। স্মাটের উপস্থিতিতে দাসের মত ব্যবহার হয়ত বা যথেষ্ট পরিমাণে উপযোগী, অবশ্যই পেশাগত দাসদের এবং জায়গা খোজার লোকদের পক্ষে সত্যি বলতে কি এ ক্ষমিত্ব জীবগুলোর পরিক্রমণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওপরের স্তরে ব্যাঙ; সাধারণ সৎ নাগরিকদের মধ্যে এদের ঘোরাফেরা নেই বললেই চলে। এ অতিশয় বিনোদ জীবেরা তাদের প্রভু এবং ঝুঁটি জোগানোর কর্তার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূলোয় লুটিয়ে পড়ত, কিন্তু অন্যদের কাছে তাদেরই ব্যবহার ছিল উদ্বিগ্ন, বিশেষ করে তাদের ধৃষ্টতা এত বেশি ছিল যে তারা একমাত্র নিজেদেরই মানুষ বলে জ্ঞান করত। এবং নিজেদের রাজকীয় মহিমা সম্পন্ন বলে ঘোষণা করতেও বিধি ছিল না তাদের।

এ কাজগুলোর সাহায্যে তারা রাজার এবং রাজকীয় আদর্শগুলোর পতন ঘটাবার পথ প্রস্তুত করে দিয়েছে; এছাড়া আর কিছু হতে পারে না। একটা মানুষ যখন যে কোন পরিস্থিতির মুখ্যমুখি দাঁড়াবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে, তখন সে কখনই তাদের সামনে মাটিতে উপুড় হয়ে সাষ্টাঙ্গে ধূলোয় পড়ে তাকে প্রণাম করবে না। সে যদি কোন প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধির জন্য সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়, তবে সে কিছুতেই নিরুৎসাহ হবে না, কোন সদস্য সেই প্রতিষ্ঠানের দোষক্রটি যতই দেখিয়ে তাকে নিরুৎসাহ করার চেষ্টা করব না কেন। এবং এটাও সত্যি যে সে সারা পৃথিবী ঘুরে ঢাক পিটিয়ে এ বিষয় বলে বেড়াবে না, যা নাকি তথাকথিত গণতন্ত্রের কয়েকজন বন্ধু করে বেড়িয়েছে। তার পরিবর্তে সে তার রাজার কাছে আবেদন জানাবে, এবং সেই রাজার নিকট তার কাজ হল পরিস্থিতির ডয়াবহতা বুঝিয়ে বলে সেভাবে কাজ করিয়ে নেওয়া। উপরন্তু তার পক্ষে এ ধরনের চিন্তাধারা গহণ করা অনুচিত যে রাজা যা ভাল বুঝবে তাই করবে; এমন কি যদি তার নির্দেশিত পথ দেশ এবং জাতিকে ধর্মসের পথে এগিয়েও নিয়ে যায়। আমি যে মানুষের স্বপ্ন দেখি, তার কর্তব্য হল রাজার কার্যকলাপের বিরোধিতা করে হলেও প্রয়োজনে রাজকীয় ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। রাজকাজ করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাকে যত বড় দায়িত্বের মুখ্যমুখি হতে হোক না কেন; যদি রাজকীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাজার কার্যকলাপের ওপরে নির্ভর করে, তবে এর চেয়ে শোচনীয় প্রতিষ্ঠান আর হতে পারে না। কারণ খুব কর্মক্ষেত্রেই আদর্শ রাজা জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতীক এবং পূর্ণ চরিত্রের লোক দেখা যায়, যদিও আমরা অন্যরকম চিন্তা-ভাবনা করতেই অভ্যন্ত। কিন্তু ওই সত্য পেশাগত জোচর এবং গোলামদের কাছে স্বাদহীন ঠেকবে। তবু মাথা উঁচু করা সবাই, যারা হল একটা জাতির মেরুদণ্ড বিশেষ, জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি এ অর্থহীন বাচান চিন্তাধারা ত্যাগ করে থাকে। কিন্তু যদি একটা জাতির সৌভাগ্য হয় মহান রাজ্য বা মহান কোন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হবার, তবে এটা মেনে নিতেই হবে যে সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে সেই জাতির সৌভাগ্যের তারা জুলজুল করছে; এবং তাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত যে খুব যারাপ

অবস্থার মুখোয়াথি দাঁড়াবার জন্য তার প্রতিকূলে নয়।

এটা পরিষ্কার যে রাজকীয় আদর্শগুলোর মূল্যায়ন এবং স্বার্থকতা ও ধূ রাজার ওপরেই নির্ভরশীল নয়। অবশ্য যদি না সেই মুকুট স্বর্ণের আদেশপ্রাণ হয়ে বীর দ্য হেট ফেডারিক বা বিচক্ষণ ব্যক্তি উইলিয়াম ফার্টের শিরে বসানো না হয়। এটা অবশ্য কয়েক শতাব্দীতে একবারই ঘটে থাকে। এর পুনরাবৃত্তি তার থেকে বেশ ঘটে না। রাজকীয়তার আদর্শ ব্যক্তির মানক্রমে হয়ে থাকে। অর্থাৎ মুকুটধারীর মানসিকতার উপরে নির্ভরশীল। আর প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের ভেতরেই নিহিত থাকে। এভাবে রাজাও সেইসব দায়িত্বশীল লোকদের পর্যায়ে পড়ে যাদের কর্তব্যকর্ম হল প্রতিষ্ঠানের সেবা করা। রাজা পর্যন্ত এ যদ্রে চাকা বিশেষ এবং তাকেও তার কর্তব্যকর্ম করে যেতে হবে। সেই উচ্চ আদর্শের পরিপূর্ণতার জন্য তারও একান্তভাবে কাজ করে যাওয়া উচিত। সুতরাং এ আদর্শের সঙ্গে এর অর্থ যদি জড়িত না থাকে তবে সমস্ত কিছুই সেই তথ্যকথিত পরিব্রত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। তখন আর সেই ক্ষীণ দুর্বল লোকের পক্ষে যোগ্যতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

বর্তমানে সেই সত্যযুগের ওপরে জোর দেওয়া উচিত, কারণ এখন সেইগুলোই আবার ফিরে এসেছে; এবং রাজকীয় ব্যবস্থা ধর্মসের জন্য এগুলো খুব কম দায়ী নয়। বেশ কিছুটা ধৃষ্টার সঙ্গে এ লোকগুলোই আবার তাদের রাজার কথা বলে; একেই তারা কয়েক বছর আগে নির্লজ্জের মত পরিত্যাগ করেছিল যখন তার সত্যিকারের সঙ্গীন সময় উপস্থিত। যারা এ মিথ্যে কথার কোরাসে নিজেদের গলা মেলায়নি, তাদেরই খারাপ জার্মান নামে অভিহিত করে ধিক্কার জানানো হয়েছে। যারা এ আখ্যা দিয়েছিল তারা হল ১৯১৮ সালের ন্যায় পলায়নবাদী এবং নিজেদের স্বার্থের তাগিদায় লাল ব্যাজ ধারণ করতে শুরু করে। তাদের চিন্তায় পরিণামদর্শিতা শৌর্যের চেয়ে অনেক শ্রেণী। কাইজারের কি ঘটছে তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যাথা নেই। তারা এমন ভাগ করত যেন তারা শান্তিপূর্ণ নাগরিক; কিন্তু প্রায়ই দেখা যেত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তারা দল বেঁধে অদৃশ্য। হঠাৎ এ রাজমর্যাদার বাহকদের প্রয়োজনের সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। পরিবেশ অনুযায়ী এ দাসের দল এবং সদস্যরা একে একে আবার নাট্যমঞ্চে আবির্ভূত হয়, যাতে আবার তারা রাজার উদ্দেশ্যে জিক্ষা চালনা করতে পারে। অবশ্যই যখন অন্যান্য রাজার বিরোধিতা করার প্রয়াসকে দমন করে ফেলেছে। আবার তারা একত্রিত হয়ে মিশ্রের ভাল খাদ্যব্য ও স্বাচ্ছন্দ বিলাসের কথা শ্বরণ করে। এবং রাজার আনুগত্যে বিভোর হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা এ গতিতেই চলতে থাকে, যতদিন না পর্যন্ত লাল ব্যাজের দিন প্রবল হয়ে ওঠে। তখন আবার পুরনো ঝরনারে সদস্যদের যারা রাজকীয় মহিমার গুণগানে মুখ পুনশ্চ কঢ়লা রাখার বদলী পাত্রের মত পলায়ন করে। ঠিক যেমন করে বিড়ালে মুখ করে ইন্দুর নিয়ে ছুটে পালায়।

যদি সম্মাট নিজে এসব ব্যাপারে দায়ী না হয় তবে প্রত্যেকেই তার প্রতি সহানুভূতি দেখবে সদেহ নেই। কিন্তু তাদেরও উপলক্ষ্মী করা উচিত যে তাদের সাহায্যে সিংহসনই একমাত্র হারানো সম্ভব, ফিরে পাওয়া নয়।

এসব ভক্তি সম্মত হল আমাদের ভুল শিক্ষাপদ্ধতির ফলাফল, যা এ ক্ষেত্রে বিদ্যেষ বশে চরম শান্তি দিয়েছিল। এ শোচনীয় সারবিহীন বস্তু জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়ে রাজকীয় মর্যাদার গোড়ায় সৃড়ঙ্গ কাটে। শেষ পর্যন্ত তা নড়ে চড়ে উঠলে সমস্ত কিছু তার গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। স্বত্বাবতই জঘন্য এবং অতি নিচু তোষামোদকারী গলগ্রহণ কিছুতেই

তাদের প্রভুর জন্য মরতে ইচ্ছুক ছিল না; রাজার পক্ষে এটা উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না এবং বুঝতে গেলে যতখানি কষ্ট সহ্যের প্রয়োজন, তার পক্ষে তত ক্রেশ বরণ করে নেওয়াটা অসম্ভব।

ভুল শিক্ষা পদ্ধতির একটা ভুল ফলাফল হল যা সততাই দৃশ্যমান তা' কাঁধে দায়িত্ব নেওয়ার ভীতি এবং তার ফলপ্রাপ্তি হিসেবে অস্তিত্বসম্পন্ন মূল সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হওয়ার দুর্বলতা।

এ মড়কের শুরুর বিন্দু হল আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে বিশেষ করে দায়িত্ব বিমুখতা পরিপূর্ণ লাভ করে। দুর্ভাগ্যবশত ধীরে ধীরে এ অসুখ প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে; বিশেষ করে তা আঘাত হানে গণজীবনের ব্যাপারগুলোতে। সবদিক থেকেই দায়িত্ব বেঢ়ে ফেলে দেওয়া হয়, যার জন্য প্রতিটি ব্যাপারেই আসে দোমনাত্মক। ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ প্রায় শূন্য হয়ে আসে।

আমরা যদি গণজীবনে বিভিন্ন সরকারের অনিষ্টকর ঘটমান বিষয়গুলোর বিচার বিবেচনা করে দেখি, তবে তৎক্ষণাত এ অর্ধেক হৃদয় দিয়ে দায়িত্ব নেবার কাপুরুষতার ত্যাবহ ফলাফল দেখতে পাব। অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে আমি মাত্র কয়েকটা উদাহরণ এখানে পেশ করব।

সাংবাদিকচক্র রাষ্ট্রের মধ্যে সংবাদপত্রকে বিরাট একটা শক্তি বলে বর্ণনা করেছে।

সত্যি বলতে কি এর উপর্যোগীতা অসাধারণ। কারোর পক্ষে এটা সহজে হিসাব করা সম্ভব নয়। কারণ সংবাদপত্র শিক্ষা পদ্ধতির একটা দিক। এমন কি প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনেও। বিশেষ করে সংবাদপত্র পাঠকদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, যারা যা কিছু পড়ে, তাতেই বিশ্বাস করে। দ্বিতীয়ত, যারা যা কিছু পড়ে, তারা কিছুতেই বিশ্বাস করে না। তৃতীয়দল হল, যারা পড়ে প্রচণ্ড সমালোচনার পর বিচার বিবেচনা অনুসারে সার বস্তুটি গ্রহণ করে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে প্রথম দলটি অতি শক্তিশালী। কারণ গণসংখ্যার বেশির ভাগই এদের সমষ্টি। বৃদ্ধিমত্তার দিক থেকে জাতির তরফে এরা অত্যন্ত সহজ অংশের লোক। পেশাগত দিক থেকে পুরো জাতিটাকে ভাগ করা অসম্ভব; বরং বৃদ্ধিমত্তার দিক থেকে এদের বাছবিচার করা যেতে পারে। এ প্রতাকার তলে তারাই জড়ে হয়, যারা শুধু নিজেদের চিন্তা-ভাবনা করার জন্য এ পৃথিবীতে আসেনি; অথবা যার এ শিক্ষা হয়নি কারণ এরজন্য কিছুটা তাদের অক্ষমতা এবং কিছুটা অজ্ঞতা; সেই কারণে তারা তাদের সামনে ছাপার অক্ষরে যে দেখে সেটাকেই বিশ্বাস করে বসে। এর মধ্যে আমরা সেই ধরনের অলসদেরও যোগ করব, যারা নিজেদের পরিপূর্ণ চিন্তা করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নেহাত আলসেমির জন্য অন্যের চিন্তাধারাটাবে গ্রহণ করে বিষয়গত এ ভেবে যে চিন্তাধারাগুলো পরিপূর্ণ। সুতরাং এ সবগুলোকে বিচার বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে সংবাদপত্রের প্রভাব জনজীবনে সুদূর প্রসার্য। কারণ জনসাধারণের বিরাট একটা অংশের ওপর এ সংবাদপত্র প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু যে কারণেই হোক অথবা অনিচ্ছুক বলে তারা এগুলোকে মানসিক চালুনি দ্বারা বেঢ়ে পার্থক্য করে না। সেই কারণে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাগুলো হল এ স্বতন্ত্র প্রভাবের ফলাফল। গণজীবনের জ্ঞানলোক যদি সৎ চরিত্রের এবং দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হয়, তবে এগুলোর একটা সুবিধাগত দিক আছে; কিন্তু যখন বদমায়েস এবং মিথ্যাবাদীরা এগুলোকে কাজে লাগায়, তখনই জাতির চরম ক্ষতি নেমে আসে।

সংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় দলটি সত্যই ছোট। কারণ এর সমষ্টি হল প্রথম দলের যারা সারি সারি ঘটনা প্রবাহে তিক্ত হয়ে শেষমেষ ছাপার অক্ষরে যা দেখে তাকে অবিশ্বাস করে চলে। তারা সমস্তরকম সংবাদপত্রকে ঘৃণা করে থাকে। হয় তারা সংবাদপত্রে সবকিছু পড়ে না, অথবা বিষয়বস্তুর ওপরে তাদের চরম একটা বাগ থাকে। তারা সেগুলোকে মিথ্যার স্তুপ এবং ভুল বক্তব্য বলে ধরে নেয়। কারণ তাদের সবসময়েই সত্যের প্রতি একটা অবিশ্বাস থাকে। সেই কারণে কোন ইতিবাচক কাজকেই তারা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে।

তৃতীয় দলটি হল সত্য অত্যন্ত স্ফুর্দ্ধ। কারণ সত্যিকারের বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন লোক দ্বারা এটা সৃষ্টি, যাদের স্বাভাবিক ধ্যান-ধারণা এবং শিক্ষা তাদের নিজেদের জন্যই চিন্তা করতে শেখায়, এবং এরা প্রতিটি বিষয়েই নিজেদের একটা মতামত খাড়া করতে সচেষ্ট হয়ে থাকে। তারা এমন কোন সংবাদপত্র পড়ে না যেখানে তাদের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সংযোগকারী লেখকের বক্তব্যের মিল থাকে। এবং স্বাভাবিকই লেখকদের পক্ষে এটা খুব একটা সহজ কাজ নয়। সংবাদিকরা এ ধরনের পাঠকদের বেশ কিছুটা পৃষ্ঠাপোষকতাই করে থাকে।

সুতরাং এ কাজে সংবাদপত্রগুলোর বিপদ্জনক ক্ষমতা অতি অল্প, অপ্রয়োজনীয়ও বটে। বিশেষ করে তৃতীয় দলের সদস্যদের নিকট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ পাঠকবর্গ প্রত্যেক সাংবাদিককে অত্যন্ত অশুক্রার চোখে দেখে যারা কদাচ সত্য কথা বলে থাকে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল এসব পাঠকবর্গের মূল্যায়ণ বুদ্ধিমত্তায়, তাদের সংখ্যার দ্বারা নয়, অসুস্থীজনক ব্যাপারটা হল সংখ্যাটাকেই গণনার মধ্যে ধরা হয়। বুদ্ধিমত্তাকে নয়। বর্তমান সময়ে যখন জনসাধারণের ক্ষেত্রে ভেটপত্রটাই কিছু স্থির করার মানদণ্ড, সেখানে পুরো ব্যাপারটাই হল গরিষ্ঠ সংখ্যা গোষ্ঠীর হাতে; অর্থাৎ প্রথম দলের। যারা নির্বোধ এবং সহজে বিশ্বাসী দলের লোক।

এটা হল একটা দেশের জাতীয় স্বার্থ যে এ দলটা যাতে কোন ধাপ্তাবাজের হাতে গিয়ে না পড়ে, যারা অজ্ঞ অথবা শয়তানি মতলবী কোন তথ্যকথিত শিক্ষক। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হল শিক্ষাপদ্ধতির উপর নজর রাখা যাতে এ ধরনের কোন অপরাধ সংঘটিত হতে না পারে।

বিশেষ করে সংবাদপত্রগুলোর ওপর যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে; কারণ এদের প্রভাব শুধু শক্তিশালীই নয়, সর্বব্যাপীও বটে। যেহেতু এর ফলাফল কিছু সময়ের জন্য নয়, বরং ক্রমাগত বলা চলে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে যা হোক করে ব্যাপারটাকে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না, বা এ কর্তব্যে অবহেলা করাটাও সম্ভত নয়। সমস্ত ব্যাপারটাই জাতির কাছে তুলে ধরা উচিত। কেন ভাল এবং কি করলে আরো ভাল হতে পারে তা বিশ্বেষণ প্রয়োজন। নির্দয়তার সঙ্গে রাষ্ট্রের উচিত শিক্ষা পদ্ধতির এ যন্ত্রটাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা এবং জাতির ও দেশের সেবায় একে নিয়েজিত করা।

কিন্তু যুদ্ধ পূর্ব জার্মানিরে জার্মান সংবাদপত্রগুলো কি ধরনের খাদ্যব্য বিতরণ করেছিল? এটা কি সবচেয়ে বিষাক্ত বিষ যা কল্পনায় আনা যায়। এটা কি বিশ্বজীবী শান্তিবাদের নিকৃষ্টরূপ নয় যা আমাদের দেশের লোকের ভেতরে ছুচের সাহায্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়নি? যখন অপরেরা ধীরে ধীরে কিন্তু নিচিতরপে বাজপাখির ধারালো নথ দিয়ে জার্মান জাতির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত? এ সংবাদপত্রগুলোই শান্তির সময়ে বিন্দু বিন্দু করে সন্দেহের বীজ জনসাধারণের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে, যা নাকি আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। এভাবেই রাষ্ট্রের আশ্চর্যকার প্রচেষ্টার হাত দুটোয় হাতকড়া পরিয়ে

দিয়েছে। এ জার্মান সংবাদপত্রগুলোই আমাদের জনসাধারণের কাছে পরিবেশনা করেনি যে পশ্চিমী গণতন্ত্র কত বড় নির্থক? যতদিন পর্যন্ত না প্রচুর আগাছা তাদের ভবিষ্যত লীগ অব নেশানসের হাতে সুরক্ষিত বলে ভেবেছে; এ সংবাদপত্রগুলোই আমাদের লোকদের নৈতিক অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিয়ে জনগণের সৌন্দর্য জ্ঞান এবং নৈতিকতাকে হাস্যস্পদের পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

ক্রমাগত আক্রমণে সংবাদপত্রগুলো কি রাষ্ট্রের অধিকারের গোড়ায় সুড়ঙ্গ কাটেনি? যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে একেবারে ধূলিসাঁ না করা যায়। সংবাদপত্রগুলো কি রাষ্ট্রের সম্পত্তি রাষ্ট্রকে দেওয়ার ব্যাপারে বারবার আপত্তি জানিয়ে আসেনি? ক্রমাগত সমালোচনায় সৈন্যদলের নাম-শব্দ টেনে নিচে নামিয়েছে, সাধারণের জ্ঞান বুদ্ধিকে পেছনে থেকে ছুরি মেরেছে এবং সামরিক বাহিনীর সুখ্যাতিকে অঙ্গীকার করেছে— যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের প্রচারকার্যে সফলতা এসেছে।

তথাকথিত এ সংবাদপত্রগুলোর কাজ ছিল জার্মান রাষ্ট্র এবং তার জনসাধারণের জন্য কবর খোঢ়া। মার্কসীয় সংবাদপত্রগুলোর মিথ্যার বেসাতি সম্পর্কে কিছুই বলা চলে না। তাদের কাছে বিড়ালের নিকট ইন্দুরের যেমন প্রয়োজন, মিথ্যা প্রচারটাও তাদের সেইরকম মূল আদর্শ। তাদের একমাত্র এবং সর্বপ্রধান কাজ ছিল জাতির মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা, যাতে পুরো জাতটা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির এবং তাদের প্রতু ইহুদীদের গোলাম হতে পারে।

জনগণের মনকে বিষাক্ত করে তোলার বিরক্তে রাষ্ট্রই বা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল? না, কিছুই করেনি। এ নীতিতেই তারা ভেবেছিল এ মহামারীর হাত থেকে রেহাই পাবে। চাটুকারিতা আর সংবাদপত্রের মূল্যায়ণের অগ্রাধিকার স্থীকার করে। ইহুদীরা জেনেওনেই মৃদু হেসে এগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ধন্যবাদের সঙ্গে।

রাষ্ট্রের এ অসম্মানজনক ব্যর্থতার কারণ হল, — বিপদটাকে বুঝতে না পারা, তার চেয়ে বেশি হল কাপুরুষতার এবং ক্রটিপূর্ণ অর্ধেক হৃদয় দিয়ে পুরো বিষয়টার মোকাবিলা করার। কারোর কোন মৌলিক এবং উৎসাহপূর্ণ পদ্ধতি ছিল না যার দ্বারা এর মোকাবিলা করা যেতে পারে। সবাই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিয়েছে; অর্থাৎ এ পথ বেছে নিয়েছে। সোজাসুজি আঘাত করার পরিবর্তে বিষধর সাপকে খালি উত্তেজিতই করে তুলেছে। এর ফলফল হয়েছে যে যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থেকেছে এবং এ প্রজ্ঞিতান্বেষণের সংগ্রাম করার ক্ষমতা বছরের পর বছর বেড়েই গেছে।

যে ইহুদী সংবাদপত্রগুলো ধীরে ধীরে জাতিকে দুর্নীতির প্রাপ্তি জড়িয়ে ফেলেছিল তাদের বিরক্তে তৎকালীন রাষ্ট্র যে আত্মরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তাঁতে কোনরকম নির্দিষ্ট পস্থা ছিল না। এর পশ্চাতে যেমন সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি ছিল না, তেমনি নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তুও ছিল না যাকে অবলম্বন করে এ আত্মরক্ষামূলক প্রয়াস গড়ে তোলা যেতে পারে। আসলে পরিস্থিতিটাকে বুঝতেই তারা অসফল হয়েছে, যে কারণে সংগ্রামের গুরুত্ব, উপায় বা কোনরকম পরিকল্পনা করাই তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। খালি সমস্যাটাকে নিয়ে টুং টাঁ শব্দ করেছে মাত্র। যখন কামড়টা জোরে বোধ হয়েছে, তখন এক আধজন সাংবাদিক বিষধর সর্পকে ধরে কয়েক সঙ্গাহ বা মাসের জন্য জলে পাঠিয়েছে; কিন্তু পুরো বিষের পাত্রটাকে শাস্তিতে বয়ে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে।

এটাকে স্বীকার করে নিতেই হবে যে এটা হল একদিকে ইহুদীদের ধূর্তনামীর ফল; অপরদিকে রাষ্ট্রের নির্বৃদ্ধিতা এবং অক্পট সরলতার পরিচয় মাত্র। ইহুদীরা চালাকির জন্য সংবাদপত্রগুলোর ওপরে সম্প্রসারণ করতে দিয়েছিল। একে অন্যকে আচ্ছাদন দিতে চেষ্টা করেনি। অন্যদিকে গোপনীয় সমস্ত তথ্য মার্কসীয় সংবাদপত্রগুলো অত্যন্ত জন্য উপায়ে উদ্ঘাটিত করে সবার সামনে তুলে ধরেছিল, তায়াবহরূপে সরকার এবং রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছিল এবং এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। এ মধ্যবিত্তিক গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রগুলোও ইহুদীদের হাতে ছিল এবং তারা ভালভাবেই জানত কি করে ছয়বেশ ধারণ করে সত্যিকারের বিষয়বস্তুটাকে লুকোতে হয়। তারা যত্নের সঙ্গে কর্কশ ভাষার ব্যবহার পরিভ্যাগ করত; কারণ তারা জানত বোকারা ওপর ওপর দেখেই বিচারপর্ব সমাধা করে এবং সত্যিকারের কোন বিষয়বস্তুর গভীরে তারা প্রবেশ করতে পারে না। তারা বিষয়বস্তুর পরিমাপ করে বাইরের রূপটা দেখে। তেতরে কি আছে তা' দেখে না বা দেখার মত ক্ষমতাও তাদের নেই। এক ধরনের মানসিক দৌর্বল্যকে সংবাদপত্রগুলো ভাল করে বুঝত এবং তার পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল।

এ মাথা মোটাদের কাছে ফ্রাঙ্কফুর্ট র বাউটং নামক সংবাদপত্রটি সমানের সঙ্গে সমান্তর হত। এরা সব সময় বেলাচাকে সোজাসুজি বেলাচা বলেনি। এরা সবরকম দৈহিক শক্তি প্রয়োগের বিরোধিতা করেছে এবং দ্রুমাগত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মহৎ যুদ্ধের জয়ঢাক পিটিয়ে গেছে। কিন্তু এ সংগ্রামের বিষয়টা অদ্ভুত ব্যাপার, তথাকথিত কম বুদ্ধিমানদের মধ্যে অভৃতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির এটাও একটা ভুল দিক; যা আমাদের দেশের যুবকগোষ্ঠীকে তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতির পথ থেকে বিচ্ছুরিত করে নিয়েছিল। সত্যিকারের জ্ঞানের বদলে কিছু এ ধরনের জ্ঞান তাদের তেতরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার সঙ্গে সত্যিকারের জ্ঞানের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। এ ধরনের বুদ্ধিমত্তা এবং শুভেচ্ছার শেষ প্রাপ্তে কিছুই মেলে না যদি সত্যিকারের লক্ষ্যবস্তু থেকে মানুষ পিছু হটে আসে। সত্যিকারের জ্ঞান তাকেই বলা যেতে পারে যা নাকি মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অনুভব করতে সক্ষম হবে।

ব্যাপারটার আরো বিস্তারে যাই : মানুষের চিত্তাধারায় এ ভুল থাকা উচিত নয় যে সে প্রকৃতির প্রতু হওয়ার জন্যই এসেছে। শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োজনীয় দিকটা তাকে এ ধরনের মিথ্যা আশা দেখাতে সাহায্য করেছে। মানুষের বেঁোৱা উচিত যে প্রয়োজনের গোড়ায় আইন-কানুনই যা নাকি প্রকৃতির রাজ্য সর্বত্র বলবৎ 'তা' হল যে তার অস্তিত্ব রাখার জন্য নিরবধি সংগ্রাম এবং দুর্দশ করে যেতে হবে তাকে। তখনই সে অনুভব করতে সক্ষম হবে যে মানব জাতির জন্য আলাদা কোন কানুন যে আইনের বাইরে সূর্য-এবং গ্রহ-নক্ষত্র তাদের আপন কক্ষপথ পরিক্রমণ করে। চন্দ্র এবং তারকারাজি তাদের নির্দিষ্ট পথে বেয়ে চলে। সবল সর্বদাই দুর্বলের প্রতু। সুতরাং এগুলো থেকেই দেখা যাচ্ছে যাদের জন্য এসব আইন-কানুন নির্দিষ্ট, তাদের সেগুলো মেনে চলতেই হবে, অন্যথায় ধৰ্মস হল অনিবার্য ফলাফল। এ চরম জ্ঞানের কাছে মানুষের উচিত নিজেকে সমর্পণ করা। সে বড়জোর তাকে বুঝতে চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তার নির্দিষ্ট পথ থেকে সে কিছুতেই সরে আসতে পারবে না।

আমাদের বুদ্ধিমত্তার বেশ্যাবৃত্তির জন্যই ইহুদীরা এসব সাংবাদিকতা এবং সংবাদপত্রগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। তাদের জন্যই ফ্রাঙ্কফুর্টের

ঝাইটুং আর বার্লিয়ান টাগেরাটে নামক সংবাদপত্রদ্বয় লিখিত। এর বজ্রব্যের উদ্দেশ্যও তারাই এবং এ পত্রিকা দু'টোর প্রভাব তাদের মধ্যেই পড়েছে। অতি যত্নের সঙ্গে কর্কশ ভাষাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে; অন্যান্য শিশির থেকে বিষ বার করে এসব অনুগত জনমণ্ডলীর দেহে অতি সতর্কভাবে সেই বিষ প্রয়োগ করেছে। টগবগে ব্রহ্ম এবং সুন্দর সুন্দর নির্বাচিত শব্দগুচ্ছ দ্বারা পাঠকদের জ্ঞান এবং নৈতিকতাই যে একমাত্র এসব পত্রিকার আদর্শ হওয়া উচিত সেই বিশ্বাসের পথ থেকে তাদের বিচ্যুত করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে এসব ব্যাপারগুলো অতি ধূর্তভাব সঙ্গে যে কোন বিরোধিতাকে সম্মুখে নষ্ট করেছে যা নাকি ইহুদী এবং তাদের সংবাদপত্রগুলোর বিরুদ্ধে যেতে পারত।

তারা পুরো ব্যাপারটাকে এমনভাবে সম্ভূমের সঙ্গে রূপ দিত যাতে সবাই মনে করে অন্যান্য সংবাদপত্রগুলো যে প্রশংস্য দিত, তা যেন অত্যন্ত মনু বলে বোধ হয়; এবং যাতে গ্রেঞ্জারী পরোয়ানাজারী করে তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম আইনগত অধিকার প্রয়োগ না করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা সংবাদপত্রের স্বাধীন আভিন্নায় অনধিকার প্রবেশেরই সমতুল্য। এ অভিব্যক্তিটা শৃঙ্খলিক পদের পরিবর্তে কোমলতর বলে এ পথেই আইনের শাস্তিটাকে এড়িয়ে যেত এবং জনসাধারণকে প্রতারণা আর গণমানসকে বিষয়ে দেওয়ার জন্মই তারা এ পথ বেছে নিয়েছিল। এভাবে শাসকবর্গ অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল; বিশেষ করে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সাইনগত কোন ব্যবস্থা — এসব সাংবাদিক দস্যুদের বিরুদ্ধে নেওয়ার ব্যাপারে। কারণ সব সময়ই তাদের একটা ভয় যে এসব সাংবাদিক দস্যুদের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হলে পরে জনসাধারণের সহানুভূতি যদি তথাকথিত শ্রদ্ধেয় সংবাদপত্রগুলোর ওপর গিয়ে বর্তায়! অবশ্য এ ভয় একেবারে অনর্থক ছিল তা' নয়, কারণ সেই মুহূর্তে পুরো ব্যাপারটা এমন হয়ে উঠেছিল যে এ নোংরা সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে যে কোন একটার বিরুদ্ধে কোনরকম আইনগত ব্যবস্থা নিলেই অন্যান্যরা তার সাহায্যে তৎক্ষণাত ছুটে আসত। এ ছুটে আসার কারণ অবশ্য এর নীতিগত সমর্থনের নিমিত্ত নয়; এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল সংবাদপত্রের তথাকথিত স্বাধীনতা এবং জনসাধারণের মুক্ত মতামত প্রকাশের অধিকারের জন্য। এ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ অনেক বলবান পূরুষকেই কাপুরুষে পরিণত করে; কারণ এগুলো তো নির্ণত হয় তথাকথিত অনুসাংবাদিক গোষ্ঠীর মুখ থেকে।

এবং এভাবেই এ বিষ জাতির জীবনের রক্তে প্রবেশ লাভ করে ও গণজীবনকে বিষাক্ত করে তোলে। সরকারের তরফ থেকে এ রোগের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দ্বিমত নিয়ে যা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা' সামগ্রিকভাবে পুরো ব্যাপারটাকে টেনে নিচে নামিয়েছে এবং পুরো সম্রাজ্যটাকেই ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। যখন কোন প্রতিষ্ঠান তার কাছে যে অস্ত্র গচ্ছিত তা'দিয়ে আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হয়, তখন তার অস্তিত্বাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। প্রতিটি দ্বিমত হল ভেতরকার ক্ষয়প্রাপ্ত উদাহরণ মাত্র যা সময়ে আজ অথবা কাল বাইরে বিপর্যয় ডেকে আনতে বাধ্য।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস আমাদের বর্তমান বংশধরেরা এ বিপদের ওপরে প্রভৃতি করতে অবশ্যাই পারে যদি তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করা যায়। কারণ এ বংশধরেরা এমন কতগুলো অভিজ্ঞতার রাস্তা অতিক্রম করেছে যা তাদের শ্বায়ুকে শক্ত করে তুলতে সক্ষম।

আমার দৃঢ় অভিমত হল এ কাজ পূর্ব পুরুষদের চেয়ে আমাদের পক্ষে করা অনেক সহজ। বারো ইঞ্জি একটা অস্ত্রের ভেদ ক্ষমতা হাজার ইহুদী সংবাদপত্রের সর্প-শব্দের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র।

জার্মানিতে প্রধান এ সমস্যাগুলোকে কী ধরনের দুর্বল এবং সন্দেহপূর্ণ চিঠ্ঠে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল : পরম্পর হাতে হাত দিয়ে রাজনৈতিক এবং নৈতিক জীবনকে বিষাক্ত করে তোলা। বহু বছর ধরে এ তুলনামূলক বিষাক্ত পদ্ধতি গণমানসকে অসুস্থ করে তুলেছে। বড় শহরে বিশেষ করে ছড়িয়ে পড়েছে সিফিলিসের মত ভয়ঙ্কর রোগ; দেশের সর্বপ্রাপ্তে রাজরোগ ধীরে ধীরে পা রেখে জীবনকে কেড়ে নিছে। অর্থাৎ তার নির্দিষ্ট ফসল সে নিচিতে ঘরে তুলে চলেছে।

যদিও এ দুই ক্ষেত্রেই জাতির জীবনে বিপদের সংকেত জানিয়ে চলেছে; পুরো ব্যাপারটা দেখে শুনে মনে হয় যে কেউই এ প্রতারণার ব্যাপারে কোনরকম সক্রিয় ব্যবস্থা নেয়ানি। বিশেষ করে সিফিলিসের ব্যাপারে তো মনে হয় সমগ্র রাষ্ট্র এবং গণমানস পুরোপুরি এর কাছে আঘসমর্পণ করে বসে আছে।

এ পরিস্থিতির বিরোধিতার মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন ছিল সত্যিকারের যতটুকু পরিষ্কার করা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি জোরের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটাকে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করার। এখানেও একমাত্র রোগকেই সোজাসুজি আক্রমণ করা শ্রেয়, রোগের উপর্যুক্তগুলোকে নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও প্রধান কারণটা এভাবে নির্ণীত হওয়া উচিত যাতে ভালবাসাটাকে বেশ্যাবৃত্তির নামাত্রণ বলেই প্রতিভাব হয়। যদিও এ পথে ভয়ানক এ ব্যাধিকে আয়তে আনা সম্ভব নয়, জাতিকে আরো অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। কারণ এ বেশ্যাবৃত্তির থেকে যে নৈতিক অধিঃপত্রেন সৃষ্টি তা' জাতিকে আরো বেশি নিচে টেনে নামাবে। ধীরে হলেও নিচিতকরণে। আমাদের আধ্যাত্মিকভাবাদকে ইহুদীকরণ এবং আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিকে ধনলোভী করে তোলার ফলাফল আজ হোক কাল হোক আমাদের ভাবীকালের ওপর তা' আঘাত হানতে বাধ্য। দৃঢ় এবং স্বাস্থ্যবান সন্তান, যারা প্রকৃতির আশীর্বাদধন্য, তাদের পরিবর্তে আমাদের ঘর-সংসার ভরবে এমন কতগুলো সন্তানে যারা এ অর্থনৈতিক হিসেবের ফলশ্রুতি হিসেবে মানবজাতির নমনুষ্ঠনের হবে। অর্থনৈতিক কারণও দিনের পর দিন বিবাহের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভবিষ্যতে বিবাহের এটাই একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ভালবাসা তখন তার বহিঃপ্রকাশের জন্য অন্য পথ খুঁজে নেবে।

এখানেও অন্যান্য ক্ষেত্রের মত প্রকৃতিকে কিছু সময়ের জন্য অস্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু আজ হোক কাল হোক সে তার নির্মম প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে। এবং মানুষ যখনই এ সত্য উপলব্ধি করবে, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আমাদের নিজস্ব উদারতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ যে প্রাথমিক বিবাহবন্ধনের কারণগুলোকে আমরা কিভাবে লুঠন করেছি ত্রুটাগত সেইগুলোকে অস্বীকার করে। এখানেও মুখ্যমুখ্য এসে দাঁড়িয়েছে সেই আমাদের চিরাচরিত অভ্যাস; একদিকে সামাজিক সমস্যার চাপ, অপরদিকে অর্থনৈতিক অবস্থা। একটা আমাদের নিয়ে গেছে বংশগত দুর্বলতার, পথে, আরেকটা মিশ্রিত রক্তে। বড় বড় দোকানের ইহুদী মালিকদের কন্যারা মহাপ্রভুদের বংশবৃক্ষের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সদিগী বলে বিবেচিত এবং এ সঙ্গিনীদের সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিপঞ্চ সত্যই অত্যন্ত প্রথর। এ সমস্তই সমাজকে অধিঃপাতে নিয়ে চলেছে। বর্তমানে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজও

সেই পথেই এগিয়ে চলেছে। তাদের যাত্রাপথের শেষে বিন্দুর লক্ষ্যও সেই একই বিন্দুতে।

এ অবস্থিকর সত্যটাকে তড়িয়ে এবং উত্তেজনাহীন অবস্থায় মার্জনা করে সরিয়ে একপাশে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে পুরো ব্যাপারটাকে রূপ দেওয়া হয়েছে যে এভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকেই মুছে ফেলা সম্ভব।

কিন্তু না এটাকে অঙ্গীকার করার উপায় নেই যে আমাদের শহর এবং নগরগুলোর লোকসংখ্যার বিরাট একটা অংশ বেশ্যাবৃত্তিতে আসক্ত হয়ে পড়েছে; কারণ হল প্রণয়ের প্রতি তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। এবং তাদের নিজেদের জীবন বিভিন্ন যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কল্পনিত হয়ে চলেছে। ঘরের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যেই তা' স্পষ্ট প্রতিভাত। এগুলো হল দৃঢ়জনক এবং বিষাদময় ঘটনার সাক্ষ যে আমাদের যৌনজীবনে কষাঘাত কর তীব্র হয়ে উঠেছে। এ যন্ত্রণায় প্রত্যক্ষ ফলাফল হল পিতামাতার পাপ।

এ অস্তিত্বময় এবং চরম সত্যের হাত থেকে নিঃস্তি পাওয়ার অনেক পথ আছে। বহু লোকই অঙ্গভাবে জীবনের পথ চলে। অথবা চোখ খোলা রাখলেও চারপাশের অনেক কিছু দেখতে চায় না। কিছু লোক আবার নিজস্ব মতবাদের জালে নিজেদের আবদ্ধ রাখে। এটাই হল জীবনের কর্দর্যময় দিকগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার সন্তা এবং সোজা পথ। পুরো ব্যাপারটাই যেন মিথ্যা এবং হাসির ঘটনা। যখন পুরো ব্যাপারটা এর মুখোযুৰি এসে দাঁড়ায়, তারা সমস্ত ব্যাপারটাকে পাপ-পূর্ণ এবং জীবিকাবিহীন বলে আঙ্কেপ করে।

শেষে যারা এ চাবুকের দ্বারা কি ত্যক্ষর ফলাফল হবে বুঝতে পেরেছিল তারাও শুধু কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে তাদের দায়-দায়িত্ব বেড়ে ফেলেছে; কারণ তারা বুঝেছে এ ধৰ্মসের সামনে তারা সম্পূর্ণ অসহায়। সুতরাং পুরো ব্যাপারটাই তার আপন গতি পথে এগিয়ে চলে।

সদেহ নেই সমস্ত ব্যাপারটাই সুবিধেজনক এবং সহজ; শুধু এর সুবিধাজনক দিকটাই আমাদের জাতীয় জীবনে চরম বিপদ ডেকে এনেছে। অন্যান্য জাতিরা আমাদের থেকে উন্নত নয়, এর দোহাই দিয়ে আমাদের জাতির অধঃপতন কোনরকমেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। শুধু যন্ত্রণাটার ওপর সহানুভূতির প্রলেপ মাথিয়ে সহ্য করার পথটাকে সুগম করে তোলা যায় মাত্র। কিন্তু প্রয়োজনীয় যে প্রশ্নটা এখানে থেকে যায় : কোন্ জাতি এ চাবুকের কষাঘাতের আঘাত প্রথমে এড়িয়ে উঠবে, এবং কোন্ জাতি এর বশ্যতা স্থীকার করবে। সেটাই হবে জাতির পক্ষে সমস্ত পরিহিতির চূড়ান্ত পরিগাম। বর্তমানে জাতির মূল্যায়নের পরীক্ষার সময় চলেছে। যে জাতি এ পরীক্ষায় পাশ করতে অক্ষম, তাদের মৃত্যু অনিবার্য এবং তাদের জায়গা তাদের চেয়ে অধিকতর বলবান এবং স্বাস্থ্য সম্পন্ন জাতি দখল করবে; যারা আরো বেশি দৃঢ় কষ্ট সহ্য করে নিতে সক্ষম। যেহেতু বিশেষ করে এ সমস্যা ভাবীকালের, সেইহেতু যে কোন পিতা মাতার পাপ তার বৎশের দশম পুরুষেও গিয়ে পর্যন্ত বর্তীয়। রক্ত এবং জাতির পবিত্রতা লজ্জন করার ফলাফল এ চরম দুর্দশা।

এ রক্ত এবং জাতির বিরুদ্ধে পাপ হল এ পৃথিবীতে বংশানুক্রমে এবং যে জাতি এ পাপে পাপী তার ধৰ্ম অনিবার্য।

যুদ্ধ পূর্ব — জার্মানিতে এ প্রধানতম সমস্যাটার প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছিল তা' রীতিমত লজ্জাজনক। আমাদের যুবকদের একটা বিরাট অংশ যাদের বড় বড় শহরে বাস, তাদের ভেতরে এ জীবন্ত অন্যপ্রবেশ বন্ধ করার কি কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল? অথবা, আমাদের যৌনজীবনকে কল্পনিত এবং ধৰ্মস করার বিরুদ্ধেই বা কি করা হয়েছিল?

অথবা, আমাদের সমর্থ জাতীয় জীবনে এবং সিফিলিস রোগ ছাড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধেই বা কতটুকু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল? এর সবচেয়ে ভাল উত্তর হল কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল?

এলোমেলো পথে এ সমস্যার মোকাবিলা করার চেয়ে শাসকবর্গের চিন্তা করা উচিত ছিল যে এ সমাধানের ওপরেই ভবিষ্যত বংশবালীর কল্যাণ নিহিত। তবে এটা ও স্থীকার করে নেওয়া উচিত যে এ সমস্যার মোকাবিলা একমাত্র নির্মম পথেই করা চলে। প্রাথমিক কাজ হল সমস্ত জাতির একত্রাতা এ বিপদের দিকে নিবন্ধ করা উচিত; যাতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলক্ষ্মি করতে পারে। ব্যক্তিগত কোন চরিত্রের ওপর বাঁধা নিষেধ আরোপ করাটাও অনর্থক, বা তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরো ব্যাপারটাকে জনসাধারণ মেনে নিছে। সর্বব্যাপী এবং শৃঙ্খলাবন্ধভাবে এ সমস্যার এমন মোকাবিলা করতে হবে যাতে সমস্ত গণমানসের নজর এদিকেই পড়ে। এবং অন্যান্য দৈনিক সমস্যাগুলোকে কিছু সময়ের জন্য সরিয়ে পিছু হাটিয়ে দেয়।

প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে দেখা যাবে যে গণমত তৈরির ব্যাপারে সমস্যাটা যথেষ্ট পরিমাণে জটিল, সেখানে উচিত একটা সমস্যার প্রতি মনোনিবেশ করা; সে মনোযোগ এমন হওয়া উচিত যে যাতে এটা জীবন মরণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। একমাত্র এ পথেই গণমানসকে এমন একটা উঁচু ধাপে জাগরিত করা সম্ভব যে জনতার অদম্য ইচ্ছার সঙ্গে হেচ্ছাপ্রণোদিত প্রচেষ্টা মিলিত হয়ে ফলাফল যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি ঘটাবে।

ব্যক্তিগত জীবনেও এ সত্য কার্যকরী, অবশ্য যদি সে জীবনে মহান কিছু অর্জন করতে সচেত হয়। সে তার অংশগতির নির্দিষ্ট একটা ধাপে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে এবং সেই ধাপে পার হওয়ার পরেই একমাত্র পরের ধাপে আরোহণের চেষ্টা করবে। যারা তাদের উদ্যম ধাপে ধাপে ওঠার চেষ্টায় ব্যয়িত করে না, এবং সমস্ত শক্তি প্রতিটি ধাপ অতিক্রমের নিমিত্ত ব্যয়িত হয় না তাদের পক্ষে শেষ এবং কাম্য বস্তু অর্জন করা সম্ভব নয়।

সুতরাং ওপরের বক্তব্য অনুসারে দেখা যাচ্ছে মানবজীবনের রাস্তাটা অতিক্রম করতে হলে জনতাকে বোঝানো উচিত যে তাদের সংগ্রামের পরবর্তী বস্তু হল মাত্র একটাই; এবং তার ওপরেই পরের ধাপে সমস্ত কিছু নির্ভরশীল। জনতার পক্ষে তাদের সামনের বিস্তীর্ণ রাস্তাটা নজরে আনা কিছুতেই সম্ভব নয়। যাতে তারা সেই বিস্তীর্ণ রাস্তা অতিক্রম করতে শিয়ে ক্লান্ত এবং অবসন্ন না হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের লক্ষ বস্তু মনে রাখতে সক্ষম; কিন্তু ছোট ছোট ধাপ ছাড়া পুরো রাস্তা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়; যেমন পথিক জানে তার পথের শেষ কোথায়! কিন্তু অনাদি পথ তো চিন্তার জগতের বাইরে। একমাত্র এভাবে আমরা তার লক্ষ্য বস্তুতে পৌঁছানো পর্যন্ত সেটার উদ্যম বজায় রাখতে পারি।

এ পথে সমস্ত প্রচারকার্যকে কেন্দ্রীভূত করেই যৌনরোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাটাকে আমরা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারি। এবং এটাকে এমনভাবে করতে হবে যে জাতির জন্য এটা একটা কাজ বলে নয়; জাতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ, বর্তমানে এ মনোভাব জনতার মধ্যে তৈরি করে। গণমানসের কাছে এ সত্যটাকে স্পষ্টরূপে তুলে ধরার জন্য সমস্ত রকমের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন, যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্ত জাতি চিন্তা করে যে এ সমস্যার সমাধানের ওপরেই সমগ্র জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে; এককথায় বলা যেতে পারে উজ্জ্বল ভবিষ্যত অথবা জাতির অবলুপ্তি।

একমাত্র এ প্রাথমিক আয়োজনের পর—প্রয়োজনে এ সময়ের ব্যাপ্তি কয়েকমাসও হতে পারে, গণমানস এবং সংকলকে পরিপূর্ণরূপে জাগরিত করা সম্ভব। একমাত্র তখনই গভীর এবং নির্দিষ্ট একটা পথ্য নেওয়া যাবে, কারণ তখন তো গণমানস সমস্যার মুখোয়ায় হওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে তৈরি; তাই জনসাধারণের ইচ্ছাশক্তির ঘাটতি তাতে থাকবে না। স্পষ্ট মনে রাখা উচিত এসব আবর্জনা বৌঠিয়ে সরানোর জন্য প্রয়োজন প্রচুর আত্মত্যাগ এবং প্রচও রকমের পরিশ্রমের। যৌনরোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অর্থ হল বেশ্যাবৃত্তি, ভুয়া সংক্ষার, মিথ্যা জনমত ইত্যাদির বিরুদ্ধে একটা নির্দিষ্ট গভীর ভেতরে সংগ্রাম বিশেষ।

রাষ্ট্রের এ সংঘাতে নামার আগে প্রথমেই দেখে নিতে হবে যুবক সম্প্রদায় যেন ছোট বয়সে বিয়ে-সাদীর সুযোগ পায়; বেশি বয়সের বিয়ের আমরা যত যুক্তিই দেখাই না কেন, মানবজাতির কাছে ব্যাপারটা লজ্জাকর।

বেশ্যাবৃত্তি মনুষ্যত্বের পক্ষে কলকবিশেষ। এবং এ বৃত্তি দয়াদাক্ষিণ্য বা শিক্ষা দ্বারা দূর করাও সম্ভব নয়। এর সীমাবদ্ধতা এবং দূরীকরণ একমাত্র সম্ভব, যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে এ বৃত্তিকে মুক্ত করা যায়। তার জন্য প্রয়োজন যুবক যুবতীদের অল্প বয়সে বিবাহের সুযোগ দান। এটাই হল এ বৃত্তি দূরীকরণের প্রধান উপায়।

এসব কারণে মানুষ এত সহজে বিপথগামী হয় যে ইদানীং যে কোন মাকে বলতে শোনা যাবে যে তার মেয়ের জন্য সে ভাল ছেলে খুঁজে পাচ্ছে না। আর সে কারণে বেশ্যাদের প্রতি আসক্ত কোন ছেলেকেই বাধ্য হয়ে সে মেয়ে বিয়ে করে। এ সঙ্গী নির্বাচনের ফলে তাদের সন্তান-সভ্রান্তির ভবিষ্যত যা হওয়া উচিত, তাই হয়ে থাকে।

একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই যে কেউ উপলব্ধি করতে পারবে যে পুরো পদ্ধতিটাই সার্থক বংশাবলী উৎপাদনের বিরোধী। এবং প্রকৃতিতে জেনে শুনে তার অধিকার থেকে প্রতারণা করা হচ্ছে; তা হলে একটা প্রশ্নই থেকে যায় : বিবাহ বলে ব্যাপারটার অতিক্র এখনো রয়েছে কেন? এবং তার কাজটাই বা কী? এটাত তা হলে বেশ্যাবৃত্তির নামান্তর। আমাদের উত্তর পুরুষদের জন্য তবে কি আমাদের কোন মাথা ব্যাথাই নেই? অথবা লোকে বুঝতে পারছে না যে প্রকৃতি তার অভিশাপ ধীরে ধীরে তাদের ওপরে আরোপ করছে এবং ভবিষ্যত বংশাবলীকে তাদের এ নির্বান্ধিতার জন্য প্রকৃতির এক ভীষণ নিষ্ঠুর আইন কানুনের মুখোয়ায় হতে হবে; এভাবেই তথাকথিত সভ্য জাতিরা অধঃপতনে যায় এবং একসময় ধ্বংস হয়।

বিবাহেই বিবাহের সমাপ্তি নয়; এর আরো মহৎ উদ্দেশ্য আছে। যার প্রধান কাজ হল উৎকৃষ্ট মানবজাতি তৈরি করা এবং সেই মানকে ধরে রেখে বাড়িয়ে চলা। এটাই হল বিবাহের সত্যিকারের অর্থ এবং উদ্দেশ্য।

এ অর্থ এবং উদ্দেশ্যকে যদি মেনে নেওয়া হয়, তবু লক্ষ্যে পৌছবার জন্য যে পথের প্রয়োজন, তাকেও মেনে নিতে হবে। সূতরাঙ অল্প বয়সে বিবাহটাকে আইন করে দেওয়া উচিত। কারণ অল্পবয়সী যুবক-যুবতীদের মধ্যে এখনো সেই আদিম শক্তি বর্তমান যা নাকি সফল উত্তর পুরুষ উৎপাদনের ব্যাপারে গবের বস্তু এবং যে শক্তি বর্তমানেও অব্যাহত। অবশ্য বাল্যবিবাহ আইন করে করা সভ্য নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন, সেগুলো মেটানো সম্ভব হচ্ছে। এমন কি তার আগে ব্যাপারটা চিন্তা করাই উচিত নয়। অন্য ভাষায় বলতে গেলে এ সমস্যার সমাধান যদিও আপাতদৃষ্টিতে সমস্যাটাকে সহজ সরল সামাজিক পটভূমিকার মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া কখনই সম্ভব না। এবং এ সমস্যার

মোকাবিলা করার ব্যবস্থাটাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখে তবে প্রয়োগ করা উচিত। বিশেষ করে তথাকথিত গণতন্ত্র যখন বাড়ি-ঘরের সমস্যাটাকে এখনো সমাধান করতে পারেনি।

আমাদের অর্থহীনের মত বেতন ব্যবস্থাও বাল্য-বিবাহের বিরোধী, যার দ্বারা নাকি পরিবার প্রতিপালন একেবারেই অসম্ভব। অতঃপর দেখা যাচ্ছে বেশ্যাবৃত্তিকে যথার্থ উপায়ে মোকাবিলা করার জন্য মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের একান্ত প্রয়োজন এবং তারপরেই বাল্যবিবাহ চালু করা সহজ হয়ে দাঁড়াবে। এ সমস্যার সমাধানের এটা হল প্রাথমিক নিয়ম।

দ্বিতীয়ত, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এবং সন্তান প্রতিপালনের মূল প্রথাগুলোর অবিলম্বে মূলোৎপাটন করা-যে কারণগুলোয় কাউকেই সবিশেষ চিন্তিত দেখা যায় না। আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে ভারসাম্য আনার প্রয়োজন, বিশেষ করে মানসিক এবং দৈহিক ব্যাপারে।

আমাদের মাধ্যমিক স্কুল বলে যা আজ পরিচিত, তা হীক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এটা ভূলে গেছে যে একমাত্র সুগঠিত শরীরেই চিরত্বাবান মানুষ পাওয়া যেতে পারে। এ বজ্রব্য কিছুটা হেরফের করে সমগ্র জনতার পক্ষে উপযোগী করা যায়।

যুক্ত পূর্ব জার্মানিতে সময়টা এমন ছিল যখন কেউ সত্যের ওপরে কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে চাইত না। শরীরচর্চাকে প্রচও রকমের অবহেলা করা হত; জাতির উন্নতির পক্ষে মনের একদিককার অনুশীলনকেই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হত। এ ভূলের প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই দেখা দেয়। বলশেভিক শিক্ষা যে এসব রাজ্যগুলোতে বিস্তৃত লাভ করে, তা' কোন হঠাতে ঘটনার ফলশ্রুতি নয়। কারণ সেইসব প্রদেশের অধঃপতিত লোকগুলো উপবাসের মুখোযুক্তি এসে দাঁড়িয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ মধ্য জার্মানি, স্যাফিনি এবং রুড় উপত্যাকার কথা বলা চলে। এসব জেলাগুলোতে কোনরকম বাধা বলতে যা বোঝায় তা' এরা পায়নি। এমন কি ইহুদী-রূপ রোগ সংক্রমণের বিরুদ্ধে সমাজের বৃক্ষজীবী সম্প্রদায় থেকেও কোনরকম বাধা আসেনি। এর সহজ কারণ হল বৃক্ষজীবী সম্প্রদায় নিজেরাই শারীরিক দিক থেকে তখন অধঃপাতে গেছে; কষ্ট বা ক্রেশের দরুণ এ অধঃপতন নয়। নিষ্কাই শিক্ষাপদ্ধতির ফল। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকটা যা আমাদের সমাজের উচু শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত, বর্তমান যুগের জীবন সংগ্রামের জন্য তা সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী। সুতরাং তারা তাদের নিজেদের প্রতিপালনে অক্ষম। জীবনধারণের ক্ষেত্রেও তাদের সক্ষমতা কোথায়। প্রায় প্রতিটি কাপুরূষতার ক্ষেত্রে দৈহিক অপুষ্টি হল আসল কারণ।

অবিবেচনা ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে বৃক্ষজীবী শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। তার ফলাফল হল দৈহিক শিক্ষার অবনতি; যার পরিণতি হল অল্প বয়সের যৌন চিন্তায়। যেসব ছেলেদের খেলাধূলার মাধ্যমে শরীর গঠন হয়, তাদের যৌন প্রবণতা অন্যান্য ছেলেরা যারা শুধু ঘরে বসে মনের খোরাক জুগিয়ে চলেছে, তাদের চেয়ে অনেক কম। সত্যিকারের শিক্ষাপদ্ধতি জীবনের এ দিকটাকে অবহেলা করতে পারে না। এবং আমাদের স্বরণে রাখা উচিত যে স্বাস্থ্যবান পুরুষ এবং স্বাস্থ্যবতী মহিলা কোন দুর্বল আণীর জন্ম দেবে না। যারা জন্মের পরেই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এভাবে আমাদের শিক্ষার সমস্ত শাখাকে ছকে বাধতে হবে যাতে ছেলেরা তাদের অবসর সময়টাকে শরীর চর্চার কাজে লাগাতে পারে। সে বছরগুলো রাস্তায় রাস্তায় ঘূরে কাটিয়ে যেন তার শরীর গঠন করতে পারে। সিনেমা দেখে নষ্ট করার কোন অধিকার তার নেই। কিন্তু যখন তার দিনের কাজ সাঙ্গ হবে, সে যেন তার শরীর গঠন করতে পারে। কারণ প্রয়োজনের সময় যেন তার শরীর গঠনের ব্যাপারে ঘাটতি না পড়ে। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির এটাও একটা বড় দায়িত্ব, তবু জান বা বিজ্ঞান তার ভেতরে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া নয়। আমাদের কুলের শিক্ষা ব্যবহৃত এমন হওয়া উচিত যাতে প্রতিটি ছাত্রের মনে দৃঢ়ভাবে গৈথে যায় যে শরীর তৈরি করার দায়িত্ব তার নিজের ওপরে অর্পিত। উত্তর পুরুষের কাছে পাপ করে গণ্য হয় এমন কিছু বেচে নেওয়ার স্বাধীনতা তাদের নেই, কারণ তাহলে সেটা জাতির বিরুদ্ধেই কাজ করা হবে।

মনের অসুস্থুতার সঙ্গে সংঘাতের জন্য শরীর গঠনের বিশেষ প্রয়োজন। আজকের গণজীবন যেন যৌন উত্তেজনার বিরাট একটা ছায়ী। চলচ্চিত্র, মাটক এবং খেলাধূলা করার জায়গাগুলোর দিকে একনজর ফেললেই বোঝা যায় যে এগুলো আমাদের সঠিক পরিবেশ নয়। বিশেষ করে আমাদের যুবকদের পক্ষে। বিজ্ঞাপনপত্র এবং বিজ্ঞাপনের জন্য টাঙামো বিজ্ঞাপনগুলো জনতাকে অত্যন্ত ইতরভাবে আকর্ষণ করে। যে এখনো তার যৌবনানুরূপ প্রবল ইচ্ছা হারায়নি, তাদের স্পষ্ট বুঝতে এতক্ষুন্ন কষ্ট হবে না যে এগুলোর পরিণতি কি ভয়ানক। এ কাম যা নাকি খারাপ কাজে প্ররোচনাশুলক, যুবকদের মাথায় ঘোরে। তারা বুঝতেই পারে না ব্যাপারটা কি। দুর্ভাগ্যবশত এ শিক্ষাব্যবহার ফলাফল কি 'তা' আমাদের সমকালীন যুবকদের দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। যারা অকালে পরিণত হয়, তারা সহজেই জুড়িয়েও যায়। মাঝে মাঝে আমাদের চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সে ছেলেদের ওপর আইন তার আলো ফেলে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে এ বয়সের ছেলেরাও যৌন রোগগ্রস্ত। এটা কি দুঃখ এবং লজ্জাজনক নয় যে অসংখ্য দৈহিক দুর্বল এবং বুদ্ধির দিক থেকে নষ্ট যুবক ছেলেরা যারা বিয়ের নামে বড় শহরে গণিকাদের সঙ্গে বসবাস করছে।

যারা সত্যিকারের গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে সততার সঙ্গে সংঘাস্ম করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রথমেই যে কারণে গণিকাবৃত্তি প্রসারলাভ করেছে সেই কারণগুলোকে দূর করতে হবে। নির্ভর চিত্তে তাদের দূর্বিত নীতিগুলোকে সরাতে হবে যা নাকি আমাদের কালচারকে বিষাড় করে তুলেছে। এবং তার জন্য যে আর্তনাদই উঠুক না কেন, তাতে তয় পেলে চলবে না। আমরা যদি আমাদের যুব সমাজকে আজকের এ পক্ষিল পরিবেশ থেকে টেনে নিয়ে না আসি, তা হলে এ পক্ষিল পরিবেশ তাদের গ্রাস করে ফেলবে। যে সব লোক এসব দেখতে চায় না, তারা কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে এ পরিবেশকে বাঢ়াতেই সাহায্য করে চলেছে। এবং ভবিষ্যতের আভিনায় এ গণিকাবৃত্তি ছড়িয়ে পড়ার জন্যও তারা দায়ী। শুধু এ নয় যে তারা উত্তর-পুরুষদের কাছে এর জন্য কি জবাব দেবে! আমাদের কালচারের এ বিশুদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয়তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে। অভিনয়, শিল্পকলা, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে এ ছোপ লেগে রয়েছে, তার থেকে এ ছোপ মুছে ফেলে জাতির উদ্দেশ্যে 'তা' উৎসর্গ করতে হবে। জনসাধারণের জীবন তথাকথিত আধুনিক প্রেম সম্বর্কীয় ব্যাপার-স্যাপারগুলো থেকে মুক্ত করতে হবে; শুধু তাই নয় গৌরবত্যাহীন এবং অতি বিনয়ী ভাবধারাগুলো থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করা উচিত। এসব করতে গিয়ে আমাদের নজর

ରାଖା ଉଚିତ ଯେ ପଦ୍ଧତି ନେଓଯା ହବେ ତା ଯେଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାର ସଙ୍ଗେ ବିବେଚନା କରା ହୁଏ, ଯାତେ ଶରୀର ଏବଂ ମନକେ ଜାତିର ମନ୍ଦିରର ଜନ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରା ଯାଏ । ଏକଟା ଜାତିର ରକ୍ଷାର ବ୍ୟାପାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଧୀନତା ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାଯର ବିବେଚନା ।

ଏସବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଓଯାର ପରେଇ ଏକମାତ୍ର ଏ ଅଭିଶଳ୍ପ ଚାବୁକେର ବିରୁଦ୍ଧେ ଭେଷଜବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗେର ପ୍ରଚାର କରା ଉଚିତ ଏବଂ ତାତେ କିଛିଟା ହଲେଓ ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ କରା ସଭ୍ବ । କିନ୍ତୁ ଏଥାମେ ଆବାର ଦୋମନା ଭାବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥହିନ । ଦୂରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନିୟ ପଦ୍ଧତିକେ କଠୋରଭାବେ ମେନେ ଚଲାତେ ହୁବେ । ଦିଧିଗ୍ରହଣ ମନ ନିଯେ ଏଗୋଲେ ଅସୁହୁ ଏକ ଜନେର ବୀଜ ସୁତ୍ତ ଶରୀରେ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ ଦେଇ ଅସୁହୁତା କ୍ରମଗତ ବେଢ଼େଇ ଚଲାବେ । ଏଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ଦାଁଡ଼ାବେ ଏକ ଧରନେର ମନ୍ଦ୍ୟାତ୍ମକ ଯା ନାକି ଏକଜନକେ ବାଁଚାତେ ଗିଯେ ହାଜାର ଜନେର ଧ୍ରୁଣ୍ସ ଅନିବାର୍ୟ । ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଦେର ଧାରା ପଞ୍ଚ ବଂଶ ବାଡ଼ିଯେ ଚଲାର ଦାବିକେ ଉପେକ୍ଷା କରା ଯେ କୋନ ଜାତିର ପକ୍ଷେ ଖୁବଇ ଅସଭିବ ବ୍ୟାପାର, ଯାର ଡିତ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତ ମାଟିତେ ପ୍ରୋଥିତ । ହାଜାର ହାଜାର ମାନୁଷେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଅସୁଧୀ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକେ କାଟିଯେ ଓଠା ଏ ପଦ୍ଧତିକେ କାଜେ ଲାଗାଲେ ସଭ୍ବ ହୁବେ । ଏତେ ଜାତିର ହାତ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଦିର୍ଘ ପଦ୍ଧତିକେ କାଜ କରେ ଗେଲେ ତା ଯୌନ ରୋଧ ବିଭାବରେ ପଥେଓ ବାଁଧା ହୁଏ ଦାଁଡ଼ାବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମ୍ୟକ ବେଦନା ହାଜାର ହାଜାର ବହୁବ୍ରାତର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଥେକେ ଆମାଦେର ଦେଶେର ମାନୁଷକେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ।

ସିଫିଲିସ ଏବଂ ଏର ପଟ୍ଟଭୂମି ଗଣିକାବୃତ୍ତିର ବିରୁଦ୍ଧେ ସଂଘାମ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତିର ପକ୍ଷେ ବିରାଟ ଏକଟା କାଜ ।

କିନ୍ତୁ ଆଲମ୍ୟ ଏବଂ କାପୁରୁଷତାର ଜନ୍ୟ ଯଦି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାରାର ସଂଘାମେ ପ୍ରକୃତ ମାନୁଷ ନା ହୁଏ; ତବେ ଆମାଦେର କମ୍ଲନା କରେ ନିତେ ବୋଧକରି କଟ ହେବ ନା ଯେ ପାଂଚଶା ବହର ପରେ ଏର ଫଳାଫଳ କି ହୁଏ ଦାଁଡ଼ାବେ । ଈଶ୍ୱରର ଛାଯା ମାନୁଷେର ଚରିତ୍ରେ ଅତି କମ ପରିମାଣେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାକିବେ; ଏକମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ଉପହାସ କରା ଛାଡ଼ା ।

ତବେ ଜାର୍ମାନିତେ ଏ କଶାଘାତେର ପ୍ରତିଶୋଧକ ହିସେବେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଓଯା ହୁଯେଛେ ଯଦି ଆୟରା ଏର ଉତ୍ତରେର ଜନ୍ୟ ଶାନ୍ତଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି, ତା ଆମାଦେର ହତାଶାଇ କରିବେ । ଏଟା ସତି ଯେ ସରକାର ଯଦି ଏ ରୋଗେର ଭୟାନକ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ କ୍ଷତିଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଅବହିତ ଛିଲ । ତବେ ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସର୍ବକେ ଯେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଓଯା ହୁଯେଛିଲ, ତା ଶତ୍ରୁ ନିରଥକଇ ନନ୍ଦ, ଅନର୍ଥକାରୀଓ ବଟେ । ତାରା ରୋଗେର କାରଣ୍ଟା ସମ୍ପର୍କେ ଉଦ୍‌ଦୀନ ଥେକେ ନିରାମଯେର ଲକ୍ଷଣଗୁଲୋ ବେଛେ ନିଯେ ସେ ରୋଗ ସାମ୍ୟକ ଚାପା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରତ । ବେଶ୍ୟାଦେର ଡାକ୍ତାରୀ ପରୀକ୍ଷା କରା ହତ ଏବଂ ଯତ୍ତା ସଭ୍ବ ଆୟତ୍ତେ ରାଖାର ଚଢ୍ଟା ହତ; ତରୁ ରୋଗେର ଲକ୍ଷଣଗୁଲୋ ଯଥନ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଫୁଟେ ବେର ହତ, ତଥନ ତାଦେର ପାଠାନେ ହତ ହାସପାତାଲେ । ଚିଂକାର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଜୁଡ଼େ ଦିଲେ ମନ୍ୟତ୍ରେର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଦେର ଆବାର ଛେଦେ ଦେଓଯା ହତ ।

ଏଟାଓ ସତି ଯେ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଯା ପାଶ କରା ହୁଯେଛିଲ ତାତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁତ୍ତ ନା ହୁଏ ଯୌନ ସହବାସ କାରାଟା ରୀତିମତ ଶାନ୍ତିମୂଳକ । ଅର୍ଥା ଯାରା ଯୌନ କୋନ ରୋଗେ ଭୁଗଛେ ତାଦେରେ ଶାତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହତେ ହୁବେ ଯଦି ସହବାସ କରେ । ତଥ୍ରେ ଦିକ ଥେକେ ଠିକଇ ଛିଲ; କିନ୍ତୁ ବାନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟର୍ଥତାଯ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୁଏ । ବେଶିର ଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରେ ମେଯେରା ପୁରୁଷଦେର ବିରୁଦ୍ଧେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଜନ୍ୟ ଆଦାଲତେ ଉପାସିତ ହତ ନା— ଯାରା ତାଦେର ହାତ୍ୟା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ହରଣ କରେଛେ । କାରଣ ଏସବ କ୍ଷେତ୍ରେ ପୁରୁଷଦେର ଥେକେ ମେଯେଦେର ବେଳାୟ ଅନେକ ବେଶ ଅଣିଷ୍ଟ ମତ୍ତବ୍ୟେର ଆଶଙ୍କା । ଏବଂ ଯାରୋର ପକ୍ଷେ ସହଜେଇ ଏଟା ଅନୁମେୟ ତାଦେର ଅବସ୍ଥା କି ହୁଏ ଦାଁଡ଼ାବେ ଯଦି ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏ

ରୋଗ ସ୍ଵାମୀଦେର ଦାରା ଛାଡ଼ିଯେ ଥାକେ । ମେଯେରା କି ଏ କ୍ଷେତ୍ରେ ତାଦେର ନାଲିଶ ନିଯେ ଏଗିଯେ ଆସବେ? ଅଥବା ତାରା କି କରବେ?

ଛେଳେଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ବ୍ୟାପାରଟାଟେ ଆରେକଟା ସତ୍ୟ ନିହିତ, ବିଶେଷ କରେ ତାରା ସବୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟେର ନେଶ୍ୟ ଥାକେ ତଥବ ତାଦେର ଅଜ୍ଞାତସାରେଇ ଏ ବିପଦେର ଦିକେ ଛୁଟେ ଚଲେ । ତାର ଅବସ୍ଥାଇ ତାକେ ପ୍ରଗମେର ସତିକାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରତେ ଦେଇ ନା । ପ୍ରତିଟି ରୋଗ-ଗ୍ରହ ଗଣିକା ପୂରୁଷେର ଏ ଅବସ୍ଥାୟ ସୁଯୋଗେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ଷା କରେ । ଏର ଫଳାଫଳ ହଳ ଏ ଯେ ହତଭାଗ୍ୟ ପୂରୁଷ ପରେ ତାର ଏ ଅବସ୍ଥାର ସତିକାରେ ହିତକାରୀ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଯେ କେ ତା' ଆର ଶରଣେ ଆନନ୍ଦେ ପାରେ ନା । ଏଟା ବାଲିନ ବା ମିଉନିକେର ମତ ବ୍ୟାପାର-ଶହରେ କୋନ ଆଶ୍ରଯଜନକ ସଟନାଇ ନାୟ । ବେଶିରଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରେଇ ଗ୍ରୀକେର ଥେକେ ଶହରେ ଆସା ଲୋକ ବ୍ୟାପାର-ସ୍ୟାପାର ଦେଖେ ଏତ ନିର୍ବିକ ଓ ବଶିଭୂତ ହେୟ ପଡ଼େ ଯେ ଗଣିକାରୀ ସହଜେଇ ତାଦେର ଲୁଟ୍ଟନ କରେ ।

ସବଶେଷେ ବିଶ୍ଵେଷଣ କରଲେ ଦେଖା ଯାବେ (କେ ବଲତେ ପାରେ ଯେ) ରୋଗେର ସଂକ୍ରମଣ ତାର ମଧ୍ୟେ ହେୟଛେ କିନା? ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଦେଖା ଗେଛେ ଓପର ଓପର ଦେଖିତେ ନିରୋଗ ଲୋକେରେ ଓ ପରେ ରୋଗଟା ଆବାର ଉଦୟ ହେୟଛେ ଏବଂ ତାର ଅଜ୍ଞାତେଇ ତାକେ କୁଡ଼େ କୁଡ଼େ ଥେଯେ ଚଲେଛେ ।

ସ୍ତୁରାଂ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରେ ଏ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନେର ଫଳାଫଳ ନେହାତ-ଇ ନେତିବାଚକ । ଗଣିକାବୃତ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରେ ବ୍ୟାପାରଟା ଏକଇ । ଶୈସମେଷ ଟିକିଂସା ଓ ନିରାମଯେର ବ୍ୟାପାରେ ଓ ବ୍ୟାପାରଟା ଖୁବ ନିର୍ଭର୍ୟୋଗ୍ୟ ଓ ସନ୍ଦେହାତୀତ ନାୟ । ଖାଲି ଏକଟା ଜିନିସ ଦିନେର ଆଲୋର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ; ତା; ହଳ ଏ କଶାଭାତ ଦିନେର ପର ଦିନ ବେଡେଇ ଚଲେଛେ । ଯେ ବସ୍ତୁଶ୍ଵାଇ ନେଓଯା ହେୟ ଥାକ ନା କେବ, ଏ ବ୍ୟାପାରଟା ତାଦେରଇ ଅପଦାର୍ଥତା ପ୍ରମାଣ କରାର ପକ୍ଷେ ଯଥେଷ୍ଟ ।

ବାକି ବ୍ୟାପାରଗୁଲୋଓ ଏକିଇ ବ୍ୟାପାରେର ମତ ନିର୍ବିର୍ତ୍ତ । ମାନୁଷେର ଗଣିକାବୃତ୍ତି କମା ଦୂରେ ଥାକ, କୋନ କିଛିଇ ଫଳାଭ ହ୍ୟାନି ।

ଯାରା ଏ ବ୍ୟାପାରେର ସଙ୍ଗେ ଏକମତ ନାୟ, ତାଦେର କାହେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ତାରା ଯେନ ଏ ରୋଗେର ସଂଖ୍ୟାତବ୍ରେର ଦିକଟା ଦେଖେ, ଗତ ଶତାବ୍ଦୀତେ ଏବ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମକାଲୀନ ଅବସ୍ଥାୟ ଏର ବୃଦ୍ଧିର ସଂଭାବନା କି ରକମ । ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷନ—ଯଦି ସେ ଏକେବାରେ ନିର୍ବୋଧ ନା ହୁଁ, ତବେ ପୁରୋ ବ୍ୟାପାରଟା ତାର କାହେ ପରିଷାର କରେ ତୁଲେ ଧରଲେ ଭୟେ ତାର ବୁକ କେଂପେ ଉଠିବେ ।

ଏ ଦୋମନା ଓ ଭୀତୁ ମନୋଭାବେର ଦରକଣ ପ୍ରାକ୍ ଯୁଦ୍ଧେର ଜାର୍ମାନି ଦୁଟୁ ଲୋକେ ଭରେ ଗିଯେଛିଲ । ସନ୍ଦେହାତୀତଭାବେ ଏଟା ଜାତିର କ୍ଷମ୍ୟେର ଲକ୍ଷଣ । ଯଥନ ମାନୁଷ ତାର ନିଜେର ସାହ୍ୱରକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ସଂଘାମେର ସାହସ ହାରିଯେ ଫେଲେ, ତଥନ ତୋ ତାର ଏ ପୃଥିବୀତେ ଟିକେ ଥାକାର ସଂଗ୍ରାମ କରାର ଅଧିକାରଇ ସେ ହାରାୟ ।

ପୁରନୋ ଜାର୍ମାନିତେ ଏର ଏକଟା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ଷତିର ଅବକ୍ଷୟ । କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷତି ବଲତେ ଆଜକେର ତଥାକଥିତ ଶାସନ ଯା ନାକି ସଭ୍ୟତା ବଲେ ପରିଚିତ ତା' ବୋଝାଇଁ ନା । ବରଂ ଏଟା ଆଜ ଜୀବନେର ଉନ୍ନତି ବଲତେ ଯା ବୋଝାଯା ତାର ବିରୋଧୀ ହେୟ ଦାଁଢ଼ିଯେଛେ ।

ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ମୋଡ୍ ଫେରାର ସମୟ ପୃଥିବୀତେ ଏକଟା ନତୁନ ଜିନିସେର ଅଭ୍ୟାସ ହେୟଛେ; ଏ ବ୍ୟାପାରଟା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବିଦେଶୀ ଯା ନାକି ଆମାଦେର କାହେ ଆଗେ ଅଜ୍ଞାତ ଛିଲ । ଆଗେ ଭାଲ କୋନ ଜିନିସ ପ୍ରହଳାଦ କରାଟାକେ ଓ ଦୋଷଗୀଯ ବଲେ ମନେ କରା ହତ; କିନ୍ତୁ ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଶାସନେର ପର ଥେକେ ତା' ଅନେକ ଦୂରେ ସରେ ଗେଛେ । ହୁଁତ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରୁଷେରା ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଶୈଳୀକ ସୃଷ୍ଟିର ଦିକେ ଥେକେ ଐତିହାସିକ ମୂଲ୍ୟ ଖୁଜେ ବାର କରବେ । କିନ୍ତୁ ନତୁନ ବଂଶଧରେରା ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଶୈଳୀକ ସୃଷ୍ଟିର ଦିକେ

বিপথগামী তাই নয়, এর মধ্যে কারো কারো তো আদর্শ বলত কোন অনুপ্রেরণাই নেই। এটা হল সাংস্কৃতিক ধর্মসের বহিঃপ্রকাশ।

বলশেভিজম মতবাদের বিশ্বাসীদের প্রতিটি শিল্পকর্ম তাদের মতবাদে জারিত এবং পুরো সংস্কৃতিটাই তাদের এ জারক রসে ডোবানো।

যাদের এ বক্তব্যে সন্দেহ আছে তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ যেসব রাষ্ট্রৈ বলশেভিজম প্রচলিত, যদি সেইসব ভাগ্যবান রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে লোকগুলো দেহমনে ব্যাধির দ্বারা কী ভীষণভাবে আক্রান্ত, যা শুধু তাদের পাগল করে তোলেনি, অধঃপাতেও নিয়ে গেছে। এসব শৈল্পিক বিপথগামীতা যা নাকি কিউবিজিম, ডাড়জিম, প্রত্তি নামে থ্যাত, এ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে সেগুলোই হল এসব রাষ্ট্রের বহিঃপ্রকাশ। এমন কি ব্যাতেরিয়ার ক্ষণস্থায়ী সোভিয়েত গণতন্ত্রের সময়ের এ জিনিসগুলোর প্রকাশ ঘটেছিল। সেই সময় অনেকেরই হয়ত বা শরণে আসবে সরকারি প্রাচীরপত্র, বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র ইত্যাদিতে শুধু রাজনৈতিক অবক্ষয়ের চিহ্নও কত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল।

প্রায় বছর ধাটেক আগে আজকের মত রাজনৈতিক ধর্ম কল্পনাতেও আনা অসম্ভব ছিল। আজকে সাংস্কৃতিক জগতে অবক্ষয় যা নাকি কিউবিস্ট এর ভবিষ্যত ছবিগুলোতে উন্নবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত; মাট বছর আগে এ ধরনের প্রদর্শনী, যা তথাকথিত ডাঙেস্টিক সম্পূর্ণ অসম্ভব একটা আদর্শ বলে মনে করা হত। এ ধরনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপকদেরও জায়গা হত গিয়ে পাগলাগারদে। অথচ আজ তাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতির স্থান দেওয়া হচ্ছে। সেই সময়ে এ ধরনের মড়ককে বাড়তে দেওয়া হত না। জনসাধারণ ব্যাপারটাকে কখনোই মেনে নিত না, বা সম্বালীন সরকার চূপ করে থাকত না। কারণ এ ধরনের বৃদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পাগলদের পাগলামী থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা সরকারের কর্তব্য। কিন্তু সেই বৃদ্ধিজীবী পাগলদের পাগলামী এ ধরনের শিল্পকে মেনে নেওয়া কর্মেই বেড়ে চলেছে; মানবজাতির ইতিহাসে এটা একটা বিরাট পরিবর্তনের নিকৃষ্টতম উদাহরণ। কারণ এর মাধ্যমেই জনসাধারণের বৃদ্ধিবৃত্তির পঞ্চাদ্গমন শুরু হয়েছে, যার পরিণতি অচিন্ত্যনীয়।

আমরা যদি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের গত পঁচিশটা বছর অনুধাবন করি, তাহলে দেখতে পাব সাংস্কৃতিক জগতে কতখানি আমরা পেরিয়ে গেছি। সর্বত্তই দেখতে পাওয়া যাবে যে এ জীবাণু ছড়িয়ে। সেই সূতীকার বৃদ্ধি আজ হোক কাল হোক আমাদের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে ছাড়বে। এখানে সন্দেহাতীতভাবে দুর্নীতির স্তোত্র প্রবাহিত। এবং জাতির পক্ষে এটা মর্মান্তিক যে এ ব্যাধিকে আর থামিয়ে রাখা অসম্ভব।

জার্মান শিল্প এবং সংস্কৃতির প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এ রোগ প্রতীয়মান। এখানে সবকিছুই মনে হয় সর্বোচ্চ সীমারেখা অতিক্রম করে দ্রুতগতিতে অবক্ষয়ের দিকে সেই রেখা এগিয়ে চলেছে। শতাব্দীর প্রথমপাদেই নাটকের মান নিচে নামতে শুরু করে, এবং সংস্কৃতির জগতের পটভূমি থেকে দ্রুত সরে যেতে থাকে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল রাজপ্রাসাদের নাটকগুলো। যা বারবার সাংস্কৃতিক জগতের এ বেশ্যাবৃত্তির বিরোধিতা করে এসেছে। অবশ্য এর সঙ্গে ব্যতিক্রম হিসেবে আরো কয়েকটা মৃষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠানের নাম করা যেতে পারে। সেখানে এমন কিছু নাটকের অভিনয় হত যে লোকে তা না দেখেও তার থেকে উপকৃত হত।

এ অবক্ষয়ের একটা দুঃখজনক উদাহরণ হল অনেক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রবেশ দ্রবজায় লেখা থাকত : প্রাণব্যক্তিদের জন্য ।

মনে রাখা দরকার যে এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের শেওড়ের শিক্ষাবিভাগ। শুধু সর্বাধুনিক জ্ঞানসম্পদের আনন্দের খোরাক জোগান নয়, অন্যান্যাপের দিকপাল নাট্যকারী এ ব্যবস্থা সম্পর্কে কি বলত, সর্বোপরি যার জন্য এ ব্যবস্থা এখনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, কুপিত হতেন, গ্যেটেও বা বিরক্তিতে কত দূরে সরে যেত ।

আমাদের আধুনিক জার্মান সাহিত্যের নায়কদের সঙ্গে কি গ্যেটে বা সেক্সপীয়ারের তুলনা করা চলে? তারা হল প্রাচীন, ছাতাধরা, সেকেলে এবং সর্বোপরি নিঃশেষ। এটাই হল বর্তমান যুগের বিশেষত্ব যে শুধু এ যুগের ফসলই নিকৃষ্ট তা' নয়, যারা সেই ফসলের উৎপাদনকারী এবং সেই উৎপাদনের যারা সাহায্যকারী তারাও কম নিকৃষ্ট নয়; যা সত্যাই একদিন অতীতে সবদিক দিয়ে মহান ছিল। এ সব যুগের চারিত্বিক বৈশিষ্ট্যই হল এগুলো। তার চেয়েও অধিম এবং ক্লেশক্রিষ্ট হল মানুষ, যারা এসব যুগের ফসল। এরা যত বেশি আগেকার বংশাবলীর কৃতিত্ব অঙ্গীকার করবে, তত বেশি নিচে নামবে। এদের একমাত্র ইচ্ছে হল পুরনো পদচিহ্নের সমস্ত চিহ্ন পুরোপুরি মুছে ফেলা। এর কারণ আর কিছুই নয়, যাতে কারোর পক্ষে আর তুলনা করা সম্ভব না হয় যে পার্টির নামে তারা সত্যিকারের কি জিনিস নিয়ত পরিবেশনা করে চলেছে। এ কারণেই নতুন দিগন্তের নামে যে সকল এরা উৎপাদন করে চলেছে, তা' শুধু জগন্য নয়, শোচনীয়ও বটে। আর এদের প্রচেষ্টা যাতে পুরনো দিনের স্মৃতি সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব হয়। কিন্তু সত্যিকারের কোন পরিবর্তন যা মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর, তা সর্বদা অতীতের সঙ্গে তুলনার জন্য প্রস্তুত থাকে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পুরনো দিনের স্মৃতি বর্তমানের ফসলকে সাহাহে বরণ করে নিতে সাহায্য করে। কারণ সেক্ষেত্রে এমন কোন আশংকা থাকে না যে অতীতের তুলনায় বর্তমানের চিত্র বিবরণ এবং অর্থহীন দেখাবে। মানুষের সাংস্কৃতিক জগতের পরিপূর্ণতার সমুদ্রে পুরনো দিনের স্মৃতি সর্বদাই বরাবীয়। কারণ এ স্মৃতিই তো বর্তমান উৎপাদনের নিয়ামকসূচক। একমাত্র তারাই অতীত স্মৃতির কোন মূল্যায়ণ করে না, বরং যে কোন মূল্যে তা ধূংস করতে চায়, কারণ তাদের দেখার মত কিছু নেই।

আর উপরের বিষয়টি শুধু সাংস্কৃতিক জগতের পক্ষেই সত্য নয়, রাজনৈতিক জগতেও এ চিরসত্য। নতুন আন্দোলন যত বেশি নিষ্কলা, ততবেশি অতীত ঐতিহ্যের ধ্বংসের প্রতি তাদের অবহেলা দেখানোর প্রচেষ্টা। এখানে আবার তাদের সেই মনোভাবই সক্রিয়; অর্থাৎ যা পুরাতন কিন্তু সত্যিকারের তাদের উৎপাদিত ফসলের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট, তাদের বিবেচনায় নিকৃষ্ট। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যতদিন পর্যন্ত ফ্রেডারিক দ্যা গ্রেটের স্মৃতি থাকবে, ফ্রেডারিক অ্যালবার্ট ততদিন পর্যন্ত দ্বিধা মেশানো বাহবাই পেয়ে আসবে।

সূর্যের সঙ্গে চন্দ্রের যেমন তুলনা, সান সুসির নায়কের সঙ্গে ব্রেসেনের ভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক নেতার তেমনি তুলনা করা চলে। কারণ সূর্যের আলো আকাশের বুক থেকে মুছে যাওয়ার পরেই একমাত্র চন্দ্রের আলোর প্রকাশের সম্ভাবনা। এ কারণেই মানুষের চন্দ্রিমারা নির্দিষ্ট চিরায়ত গ্রহকে ঘৃণা করে এসেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ভাগ্য যদি সাময়িকভাবে এদের দেশের শাসন ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করে, তবে অতীতকে এরা শুধু কল্পিতই করে না,

কৌশলে এড়িয়েও যায়। এ সত্ত্বের একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল জার্মান গণতন্ত্রের সংরক্ষণ আইন যা নাকি জার্মান রাষ্ট্র রক্ষার নিমিত্ত করা হয়েছে।

এসব কারণে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে সন্দেহ পোষণ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে নতুন আদর্শ, মতবাদ বা দর্শন, যে কোন রকমের রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলন, যা নাকি অতীতে উৎপাদিত হয়েছে তা' বর্তমানের তুলনায় নিকৃষ্ট এবং মূল্যহীন। যে কোন পরিবর্তনের শুরু হয়ে থাকে, যা সত্যিকারের মানবজাতির অগ্রগতির পরিচায়ক, শেষ ধাপে যে পাথরটা গাঁথা হয়েছিল তার থেকে। অতীতের সেইসব প্রতিষ্ঠিত সত্ত্বকে কাজে লাগাবার জন্য লজিত হবার কিছুই নেই। কারণ মানুষের সংস্কৃতির উৎস এবং মানুষ স্বয়ং হল সেই দীর্ঘ উন্নতির সরলরেখার ফসল। যেখানে প্রতিটি বংশাবলী এ বিরাট সৌধ গড়ে তোলার জন্য একটার পর একটা পাথর সাজিয়ে গেছে। বিপ্লবের লক্ষ্য বা মূল উদ্দেশ্য বাড়িটাকে ভেঙে ফেলার নয়; যেসব জিনিস খাপ খাচ্ছে না, অথবা যোগ্য নয়, সেগুলোকে সরিয়ে তার জায়গায় নতুন করে ভিত্তি দিয়ে তারপর সৌধটার নির্মাণ কার্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

গুলোকেই একমাত্র মানবজাতির উন্নতি বলা চলে, নইলে পৃথিবীটাকে গোলমালের হাত থেকে কিছুতেই মুক্ত করা সম্ভব নয়; কারণ প্রতিটি বংশাবলী অতীতের কাজকে বাতিল করে দিতে চাইবে, এবং পুরোনোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্রংস করবে, আর এটাকেই এরা নতুন কাজ শুরু প্রাথমিক কর্ম বলে গণ্য করবে।

যুদ্ধের পূর্বে আমাদের সভ্যতার সবচেয়ে দুর্ব্যবহৃত দিক হল, এর নিজস্ব কোন সৃষ্টির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল না যার দ্বারা সাহিত্য বা সভ্যতার কিছু অগ্রগতি হতে পারে; কিন্তু অতীতের উচ্চদের কার্যাবলীর সৃষ্টি এরা মুছে ফেলতে, কল্পিত করতে এবং ঘূণা করতে আরম্ভ করে। ব্যাপারটা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ায় যে মনে হয় এ ক্ষয়িত যুগের মহৎ কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতাই নেই। অতীতকে বর্তমানের দৃষ্টি থেকে এমনভাবে গোপন করে রাখা হয় যে মনে হবে তবিষ্যতের দেবতারা পুরো শয়তানের দ্বারা পরিচালিত। এ কার্যকরণগুলো সবার কাছে পরিকার করে দেওয়া উচিত নতুন বলে নয়, এগুলো ভুল বলেই। কিন্তু যে পদ্ধতিতে মানবসভ্যতার ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে, সেটাই ঠিক নয়। এ খামখেয়ালি শিল্পেই বলশেভিক মতবাদের স্রোতটাকে বয়ে আনতে সাহায্য করে। যদি পেরিস্কিন যুগের সৃষ্টির উন্নয়ন বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়, তবে বলশেভিক তার কিউবিষ্ট বিকৃত মুখ্যত্বে করে হাসাহসি করবে।

এ প্রসঙ্গে একশ্রেণীর লোকের সাহসের অভাব; বিশেষ করে শিক্ষাদীক্ষা এবং পদদর্শনাদার দরুণ তাদের উচিত ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক এ চূড়ান্ত অবমাননার বিরুদ্ধে রূপে দাঁড়ানো। তাঁরা প্রতিরোধের থেকে সরে দাঁড়ায় কারণ তারা এটাকে অনিবার্য বলে মনে নিয়ে তার কাছে মাথা নত করেছিল। সুতরাং তাদের এ পদস্থলন প্রাপ্য, কিন্তু তাদের নিছক তয়ই তথাকথিত বলশেভিক শিল্পের দেবতাদের রাজ্য গঢ়গোলের সৃষ্টি করে। কারণ যারাই তাদের শিল্প সৃষ্টিকে মনে নিত না, সেই দেবতারা তাদেরই প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করত এবং তাদের ভাষায় এসব মনোবৃত্তি হল সংকীর্ণমনা এবং আবন্দ জলা। লোকে আরো ভয় পেত এ ভেবে যে এসব প্রতারক জোচ্চরণগুলো তাদের নামে বলে বেড়াবে যে তাদের শিল্পজ্ঞান বলতে কিছু নেই। এগুলো যেন এমন একটা ব্যাপার যা সত্যিকারের ভাবোচ্ছাস আর অধিঃপতনের বক্তৃ যা নাকি কতগুলো কুখ্যাত শ্টেলের সৃষ্টি, তা' না বুঝতে পারলে সমাজ তাদের ছোট চোখে

দেখবে। এসব সাংস্কৃতিক ভক্ত দলের একটা গুণ ছিল যে সহজ উপায়ে এ ভাবোচ্ছাসগুলোকেই অতি উৎকৃষ্ট ধরনের শিল্প বলে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে পারত। অতুলনীয় এবং চরম মাদকতাময় উপায়ে তাদের সমকালীন শিল্পকে তুলে ধরতো নিজস্ব অন্তরের অভিজ্ঞতা বলে। এ পথেই তারা তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাকে এড়িয়ে যেত অতি অল্প আয়াসে। বলাবাহল্য, এ অন্তরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কেউ-ই কোনরকম সন্দেহ প্রকাশ করত না। কিন্তু সন্দেহ করা উচিত ছিল যে পাগলের সৃষ্টির পেছনের তাগিদটা সত্যিকারের কি? মারটিজ্ড ভন সুইড অথবা বক্লিনের শিল্পই হল অন্তরের অভিজ্ঞতার সার্থক প্রকাশ; কিন্তু এগুলো হল ঈশ্বরের দান, কোন বিদ্যুক্তের কাজ নয়।

আমাদের বৃক্ষজীবীদের কাপুরুষতার এটা একটা চমৎকার উদাহরণ, যারা নাকি আমাদের মানুষগুলোর সহজাত প্রযুক্তিকে বিষয়ে দেওয়াটা কোনরকম প্রতিরোধ ছাড়াই সহজভাবে মেনে নিয়েছে সবরকম নেতৃত্বকে দায়িত্ববোধ কাঁধ থেকে ঘেড়ে ফেলে দিয়ে। এ অবিবেচক অর্থহীন ব্যাপারটাকে লোকের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ তারা যা ভালো বোঝে তাই করতে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি জনসাধারণের বিচার ক্ষমতা বলতে কিছুই নেই, কারণ শিল্প জিনিসটাকেও বুঝতে অক্ষম। তারা শিল্পের নামে যে কোন ব্যঙ্গ তামাসাকেও মেনে নিয়ে থাকে; অবশ্যই যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত তারা শিল্পের ভাল বা খারাপ বিচার বোধটাকে হারিয়ে ফেলে।

এসব বিচার বিবেচনা করলে দেখা যাবে অপর্যাপ্ত চিহ্ন সেই যুগে বর্তমান যার দ্বারা সহজেই বোঝা সম্ভব যে পচনাক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

আরেকটা বিপদজ্ঞনক চিহ্ন বিচার বিবেচনা করা উচিত। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের নগর এবং শহরগুলো তাদের সভ্যতা কেন্দ্রিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং মাত্র সাময়িক বসবাসকারীর চরিত্রিক রূপ নেয়। আমাদের বড় শহরগুলোতে যেসব শ্রমিকেরা বাস করত, তারা আদৌ সেই শহরগুলোকে মনেপ্রাণে তালবাসত না। এ অনুভূতির সৃষ্টি হওয়ার পেছনের কারণ হল জায়গাগুলোতে হঠাতে তারা বসবাস করার সুযোগ পায়, যে কারণে তাদের প্রতি কোন যায়া যমতা সেই বসবাসকারীদের প্রাণে ছিল না। অবশ্য এ অনুভূতির জন্য দায়ী হল সামাজিক কারণগুলো, যে কারণে তারা প্রায়ই বাসস্থান বদল করতে বাধ্য হত। যে নগরে তারা বাস করত তার প্রতি এ কারণে কোন যমতাই গড়ে ওঠার সুযোগ তারা পেত না। এর আরেকটা কারণ হল আমাদের সাংস্কৃতিক শূন্যাঙ্গতা এবং শহর জীবনের অন্তঃসামারণ্যতা। জার্মানির মুক্তি যুদ্ধের সময়ে আমাদের নগর ও শহরগুলো সংখ্যায় শুধু কম ছিল না, আকারেও ছিল খুবই সীমিত। কয়েকটা যাদের সত্যিকারের বড় শহর বলা চলত সেগুলো ছিল তৎকালীন রাজাদের আবাসস্থল, প্রাসাদ নগরী। সেই কারণে সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার একটা আলাদা মূল্য ও মর্যাদা ছিল। হাজার পঞ্চাশেক অধিবাসী অধ্যুষিত সেই শহরগুলো যা প্রায় তখনকার যে কোন বড় শহরের তুল্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির কোষাগারস্থলগুলি। তৎকালে যখন মিউনিকে হাজার ষাটেক বাসিন্দা বাস করত, তখনই মিউনিক জার্মান শিল্পের একটা প্রধানকেন্দ্র বলে বিবেচিত হত। বর্তমানে অবশ্য যে কোন শিল্পগুলোই তার চেয়ে বেশি লোক বসবাস করলেও তাদের নিয়ে কোন মূল্যবোধ নেই। এগুলো হল কতগুলো বস্তী ও গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ানো ব্যারাকের সমষ্টি, আর কিছুই নয়। সুতরাং এ অর্থহীন বাসস্থানগুলোর প্রতি যদি কারোর যমতা না গড়ে ওঠে, তবে কারোর

পক্ষেই বেড়ে ওঠা সম্ভব নয়। যার নিজস্ব চরিত্র বলতে কিছু নেই এবং যেখানে সাংস্কৃতির কোন ছায়া দৃঃশ্য কঠের প্রাচীর ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না।

এটাই সব নয়। বড় বড় শহরগুলোর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের শিল্পকর্মের সৃষ্টির ফলে হানটা মরহৃষি হয়ে দাঁড়ায়। এদের আবহাওয়ায় সেই শিল্প-ভারাক্রান্ত শহরগুলোর প্রতিচ্ছায়া স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। আমাদের বড় শহর গুলোতে সভ্যতার দান বলতে কিছুই নেই। শহরগুলো শুধু অতীতের গৌরব আর ঐশ্বর্যের জোরে বেঁচে আছে। আমরা যদি শহর মিউনিক থেকে দ্বিতীয় লুইডভিগের সমস্ত কিছু তুলে নেই, তবে দেখতে পাওয়া যাবে এ প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম ছাড়া শহর মিউনিক কত কৃশ হয়ে পড়েছে। বার্লিন বা অন্যান্য বড় বড় শহরগুলো সম্পর্কেও এ একই কথা প্রযোজ্য।

কিন্তু নিচের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা একান্ত প্রয়োজন : আমাদের বড় বড় শহরগুলোর এমন কোন সৃতি নেই যা নাকি শহরের সাধারণ বিষয়গুলোর ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এবং যা এ যুগের চিহ্নস্বরূপ উপস্থাপনা করা যায়। যদিও সুপ্রাচীন শহরগুলোর প্রত্যেকের গৌরবের সৃতিসৌধ ছিল। ব্যক্তিগত সৌধমালা কোন সুপ্রাচীন শহরের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী নয়। জনসাধারণের জন্য তৈরি সৃতিসৌধই চিরস্থায়ী শিল্পের নির্দর্শন, যার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী নয়। কারণ এগুলো সৃষ্টিমেয়ে ব্যক্তির সম্পদ প্রদর্শন করে না, এ সৃতিসৌধগুলো হল সমাজের গুরুত্ব এবং সংস্কৃতির চিহ্ন। এ সৃতিসৌধগুলো বসবাসকারীদের নিজেদের শহরের প্রতি অনুপ্রাপ্তি করবে, যা নাকি আজ আমাদের ধারণার অতীত। মাঝামাঝি গোছের ব্যক্তিগত মালিকানায় কতগুলো বাড়ি নাগরিকদের দৃষ্টি কাঢ়তে সক্ষম হয় না, কিন্তু সমাজের সবার জন্য গড়া সৃতিসৌধ প্রতিটি নাগরিকের মন ভরাতে পারে।

আমরা যদি সুপ্রাচীন গণসৌধগুলোর সঙ্গে সেই যুগের ব্যক্তিগত বাড়িগুলোর তুলনা করি, তাদের প্রয়োজনীয়তা বৃত্তে পারব যে এ কাজগুলোর ব্যাপারে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, যার প্রতিচ্ছবি সামাজিক জীবনেও গভীরভাবে পড়েছিল। এগুলো হল পরবর্তী যুগের অগ্রগামিতা।

শুধু বাণিজ্যিক প্রসাদগুলো নয়, মন্দির এবং সাধারণের জন্য নির্মিত অট্টালিকাগুলোও রাষ্ট্রের ছিল, যা সত্যি বিশ্বয়কর। সমাজই এ সব বিশাল অট্টালিকার মালিক ছিল। এমন কি রোমের গৌরবের অন্ত-সূর্যের দিনেও ব্যক্তিগত ভিলা বা প্রাসাদে শহরের বিখ্যাত জায়গাগুলো পরিকীর্ণ ছিল না; ছিল মন্দির, মানাগার বা হায়াম, পয়ঃপ্রেণালী এবং রাজপ্রাসাদ। এগুলো সবই ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি, সুতরাং এককথায় জনসাধারণের তার ওপর পূর্ণ অধিকার ছিল।

মধ্যযুগীয় জার্মানিতেও একই আদর্শকে মেনে ঢলা হত। যদিও শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ ছিল আলাদা। প্রাচীনকালে যে চিন্তাধারা এখেস শহরের দূর্গে অথবা প্যানথনে রূপ পেত, আজ তা রূপান্তরিত হয়েছে গথিক ক্যাথিড্রালে। মধ্যযুগীয় শহরগুলোর এ সৃতিসৌধগুলো ব্যক্তিগত মালিকানায় নির্মিত ছোট ছোট বাড়িগুলোর মাথা ছাড়িয়ে অনেক উচুতে চুঁড়ো আন্দোলিত করত। তাদের প্রাচীর, কাজ এবং ইট তৈরিও ছিল দ্রষ্টব্য। এবং এসব শহরে আজও তারাই প্রধান ভূমিকায় বিরাজ করছে, যদিও দিনে দিনে তারা ফ্ল্যাটবেন্টার জঙ্গলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। কারণ, তারাই স্থানীয় চরিত্র ও সৌন্দর্য লোকের সামনে উপস্থাপনা করে থাকে। গীর্জা, টাউন হল, আঞ্চলিক স্তুপ প্রভৃতিই হল চিন্তাধারার বাইরের প্রকাশ যার তুলনা একমাত্র প্রাচীনকালেই পাওয়া সম্ভব।

আজকের জনতার জন্য নির্মিত বাড়িগুলোর আকার এবং উপাদানের অবস্থা সত্যই শোচনীয়, বিশেষ করে ব্যক্তিগত আটালিকাগুলোর তুলনায়।

রোমের মত বার্লিনের ভাগ্যেও যদি একই রূপান্তর হয়, তবে ভবিষ্যত বংশবালী ইহুদীদের বহুতল দোকান, যৌথভাবে গড়া হোটেলগুলোকেই আমাদের সময়কার সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নেব। একমাত্র বার্লিনেই দেখা যাবে তুলনামূলকভাবে বাণিজ্যিক কারণে গড়া বাড়িগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তৈরি বাড়িগুলোর কী প্রচণ্ড তফাত।

জনতার জন্য তৈরি অধিকাংশ বাড়ি শুধু অপ্রতুলই নয়, হাস্যকরও বটে। এ সব বাড়িগুলো তৈরির সময়ে এদের স্থায়ীভূতের দিকে নজর দেওয়া হয়নি, সাময়িক প্রয়োজনে নির্মিত হয়েছিল এগুলো। কোন সৎ চিন্তা ভাবনাকেই বাড়িগুলো তৈরির সময়ে ঠাই দেওয়া হয়নি। বার্লিনের দুর্ঘ যখন গড়া হয়েছিল, তৎকালীন চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে আলাদা ছিল, যখন বার্লিন লাইব্রেরি তৈরি হয়েছিল সেই সময়ের সঙ্গে। একটা যুদ্ধ জাহাজ তৈরির ব্যাপারে যেখানে খরচ পড়ে যাট লক্ষ জার্মান মার্ক, সেখানে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তৈরি একটা বাড়ির জন্য তার অর্ধেকও খরচ করা হয় না। কিন্তু সত্যি বলতে কি, যার স্থায়ীভূত এবং অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ আরো অনেক ভালভাবে হওয়া প্রয়োজন। তবু ভেতরটা সাজনোর ব্যাপারে আপার হাউস পাথরের ব্যবহারের পরিবর্তে দেওয়ালগুলো শুধু চুনকাম করার পক্ষে রায় দেয়। অবশ্য একথা বলতে দিখা নেই, যে এ বিষয়ে সংসদের মতামতই সঠিক; কারণ চুনকাম করা মাথাগুলো পাথরের দেওয়ালের সৌন্দর্য বৃত্ততে সত্যই অক্ষম।

আমাদের সমকালীন শহরগুলোই এমন ধাঁচে গড়ে উঠেছে যে ‘তা’ সামাজিক চরিত্রের প্রকাশ কোনমতেই করে না। সুতরাং সমাজ যে স্থাপত্যকলার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে না, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। এভাবে বাস্তবিক আমরা এমন একটা জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হব, যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা বাসিন্দাদের সঙ্গে তার দেশের প্রচণ্ড রকমের গরমিল থেকে যাবে।

এসব হল আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের অবক্ষয় এবং সামাজিক অনুশাসনগুলো ভেঙে পড়ার চিহ্ন। আমাদের দিগন্ত সম্পূর্ণভাবে ছোট ছোট স্বার্থ দ্বারা ঢাকা। সত্যি কথা বলতে কি সেগুলোর কোন উদ্দেশ্যাই নেই, একমাত্র টাকা রোজগার করা ছাড়া। সুতরাং এসব ঠাকুরের ভজনা করতে গিয়ে আশ্চর্যের কি আছে যে আমাদের নায়কোচিত গুণগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে। অতীতে যে বীজ ব্যবহার করা হয়েছিল বর্তমানে আমরা শুধু তার ফসল কেটে চলেছি।

পূর্ববর্তী যেসব ঘটনাবলী দ্বিতীয় স্মার্টের রাজত্ব ভেঙে পড়ার জন্য দায়ী, সেইগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে নির্দিষ্ট এবং সার্বজনীন মতবাদের অভাবেই এ সম্ব্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর সামাজিক অবসাদ এবং অস্থিরতা তো ছিলই। বিশেষ করে এ অনিশ্চয়তা প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয় যখন একের পর এক জীবন জিজ্ঞাসাগুলোর ওরু হয়, এবং তার প্রতি চূড়ান্ত মনোভাব দেখা যায় এদের। এ খামতির আরো একটা কারণ হল সবকাজ অর্ধেকভাবে করা। শুরু হয় শিক্ষা পদ্ধতিতে, তারপর যে কোন দায়িত্ববোধের প্রতি অনীহা, কাপুরুষের মত শয়তানকে সহ্য করা; এমন কি শেষমেষ ধ্বংসকে পর্যন্ত নৌরবে মেনে নেওয়া।

কান্নাক মানবতাবাদ একটা স্টাইলে এসে দাঁড়ায়। এ বিপর্যামীতার প্রতি আত্মসমর্পণ ও ব্যক্তির প্রতি যুদ্ধ দেহি মনোভাবের কাছে আগামী ভবিষ্যতের লক্ষ লক্ষ মানবতাবোধ উৎসর্গ করা হয়েছে।

প্রাক যুদ্ধের ধর্মীয় অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে সাধারণভাবে বিভক্তিকরণ এ পরিবেশটাকেও বিষয়ে দিয়েছিল। জাতির একটা বিরাট অংশ জাতীয় পোশাক সম্পর্কে উদাসীন এবং সত্যিকারের আদর্শের প্রতি তাছিলের ভাব তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এ ব্যাপারে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় এটা নয় যে বহু সংখ্যক লোক, তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হল লোকদের উদাসীনতা। যখন খৃষ্টধর্মের দুই সম্প্রদায় এশিয়া আর আফ্রিকার বুকে তাদের ধর্মপ্রচার করে চলেছে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী শিষ্য জোগাড় করা, কিন্তু এ দুই সম্প্রদায়ই তখন ইউরোপে লক্ষ লক্ষ অনুগামীদের বিশ্বাস হারাচ্ছে। এসব শিষ্যরা তখন তাদের জীবনশক্তির উৎসবরূপ যে ধর্ম, তাকে পরিত্যাগ করে চলেছে, অথবা তারা নিজের অভিমত অনুসারে সেই ধর্মকে পরিবর্তন করে চলেছে। বিশেষ করে এর ফলাফল দেশের নৈতিক জীবনে সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছে। কারণ কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য না থাকায় খৃষ্টীয় বিশ্বাসের চেয়ে মুসলমান ধর্ম অনেক বেশি পরিমাণে এশিয়া আফ্রিকায় ব্যাপ্তি পেয়েছে।

এটা ও লক্ষ্য করার বিষয় যে তথ্য নির্ভর নয় বলে এসব মতবাদ খৃষ্টীয় ধর্মের প্রতি মানুষকে আকর্ষণ করার পরিবর্তে হিংসাকেই প্রশংস্য দিয়েছে। যদিও মানুষের এ পৃথিবী ধর্ম বিশ্বাস ছাড়া যে কী বস্তুতে পরিণত হতে পারে তা' আমাদের ধারণার অতীত। কোন জাতিরই বিরাট অংশ দার্শনিক নয়। জাতির বিরাট একটা অংশের বিশ্বাস জীবনের প্রতি ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। রকমারী ব্যবহৃত যা নাকি আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তে তুলে ধরা হয়েছে, তার কোন মূল্য নেই। কিন্তু যদি ধর্মীয় অনুশাসন এবং বিশ্বাস জাতির গরিষ্ঠ অংশ মেনে নেয়, তবে সে মতবাদের ভিত্তাপনা হয় শক্ত জমিতে। জীবন ধারণের প্রাত্যহিক নিয়মগুলোকে না মেনেও হয়ত কয়েক শো বা হাজার অতি মানব আছেন, যারা তাদের জীবনটাকে কাটিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু বাকি লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে তা' সম্ভবপর নয়। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা যে বাঁধাধরা খাতে বয়ে চলে, রাষ্ট্রের পথেও সেই একই খাতে প্রবাহিত। আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে, ধর্মীয় অনুশাসনগুলোও সেই কারণে প্রয়োজনীয়। সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় মতবাদ হল এমন একটা বস্তু, যার বিশেষ ব্যাখ্যার শেষ নেই। একমাত্র মতবাদের মধ্যে আবদ্ধ নেই সেই কারণে এটা সূক্ষ্ম এবং শক্ত একটা রূপ দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া কোনরকম বিশ্বাসই গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। নইলে ধর্মীয় মতবাদ কোনক্রমেই দার্শনিক মতবাদের উর্বর উঠতে সক্ষম হত না। বরং সোজাসুজি একটা দার্শনিক মতবাদে গিয়ে ঠেকত। সেই কারণে এ মতবাদের ওপর আক্রমণ করা আর বাষ্ট্রের কোন অনুশাসনের প্রতি আক্রমণ একই কথা। তাই এ ধরনের কোন আক্রমণ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ডেকে আনতে বাধ্য।

রাজনৈতিক নেতাদের ধর্মের মূল্যায়ণ কথনোই এর কোন খামতির দিক বিবেচনা করে করা উচিত নয়। তার বদলে তার চিন্তা করা উচিত এর পরিবর্তে অন্য কিছু যা সত্যিকারের ভাল তার পক্ষে জনমত গঠন করা সম্ভব কিনা যতক্ষণ না পর্যন্ত ভাল, এবং গ্রহণযোগ্য কোন ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায়, ততদিন পর্যন্ত একমাত্র বোকা এবং দাগী আগামীরাই প্রচলিত ধর্মের অবলুপ্তি চাইবে।

অবশ্য এটা নিঃসন্দেহে সত্য যারা এ প্রচলিত ধর্মের গতি ব্যাহত করেছে, জাগতিক কিছু প্রাণিগুলির জন্য তাদের ক্ষমা করাটা মোটেই উচিত হবে না। কারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সংঘর্ষ

তারাই ডেকে এনেছে। এ সংঘর্ষে বিজয়মাল্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের গলাতেই ঝুলবে। যদিও তা' হবে তিক্ত সংঘর্ষের পরে, যাতে ধর্মের ক্ষতি প্রচণ্ডই হবে। কারণ কাছেই ধর্মের উচ্চতা খর্ব হবে যাদের দৃষ্টি বিজ্ঞানের ওপরের তরঙ্গে ভেদ করতে অক্ষম।

কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ধর্মে খাদ মিশিয়ে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে সেটাকে ব্যবহার করে। বরং সোজাসুজিভাবে বলতে হয় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই ধর্মটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। নিলর্জ উঁচু গলায় চিংকার করা মিথ্যুক মানুষগুলো যারা খনখনে গলায় তাদের একরাশ মিথ্যা প্রচার করে চলেছে, যা কাপুরুষ উদ্দেশ্যবিহীন লোকগুলোই শোনে। এরা কিন্তু কোন কারণেই মৃত্যুর জন্য তৈরি নয়। বরং কি করে ভালভাবে বাঁচা যায়, তার ফল্দি-ফিকির খুঁজতেই তারা সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকে। রাজনৈতিক নাভের জন্য তারা তাদের যে কোন বিশ্বাসকে বিকিয়ে দিতে পারে। মাত্র দশটা সংসদীয় আদেশের জন্য মার্কসবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাতে এতটুকু ইত্তত করে না। যারা হল ধর্মের শক্তি, আর একটা মন্ত্রীত্বের জন্য তারা শয়তানের সঙ্গেও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত। যদিও সেই শয়তানের চক্ষুলজ্জা বলতে কোন বস্তু নেই।

প্রাক যুক্তের জার্মানিতে খৃষ্টধর্মের আশ্বাদন বহু লোকের কাছে বিশ্বাদ ঠেকে। তবে তার জন্য দায়ী রাজনৈতিক দলগুলো, যারা ক্যাথলিক বিশ্বাসকে লজ্জাক্ষরভাবে নিজেদের দলীয় স্বার্থে কাজে লাগিয়েছিল।

এ পরিবর্তিত ব্যবস্থাটাই ছিল মারাত্মক। এটা গোটা কয়েক মূল্যহীন সংসদীয় আদেশ পার্টির জন্য জোগাড় করতে সমর্থ হয়েছিল; কিন্তু তার জন্য চার্চের ক্ষতি হয়েছিল প্রচণ্ড রকমের।

এ ঘটনার ফলাফল জাতিকেই বহন করতে হয়েছিল। ধর্মীয় জীবনে অবসাদ নেমে এসেছিল, যার ফলে সমস্ত রকম বিশ্বাসের নৈতিকতার প্রচলিত আচার আচরণের ভীত নড়ে উঠেছিল-যা যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।

তবু এসব চিঢ় খাওয়া ফাটল ধরা সামাজিক সংগঠনগুলো হয়ত খুব একটা ক্ষতিকারক ছিল না, যদি তার ওপর দুঃখের বোৰা আর না চাপানো হত। কিন্তু জাতির কাঁধে এ ঝড় এমন এক সময় এসে উপস্থিত হয়েছিল যখন অন্তর্দেশীয় একতার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল জার্মান রাষ্ট্রের কাঠামোর কয়েকটি ব্যাতিক্রম যা নাকি আগামী ধর্মস্টাকে দেখিয়ে দিয়েছিল, যদি সময় মত সেগুলোকে গন্ধিকরণ করা না হয়। জার্মান নীতির অক্ষত বৈদেশিক এবং অন্তর্দেশীয় প্রায় সবার চোখে এবা পড়েছিল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল বাইরে থেকে ছেন্দোবন্ধ মনে হলেও এ ব্যাপারে বিসমার্কের মতামতটাই সত্য, যে রাজনীতি হল সাম্ভব্যতার শিল্প। কিন্তু পরের চ্যাপেলারদের থেকে বিসমার্কের চিন্তাধারা কিছুটা আলাদা ধরনের ছিল। আর এ পার্থক্য থাকার দরুণ বিসমার্কের পক্ষে এ তত্ত্বের নির্যাস তার রাজনীতিতে অভীষ্ট পূরণের জন্য সবরকম রাস্তা দেখা উচিত; অস্তত চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টার প্রয়াস থাকার দরকার। কিন্তু তারা পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণ এ কথার একটা অর্থই করেছিল যে রাজনীতিতে কোনরকম আদর্শ বা নাম্বের প্রয়োজন একেবারেই নেই। সবচেয়ে বড় কথা তৎকালীন জার্মান রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদর্শী নীতি ছিল না; কারণ হল পুরো ব্যাপারটাই নড়বড়ে ভিতরে ওপরে

দাঢ়ানো; বশেষ করে আন্তর্জাতিকতাদের। ওধু তাই নয়, এসব নেতাদের রাজনীতির বিবর্তন সম্পর্কে কোন ধ্যান-ধারণাই ছিল না, যেটা রাজনৈতিক নেতাদের অবশ্যই থাকা উচিত।

তৎকালীন অনেকেই যারা পুরো ব্যাপারটাকে হতাশার দৃষ্টিতে দেখত, তারা দোষারোপ করত যে আদর্শ এবং দিগন্দর্শনের অভাবেই জার্মান রাষ্ট্রের এ দুরবস্থা। তারা এজন্য দায়ী করত ভেতরের দুর্বলতা এবং আদর্শের অনুরূপতাকে। যদের দ্বারা সরকার পরিচালিত, তাদের ধ্যান-ধারণার চিত্তান্তায়ক হস্টন ট্যুয়ার্ট চেম্বারলিন, আজকের যারা প্রথ্যাত রাজনৈতিক নেতা তাদের থেকে আলাদা ছিল। আসলে এ লোকগুলো তাদের সময়কালের উন্নতির জন্য চিন্তা করতে অন্যের উপদেশ নিতেও তাদের অহংকারে বাজত। গুরোভাস্ আডফুসের মৃত্যুর পর সুইডিস্চ চ্যাম্পেলার অস্পেনষ্ট্যারিন কিছু সত্ত্বের সম্মান দিয়েছিল যা নাকি স্বরণাতীত কাল পর্যন্ত সত্য ছিল। সে বলেছিল এ পৃথিবীর শাসন একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই করা সম্ভব। সূতরাং আশা করা যায় সংস্মীয় সদস্যদের ভেতরে এর একটা অণু হলেও থাকা উচিত ছিল। কিন্তু জার্মানিতে গণতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার পরে এক যুক্তিপ্রিয়ত দেখা পাওয়া যায়নি। তার জন্যই তাদের গণতন্ত্রের রক্ষার আইন পাশ করতে হয়েছে, যার দ্বারা স্বাধীন কোন মতবাদ ব্যক্ত করাই নিষিদ্ধ। অস্পেনষ্ট্যারিনের পক্ষে এটা সৌভাগ্য বলতে হবে যে সে তৎকালে জীবন ধারণ করেছিল, এ গণতন্ত্রের কালে নয়।

ইতিমধ্যেই যুদ্ধের আগে এ প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত ছিল,-সংসদ, জার্মান রাষ্ট্রসভা কিন্তু রাষ্ট্রের পর্যায়ে সবচেয়ে দুর্বলতম স্থান বলে ইতিমধ্যেই পরিচিতি লাভ করেছিল।

সবচেয়ে নেংরা একটা কথা যা এখন শোনা যায় যে বিপ্লবের সময় থেকে জার্মান সংস্মীয় গণতন্ত্র আর কার্যকরী নয়। এ কথায় এ ধারণাই সবার হবে যে বিপ্লবের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। কিন্তু বাস্তবে সত্য হল দেশকে টেনে নিচে নামানো ছাড়া অন্য কাজ এ তথাকথিত সংস্মীয় প্রতিষ্ঠানের ছিল না। জার্মানির পতনের জন্য এ প্রতিষ্ঠানও কম দায়ী নয়।

এ বিশাল বিধ্বংসকারী শয়তানের দল যারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সংসদে ভিড় করেছিল, এরা হল এ সংসদের একটা টিপিক্যাল উদাহরণ, যদের কোন যুগেই দায়িত্ববোধ বলে কিছু থাকে না। যে শয়তানের কথা আমি বলছি, 'ত' অন্তর্দেশীয় শাসনভাব চিলেচালা এবং বৈদেশিক নীতিতেও দৃঢ়া ছিল না; এগুলোই হল রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রধান কারণ।

সংস্মীয় সমন্ত কাজই আর্দ্ধেক করা হয়েছে এবং সবচেয়ে আশ্঵র্যের ব্যাপার এ কাজ সম্পূর্ণ না করার নীতি সব ব্যাপারেই মেনে চলা হয়েছে।

মৈত্রীর ব্যাপারে জার্মান রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি একেবারেই নিকৃষ্টতম। তাদের ইচ্ছে ছিল শাস্তি স্থাপনের, কিন্তু সোজা গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে যুদ্ধে।

পোল্যান্ডের ব্যাপারেও এ বৈদেশিক নীতি মনপ্রাণ দিয়ে লাগানো হয়নি। যার ফলে না পেরেছে জার্মানি যুদ্ধে জিততে অথবা পোল্যান্ডকে টেনে নিজের স্বপক্ষে আনতে, বরং রাশিয়াকে শক্ত বানিয়ে ছেড়েছে।

অ্যালসেস-লোরাইনের প্রশ্নটাকে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু পুরোপুরি মন চেলে দেওয়া হয়নি। ফরাসী বহু মন্তক বিশিষ্ট জলচর সাপটার মাথা চূর্ণ করার

পরিবর্তে শুধু আন্তে একটু ছোঁয়া এবং অ্যালসেস-লোরাইনের তত্ত্ব অনুসারে অন্যান্য জার্মান প্রদেশের সঙ্গে সমান অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তারা এক নয় বা একের সঙ্গে আরেক জনের তুলনাও করা চলে না। যাহোক এছাড়া তাদের অন্য কোন গতিও ছিল না, কারণ দেশের মধ্যে তারাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসযাতক; বিশেষ করে মিট্টির ভিটারলে তো কেন্দ্রের মধ্যমণি।

তবু দেশ এ সব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারত, যদি না, তাদের সেই প্রতিরোধ করার শক্তিটাকে দোদুল্যমান নিয়তির দ্বারা হত্যা না করা হত। আর এটাই ছিল শেষ পথ। সম্মাটের অস্তিত্ব নির্ভর করে তার সৈন্যবলের ওপর।

তৎকালীন জার্মান বাণ্ট জাতির প্রতি যে অপরাধ করেছে তাকে নিচে নামিয়ে নিয়ে এসে তার জন্য সারাজীবন জাতির অভিশাপ তাদের প্রাপ্ত। এ সংসদীয় দলের সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল এদের রাজনৈতিক সমর্থক দ্বারা এরা জাতির আত্মরক্ষার সবচেয়ে বড় অন্তর্টাকে অপহরণ করে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। যার জন্য জাতির অস্তিত্ব, স্বাধীনতা সরিছিল বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আজ যদি কবর খোঁড়া হয়, তবে রক্তস্তুত সেইসব ফরিয়াদীরা বেরিয়ে পড়বে, হাজার হাজার জার্মান যুবকের ভবিষ্যতের জন্য দায়ী এ সব রাজনৈতিক ডাকাতগুলো অথবা স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে তাদের তৃল শিক্ষা আর কুশিক্ষাই দায়ী। এ লক্ষ লক্ষ লোকের নিধন বা অঙ্গ ছেদন করা হয়েছিল মাত্র কয়েকশ লোকের রাজনৈতিক কৌশলে ও জোর করে তাদের উপর রাজনৈতিক মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য।

মার্কসবাদী এবং গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রগুলো দ্বারা ইহুদীরা সারা পৃথিবীতে জার্মান সামরিক বাহিনী সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে। কিন্তু আমাদের জাতীয় বাহিনীর শিক্ষা ব্যবস্থা যে অপ্ততুল, তার কোন ব্যবস্থাই মার্কসবাদী বা গণতান্ত্রিক দলগুলো করেনি। এ ভয়াবহ অপরাধের জন্য যুক্তের সময়ে প্রত্যেকের ডাক পড়ে, কারণ এ লোকগুলোর ফেরিওয়ালা মনোবৃত্তির জন্য লক্ষ লক্ষ জার্মানকে তার জন্য অনেক নিরমানের অন্তর্শপ্ত এবং অর্ধেক সময়ে-ভিক্ষা নিয়ে অন্তর্শপ্তে সুসজ্ঞিত সামরিক শিক্ষায় পারদর্শী শক্তির মুখোযুক্তি হতে হয়। নির্দয় নিষ্ঠার রকমের বিবেক-বুদ্ধির অভাবও এ সংসদীয় বদমায়েসদের ক্ষম ছিল না। এবং এটা পরিকার যে সুশিক্ষিত সৈন্যের অভাবই এ যুক্তে পরাজয়ের অন্যতম কারণ। এবং মহাযুদ্ধের কালে এ সত্তাই অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশ পায়।

সুতরাং জার্মান জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষমতাটাই হারিয়ে ফেলে, কারণ আর কিছুই নয় সংঘের শাস্তিবাদী নীতি এবং জাতির আত্মরক্ষার নীতির শিক্ষার অভাব।

পদাতিক সৈন্যবাহিনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিক খুব কম পরিমাণেই সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং সেই নৌ-বাহিনীর অবস্থা ও ছিল তৈথেবচ। সুতরাং জাতির আত্মরক্ষার অন্তর্টাকে এভাবে তোতা করে দেওয়া হয়েছিল। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যে নৌ-বাহিনীর পদস্থ অফিসাররাও এর জন্য দায়ী। বৃত্তিশৈলের থেকে ছোট যুদ্ধ-জাহাজ জলে ভাসাবার মনোবৃত্তি দূরবৃত্তির পরিচয়ক নয়। এক সারি জাহাজ বলেই তা কখনো একক জাহাজের যুদ্ধ শক্তির সমতুল্য হতে পারে না। যুদ্ধ করার ক্ষমতাটাই যুদ্ধ করার সময়ে একমাত্র বিবেচ। সত্যি বলতে কি, আধুনিক সমর-বিজ্ঞান এত বেশি উচ্চস্তরে পৌছেছে যে একই মাপের যুদ্ধ-জাহাজের যুদ্ধ করার ক্ষমতা অন্য দেশের তৈরি সেই মাপের যুদ্ধ-জাহাজের থেকে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে; অন্য দেশের বড় যুদ্ধ জাহাজের তুলনায়।

সত্যি কথা বলতে, কি গতি এবং সমর-সজ্জার পরিবর্তে একমাত্র জার্মান নৌ-বহরের যুদ্ধে একটা অংশকেই প্রতিপালন করা যেতে পারে। এ নীতির সার্থকতা সম্পর্কে যেসব যুক্তি উপস্থাপনা করা হয়েছে তাতেই প্রমাণিত হয় যে শান্তির সময়ে নৌ-বাহিনীর অফিসারদের চিন্তাধারা কতখানি আসার ছিল। তারা ঘোষণা করেছিল জার্মান কামানগুলো বৃটিশ ৩০.৫ সেন্টিমিটার কামানের চেয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত করার ব্যাপারে অনেক বেশি কুশলী।

এবং এ যুক্তির জোরেই তারা ৩০.৫ সেন্টিমিটার কামান তৈরি করতে শুরু করে। কিন্তু ওদের উচিত ছিল সমর-সজ্জায় বৃটিশের সমকক্ষ না হয়ে যুদ্ধের অধিক পারদর্শিতা লাভের প্রচেষ্টা করা। যদি এটা সত্যি না হয় তবে বৃথাই তারা পদাতিক বাহিনীকে ৪২ সেন্টিমিটার মটারে সাজিয়েছিল। কারণ জার্মান ২১ সেন্টিমিটার মটারগুলো ফরাসী মটারের থেকে অনেক উন্নতমানের ছিল এবং দুর্গগুলোকে ৩০.৫ সেন্টিমিটার কামানের গোলা দ্বারাই অধিকার করা যেত। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর কর্তৃপক্ষের স্থানীয় ব্যক্তিগত এ বিষয়ে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারেনি। পদাতিক বাহিনীর অন্তর্সজ্জায় উন্নত না করার প্রচেষ্টা আর কিছু নয়, মিথ্যা দায়িত্বের ভয়। নৌ-বহর তো শান্তির সময় থেকেই আক্রমণ বিমুখ মনোবৃত্তি নিয়ে বসে ছিল, যার জন্য যুদ্ধের শুরুর থেকেই তারা আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু এ পথে তারা জয়ের পথ থেকেও সরে দাঁড়ায়, কারণ একমাত্র এগিয়ে যাবার নীতিতেই জয়লাভ করা সম্ভব।

নিম্নগতি সম্পন্ন এবং দুর্বল সমরসজ্জা বিশিষ্ট যে কোন যুদ্ধ-জাহাজ তার থেকে দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং সমরসজ্জায় সজ্জিত জাহাজের কাছে পঙ্কু এবং আঘাত থেকে বাধ্য, কারণ তাদের পক্ষে দুর্বল জাহাজে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরের থেকে আঘাত করা সম্ভব। এক বৃহৎ সংখ্যার কুজারকে এ অভিজ্ঞতার পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। নৌ-বহরের অফিসারদের ধারণা যে কত তুলে ভর্তি ছিল যুদ্ধের সময়ে তা' ভালভাবেই প্রমাণিত হয়। তারা বাধ্য হয়ে পুরনো জাহাজগুলোর সমর ব্যবস্থার বদলি করে এবং সুযোগ মত নতুন জাহাজের সমর ব্যবস্থাও উন্নত করতে বাধ্য হয়। যদি জার্মান নৌ-বহরের যুদ্ধ-জাহাজগুলো এবং কামানের শক্তি বৃটিশ বহরের যুদ্ধ-জাহাজের অনুরূপ হত-তবে কাগরেকের যুদ্ধে ইংরেজ নৌ-বহর জার্মান ৩৮ সেন্টিমিটার শেষে ধ্বংস হয়ে যেত, যদি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সঠিক নিশানায় আঘাত করতে পারত।

জাপান অবশ্য নৌ-যুদ্ধের নীতি অন্যরকমের নিয়েছিল। তারা প্রতিটি যুদ্ধ জাহাজ শক্তিশালী করেছিল যাতে বিরুদ্ধপক্ষের যুদ্ধ-জাহাজগুলো এককভাবে এদের শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারে। এবং এ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই পরে এগুলোকে আত্মরক্ষার কাজেও লাগানো সম্ভব হয়।

এটা সত্যই অদ্ভুত যে পুরনো জার্মানির দোস ক্রটিগুলোকেই জনসমক্ষে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যাতে তার অস্তর্নির্দিত ঐক্যে চিঢ় খায়। এমনকি অপ্রিয় সত্য বাক্যগুলো সরবে বারবার বিশাল জনতার কানে তুলে দেয়া হয়েছে; কিন্তু অন্যান্য বহু জিনিস চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছে বা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সেই খোলাখুলি বিতর্ক যখন জাতির উন্নতিকে টেনে আনার সংজ্ঞাবনায় রয়েছে। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ এ ব্যাপারে হয় কিছুই অবহিত ছিল না। বা সামান্যই খবর রাখত। একমাত্র ইহুদীরাই জানত প্রচারের সেই আর্ট যার দ্বারা স্বর্গকেও নরক বলে তুলে ধরা যায় অথবা তার উল্টোটা।

সবচেয়ে দুঃখজনক ক্রেশময় জীবনকেও স্বর্গীয় বলে মনে হত এদের প্রচারের ধরন-ধারণে। ইহুদীরা অভিনয়ও করত সেই ঢঙে। কিন্তু জার্মান, বিশেষ করে জার্মান সরকার এ বিষয়ে বিদ্যুত্ত্বাত্ত্ব সন্দেহ করত না। যুদ্ধের সময়ে এ অঙ্গতার জরিমানা যথেষ্ট পরিমাণেই দিতে হয়েছিল।

অসংখ্য দোষের মধ্যে যা আমি উল্লেখ করেছি, যুক্ত পূর্ব জার্মানির ভাগে বহু লাখনা ডেকে এনেছে, তার একটা ইতিবাচক দিকও ছিল। যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পুরো ব্যাপারটাকে বিচার করি তবে দেখতে পাব অন্য দেশ এবং জাতির মধ্যেও এ দোষ বর্তমান। আমাদের থেকে তা অনেক গভীরে। উপরন্তু আমাদের যত সুযোগ ছিল, অন্য কারোরই তা ছিল না।

জার্মানির ইতিবাচক দিকটার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল জার্মানির অর্থনৈতিক শক্তি বুনিয়াদ, যা অপর কোন ইউরোপীয় দেশের ছিল না। সেই কারণে অন্য দেশের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করা তার পক্ষে সহজ ছিল। যদিও স্বীকার করতে বাধা নেই যে এর মধ্যে খুঁতও কম ছিল না। তবু এ আধিপত্য বিপদ্জনকও বটে। এটাই ভবিষ্যত বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এমন কি আমরা যদিও জাতির স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার দিতে স্বীকারও না করি, তবু রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যাপারে এর ভূমিকা যে অত্যন্ত চমকপ্রদ তা অঙ্গীকার করার কোন উপায় নেই। এ বিষয়গুলোই তিনটে প্রতিষ্ঠানকে উপস্থাপন করত। যারা নিয়মিত পুনঃঅভ্যন্তরের ক্ষেত্রে শক্তি জোগাত;

প্রথমদিকে তো জার্মানির আধুনিকীকরণের ব্যাপারে রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করেছে। সুতরাং আমাদের সেইসব রাজাদেরও মনে নেওয়া উচিত তাদের কাজের গলতির জন্য আজকের গণজীবন এবং সন্তানদের জীবন দুঃখ জর্জরিত হয়ে পড়েছে। আমাদের যদি এসব ব্যাপারে সহনশীলতা না থাকে, তবে বর্তমান যুগের ছেলেরা হতাশ হয়ে পড়বে। সমকালীন কালের প্রতিনিধিদের চরিত্র, ব্যক্তিগত দক্ষতার কথা যদি বিচার করি তবে দেখতে পাব তাদের বৃদ্ধিমত্তা এবং নৈতিক চরিত্রের মানদণ্ড খুব একটা উঁচু ছিল না। আমরা যদি জার্মান বিপ্লবের ব্যক্তিগত মূল্যায়ণ করি, তবে দেখব ১৯১৮ সালের বিদ্রোহ সাধারণ জীবনের কোন উন্নতি সাধনই করেনি। এবং উত্তরকালের বংশধরেরা কী ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে পথ হাঁটবে যখন জার্মান সংবর্ক্ষণ আইনের দ্বারা তাদের মতামত চাপা দেয়া থাবে না।

আজকের রাজনৈতিক নায়কদের বৃদ্ধিমত্তা, নীতিজ্ঞান বিচার করে আগামী বৎসরেরা তাদের সম্পর্কে নিচু ধারণাই পোষণ করত।

এটা অঙ্গীকার করার উপায় নেই যে, বেশির ভাগ জনতার কাছে সেই রাজা বিদেশী বলেই পরিগণিত হত। এর কারণ আর কিছুই নয়, রাজাদের বৃদ্ধিমত্তা সব সময় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল না এবং আরো স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় চারিত্রিক দৃঢ়তা হয়তবা ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত বেশির ভাগ রাজাই তোষামোদপ্রিয় ছিল এবং এসব চাটুকারের দলই তাদের গোপন খবরাখবর দিত।

শতাব্দীর শেষে একজন যুবরাণীকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে সৈন্য পরিদর্শন করতে দেখে জনসাধারণের মধ্যে আর আগেকার মত চাপ্পল্য জাগত না। তৎকালীন উচ্চতলার বাসিন্দাদের এটাও জানা ছিল না যে এ ধরনের প্যারাড সাধারণ মানুষের ভেতরে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া জাগায়। যদি ধারণা থাকত তবে হয়ত বা এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত না। ভাবালুতাস্পন্দন মানবতাবাদ—যার সঙ্গে বেশিরভাগ সময়েই অত্তরের স্পর্শ থাকে না,— তৎকালে এ ওপর

তলার বাসিন্দাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা' জনসাধারণকে আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণই করত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে 'ক' রাজা যদি মুরগীর স্ফুরণ থেকে ভাল বলত, সবারই ভেতরে তার সেই ত্ণিটা ছড়িয়ে পড়ত; কিন্তু তা হত আজ থেকে অনেক আগে; আজ তা' আর নেই। বরং পুরো ব্যাপারটাই উল্টে হয়ে গেছে। যদি আমরা এটা ধরেও নেই যে রাজা মহারাজাদের এসব ব্যাপারে একেবারেই কোন ধ্যান-ধারণা ছিল না, তবু এটা স্বীকার করেত হবে যে তাদের বোঝা উচিত ছিল দিনকাল বদলে গেছে। এমনকি তাদের সবচেয়ে ভাল উদ্দেশ্যটাও হাস্যকর লাগত অথবা ক্ষেত্রের কারণ হয়ে দাঁড়াত।

সুবিদিত মিতব্যায়িতা যার মধ্যে সেই সব রাজাদের দিন কাটত, তাকে খুব তোরে ঘূম থেকে উঠে গভীর রাত পর্যন্ত একঘেয়ে কঠোর খাটতে হত,— বিশেষ করে সদা সর্বদা তার মুকুট হারানোর আশঙ্কায়। সব মিলিয়ে লোকদের পক্ষে পুরো ব্যাপারটাই অমঙ্গল সূচক ছিল। রাজারা কতখানি খায় বা পান করে, এ সব বিষয়ে কারোরই কোন আগ্রহ ছিল না; সে পরিপূর্ণ খেল কিনা বা প্রয়োজনের পরিমাপ মত ঘূমল কিনা, এসব বিষয়ে কারোরই কোন প্রকার মাথাব্যথা ছিল না। রাজা তার ব্যক্তিত্বের জোরে যখন তার পরিবারের সম্মান নিয়ে আসত এবং যে সম্মান দেশেরও বটে; দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে তার কর্তব্য করে যেত। তার সম্পর্কে যত সব গল্প কথা প্রচারিত হত, তা' তার লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য খুব কম পরিমাণেই করত, বরং ক্ষতি করত অনেক বেশি।

অবশ্য এসব ব্যাপারগুলো একরকম খেলা ছাড়া কিছু নয়। সবচেয়ে খারাপ ছিল সেই সময়কার বিশেষ একটা অনুভূতি যে ব্যক্তিগত সবার স্বার্থ রাজা নিপুণ হাতে দেখছে এবং জনসাধারণের বিরাট একটা অংশ এ চিন্তাতেই নিশ্চিত ছিল। সুতরাং তাদের নিজস্ব স্বার্থের ব্যাপারগুলো নিয়ে তারা মোটেই ভাবিত ছিল না। যতক্ষণ দেশে ভাল সরকার প্রতিষ্ঠিত, অন্ততপক্ষে সৎ চিন্তার দ্বারা সেই সরকার সুপরিচালিত, ততদিন পর্যন্ত তো কোনরকম প্রতিবাদ উঠতে পারে না। কিন্তু যখন পুরনো সরকারের বদলে নতুন সরকার দেশের শাসনভার তুলে নেয়, যার দক্ষতা মোটেই পূর্বের সরকারের মত নয়, তখনই দেশ বিপর্যয়ের মুখোয়াখি এসে দাঁড়ায়। শাস্তি, বাধ্যতা এবং নির্দয়তার শৈশবস্থা যা আগের সরকারের প্রতি কোন প্রতিবাদ তোলেনি, তা সমাজের পক্ষে রীতিমত বিপদজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় যা নাকি কল্পনাতেও আনা যায় না।

কিন্তু এসব এবং অন্যান্য দোষ ছাড়াও তাদের নিচয়ই কিছু গুণ ছিল যার প্রভাব ইতিবাচক।

প্রথমত রাজতন্ত্র জনসাধারণের ব্যাপারেও তাদের স্বার্থবক্ষায় স্থির প্রত্যয় সরকার, বিশেষ করে আন্দোলনকারী উচ্চাকাঞ্জী রাজনৈতিক নেতাদের থেকে এসব ব্যাপারে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল অনেক বেশি। উপরন্তু সুপ্রাচীন অভিযানগুলোও এ সব রাজতন্ত্রের মহিমা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করত। তার চেয়েও বড় কথা সৈন্যবাহিনী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দকে রাজনীতির উর্ধে সবসময় রাখা হত। দেশের সর্বোচ্চ শাসনভার রাজার ওপরেই ন্যস্ত থাকত। সত্যি কথা বলতে কি, সুবিদিত সাধুতা এবং জার্মান শাসনকার্যে অখণ্ডতা প্রধানত এ কারণেই বজায় ছিল। শেষমেষে রাজতন্ত্রের কারণে জার্মান জনসাধারণের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক প্রসার লাভ করে, তা' এর অনেক দোষক্রটি ঢাকতেই সাহায্য করেছিল।

আমাদের সময় পর্যন্ত জার্মান শহর সংস্কৃতি এবং শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল; যা নাকি চরম বন্ধুত্বাত্মিক হয়ে উঠেছে। জার্মান যুবরাজরা বারবার বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার উৎকর্ষতার জন্য উৎসাহ দিয়ে এসেছে। সমকালীন ঘৃণে এর কোন তুলনা নেই।

ধীরে ধীরে সামাজিক বিপর্যয়ের সময়ে এ সৈন্যদলই সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ করেছিল। জার্মান জনসাধারণের এর চেয়ে ভাল শিক্ষা আর জোটেনি বলেলাই হয়। এ কারণেই শক্রদের সব ঘৃণা আমাদের জাতীয় সংরক্ষণ ও স্বাধীনতা নামক মন্তব্যীরের বিরুদ্ধে বর্ষিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমাদের সবচেয়ে বড় সুশিক্ষা হল এদের বিদ্রূপ, ভয় এবং ঘৃণা; আন্তর্জাতিক মুনাফাখোরের দল যারা ভার্সালিসে জড়ো হয়েছিল জাতিকে লুণ্ঠন এবং প্রতারণা করার জন্য, তাদের সমস্ত শক্রতার লক্ষ্য ছিল প্রাচীন জার্মান বাহিনী যারা নাকি ফাটকার হাত থেকে জাতিকে এতদিন বুক দিয়ে রক্ষা করে এসেছে। যদি এ সৈন্যবাহিনী জাতীয় স্বার্থ এত নিপুণ হাতে না দেখত তবে ভার্সাইয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ অনেক আগেই তাদের স্বার্থ কার্যে পরিণত করত। একমাত্র একটা শব্দের দ্বারা এ সৈন্যবাহিনীর কাছে জার্মানদের কি ঝণ প্রকাশ করা হয়, তা' হল-সবকিছু!

যখন লোকদের ভেতরে এ গুণের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে, সবাই যে যার দায়িত্ব কাঁধ থেকে ছেড়ে ফেলে দিতে উৎসুক, তখন সামরিক বাহিনী তাদের কর্তব্য স্থির প্রতিষ্ঠিতাবে পারলন করে চলেছে। এবং একথা অঙ্গীকার করার উপায় নেই যে গণতন্ত্রের ঝড়ে আবহাওয়ায় তাদের এ দায়িত্ববোধ স্যন্ত্রে পালন করে চলেছে। সামরিক বাহিনী জনসাধারণকে সাহসী হতে শিক্ষা দিয়েছিল যখন ভীরতায় সমস্ত জনসাধারণ ভুগছে এবং তা' মহামারীরাপে দেখা দিয়েছে। তখন সমাজের মগলের জন্য কারোর ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগটাকে পাগলামী বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। তখনকার ঘৃণে যখন একমাত্র চালাক ব্যক্তিরাই নিজেদের স্বার্থক্ষণ্ঠা করত, তখন সামরিক বিভাগই ছিল একমাত্র বিভাগ, যা নাকি জাতির মুক্তির পথ বাতলে দিয়েছে যিথ্যা আদর্শের মায়ায় আকৃষ্ট করে আন্তর্জাতিক ভাত্তাবে নিশ্চেদের, চাইনিজ, ফ্রেঞ্চ বা ইংরেজদের সঙ্গে জার্মানদের শেখায়নি। তাদের শিক্ষা ছিল নিজেদের জাতিকে একতা ও দৃঢ়তার বক্ষনে বাঁধা।

সামরিক বাহিনী একতা শক্তিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে, তখনকার সময়ে যখন সন্দেহবাদ দোষে সামগ্রিকভাবে মানুষের চরিত্র দৃষ্ট এবং পশ্চিত-মূর্চ্ছের দল নকল ফ্যাসানের আদর্শে নিজেদের আবৃত করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যে কোনরকম আদেশ পালন করা কোন কিছু না করার চেয়ে অনেক ভাল। যদিও এটাকে ভাসা ভাসাভাবে স্থির প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী একটা আদর্শ বলে মনে হয়, তবু সামরিক বাহিনী যদি নিয়মিত জীবনে যৌবন না জুগিয়ে যেত তবে এ ভিত্তি আদর্শের কোন গ্রাণ নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যেত না। এ ব্যাপারে অনেক ভয়াবহ খামতির পরিচয় পাওয়া যায়, যা নাকি আমাদের বর্তমান সরকারের কার্যকলাপে প্রকট। তাদের ভেতরে নতুন কাজকর্মের দরুন কোনরকম উৎসাহের সাড়া বর্তমানে নেই, অবশ্য তা' যদি জার্মান জাতিকে প্রতারণার ব্যাপারে না হয়। এ ব্যাপারে অবশ্য তাদের সমস্ত দায়িত্ববোধ তারা খেড়ে ফেলে দেয় এবং দলিলপত্রে স্বাক্ষর দেয় এমন ভঙ্গিতে যেন সরকারি আমলামাত্র। তাদের চারিত্বিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে তাদের মতামত দেবার কোন ক্ষমতাই নেই, মতামত জোর করে তাদের ওপর চেপে বসানো হয়েছে।

সারাদেশ জুড়ে যখন চলছিল লোভ লালসা আর জড় রাজ্যের প্রাধান্য, তখন সামরিক কর্তৃপক্ষ সেনাবাহিনীর সদস্যদের এক আদর্শবাদে দীক্ষিত করে তোলে। সে আদর্শ হল দেশের প্রয়োজনে জীবন বিসর্জনের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে। এ সেনাবাহিনী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে। সেদিক দিয়ে এর একটা দোষ ছিল। দেশে সামরিক শোধনবাদের সুযোগ থাকতে দেয় না। একসময় যারা এ চিন্তা থেকে মুক্ত তারাই সে সুযোগ পেত। এটা দোষ, এজন্য যে এর দ্বারা দমনের নীতিটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কারণ এর ফলে যারা বেশি শিক্ষা লাভ করেছে তাদের সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সরিয়ে এনে সম্পূর্ণ পৃথক এক উন্নত স্তরে আবদ্ধ করে রাখা হত। এর উল্লেখটা হলেই বরং ভাল হত। যেহেতু আমাদের উচ্চ অভিজ্ঞাত শ্রেণীর লোকেরা জাতির জীবনে কি ঘটছে না ঘটছে সে সংস্কৃতে কিছুই জানত না এবং এভাবে তারা জনগণের জীবন থেকে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছিল। সেই হেতু সেনাবাহিনী যদি নিজেদের মধ্যে তেদজানের পরিচয় না দিত, যদি বৃক্ষজীবীদের বেশি সুযোগ সুবিধে না দিত, তাহলে তারা দেশের অনেক উপকার সাধন করতে পারত। এ বিষয়ে অবশ্যই তারা ভুল করেছিল। কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে এমন কি কোন প্রতিষ্ঠান আছে যার মধ্যে ভুল কৃটি নেই। কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনীর দোষক্রটিগুলো চোখেই পড়ত না। মানবজাতির দুর্বলতাজনিত সাধারণ দোষক্রটির তুলনায় তা' অনেক কম।

কিন্তু আমাদের সেনাদলের সবচেয়ে বড় প্রসংশার কাজ হল মানুষের সমষ্টিগত মূল্যায়নের ওপরে ব্যক্তিগত মূল্যায়নকে স্থান দেওয়া। ইছদি ও গণতন্ত্রের প্রবক্ষদের সংখ্যাদিক্যপ্রিয়তা ও মানুষের সংখ্যাগত শক্তির ওপর অত্যধিক নির্ভরতার নীতিতে বাধা দিতে থাকে। তখন আমাদের দেশের যার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল 'তা' সত্যিকারের মানুষের; আমাদের সেনাবাহিনী সুকঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের মত মানুষ গড়ার কাজে ব্রতী হয়েছিল। দেশের মানুষ যখন নারীসুলভ দুর্বলতা ও আলসে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, তখন প্রতি ঘরের থেকে একজন করে সর্বসাকুল্যে সাড়ে তিন লক্ষ সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাণু যুবক সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে জনগণের সঙ্গে মিশে যেত। তাদের এ দু'টি বছরের প্রশিক্ষণকালে তারা সমস্ত দুর্বলতা ঝোড়ে ফেলে ইস্পাতের মত শক্ত করে তুলত তাদের দেহগুলোকে। দু'টি বছর ধরে যেসব যুবক চৰম আনুগত্য শিক্ষা করে আসত, প্রশিক্ষণ পেয়ে তারা পরিচালনা কার্যের যোগ্য হয়ে উঠত সর্বত্বাবে। প্রশিক্ষণপ্রাণু সৈনিককে তার চলন দেখেই চেনা যেত।

এ সেনাবাহিনীই ছিল সমগ্র জার্মান জাতির সবচেয়ে বড় শিক্ষালয়। এভাবে নিতান্ত সঙ্গত কারণেই আমাদের সেনাবাহিনী সেই ব্যক্তির ঘৃণার বোকা মাতায় তুলে নিয়েছিল, যারা চাহত জার্মান সাম্যাজিক প্রতিরক্ষার অবস্থায় দুর্বল হয়ে যাক; এরা নিজেরা লোভ লালসায় জর্জিরিত বলে জার্মান জাতির উন্নতিতে দীর্ঘকাতর হয়ে উঠেছিল। যে কথা সমগ্র জগৎ বুঝতে পেরেছিল সেকথা অনেক জার্মান বুঝতে পারেনি, কারণ তারা দেখে দেখে অন্ধ হয়েছিল অথবা হিংসার বশে সেকথা বুঝতে চায়নি। বাধা হল এ যে জার্মান জাতির স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার এবং দেশের নাগরিকদের জীবিকার্জনের ক্ষেত্রেও এ উজ্জ্বল প্রতিক্রিয়া প্রতীক।

তার মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানের নাম করা যেতে পারে, রাজশক্তি ও সেনাবাহিনীর ওপরে থাকে স্থান দেওয়া যেতে পারে, তা হল জার্মান সিভিল সার্ভিস বা অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা।

জার্মানির শাসনব্যবস্থা অন্যান্য দেশের শাসনব্যবস্থার থেকে আরো উন্নত ও সুগঠিত। সরকারি কর্তৃব্যক্তিদের আমলাতাত্ত্বিক রাজনীতির বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু সে রাজনীতি অন্যদেশের তুলনায় এমন কিছু বেশি খারাপ নয়। অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রশাসনব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে জার্মানির মত এমন ঐক্য ও অখণ্ডতা নেই। তাছাড়া জার্মানির মত অন্যান্য রাষ্ট্রে সিভিলসার্ভিসের আমলাদের মধ্যে এতখানি সততা ও নৈতিক কৃষ্ণ নেই। অহংকারী, অসৎ, দুর্চিরিত্ব ও অযোগ্য সরকারি কর্মচারীদের থেকে সৎ মনোভাবাপন্ন আমলা অনেক ভাল। কেউ যদি বলেন প্রাক্যুন্দকালীন জার্মানির শাসনব্যবস্থায় আমলারা সৎ হলেও প্রশাসনিক কাজকর্মের দিক থেকে তারা ছিল অযোগ্য, তাহলে আমি নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করব;

পৃথিবীর আর কোন্ দেশে জার্মানির থেকে আরও উন্নত ও সুগঠিত প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল? দৃষ্টান্ত ব্রুরুপ ষ্টেট রেলওয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। তারপর বিপ্লব এসে এ প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে দেয়। ক্রমে এমন একদিন আসে যেদিন এ বিপ্লবের কর্ণধার পুঁজিবাদীরা জার্মানির প্রশাসন যন্ত্রটাকে আন্তর্জাতিক শিল্পত্বিদের দ্বারা পরিচালিত ষ্টক এক্সচেঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসে।

বিপ্লবের সময় সিভিল সার্ভিসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অসৎ মনোভাবসম্পন্ন সরকারি কর্মচারীদের অবাধ স্বাতন্ত্র্য। দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক আবহাওয়া জার্মানির সরকারি কর্মচারীদের ওপর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না। বিপ্লবের পরে সমগ্র পরিস্থিতির আয়ুল পরিবর্তন হয়। কর্মচারীদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার জায়গায় পার্টি আনুগত্য স্থান এহণ করে। চরিত্রের স্বাধীনতা ও কর্মতৎপরতা সরকারি কর্মচারীদের আদর্শ গুণ হিসেবে আর স্বীকৃত হয় না। বরং এ সব গুণগুলি ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে তাদের পক্ষে।

আগে জার্মান সম্রাজ্যের আন্তর্জনক বিশাল শক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বাজতন্ত্রের ওপর। আর এ বাজতন্ত্রের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি ছিল সেনাবাহিনী ও সিভিল সার্ভিস। এ তিনটি ভিত্তের ওপর রাষ্ট্র কর্তৃত্বপূর্ণ শক্তির যে বিশাল সৌধূর্ধি প্রতিষ্ঠিত ছিল আজ তা দেখা যায় না। পার্লামেন্ট বা প্রাদেশিক সভাগুলোর কাজকর্মের দ্বারা কখনো রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কোন দেশের সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষ জনগণের মনে যে বিশ্বাস উৎপাদন করে তাদের সততা ও কর্মদক্ষতার দ্বারা, সে বিশ্বাসই হল রাষ্ট্র কর্তৃত্বের মূল ভিত। দেশের সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষ এক অটল অবস্থা থেকেই জনগণের বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। শুধু সম্রাসের দ্বারা কখনো কোন সরকারের শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা যায় না; জনগণের উন্নতিতে তৎপর শাসন কর্তৃপক্ষের যোগ্যতা ও নিয়মায় জনগণের যে বিশ্বাস-সেই বিশ্বাসই কোন সরকারের শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে পারে। অবশ্য একথা সত্য যে প্রাক্যুন্দকালীন জার্মানিতে এমন কিছু অসভ্য শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে শাসনব্যবস্থার মধ্যে, যা জাতির অন্তর্নিহিত শক্তিকে জোরদার করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সঙ্গে একথা ও মনে রাখতে হবে জার্মানির তুলনায় অন্যান্য রাষ্ট্রে এ ধরনের শক্তির কর্মতৎপরতা আরো বেশি। এ কথাটায় বুঝতে পারব আমাদের ধূংসের মূল কারণটা কোথায়।

জার্মানির প্রারম্ভে প্রধানতম কারণ হল এ যে জার্মানিতে বর্ণসমস্যা এবং জাতির ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারার এ সমস্যার তাৎপর্যটিকে উপেক্ষা ও অগ্রহ্য করা হয়। কারণ মনে

রাখতে হবে কোন জাতির জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে তা' কখনো দৈবক্রমে ঘটে না, তা হল জাতিরই কার্যের স্থাভাবিক প্রতিফল। জাতির জনসংখ্যা কিভাবে বেড়ে চলছে এবং জাতীয় শক্তির সংরক্ষণ কিভাবে হচ্ছে তারই ওপর নির্ভর করছে জাতির ভবিষ্যত।

বর্ণ ও জনতা

কতগুলি সত্য আছে যা মানুষের পথের ধারে এমন সহজভাবে ছাড়িয়ে থাকে যে তা প্রতিটি পথিকেরই চোখে পড়ে। কিন্তু তাদের সর্বাদাই দেখা যায় বলেই মানুষ সেই সব সত্যগুলোকে বুঝতে বা তাদের বিশেষ বিষয়বস্তু বলে গণ্য করতে চায় না। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের কতগুলো অতি সরল ও সাধারণ ঘটনা সংবলে এমনি অবহিত যে যখন কেউ সেই বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখন আচর্ষ হয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কলশাস ও ডিমের ঘটনাটার উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি খুবই সহজ, সকলেই তা' জানে। কিন্তু কলশাসের মত পর্যবেক্ষক সত্যাই বিরল।

প্রকৃতির বাগানে বেড়াতে বেড়াতে অনেকে অহংকারের সঙ্গে ভাবে তারা প্রকৃতির সবকিছু জেনে গেছে। কিন্তু তাদের কেউ-ই প্রকৃতির জগতের এক বিশেষ নীতির কথা জানে না। সে নীতি হল এ যে জগতের সকল জীবন্ত প্রাণীর মধ্যেই এক বিচ্ছিন্নতাবোধ নিহিত আছে।

এ নিয়মের বশেই প্রতিটি প্রাণী তার আপন জীবন বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ থেকে তার প্রজাতি বৃদ্ধি করে চলে। প্রতিটি প্রাণী তার ইজাতীয় স্ত্রী প্রাণীর সঙ্গে সহবাস করে থাকে। যেমন ঘরের ইন্দুর কথনো মেঠো ইন্দুরের সঙ্গে সহবাস করে না। সে কাজে তার একমাত্র সঙ্গী ঘরের ইন্দুর। নেকড়ের স্ত্রী নেকড়ের সঙ্গেই সহবাস করে।

একমাত্র বিশেষ অবস্থার বশেই প্রাণীরা এ যৌন প্রকৃতির নিয়ম হতে বিছুত হতে বাধ্য হয়। কোন জায়গায় বন্দী থাকাকালীন অথবা যখন ইজাতীয় প্রাণীর সঙ্গে কোনক্রমে সহবাস সঞ্চলন হয় না, তখনি কোন প্রাণী ভিন্ন জাতীয় প্রাণীর সঙ্গে বাধ্য হয়ে সহবাস করে থাকে। কিন্তু এ ধরনের সহবাস প্রকৃতি ঘণ্টা করে এবং এর বিরুদ্ধে প্রকৃতির নীরব প্রতিবাদ বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত হয়। যেমন ভিন্ন জাতির দুই প্রাণী হতে উৎপন্ন বর্ণসংকর কোন প্রাণী সম্পূর্ণক্রিয়ে বা আশপিকভাবে প্রজনন ক্ষমতা হতে বক্ষিত। এ বর্ণসংকর কোন প্রাণীর অনেক রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা ও বহিরাক্রমণ হতেও আত্মরক্ষার ক্ষমতায় বক্ষিত হয়।

প্রকৃতির এ বিধান খুবই যুক্তসম্পত্তি। দুটি অসম স্তরভুক্ত ভিন্নজাতীয় প্রাণী তার পিতামাতার থেকে কিছুটা উন্নত হলেও তাদের থেকে উন্নত কোন প্রাণীর আক্রমণে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। এ কাবণেই ভিন্ন জাতীয় দুই প্রাণীর সহবাস প্রাণধারার নির্বাচন যুক্ত বিবর্তন সম্পর্কিত প্রকৃতির ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী; বলবান প্রাণীও দুর্বল দুই ভিন্ন জাতীয় প্রাণীর মিলন প্রাণের উন্নত বিবর্তনধারার পরিপন্থী। কারণ এসব সহবাসের ক্ষেত্রে বলবান প্রাণীকে কিছুটা নতি স্বীকার করতে হয় এবং এ মিল হতে যে প্রজাতির জন্ম হয়, তার প্রকৃতি ও মান দুর্বল হয়। সুতরাং এক অমোগ প্রাক্তিক নিয়মের দ্বারা প্রাণের বিবর্তনধারাটা নিয়ন্ত্রণ না হলে জৈব জীবনের উন্নয়নমূলক বিবর্তন মোটেই সংক্ষিপ্ত হত না।

অমিশ্রিত রক্তবিশিষ্ট অর্থাৎ সমজাতীয় দুই প্রাণীর মিলনের এ নীতিটি তাই প্রকৃতি জগতের সর্বত্র পালিত হয়, এবং এ মিলনের ফলে যে প্রাণীর জন্ম হয় তা' শুধু দেহগত

আকৃতি নয়, চরিত্র ও ব্যবহাগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও অন্য জাতীয় প্রাণী হতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়। শেয়াল ও বাঘের চরিত্র কখনো কি এক হবে? তাদের জাতীয় চরিত্র ভিন্ন থাকবেই। শেয়াল কখনো রাজহাসের প্রতি আর বিড়াল কখনো ইঁদুরের প্রতি বক্রভাবাপন্ন হতে পারে না।

প্রকৃতি আবার প্রতিটি জাতির জীবনধারাকে উন্নত করার জন্য প্রতিটি জাতির প্রাণীদের মধ্যে ক্ষুধা ও প্রেমগত প্রতিযোগীতা ও জীবন সংগ্রামের এক তাগিদ সঞ্চারিত করে দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবিকার্জন ও স্ত্রী প্রাণীদের ওপর অধিকার ও কর্তৃত্ব নিয়ে সমজাতীয় প্রাণীরা বাগড়া ও সংখাম করে পরম্পরার মধ্যে। সংগ্রামে বলানীনরাই প্রার্ধান্য লাভ করে দুর্বলের ওপর।

তা' যদি না হত তবে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের উন্নতির বা বিবর্তনের ধারাটা বন্ধ হয়ে যেত একেবারে। তাঁহলে অগ্রগতির পরিবর্তে শুরু হত পশ্চাদ্গতি। প্রাণীদের মধ্যে যারা দুর্বল, যারা অযোগ্য, তারা সংখ্যায় বেশি। তারা যদি অবাধে যা ইচ্ছেমত বংশবৃক্ষি করে যেতে পারে তাঁহলে সব জাতির প্রাণীর মধ্যে অযোগ্য ও দুর্বলের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তাদের মধ্যে তাঁল গুগলো কমে যাবে। তাই অযোগ্য ও দুর্বলদের সংখ্যাকে সীমায়িত ও তাদের অবাধ বংশবৃক্ষিকে খর্ব করার জন্য প্রকৃতি এমন এক কঠোর নির্বাচনমূলক নীতি ও নিয়মের প্রবর্তন করেছে, যার ফলে প্রজননের ক্ষেত্রে অযোগ্য ও দুর্বলদের সব সময় স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমানদের কাছে নতি স্বীকার করে চলতেই হবে।

প্রকৃতির রাজ্য এ নিয়ম যদি প্রতিষ্ঠিত না থাকত, যদি যোগ্য-অযোগ্য, দুর্বল ও শক্তিমান অবাধে সহজভাবে মেলামেশা করত, তাঁহলে প্রকৃতি শত শত হাজার হাজার বছর ধরে সকল জাতির প্রাণীর বংশধারাটিকে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে উর্ধ্বতন স্তরের দিকে নিয়ে যাবার যে প্রমাণ পাচ্ছে, সে প্রমাণ ব্যর্থ হয়ে যেতে।

ইতিহাসের মধ্যে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যার মধ্যে এ প্রকৃতির নিয়মটি অভ্যন্তরভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায় যে আর্যরা একদিন এক উন্নত ধরনের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল, সেই আর্যদের রক্ত যখন নিকৃষ্ট জাতির রক্তের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়, তখন তাদের পতন ঘটতে থাকে। উত্তর আমেরিকার অধিবাসীরা ছিল প্রধানত টিউটন জাতীয়। কিন্তু তারা যখন নিকৃষ্ট জাতির লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকে তখন তারা মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে, এবং তাদের সভ্যতার মান কমে যায়। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার লাতিন জাতীয় অধিবাসীরা আবার অধিবাসীদের রক্তের সঙ্গে তাদের রক্ত বহু পরিমাণে মিলিয়ে ফেলে। বিভিন্ন জাতির রক্তগত সংমিশ্রনের ফল কি হতে পারে তা' আমরা এ দৃষ্টান্ত থেকে বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু উত্তর আমেরিকার নিউটনজাতীয় যেসব লোকেরা তাদের জাতিগত সম্পূর্ণ রাখতে সমর্থ হয়, যারা তাদের রক্তকে অন্য জাতির রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেনি, তারাই সমগ্র আমেরিকার ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে এবং তাদের রক্ত সংমিশ্রিত বা দৃষ্টিত না হওয়া পর্যন্ত তারা এভাবে প্রভৃতি ও কর্তৃত্ব করে যাবে।

জাতিগত সংমিশ্রণের কুফল সাধারণত দু'ভাবে দেখা যেতে পারে;

(ক) উৎকৃষ্ট জাতির গুণগত মান কমে যায়;

(গ) তাদের দৈহিক ও মানসিক ক্রমবন্নতির জন্য তাদের প্রাণশক্তি কমে গিয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে।

জাতিগত রক্তের এ দুষণ ক্রিয়া পরম স্মষ্টার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক ঘোরতর পাপ এবং এ পাপের ফলভোগ করতেই হবে।

মানুষের এ কাজ যেসব নীতির ওপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেইসব নীতির বিরুদ্ধে সংঘাতে প্রবৃত্ত করে তোলে তাকে। এতাবে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ করে সে নিজের ধৰ্মস নিজেই ডেকে আনে।

এ বিষয়ে ইহুদি ও আধুনিক শাস্তিবাদীদের কাছ থেকে এক ঔন্নতামূলক আপত্তির সম্মুখীন হই। তারা বলেন, মানুষ প্রকৃতির ওপর প্রভৃতি করতে পারে। ইহুদীদের অনুসরণ করে বহু লোক এ ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে তারা প্রকৃতিকে জয় করতে পেরেছে। কিন্তু এটি শুধু তাদের এ বিপজ্জনক ধারণামাত্র। কারণ তাদের এ বিপদজনক ধারণাটাকে যদি সকলে দ্বিকৃতি দান করে তাহলে জগতের অস্তিত্বই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

আসল কথা এ যে মানুষ প্রকৃতিকে যে কোন ক্ষেত্রে জয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতি যে বিশাল অবগুঠন বা আবরনের দ্বারা তারা অস্তিনিহিত গোপন রহস্যগুলোকে অনন্তকাল ধরে ঢেকে রেখেছে, মানুষ শুধু সেই অবগুঠনের সামান্য এক অংশমাত্র অপসারিত করতে পেরেছে। মানুষ কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। সে শুধু কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম। মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে পারে না, তারা শুধু সেই সব প্রাণীদের ওপর প্রভৃতি বিস্তার করতে পেরেছে যারা প্রকৃতির নিয়ম কানুন ও রহস্যের গভীরে প্রবেশ করার মত উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। যে কোন ভাব বা ধারণার জন্য হ্যাঁ মানুষের মনের মধ্যে। তাই মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য যে সব ঘটনা অত্যাবশ্যক, সেই ঘটনাগুলিকে কোন ভাব বা ধারণা কখনো ধৰ্মস করতে পারে না। মানুষকে দিয়ে কোন ভাব বা ধারণা কখনো জন্মাবত করতে পারে না। সুতৰাং যে কোন ভাব বা ধারণা মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অবশ্যই সেই ঘটনাগুলোর ওপরে নির্ভরশীল হবে।

শুধু তাই নয়। কতগুলো ভাব বা ধারণা আবার কতগুলো মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে যেসব ভাব বা ধারণা একান্তভাবে অনুভূতি সম্পর্ক। যেগুলো বস্তু সাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সত্য হতে উদ্ভৃত নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে একথা সমধিক প্রযোজ্য। অনেকে বলে এ সব ভাবগুলো নাকি মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের প্রতিফলন। তাদের মত এসব আত্মগত ভাবগুলোর নীরস যুক্তিকর্ত্তৃর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এগুলো মানুষের নৈতিক ধারণার প্রকাশ মাত্র। তারা আরও বলে মানুষের অন্তরে সৃষ্টিশীল শক্তিই এ সব ভাবগুলোর উৎস। বিশেষ ভাবধারা বা ধারণাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সেই বিশেষ জাতিকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: যদি কেউ মনে করে শাস্তিবাদী ভাবধারার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, তাহলে তাকে জার্মান জাতির বিশ্বজয়ে সর্বপ্রকার যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। এর উল্টোটা হলে সমগ্র জার্মান জাতির সঙ্গে সব শাস্তিবাদীদেরও মরতে হবে। আমি একথা বলছি কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের জার্মান জাতি এ ভাবধারার অধীন হয়ে পড়ে। কেউ যদি শাস্তিবাদী আদর্শে দীক্ষিত হতে চায় তাকে তবে যুদ্ধের কথা একেবারেই ভুলে যেতে হবে। আমেরিকার বিশ্ব-সংস্কারপন্থী নেতা উড়া উইলসনের এ ধরনের এক পরিকল্পনা ছিল। এ আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে আমাদের দেশের অধিবাসীরাও ভাবত এ পরিকল্পনার মাধ্যমেই তারা তাদের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবে।

শান্তিবাদ ও মানবতাবাদ এক উৎকৃষ্ট ভাবাদর্শ হিসেবে বিবেচিত হবে সেইদিন, যেদিন মানুষ পৃথিবীতে পূর্ণ মনুষ্যত্ব নাভ করবে এবং সেই মনুষ্যত্ব এক অবিসম্মানী প্রাধান্য বিস্তার করবে সারা বিশ্বে। কিন্তু কেউ যদি অপরিগামদর্শিতার বশে এ ভাবাদর্শ জোর করে কারোর ওপর চাপাতে চায়, তবে তা' ফ্রিডমকার হয়ে উঠতে বাধা। তাই চাই আগে যুক্ত, তারপরে শান্তি। যদি তা' না হয় তা'হলে বুঝতে হবে মানুষ আগেই উন্মত্তির সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে। অপরিগামদর্শিতার বশে এ ভাবধারা চালিত করলে নৈতিক আদর্শ এবং প্রাধান্য স্থিতি হবে না; বরং মানুষ নিচুস্তরে নেমে যাবে। আর তার ফলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে সারা বিশ্বে। এ কথায় অনেকে হয়ত হাসতে পারে। আমাদের এ পৃথিবীর মানুষ আমাদের আগে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মহাশূন্যে একা ঘুরে চলেছিল। ভবিষ্যতে কোনদিন আবার হয়ত তাকে সেভাবে জনমানবশূন্য অবস্থায় ঘুরতে হবে, যদি মানুষ একথা ভুলে যায় যে স্বপ্নপ্রবণ অপ্রকৃতিস্থ বাস্তিত্বের ভাবধারাকে ভিত্তি করে নয়, প্রকৃতির নিয়ম কঠোরভাবে মেনে তুবেই মানুষ বড় হতে পারে; যে কোন জ্ঞানগায় তারা তাদের অস্তিত্বকে সমৃদ্ধ ও মহান করে তুলতে পারে।

আমরা সারা বিশ্বের বিজ্ঞান, কলা ও কারিগরী বিদ্যার যে সব আবিষ্কার ও উন্মত্তির প্রশংসা করি তা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের সৃষ্টিশীল প্রতিভার ফল। জাতিগত ভিন্নতা সত্ত্বেও এসব প্রতিভাবান ব্যক্তিরা বৃদ্ধিগত যোগ্যতার দিক থেকে যেন একই জাতীয়। মানব সভ্যতার অস্তিত্ব আসলে এসব প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের ওপরেই নির্ভরশীল। এসব ব্যক্তিত্বের ধৰ্ম হলে পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর তা' সব তাদের সঙ্গে চলে যাবে ধর্মসের সমাধিগহবরে।

কোন দেশের ভূ-প্রকৃতির প্রভাব যতই বেশি হোক সে প্রভাব নির্ভর করে সে দেশের অধিবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ওপরে। কোন দেশের ভূমির পরিমাণ কম হলে সে দেশের মানুষেরা খুব পরিশৃমী হয়, ভূমির অভাবের ফলে সে দেশের লোকেরা চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং স্বাভাবিকভাবেই অপৃষ্ঠ প্রভৃতি দারিদ্র্যগত কুফলগুলোয় ভুগতে থাকে। সুতরাং কোন দেশের অধিবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই পারিপর্যাক অবস্থা ও পরিবেশ প্রভাবের গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। কোন দেশের ভূমির ঘাটতি জাতিকে দারিদ্র্যতা ও অনশনের পথে ঠেলে দেয়, আবার অন্য এক জাতিকে কঠোর পরিশ্রমের পথে নিয়ে যায়।

অতীতের বড় বড় সভ্যতার ধর্মসের কারণ হল— প্রতিভাবান শ্রেণীর রক্তে সংশ্মিশ্রণ ও দূষণের ফলে অবনতি ঘটে এবং তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এ সব ধর্মসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তখনকার মানুষ একটা কথা ভুলে গিয়েছিল; ভুলে গিয়েছিল সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতি সেইসব মানুষের ওপরে নির্ভরশীল যারা সেই সব সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রষ্টা। সুতরাং কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাদের স্রষ্টাদেরও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এ বাঁচিয়ে রাখার নীতির সঙ্গে আর একটা অমৌখ নীতি জড়িয়ে আছে, সে নীতি হল এ যে যারা অধিকতর শক্তিমান ও যোগ্যতম তাদের প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা স্বীকার করতেই হবে। তাদের বেঁচে থাকার অধিকার দিতেই হবে।

এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে লড়াই করতে হবে। যে পৃথিবীতে নিরস্তর সংখ্যামই জীবনের নীতি ও নিয়ম, সেই পৃথিবীতে কেউ যদি লড়াই করতে না চায়, তার বেঁচে থাকার কোন অধিকারাই নেই।

একথা রুচি শোনালেও প্রকৃত অবস্থা এটাই। তবে তাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে ওঠে যাবার প্রকৃতিকে জয় করার দন্ত দেখিয়ে প্রকৃতিকে অপমান করে। ফলে তাদের ভাগ্যে ঘটে অশেষ দুঃখকষ্ট।

বিভিন্ন জাতির রক্ষণত প্রকৃতিক নিয়মকে কেউ যদি উপেক্ষা বা ঘূণা করে তাহলে সঙ্গব্য সুখ থেকে বঞ্চিত করবে নিজেকে। যোগ্যতম ব্যক্তিত্বের জয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে এ ধরনের ব্যক্তিকা সমগ্রভাবে মানবজাতির উন্নতির পক্ষে আবশ্যিকীয় বস্তুগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। মানবতাবাদের এবং ভাবালুকতার বশবর্তী হয়ে তারা আবার মানুষের শরে নিজেদের নামিয়ে নিয়ে যায়, যারা ভেবেছিল নিজেদের তুলে নিয়ে যেতে পারবে না কোন উন্নতির শরে।

মানবজাতির প্রথম সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কারা ছিল এবং তারা কোন জাতিভুক্ত ছিল, সেকথা আলোচনা অর্থহীন। আজ আমরা মনুষ্যত্ব বলতে যা বুঝি, আমাদের সে ধারণা একদিন তারাই বপন করেছিল আমাদের মনে। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজ খুব সহজ। সভ্যতার আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানব সংস্কৃতির যেসব বিচিত্র বিকাশ ঘটেছে, আমরা আজ বিজ্ঞান, কলা, কারিগরী বিদ্যার যেসব অভাবনীয় উন্নতি চোখের সামনে দেখতে পাই, তা নিঃসন্দেহে আর্যদের সৃষ্টিশক্তিরই ফল। এ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে একমাত্র আর্যরাই এক উন্নত ধরনের মূন্যস্থত্ব বোধকে প্রতিষ্ঠিত করে। আমরা আজ প্রকৃত মানুষ বলতে যা বুঝি সে ধারণা তাদেরই সৃষ্টি। আর্যরা হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির সেই প্রমিহিউস যার জুলত ক্রযুগল হতে আসে আলোকিক প্রতিভার অগ্নিশূলিঙ্গ। সেই সব অগ্নিশূলিঙ্গ জ্ঞান বিকাশের বিচিত্র অনেক রূপ ধরে সর্বব্যাপি অজ্ঞতার রহস্যময় অঙ্ককার অপসারিত করে। এ আলোই মানুষকে প্রথম উন্নতির পথ দেখায় এবং পৃথিবীর অন্য সব প্রাণীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সহায়তা করে। সেই আর্যরা যদি ধৰ্মস হয়ে যায় তাহলে আবার সেই অজ্ঞতার গভীর অঙ্ককার নেমে এসে পরিব্যঙ্গ করে ফেলবে সমস্ত পৃথিবীতে। কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। যব্বত্ত্বমি হয়ে পড়বে সারা বিশ্ব।

সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং সংস্কৃতির ধর্মসকর্তা— এ তিনি শ্রেণীতে যদি সমগ্র মানবজাতিকে ভাগ করা হয় তাহলে আর্যরা অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর অস্তর্গত হবে। এ আর্যরাই মানব সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি রচনা করে। তার ওপরে তার প্রতিটি শুভ ও কাঠামো করে। শুধু বিশ্বের বিভিন্ন জাতি তাদের আপন আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে সংস্কৃতির সেই কাঠামোতে রঙ ও রূপ দান করে। এ আর্যরাই মানবজাতীয় উন্নত সৌধ রচনার উপযুক্ত পরিকল্পনা ও মাল মসলা সরবরাহ করে। বিভিন্ন জাতি তাদের আপন আপন মান অনুসারে এক একটা বিশেষ পদ্ধতিতে সেই উন্নতির সৌধ রচনা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে কয়েক দশকের মধ্যে সমগ্র পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীরা একটি সংস্কৃতিকে আন্তর্সাং করে সেই সংস্কৃতিকে নিজেদের বলে অভিহিত করে। আসলে কিন্তু আমরা জানি এ সংস্কৃতির ভিত্তি গ্রীকদের রচিত এবং ‘তা’ তাদের কলাকৌশলের সৃষ্টি। শুধু সেই সংস্কৃতির বহিরঙ্গন অন্তত কিছু পরিমাণে এশিয়ার জাতিগুলোর নিজস্ব অগ্ররেখার সৃষ্টি। অনেকে বলে থাকে যে জাপান তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু বাস্তবে জাপান ইউরোপীয় সংস্কৃতি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ পদ্ধতিকে পুরোপুরি গ্রহণ করে তার ওপর

আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্যের রঙ দিয়ে সেগুলোকে অলংকৃত করে। জাপানের জাতীয় জীবনের বহিরঙ্গনটিতে তার নিজস্ব সংস্কৃতির কিছু নির্দেশন থাকলেও তার বর্তমান জাতীয় জীবনের আপন ভিত্তিটির সঙ্গে কিন্তু তার নিজস্ব দেশীয় সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নেই। জাপানের সমসাময়িক জীবন-ধারার বাস্তব রূপটি ইউরোপীয় ও আমেরিকান জ্ঞান বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির থাতেই বয়ে চলেছে। এ সংস্কৃতি হল মূলত আর্য সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের সুফলগুলোকে তাদের উন্নতির মূল ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করার ফলেই প্রাচ্যের জাতি আধুনিক বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে; ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যার উজ্জ্বল কৃতিত্বগুলোকে ভিত্তি করেই প্রাচ্যের জাতিগুলোর দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের জাতিগুলোর জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার জোগায়। তবে সেই সব হাতিয়ারের বহিরঙ্গনটি জাপানীদের জীবন যাত্রার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে ধীরে ধীরে।

জাপানের ওপর এ আর্য সংস্কৃতির প্রভাব শক্ত হয়ে যাবে যদি ইউরোপ আমেরিকা অক্ষয় ধৰ্মস হয়ে যায়। তাতে জাপানের উন্নতির স্মৃতামাত্র কয়েক দশক অব্যাহত থাকবে, পরে শুকিয়ে যাবে একেবারে। তাহলে জাপানের প্রাচীন স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য লাভ করবে এবং বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি সেই বিদ্যার জড়ত্বার মধ্যে স্তরীভূত হয়ে পড়বে। আজ হতে কুড়ি বছর আগে যে নিদো থেকে একদিন অপসংস্কৃতির ডাকে তারা জেগে উঠেছিল। সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে যেতে পারি যে জাপানের বর্তমান উন্নতির ধারাটা যেমন জনপ্রভাব থেকে উৎসারিত, তেমনি তার প্রাচীন সভ্যতার রূপচিত্র বহিরাগত কোন প্রভাব হতেই উত্তৃত হয়। একথা মনে করার যুক্তি এ যে প্রাচীন জাপানী সভ্যতার ধারাটা চলতে চলতে শক্ত ও প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। সভ্যতার এ অবক্ষয় ধরা হয় তখনই যখন কোন জাতি তার সৃষ্টিশীল সঙ্গ হারিয়ে ফেলে অথবা বহিরাগত যে প্রভাব একদিন জাতিকে জাপিয়ে তোলে, তার সংস্কৃতিকে উন্নতি ঘটায়, সেই প্রভাব সহস্র প্রত্যাহত হয়। যদি দেখা যায় কোন দেশ তার সংস্কৃতির মূল উপাদান অন্য কোন বিদেশী সংস্কৃতি থেকে সংগ্রহ করে এবং বাইরে থেকে সেই উপাদান আসার পথ বন্ধ হয়ে গেলেই সেই জাতির সংস্কৃতির ধারাটা শূন্য ও প্রস্তরীভূত হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে সে সংস্কৃতির সংরক্ষকমাত্র, সংস্কৃতির স্থৃষ্টা নয়।

এদিক দিয়ে আমরা যদি বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে বিচার করি তা'হলে দেখতে পাব তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মূল্যগতভাবে কোন সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারেনি। অন্য কোন দেশে সৃষ্টি কোন সংস্কৃতির ধারাটিকে গ্রহণ ও আস্তসার করেছে মাত্র।

নিম্নে দৃষ্টান্ত থেকে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি।

আর্যজাতি সংখ্যায় বহু হয়েও বিশ্বের বহু দেশ ও জাতিকে জ্য করে এবং দেইসব বিজিত দেশের ভূমির উর্বরতা, জলবায়ুর ও কায়িক শ্রমের প্রাচুর্য প্রভৃতি এমন কতগুলো জীবনযাত্রাগত সুযোগ সুবিধা পায় যাতে তারা তাদের বুদ্ধি ও সংগঠন প্রতিভাকে আরো ভালভাবে বিকশিত করে তুলতে পারে। কয়েক শত বা কয়েক হাজার বছরের মধ্যে বিজেতারা বিজিত জাতির আদিম প্রাণহীন সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। তবে এ নতুন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে গিয়ে বিজিত জাতিরা তাদের দেশজ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে কপটা কিছু পরিবর্তিত করে ফেলে। কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় বিজেতারা তাদের জাতিগত রক্তকে অবিমিশ্র রাখার প্রাকৃতিক নিয়ম ও নীতি হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তারা বিজিত

জাতিদের সঙ্গে তাদের রক্ষণত সংমিশ্রণ ঘটাতে থাকে। এভাবে তাদের পৃথক সন্তানি তার সব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে।

এক হাজার বছরের মধ্যেই দেখা যায় বিজিত জাতিগুলো বিজেতাদের রক্ষ হতে তাদের তুকরের যে যে অংশ উজ্জ্বলতা লাভ করেছিল, সে রঙ ও উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে গেছে অনেকখানি। বিজেতা জাতির যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সন্তান দীপ্তি হতে বিজয়ী জাতি সংস্কৃতি ও জাতীয় উন্নতির মশালটি জুলে ওঠে, বিজেতা জাতির রক্ষ ম্লান হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেই আভাব দীপ্তিও ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু বিজেতাদের প্রভাব কালক্রমে ম্লান হয়ে গেলেও বিজেতাদের রক্ষের মধ্যে বিজয়ীদের রক্ষের রঙ কিছুটা রয়ে যায়। তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বলতায় একটা ক্ষীণ অংশ যা বিজেতাদের ওপর নেমে আসা সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ও বর্বরতার অন্ধকারকে ঘন হতে দেয় না কিছুতে। যে অন্ধকার নতুন করে আচ্ছন্ন করে বিজিতদের, সেই অন্ধকারের মাঝে বিজয়ীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অতীত উজ্জ্বলতার অংশটি কিরণ দিতে থাকে। সেই কিরণের আভায বর্তমানের কোন ভাবমূর্তি নয়, বিশিষ্ট অতীতের একটা দিক প্রতিফলিত হয়ে ওঠে শুধু।

তবে এমনও হতে পারে যে কালের বিবর্তনে ভবিষ্যতে কোন এক সময় বিজিত জাতি তাদের সংস্কৃতির সুপ্রাচীন স্মৃষ্টিদের সংশ্লিষ্টে আবার আসতে পারে। তখন হয়ত তারা অতীত খণ্ডের কথা ভুলে যায়। তথাপি তাদের রক্ষের মধ্যে বিজয়ীদের রক্ষের যে একটা অংশ রয়ে যায়, সেই রক্ষের প্রভাব তাদের প্রবৃত্তিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে বিজেতাদের দিকে। সুতরাং অতীতে যে জাতিগত সংমিশ্রণ বাধ্যবাধকতার মধ্যে দিয়ে বয়ে ছিল, এবার তা' হবে স্বচ্ছদে ও প্রেছায়। ফলে এক সাংস্কৃতিক উন্নতির চেউ নতুন করে প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তা' এ সংমিশ্রণের জন্য বিজেতা জাতির রক্ষ নতুন করে দৃষ্টিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে সবকিছু চলতে থাকবে।

যারা বিশ্বের ইতিহাস ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করতে চান তাদের এ দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করতে হবে।

সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে সব পরিবর্তন ঘটছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে সব জাতির নিজস্ব কোন সংস্কৃতি নেই, যারা বহিরাগত কোন সংস্কৃতির ধারক বা সংরক্ষক মাত্র তারা বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি করছে, আর আর্যদের মত যেসব জাতি এক উন্নত ধরনের স্মৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠাতা তারা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের জীবনে দেখা যায় প্রতিভাবান ব্যক্তি তাদের দেখে সাধারণত আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতই মনে হয়; কোন বিশেষ ঘটনা বা উপলক্ষ্য ছাড়া তাদের প্রতিভাব বিকাশ ঘটে না। যখন জাতীয় জীবনে এমন কোন বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার সৃষ্টি হয় যা দেখে সাধারণ মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, তখনি আপাত সাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তিরা তাদের প্রতিভাব পরিচয় দেয়। এ কারণেই কোন জাতির জীবনে মাঝে মাঝে এতজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। যুদ্ধও এমন এক বিশেষ ঘটনা যার মাধ্যমে বৃদ্ধিমান, শক্তিমান ও প্রতিভাবানরা তাদের অসাধারণত্বের পরিচয় দান করতে পারেন। কোন বিপর্যয়কালে দেখা যায় অনেক নিরীহ যুবক হঠাৎ সামনে এসে দৃঢ়সংকল্প ও স্থিরবুদ্ধির মাধ্যমে সেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে তাদের আশ্চর্য প্রতিভা শক্তির পরিচয় দেয়। এ ধরনের কোন পরীক্ষামূলক ঘটনা ছাড়া কেউ বুঝতেই পারবে না কার মধ্যে এ আশ্চর্য এক বীরের শক্তি লুকিয়ে আছে। কোন

প্রতিভা বা বীরত্বের সর্বসমক্ষে প্রকাশ ঘটাতে হলে বিশেষ কার্যপ্রেরণা ও প্রবৃত্তির দরকার। ভাগ্যের হাতড়ীর যে নিউর আঘাত একজন সাধারণ মানুষকে সহজেই ডেডে চুরামার করে দেয়, সে আঘাত কোন বীর বা প্রতিভাবান ব্যক্তির মাঝে এক ইস্পাতকঠিন প্রতিধাতের সম্মুখীন হয়। প্রথমে প্রকৃত ঘটনার আঘাতে বীরদের ওপর থেকে সাধারণের খোলস খসে যায় আর তখন তাদের অন্তর্নিহিত অসাধারণ সত্ত্বার কঠিনতম অংশটি বেরিয়ে পড়ে। তা দেখে সারা জগৎ বিস্মিত হয়ে যায়। জগতের লোকের ধারণা তাদের মতই এক আপাত সাধারণ লোকের মধ্যে এমন অসাধারণ গুণ ও শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে। যতবারই কোন প্রতিভাব আবির্ভাব হয়, ততবারই এ নিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

যে ব্যক্তি কোন সৃষ্টিশীল প্রতিভাব অধিকারী, জন্মের পর থেকে তার সেই অগ্নিস্ফুলিম্পটি ভঙ্গাছাদিত অগ্নির মত তার অন্তরের মধ্যে চাপা ছিল। যে কোন প্রতিভাই এমনি এক অন্তর্নিহিত সহজাত শক্তি। প্রতিভা কখনো কোন শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের সৃষ্টি নয়।

আমি আগেই বলেছি, আবাব বলছি, এটা শুধু ব্যক্তির পক্ষে নয়, সমগ্র জাতির পক্ষেও প্রযোজ্য। যে সব জাতি বিভিন্ন সৃষ্টিশীল শক্তির পরিচয় দেয়, তারা জন্মাগতভাবেই সৃষ্টিশীল প্রতিভাব অধিকারী। আপাত দৃষ্টিতে লোকে দেখতে না পেলেও তাদের স্বভাবের মধ্যেই সে শক্তি নিহিত থাকে। উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যেমন কোন বিশেষ অবস্থা ছাড়া তার সহজাত প্রতিভাব বিকাশ সাধন করতে পারে না, তেমনি কোন জাতিও উপযুক্ত কর্মপ্রেরণা বা অবস্থা ছাড়া তাদের সৃজনশীল প্রতিভাকে কার্যে রূপায়িত করতে পারে না।

এ সত্যের জুলন্ত দৃষ্টান্ত হল সেই আর্যজাতি যারা আজও মানবজাতির সকল উন্নতি ও প্রগতির ধারক ও বাহক। ভাগ্য যখনি তাদের কোন বিশেষ অবস্থার ওপরে উপস্থাপিত করে, তখনি তাদের সহজাত শক্তি এক বিশেষ রূপে বিকাশ লাভ করে থাকে। এ সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা যেসব বিশিষ্ট সংস্কৃতি সৃষ্টি করে, সে সব সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বিজিত দেশের ভূমি, প্রকৃতি, জলবায়ু ও অধিবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর মধ্যে দেশের অধিবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোন দেশের উন্নতি করতে গিয়ে যদি দেখা যায় সেখানে যন্ত্রপাতি ও কারিগরী বিদ্যার অভাব আছে, তাহলে সেখানে প্রচুর শ্রমশক্তির দরকার হয়। আর্যরা যদি তাদের বিজিত জাতিগুলোর যৌবনের শ্রমশক্তির সাহায্য না নিত, তাহলে প্রবর্তীকালে তারা উন্নত ধরনের সংস্কৃতির সৃষ্টি করতে পারত না। যেমন প্রথমে অশ্ব ও বিভিন্ন পশুর সাহায্যে পরিবহন কার্য সম্পন্ন করার পর মানুষ যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে।

উন্নত ধরনের সভ্যতার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনুন্নত জাতিগুলো এক অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে কাজ করে; তারা নিজেদের শ্রমশক্তির দ্বারা যন্ত্রের অভাব পূরণ করে। সভ্যতার প্রথম স্তরে পোষা পশুর পরিবর্তে বিজিত নিবৃষ্ট জাতির লোকদের বিভিন্ন কাজে লাগানো হত।

প্রথম প্রথম বিজিত লোকদের ক্রীতদাস হিসেবে যেসব কাজে লাগানো হত, পরে পোষণ মানানো পশুদের সেইসব কাজে লাগানো হয়। প্রথমে যেসব শক্তিদের জয় করা হত তাদের লাঙল টানার কাজে নিযুক্ত করা হত, পরে এ কাজে বলদ ও ঘোড়াদের লাগানো হয়। একমাত্র অপদার্থ শান্তিবাদীরাই এটাকে মানবজাতির অধিপতন বলে অভিহিত করতে পারে। আজকের মান্যমের সভ্যতার যে উন্নতি হয়েছে সেখানে ওঠার জন্য এ ধরনের বিবর্তনের প্রয়োজন ছিল।

অসংখ্যা ক্রম বিবর্তন ও ক্রম পর্যায় সমৰিত মানবজাতির উন্নতি বা অগ্রগতির ব্যাপারটাকে একটা খণ্ডীন মইয়ের ওপরে ঘোষে তুলনা করা যেতে পারে। একটি মইয়ের মধ্যে অনেক অংশ বা সিঁড়ি আছে। কিন্তু নিচের অংশটি অতিক্রম না করে কেউ উজ্জ্বলতার অংশটায় উঠতে পারে না। আর্যরা তখন তাদের বাস্তবতা চোখের বশবর্তী হয়ে যেসব গ্রহণযোগ্য মনে করেছিল সেই সবই গ্রহণ করেছিল; আধুনিক শান্তিবাদীদের কথা মত চলেনি। তবে এ বাস্তব নির্ণয় করা ও সেই মতে চলা খুবই কঠিন। একমাত্র এ পথই মানুষকে নিয়ে যেতে পারে তার আকঞ্জিত লক্ষ্যে।

কিন্তু এমন অনেক লোক আছে যারা মানুষকে শুধু স্বপ্নের রাজ্যে নিয়ে যায়। এ সব স্বপ্নদীর্ঘীরা মানুষকে তাদের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

সুতরাং দেখা যায় আর্যরা কোন নিকৃষ্ট অনুন্নত জাতির সংশ্পর্শে আসামাত্র সভ্যতার প্রথম স্তরটি গড়ে উঠে। এ স্তর গড়ে উঠে তখনি যখন সেই অনুন্নত জাতির লোকেরা ক্রমবর্ধমান মানব সভ্যতার এক যাত্রিক উপাদান হিসেবে কাজ করতে থাকে।

এভাবে আর্যরা এক সুনির্দিষ্ট পথের সকান পায়। বিজেতা হিসেবে তারা নিকৃষ্ট অনুন্নত জাতিগুলোকে জয় করে তাদের নেতৃত্বাধীনে তাদের কর্মশক্তিকে এক সুসংগঠিত পদ্ধতিতে গঠন করতে থাকে। পরাজিতরা বিজয়ীদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুসারে চলতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরাজিতদের ওপর আর্যরা তাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য জোর করে চাপিয়ে দিলেও এর ফলে তাদের স্বার্থ প্রথমে রক্ষা পায়নি। আগের যুগের থেকে তাদের জীবনযাত্রা আরো সহজ হয়ে উঠেছিল। তারা শুধু বিজয়ী হিসেবে বিজেতাদের প্রভৃতীই রক্ষা করে চলেনি, তারা তাদের মাঝে সভ্যতারও বিস্তার করেছিল। এটা আর্যদের সহজাত কর্মসূক্ষ্মতা, যোগ্যতা, প্রতিভা ও জাতিগত রক্তের সংরক্ষণ থেকে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু যখনি বিজিতরা বিজেতাদের স্তরে ধীরে ধীরে তাদের ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে পৌছে যায়, তখনি এতদিন ধরে বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে যে বাধা ও ব্যবধান বিরাজ করেছিল তা' সব অবনুষ্ঠ হয়ে যায়। আর্যরা তাদের জাতীয় সত্তা ও রক্তের পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ ও অমিশ্রিত করে রাখতে না পারায় তাদের নিজেদের হাতে গড়া স্বর্গ বিজেতাদের কাছেই হারিয়ে ফেলে। এভাবে তারা জাতিগত সমিশ্রণের মধ্যে ডুব দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতাকে বাড়িয়ে ফেলে। তারা তাদের উত্তর পুরুষের বংশধারা হতে বিচ্যুত ও বিছ্নিয় হয়ে দেহ ও মনের দিক থেকে তাদের দ্বারা আদিম অধিবাসীদের মত হয়ে উঠে, তারা অবশ্য কোনরকমে তাদের দ্বারা নির্মিত সৌধটিকে টিকিয়ে রাখে। কিন্তু তাদের সেই মূল সংস্কৃতির প্রাণসন্তুষ্টি প্রস্তরীভূত হয়ে যেতে থাকে ধীরে ধীরে এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রাণশক্তির সকল গৌরব বিস্তৃতির অতল গর্তে তলিয়ে যেতে থাকে; এভাবেই সমস্ত সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যের ধৰ্মস নেমে আসে। রক্তগত সংযোগজনিত জাতীয় অধঃপতনই প্রাচীন সভ্যতাগুলোর পতনের প্রধানতম কারণ। যুদ্ধে দ্বারা কখনো কোন জাতি ধৰ্মস হয় না। সম্পূর্ণরূপে জাতিগত রক্তের অশিক্ষিতা ও ওচিতা হতে যে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে, সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলায় ধৰ্মস ও অধঃপতন ঘটে প্রাচীন আর্যদের। যুদ্ধ, বড় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো জাতিগত অবক্ষয় প্রবৃত্তির এক বাস্তব প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর্যদের প্রভুত্বের কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে আর্যদের মধ্যে আস্তরক্ষা প্রবৃত্তি শুধু প্রধান নয়, তাদের প্রবৃত্তির প্রকাশের বীভূতীতিটি ও বড় অন্তর্ভুক্ত। আস্তগত দৃষ্টিকোণ

পদ্ধতিটি ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা। আদিম প্রবৃত্তিগুলির অন্যতম আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি মানুষের ব্যক্তিগত অহংবোধের বাইরে কোন কাজ করতে পারে না। আমরা এ প্রবৃত্তিকেই অহংবোধ নাম দিয়েছি। এ অহংবোধের মধ্যেই মানুষের সমস্ত কালচেতনাও সীমাবদ্ধ। এ কালচেতনার অর্থ হল এ যে বর্তমানকালই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষের জীবনে। অহংভিত্তিক এ কালচেতনার মধ্যে ভবিষ্যতের কোন স্থান নেই। সকল জীব শুধু নিজের জন্য বাঁচে, তারা একমাত্র যখন শুধু অনুভব করে তখনি খাদ্যের অনুসন্ধান করে। একমাত্র আত্মরক্ষার কারণ ছাড়া তারা যুক্ত করে না। যতদিন এ আত্মরক্ষণ প্রবৃত্তি মানুষের মনে প্রবল থাকে ততদিন কোন জনসমাজ বা সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারে না। এমন কি এ অবস্থায় কোন পরিবারও গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। কারণ নরনারীর যে সম্পর্ক কোন পরিবারকে গড়ে তোলে সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিটা ব্যক্তিগত সীমানা পার হয়ে যায় আর একটি জীবন পর্যন্ত প্রসারিত হয়। অর্থাৎ মানুষ সবসময় নিজের সঙ্গে তার জীবনের সাথীর জীবনকেও রক্ষা করে চলার চেষ্টা করে। পুরুষ নারীর জন্য খাদ্যসংগ্রহ করে এবং নারী পুরুষ উভয়ে মিলে তাদের সন্তানদের আহারের ব্যবস্থা করে থাকে। তারা সব সময় একে অন্যকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়। এভাবে আমরা সংকীর্ণ পথে হলেও এক একটি পরিবারের মধ্যে মানুষের আত্মত্যাগের প্রথম পরিচয় পাই। এ প্রবৃত্তি যখন পরিবারের সীমানা অতিক্রম করে সমাজ ও সম্প্রদায় সম্পর্কের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মধ্যে প্রসারিত হয়, তখনই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংভবপ্র হয়ে ওঠে।

মানব জাতির মধ্যে যারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর অস্তর্ভুক্ত তারা তাদের পরিবারের বাইরে আত্মত্যাগের প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে পারে না। ব্যক্তিস্বার্থকে পেছনে সরিয়ে কারোর জন্য কিছু করার ও আত্মত্যাগের প্রবৃত্তিটির যত বেশি সম্প্রসারণ সংটে ততই বড় বড় সমাজ ও সম্প্রদায় গড়ে ওঠে।

পরের জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম, কামনা বাসনা ও প্রয়োজন হলে নিজের জীবন পর্যন্ত আর্যদের মধ্যেই পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করে। আর্যদের মহত্ত্বের ভিত্তিভূমিটি কোন বুদ্ধিগত উৎকর্ষকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি। সমাজের স্বার্থেই আপন আপন বুদ্ধিগত শক্তি ও উৎকর্ষকে ত্যাগ করার সুযোগ বাসনাই হল সেই মহত্ত্বের ভিত্তি। এখানে দেখা যায় আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিটি এক মহত্তম রূপ পরিগ্রহ করেছে। কারণ আর্যরা ব্রহ্মায় সমাজের সুখ ও স্বার্থের কাছে তাদের ব্যক্তিগত অহংবোধকে বিলিয়ে দেয় এবং প্রয়োজনবোধে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়।

আর্যদের সংগঠন ক্ষমতা এবং বিশেষ করে কোন সংস্কৃতিকে গড়ে তোলায় তাদের আচর্য ক্ষমতার মূল উৎসটি একাত্মতাবে বুদ্ধিগত নয়। তা যদি হত তাহলে তাদের বুদ্ধিগত শক্তি ও উৎকর্ষ ধর্মসম্মত হতে পারত, তাহলে তারা এতখানি সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারত না। কারণ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ ও সেবায় ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মতামত বিসর্জন দেবাব অকৃষ্ট প্রস্তুতি ও প্রবৃত্তির ওপরেই নির্ভর করে মানুষের সকল সাংগঠনিক ক্ষমতার সার্থকতা। সমাজের উন্নতি ও সেবায় আনন্দিয়োগ করার প্রশিক্ষণ সে পায়। এক্ষেত্রে সে প্রত্যক্ষভাবে নিজের জন্য বা ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের জন্য কাজ করে না। তাদের সকল উৎপাদক কর্মশক্তি সমাজের সকল মানুষের কর্মের একটি অংশ বলে মনে করে। সে নিজেকেই এ সাজের এক অংশ হিসেবে ধরে নেয়। ‘কর্ম’ শব্দটির অভিনিহিত অর্থ- নিজের উপার্জনের জন্য কোন কাজ করা নয়, এ শব্দের অর্থ হল এমন কিছু করা যাতে ব্যক্তিগত

স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের স্বার্থও পূরণ হবে। যখন কোন মানুষের কোন কর্ম একান্তভাবে আত্মবক্ষণ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের জন্য পরিচালিত হয়, তখন তার সে কাজকে চৌর্যবৃত্তি বলে।

সমাজের স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলার এ নীতি ও প্রবৃত্তিই প্রকৃত মানব সভ্যতার প্রধানতম ভিত্তি। এ নীতি ও প্রবৃত্তির ফলে বিশ্বের এমন অনেক অক্ষয় কীর্তি গড়ে উঠেছে যার জন্য তার স্মষ্টারা জীবিতকালে কোন প্রতিদান বা প্রতিফল লাভ করে যেতে পারেন; তাদের মৃত্যুর পর তাদের বৎশর্দেরো সেইসব কীর্তির সুফল ভোগ করে। এ নীতি ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই মানুষ এমন অনেক কাজ করে যার জন্য সৎ ও দীনহীন জীবিকা ছাড়া প্রতিদানে কিছুই সে পায় না। কিন্তু এ সৎ জীবিকাই সমাজের ভিত্তিভূমিকে দৃঢ় করে তোলে। কোন কৃষক, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্তা বা সরকারি কর্মচারী যিনিই হোন না কেন— যখন কোন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত সুখ সম্মুদ্দিশ কথা চিন্তা না করে সমগ্র সমাজের বা মানবজাতির জন্য কাজ করে তখন তারাই এক সুমহান নিঃস্থার্থ কর্মপ্রবৃত্তির মূর্ত প্রতীক। অনেক সময় মানুষ তার এ প্রবৃত্তিও কর্মতৎপরতার তাৎপর্য না জেনেই তার পরিচয় দিয়ে থাকে।

খাদ্যসংগ্রহ, মানবজাতির উন্নতির প্রাথমিক ভিত্তি রচনা বা মানব সভ্যতা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি যে কোন কাজের ক্ষেত্রে মানুষ নিঃস্থার্থভাবে যা কিছু করে তাতেই তার ত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের স্বার্থে প্রাণ বিসর্জনই হল এ ত্যাগের সুমহান প্রবৃত্তির সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তবরূপ। একমাত্র এ ত্যাগের মাধ্যমেই মানুষ যুগ যুগ ধরে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছে, সে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সে রক্ষা করে যেতে পারবে। এভাবে কাজ করে গেলে মানুষের সভ্যতাকে প্রকৃতি বা মানুষ কেউ কখনো ধ্বংস করতে পারবে না।

জার্মান ভাষায় একটি শব্দ আছে যার অর্থ হল ব্যক্তিস্বার্থ থেকে সমাজের সর্বসাধারণের স্বার্থ সবসময় বড়। যে মৌন প্রবৃত্তি থেকে এ ধরনের কর্মের উদ্ভব হয়, অহং ও আদর্শের পার্থক্যাই সেই প্রবৃত্তির উৎস। এর অর্থ সমাজের স্বার্থে যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকার এক স্বীকৃত বাসনা।

এ বিষয়ে একটি কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হল এ যে আর্শীবাদের অর্থ ভাবানুরাগের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ নয়, আদর্শবাদের প্রকৃত অর্থ হল মানব সভ্যতার জন্য অত্যাবশ্যক এক ভিত্তি। এ আর্শীবাদ হতেই ‘মানবিক’ শব্দটির উৎপত্তি। এ মনোভাবের জন্য সারা বিশ্বে আর্যদের এত প্রতিষ্ঠা। ‘মানবজাতি’ এ ধারণাটির জন্য সারা বিশ্ব আর্যদের নিকট খনী। মানবতার এ আদর্শ থেকে এমন একটি সৃষ্টিশীল শক্তির উদ্ভব হয় যে শক্তির সাহায্যে মানুষ তার দেহগত শক্তির সঙ্গে বুদ্ধিগত শক্তির মিলন ঘটিয়ে মানব সভ্যতার সৌধৃতিকে গড়ে তোলে।

এ আদর্শবাদ ছাড়া মানুষের সকল বুদ্ধিগত সৃষ্টি শক্তিহীন বক্ষ্যা বাইরের ঘটনায় পর্যবেক্ষিত হবে এবং ঘটনার কোন বিশেষ মূল্য বা বৃহত্তর কোন তাৎপর্য থাকবে না।

প্রকৃত আদর্শবাদের অর্থই হল ব্যক্তি স্বার্থকে সমষ্টি স্বার্থের অধীনস্থ করে তোলা। তাই সমাজের বৃহত্তর স্বার্থপূরণের আদর্শ প্রকৃতির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য পূরণের পথে নিয়ে যায় মানুষকে।

যে আদর্শবাদ যত বিশুদ্ধ, তা' তত গভীর জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত। একটি বালককে ভাববাদী শাস্তিবাদীরা যতই বোঝাক না কেন, সে তাদের কথা ভালোভাবে না বুঝালে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তার জাতির আদর্শের খ্যাতিতে প্রাণ বিসর্জন দিবে।

কোন কিছু না বুঝলেও বালকটি অস্তত এ কথাটা বেশ বোনে যে প্রয়োজন হলে কোন ব্যক্তিজীবনের বিনিময়ে একটি প্রজাতিকে বাঁচাতে হবে। সে তাই ভাবনাদী শাস্তিবাদের নীতিকথার প্রতিবাদ করবে। যে স্বার্থবাদীরা এক একজন ছদ্মবেশী দ্বার্থগতিক অহংবেশী কাপুরুষকে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধিতা করে চলেছে। মানবসভাতার দিব উন্নের জন্য যা অত্যাবশ্যক তাহল এ যে সমাজের স্বার্থে আত্মত্যাগের আদর্শে একটি ব্যক্তি উদ্বৃক্ষ হয়ে ওঠে। এ আদর্শকে ত্যাগ করে কোন মানুষ কখনই সেই ভওদের কথা শুনবে না বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে না যারা প্রকৃতির থেকে বেশি জানার ভান করে এবং যারা ধৃষ্টতাবশত প্রকৃতির বিধানের সমালোচনা করে।

একমাত্র যথন এ আদর্শ লুণ্ঠ হয়ে যেতে বসে, তখনি সেই শক্তির মধ্যে আমরা একটি চিত্র দেখতে পাই-- যে শক্তি ছাড়া কোন সভ্যতাই টিকে থাকতে পারে না। যে মুহূর্তে মানুষের স্বার্থপরতা ও অহংবোধ সমাজে প্রাধান্য লাভ করে, সেই মুহূর্তে সমাজ সম্পর্কের বক্রনাটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তখন মানুষ সমাজকে বাদ দিয়ে আত্মসূখের সকান করতে গিয়ে স্বর্গ থেকে নরকে পতিত হয়।

যারা সারাজীবন সুখের সকান করে যায়, ভবিষ্যত বংশধরেরা তাদের মনে রাখে না। তারা মনে রাখে তাদেরই কথা, সেইসব বীরদের কথা, যারা তাদের ব্যক্তিগত সুখ জলাঞ্জলী দিয়েছিল।

ইহদিরা জাতি হিসেবে আর্যদের সম্পূর্ণ বিপরীত। সারা পৃথিবীতে আর এমন একটি জাতিও নেই যাদের মধ্যে আত্মসংরক্ষণের প্রবৃত্তিটি এতখানি প্রবল। যারা মনে করে তারা ঈশ্বরপ্রেরিত জাতি। পৃথিবীতে এমন কোন জাতি আছে হাজার বছরের মধ্যেও যে জাতির চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। আর কোন জাতি সর্বাঙ্গিকভাবে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছে? কিন্তু এত বিবাট পরিবর্তন সত্ত্বেও ইহদি জাতি যেখানে ছিল সেখানেই আছে, তাদের মনপ্রাণের কোন পরিবর্তনই হয়নি। তাদের জাতিগত সংরক্ষণ ও বাঁচার প্রবৃত্তি এমনই দৰ্ঘৰ।

ইহদিদের বুদ্ধিগত কাঠামোটা হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে। আজকাল লোকে ইহদিদের ধূর্ত্ব বলে। অবশ্য একদিক দিয়ে ইহদিরা বহু যুগ থেকে তাদের ধূর্ত্বামীর পরিচয় দিয়ে আসছে। তাদের বুদ্ধিগত শক্তি ও চাতুর্যের কাঠামোটি তাদের কোন অন্তর্নিহিত বিবর্তনের ফল নয়, যুগে যুগে বাহিরের অভিজ্ঞতা ও ঘটনা থেকে যে বাস্তব শিক্ষা লাভ করেছে, তার উপাদানেই গড়ে উঠেছে তাদের বুদ্ধিগত কাঠামোটি। মানুষের মন বা আত্মা পর পর ক্রমপর্যায়ের স্তরগুলো পার না হয়ে কথনো ওপরে উঠতে পারে না। ওপরের যে কোন স্তরে উঠতে হলে আগে তার নিচের স্তরটি অতিক্রম করতে হবে। যে কোন সভ্যতার ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে অতীতের একটি জ্ঞান আছে। মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই তার সকল চিন্তাভাবনার উত্তর হয়। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত পুঁজীভূত অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষের বেশি চিন্তা ভাবনা গড়ে ওঠে। সভ্যতার সাধারণ স্তরের কাজ হল প্রতিটি মানুষকে এমন এক প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা, যার ওপর ভিত্তি করে সে সকলের সঙ্গে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির মান এগিয়ে নিয়ে চলতে পারে। যারা আজকের যুগের অগ্রগতিকে বুঝতে চায় ও সেই অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে চায়, তাদের কাছে এসব জীবন-জিজ্ঞাসা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কোন প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ বা মনীষী সহসা তার

নন্দন থেকে যদি উঠে আসেন, তিনি এ যুগের অগ্রগতির কথা কিছুই বুঝতে পারবেন না। অতঃপরে কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে এ যুগে এসে এ যুগের গতিপ্রকৃতি বুঝতে হলে তাকে অনেক প্রাথমিক জ্ঞান সঞ্চয় করতে হবে, যে জ্ঞান আজকের যুগে ছেলেরা আপনা থেকে খুব সহজ ভাবে পেয়ে যায়।

ইহন্দি জাতির নিজস্ব কোন সত্যতা ছিল না। কেন ছিল না তা আমি পরে বলব। যেসব সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব বিভিন্ন দেশ চোখে দেখেছে বা হাতের কাছে পেয়ে গেছে— সেই সব কৃতিত্বের দ্বারাই তাদের এ বৃদ্ধিবৃত্তিকে উন্নত করেছে।

এর উল্লেখটানো কথনো দেখা যায়নি।

যদিও ইহন্দিদের আঙ্গোন্তির প্রকৃতি অন্যান্য জাতির থেকে আরো প্রবল এবং তাদের বৃদ্ধিবৃত্তি অন্যান্য জাতির থেকে কিছুমাত্র কম নয়, তথাপি একটা দিক দিয়ে বড় রকমের একটা অভাব দেখা যায় তাদের জাতীয় চরিত্রে। সাংস্কৃতির উন্নতির জন্য যে জিনিসটার সবচেয়ে বেশি দরকার সেই আদর্শবোধ তাদের একেবারেই নেই। ইহন্দিদের মধ্যে দেখা যায় তাদের আঘ্যত্যাগের প্রবৃত্তিটি আঘ্যসংরক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠতে পারে না তারা কথনো। তাদের মধ্যে যে ‘জাতীয় সংহতি দেখা যায় তা’ আদিম সঙ্গপ্রবণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা উল্লেখযোগ্য যে, যতদিন কোন বিপর্যয় তাদের জাতীয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে দেবার ভয় দেখায়, ততদিনই তারা পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সংহত থাকে। এ জাতীয় বিপর্যয়ই তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবকে অপরিহার্য করে তোলে। একদল নেকড়ে যেমন একমোগে তাদের শিকারের বস্তুকে আক্রমণ করার পর তাদের ক্ষুধা মিটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দল থেকে পৃথক হয়ে পড়ে, তেমনি ইহন্দিরাও ঠিক তাই করে।

ব্যক্তিগত আঘ্যবক্ষার জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকু ত্যাগ করতেই তারা প্রস্তুত সব সময়। তার বেশি নয়। ইহন্দিরা একমাত্র তখনই ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠে যখন কোন সাধারণ এক বিপদ তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় অথবা কোন সাধারণ শিকারের বস্তু তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু যখন সেই বিপদ কেটে গিয়ে শিকারের বস্তু হাতের মুঠোয় এসে পড়ে, তখন তাদের আপাতদৃষ্টি সাময়িক সংহতি বোধ উবে যায় মুহূর্তে। তখন দেখা যায় যে জাতি একদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেছে আজ তারাই পরিপ্রের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে মন্ত হয়ে উঠেছে।

ইহন্দিরা ছাড়া পৃথিবীতে যদি অন্য কোন জাতি না থাকত তাহলে তারা নিজেরা মারামারি করে একে অন্যকে ধ্রংস করে ফেলত; অবশ্য যদি হঠাৎ কোন আঘ্যত্যাগের আদর্শে উদ্বৃদ্ধ ও দীক্ষিত হয়ে সব ঝগড়া মারামারি নিজেরা বন্ধ করে ফেলত তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। সুতরাং কেউ যদি ইহন্দিদের পারস্পরিক সহযোগিতার সাময়িক নীতিটাকে আঘ্যত্যাগের আদর্শ বলে মনে করে বা ‘ব্যাখ্যা করে তা’হলে সে ভুল করবে।

তারা যা কিছু করে ব্যক্তিগত অহংকারের দ্বারা প্রশংসিত হয়েই করে। আর এ জন্যই দেখা যায় ইহন্দিদের রাষ্ট্রের কোন নির্দিষ্ট ভৌম সীমানা নেই। যে রাষ্ট্রের কোন ভৌম সীমানা নেই, সে রাষ্ট্র কথনো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। যদি না সে রাষ্ট্রের নাগরিকদের সকল মর্মপ্রেরণা ও কর্ম প্রবণতা কোন ত্যাগের আদর্শের দ্বারা পরিচালিত না হয়। এ আদর্শ যে জাতির নেই সে জাতির সভ্যতাও তার ভিস্তৃতি হারিয়ে ফেলে।

এ কারণে ইহুদিদের বৃক্ষিবৃত্তি যথেষ্ট থাকলেও তাদের নিজস্ব কোন সংকৃতি নেই। ইহুদি জাতির মধ্যে আজ যে সংকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, সে সংকৃতি তাদের নিজস্ব সৃষ্টি নয়, তা' অন্য সব জাতির দান। শুধু তাই নয়, তাদের হাতে পড়ে সেই সংকৃতির মানের অধোগতি ঘটেছে।

মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে ইহুদিদের স্থান কোথায় এ বিষয়ে যদি আমরা আলোচনা করতে যাই, তা'হলে আমাদের একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে শিল্পের ক্ষেত্রে ইহুদিদের কোন নিজস্ব সৃষ্টি নেই। স্থাপত্য ও সঙ্গীতবিদ্যা কলাবিদ্যার এ দু'টি প্রধান ক্ষেত্রে ইহুদিদের কোন মৌলিক সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। শিল্পের ক্ষেত্রে যখনি তারা কিছু সৃষ্টি করতে আসে তখনি তারা অন্য জাতির কোন না কোন শিল্পবিত্তিকেই ভিন্ন উপায়ে তৈরি করার চেষ্টা করে। যেসব জাতি সভ্যতার স্রষ্টা ও প্রবর্তক, যারা সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী, তাদের যেসব গুণ আছে ইহুদি জাতির তা' নেই।

কি পরিমাণে ইহুদিরা অপর জাতির সভ্যতাকে আঘাসাং করতে পেরেছে বা তার অবনতি ঘটিয়েছে তা' বোঝা যাবে একটা বিষয়ে। তারা বানরদের মত শুধু অনুকরণ প্রবৃত্তিরই পরিচয় দিয়ে থাকে। যে গতিশীল সৃষ্টিশীলতা কোন মহৎ নাট্যসৃষ্টির জন্য একান্তভাবে আবশ্যক তা' তাদের নেই। ওপরে যে যত কলাকৌশলই দেখাক না কেন, তাদের সৃষ্টি শিল্পবস্তুর কোন প্রাণ নেই। অথচ তাদের সংবাদপত্রগুলো তাদের এ অপূর্ণতাকে ঢাকার জন্য এগিয়ে আসে। এ অপূর্ণতা ঢাকা দেবার জন্য এক মিথ্যা সাফল্যের জয়ঠাক পেটায়। তখন পৃথিবীর সবাই মনে করে যে শিল্পীর এত প্রচার তার মধ্যে নিচয় কোন বস্তু আছে। অথচ আসলে সে শিল্পী কৃশ্লী নকল-নবীশমাত্র।

যে সৃষ্টিশীল শক্তি কোন সভ্যতার প্রবর্তন বা মানব জাতির উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক— ইহুদিদের তা' নেই। ইহুদিদের কোন আদর্শ না থাকায় তারা সূজনাত্মক কোন কাজে নিযুক্ত না হয়ে ক্ষঁৎসাত্মক থাতেই প্রবাহিত হয়ে থাকে।

ইহুদিদের কথনে কোন স্থায়ী রাষ্ট্র ছিল না বলেই তাদের কোন নিজস্ব সভ্যতা গড়ে উঠেনি। অথচ ইহুদিরা আবার ঠিক যায়াবরও নয়। যায়াবরেরা এক-এক সময়ে এক-এক জায়গায় বাস করে, যদিও সে জায়গা কোন ভৌম সীমানা দিয়ে ঘেরা যাবে না। তারা সে জায়গায় চাষ আবাদ করে না। তার স্বপক্ষে তাদের যুক্তি এ যে ভূমি উর্বর না হওয়ায় প্রতি বছর সমান ফসল ফলান যেতে পারে এমন কোন কথা নেই। এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের নিচয়তা না থাকলে কোন মানুষের পক্ষে এমন কোন জায়গায় বসবাস করা সম্ভব নয়। আর্যরাও প্রথমে যায়াবর জীবন-যাপন করত। আমরা জানি আমেরিকায় উপনিবেশিক যুগের প্রথম যুগে মানুষ শিকারের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করত। পরে তারা আরো শক্তিবৃদ্ধি করে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে আদিম অধিবাসীদের তাড়িয়ে দেয়। এভাবে ধীরে ধীরে তারা সারা দেশ জুড়ে বসতি স্থাপন করে।

কিন্তু আর্যরা প্রথমে যায়াবর জীবনযাত্রা করলেও তারা ইহুদিদের মত ছিল না। ইহুদিরা কোনদিন ঠিক যায়াবর ছিল না।

ইহুদীরা যায়াবর নয়, তারা পরগাছা বা পরজীবি। তারা একটির পর একটি রাজ্য ত্যাগ করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গেছে; তার কারণ এটা নয় যে কোন এক নীতির বশবর্তী হয়ে গেছে। স্বেচ্ছায় তারা স্থান ত্যাগ করেছে। স্থানীয় অধিবাসীদের চাপে পড়েই সেইস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে তারা।

ইহুদিরা কখনো কোনদিন যায়াবৰ ছিল না, কারণ তারা যে জায়গা দখল করতে পারত, সে জায়গা ছাড়াৰ কথা মনেও ভাবত না। তবে একটু সুযোগ পেলেই আশেপাশের জায়গাও দখল করে ফেলত। তখন তাদের সে জায়গা থেকে বিতাড়িত করা অন্য জাতিৰ পক্ষে অসম্ভব হয়ে গঠে। তারা এমন এক দৃষ্টি জাতি যাবা তাদেৱ আশ্রয় দেয় তাদেৱ অবিলম্বে মেৰে ফেলে।

ভাবাৰে দেখা যায় ইহুদিৰা সব সময় পৱেৱ রাজো বাস করে এসেছে এবং আশেপাশেৱ আৱো কিছু রাজ্য দখল করে নিয়েছে। কিন্তু এ সব রাজাগুলোৰ মধ্যে তারা ধৰ্মস্পন্দনায়েৱ মুখোস পৱিয়ে তাদেৱ একটা নিজস্ব বাট্টা গড়ে তুলত। যখন তারা উপযুক্ত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে, তখন তারা সে মুখোস খুলে ফেলে আপন স্বৰূপে আঞ্চলিক কৰত, তাদেৱ এ রূপ দেখতে কেউ চায়নি।

যে জীবন ইহুদিৰা যাপন কৰত সে জীবন হল পৱগাছাৰ জীবন। এ জন্য এক বিৱাট মিথ্যাৰ ওপৱে গড়ে উঠেছিল ইহুদিদেৱ জীবন। দৰ্শনিক শোপেন হাওয়াৱেৱ মতে ইহুদিৰা বিৱাট মিথ্যাবাদী।

তারা অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্ৰেৱ মধ্যে বাস কৰতে পারত যতদিন তারা এ কথা বলে ভুল বুঝিয়ে বাবতে পারত যে তারা কোন পৃথক জাতি নয়, তারা এক বিশেষ ধৰ্মতেৱ প্ৰতিনিধিমতা।

যাতে অন্যেৱ মধ্যে পৱগাছা হয়ে থাকতে পাৱে দেজন্য ইহুদিৰা নিজেদেৱ স্বৰূপ প্ৰকাশ কৰত না। তারা জানত ব্যক্তিগতভাৱে তারা যত বৃদ্ধিমান হয়ে উঠবে ততই তারা অপৱকে ঠকাতে পাৱবে। তারা এতদূৰ মানুষকে প্ৰতাৱিত কৰতে সফল হত যে তারা যে জাতিৰ আশ্রয়ে থাকত তাদেৱ এ ধাৰণা হত যে ইহুদিৰা ফৰাসী হতে পাৱে, আবাৱ ইংৰেজও হতে পাৱে। ওদেৱ জাতিভেদ বলে কোন জিনিস নেই। ওদেৱ সঙ্গে তাদেৱ একমাত্ৰ অৰ্থ ছাড়া অন্য বিষয়ে কোন সাৰ্থকতাই নেই। যে সমস্ত রাষ্ট্ৰৰ প্ৰশাসন ঘন্টে কাৰ্যৱত লোকদেৱ কোন ঐতিহসিক কাল নেই, ইহুদিৰা হল সেই জাতেৱ। ব্যাভেইয়াৱ সৱকাৱেৱ অনেক কৰ্মচাৱী জানে না যে ইহুদিৰা এক স্বতন্ত্ৰ জাতি, তারা শুধু এক বিশেষ ধৰ্মতেৱ প্ৰতিনিধি মা৤্ৰ। কিন্তু ইহুদিদেৱ পত্ৰ-পত্ৰিকাগুলি একথা মানতেই চায় না। বহু প্ৰাচীনকালে ইহুদিৰা সাৱা পৃথিবী পৱিত্ৰণ কৰতে গিয়ে এমন সব উপায়েৱ আৰিষ্ঠাৰ কৰে যাব দ্বাৱা তারা যেখানে থাকে সেখানকাৱ মানুষেৱ কাছে থেকে সহানুভূতিকৃত লাভ কৰে।

কিন্তু ধৈৰ্যেৱ ক্ষেত্ৰেও ইহুদিৰা পাৱেৱ অনুকৰণ কৰেছে। তাদেৱ ধৰ্ম ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্ৰ জুড়ে প্ৰসাৱিত হয়। ইহুদিদেৱ চেতনা ও অনুভূতি হতে ব্যতৰ্ক্ষতভাৱে উত্তৃত কোন ধৰ্ম বিশ্বাস গড়ে ওঠেন্তি। এ পাৰ্থিব জীবন ও জগতেৱ বাইৱে এক মহাজীবনেৱ বিশ্বাস একেবাৱে অপৰিচিত তাদেৱ কাছে। আৰ্যদেৱ মতে মৃত্যুত্বীৰ্ণ এক মহাজীবনেৱ প্ৰতি বিশ্বাস ছাড়া কোন ধৰ্মতেৱ বন্দনা সম্ভব নয়। ইহুদিদেৱ ধৰ্মশাস্ত্ৰে এ মৃত্যুত্বীৰ্ণ মহাজীবনেৱ কোন কথা সেখা নেই। তাতে শুধু এ পাৰ্থিব জীবন-যাপনেৱ জন্য কতগুলো আচৱণবিধি লেখা আছে।

ইহুদিদেৱ ধৰ্মশিক্ষাৰ মূল কথা হল এমন কতগুলো নীতি-উপদেশ যাব দ্বাৱা তারা তাদেৱ জাতিগত রক্তেৱ শুচিতা অক্ষুণ্ণ রেখে জগতেৱ অন্যান্য জাতিদেৱ সঙ্গে মিশতে পাৱে। ইহুদি অ-ইহুদিদেৱ সঙ্গে কিভাৱে মেলামেশা কৰবে তাৰ কথা সব বলা আছে। কিন্তু ইহুদিদেৱ ধৰ্মশিক্ষাৰ মধ্যে কোন নীতিকথা নেই, আছে শুধু অৰ্থনীতিৰ কথা। এ কাৱণে ইহুদিদেৱ ধৰ্ম আৰ্যদেৱ ধৰ্মেৱ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। এ কাৱণেই খন্টধৰ্মেৱ প্ৰবৰ্তক ইহুদি জাতি

সম্পর্কে যথাযোগ্য মূল্যায়ন করে এবং সমস্ত মানবজাতির শক্তি এ জাতিকে দৈশ্বরের ব্র্গরাজ্য হতে বিভাড়ি করে। তার কারণ ইহুদিরা সব সময় ধর্মকে ব্যবসা ও কাজকারবারের কাজে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ইহুদি জাতির লোকেরা খুঁটকে দ্রুশবিদ্ধ করে, সেই খ্রিস্টানরা পর্যন্ত ইহুদি জাতির লোকদের কাছে নির্বাচনের সময় ভোটভিক্ষা করতে যায়। এমন কি তারা নাস্তিক ইহুদি জাতির সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করে সময় খ্রিস্টান জাতির বিশুদ্ধিকরণ করে থাকে।

ইহুদিদের এ ধর্মগত ভগুমীর ওপর আরো অনেক মিথ্যা পরবর্তীকালে জমা হতে থাকে। এসব মিথ্যা অন্যতম হল ইহুদিদের ভাষা। ইহুদিদের কাছে ভাষা মানুষের মনের গভীর ভাব ও চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের মাধ্যমে নয়। সে ভাব ও ভাবনা দেকে রাখার উপায়মাত্র। ইহুদিরা যতদিন অন্য কোন জাতিকে জয় করতে পারে না ততদিন তাদের দেশে গিয়ে তাদের ভাষা রঞ্জ করে।

ইহুদি জাতির সময় অস্তিত্ব যে মিথ্যায় ভরা তার প্রমাণ হল ইহুদিদের ধর্মশাস্ত্র কোন ধ্যানতন্ত্রযুক্ত থেকে এ শাস্ত্রবাক্যের উত্তর তা' কেউ জানে না। তবে এর থেকে ইহুদিদের ভাবধারা ও জাতীয় চরিত্রের অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়। তার সঙ্গে যে লক্ষ্যের দিকে তাদের সকল জাতীয় কর্মধারা প্রবাহিত হচ্ছে তাও জানা যায়। এমন কি তাদের সংবাদপত্রগুলোও এ শাস্ত্রের কোন মহত্ব বীকার করতে চায় না। যে মুহূর্তে বিশ্বের মানুষ এ শাস্ত্র হতে পাবে এবং তাতে কি আছে তা' সব জানতে পারবে সেই মুহূর্তে ইহুদি জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এ পৃথিবী থেকে।

ইহুদিজাতিকে ভাল করে জানতে হলে কয়েক শতাব্দী আগে থেকে তাদের গতিবিধির কথা জানতে হবে। তাদের এ গতিবিধির ইতিহাসটিকে কয়েকটা স্তর বা পর্যায়ে ভাগ করে দেখালে ভাল হয়।

জার্মানিয়া নামে অভিহিত প্রথম কয়েকজন ইহুদি আসে রোমান আক্রমণের সময়। তারা আসে বণিকের বেশে, আপন জাতীয়তা গোপন করে। ইহুদিরা যখন আর্যদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসে একমাত্র তখনি তাদের কিছু উন্নতি দেখা যায়।

(ক) স্থায়ী বসতি স্থাপিত হওয়া মাত্র ইহুদিরা সেখানে বণিকের বেশে উপস্থিত হয়। তারা তখন সাধারণত দু'টি কারণে তাদের জাতীয় স্বত্ত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়। প্রথমত তারা অন্যান্য জাতির ভাষা জানত না। একমাত্র ব্যবসাগত ব্যাপার ছাড়া আর অন্য বিষয়ে কোন কথা বলত না বা মিশত না কারো সঙ্গে। দ্বিতীয়ত তাদের স্বভাবটা ছলচাতুর্যে ভরা ছিল বলে কারো সঙ্গে মিল হত না তাদের।

(খ) ধীরে ধীরে তারা স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু অর্থনীতির ফেরে তারা কোন উৎপাদকের ভূমিকা গ্রহণ করেনি, গ্রহণ করে দালানের ভূমিকা। হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবসা করা সত্ত্বেও তাদের ব্যবসাগত চাতুর্য আর্যদের হার মানিয়ে দেয়। কারণ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আর্যরা সবসময় সতত মেনে চলত। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারটা যেন ইহুদিদেরই একচেটিয়া কারবারে পরিণত হয়। তা'ছাড়া তারা চড়া সুন্দে টাকা দিতে থাকে। ধার করা ঢাকায় সুন্দের প্রবর্তন তাদেরই কীর্তি। এ সুন্দপ্রথার অন্তর্নিহিত জটিলতার কথাটা ভেবে দেখা হয়নি, সাময়িক সুবিধার জন্য এ প্রথা তখন মেনে নিয়েছিল সবাই।

(গ) এভাবে ইহুদিরা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে নিজেদের। ছোট বড় বিভিন্ন শহরের এক একটা অংশে বসতি গড়ে তোলে তারা। এক একটা রাষ্ট্রের মধ্যে গড়ে ওঠে এক একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। তারা ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারটাতে যেন একমাত্র তাদেরই অধিকার, আর এ অধিকার বশে প্রমত্ত হয়ে তার স্বর্ণ সুযোগ নিতে থাকে।

(ঘ) ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিপত্য লাভ করলেও ইহুদিরা যুক্তের কারবারের জন্য হয়ে হয়ে ওঠে জনগণের কাছে। ক্রমে ইহুদিরা ভৃ-সম্পত্তি অর্থাৎ জমি জায়গা প্রভৃতি নিয়েও কেনাবেচে করা শুরু করে। তারা অনেক জমি কিনে কৃষকদের খাজনার বন্দোবস্ত করে বিলি করতে থাকে। যে কৃষক তাদের বেশি খাজনা দিত, সেই কৃষক জমি চাষ করতে পারত। ইহুদিরা কিন্তু নিজেরা জমি চাষ করত না। তারা শুধু জমি নিয়ে ব্যবসা করত। ক্রমে ইহুদিদের অত্যাচার বেড়ে উঠলে ঝুঁপগ্রস্ত জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাদের বিরুদ্ধে। তৎক্ষণাত্ম স্থানীয় অধিবাসীরা ইহুদিদের স্বরূপ বুবত্তে পারে। তাদের সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। ইহুদিদের জাতীয় চরিত্রের অশুভ বৈশিষ্ট্যগুলোকে তখন তারা খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।

চরম দূরবহুর মধ্যে পড়ে জনগণ প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং ইহুদিদের বিষয়সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেয়। তখন তারা ইহুদিদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে থাকে এবং তাদের দেশে ইহুদিদের উপস্থিতি বিপজ্জনক বলে ভাবতে শুরু করে।

(ঙ) ইহুদিরা এবার খোলাখুলিভাবে আপন স্বরূপে আঘাতকাশ করে। তারা সরকারকে হাত করে, তোষামোদ দ্বারা প্রশাসনের লোকজনদের বশীকৃত করে টাকা উৎকোচ দ্বারা অনেক অসৎ কাজ করিয়ে নেয়। এভাবে তারা শোষণের সুবিধা করে নেয়। ক্রুদ্ধ জনগণের কোপে পড়ে তারা একসময় বিতাড়িত হতে বাধ্য হলেও আবার তারা ফিরে আসে। আবার তারা সেই ঘৃণ্ণ ব্যবসা শুরু করে দরিদ্র জনগণকে শোষণ করতে থাকে।

এ ব্যাপারে ইহুদিরা যাতে বেশি দূর এগোতে না পারে তার জন্য আইন প্রণয়ন করে কোন ভৃ-সম্পত্তির অধিকার হতে বন্ধিত করা হয়।

(চ) রাজা মহারাজাদের শক্তি যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ইহুদিরা তাতেই তাদের দিকে ঢেলে। তাদের তোষামোদ করতে থাকে। তাদের কাছ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ ও সুবিধে লাভের চেষ্টা করে। মোটা মোটা টাকার বিনিয়মে রাজা রাজরাও তাদের সেইসব সুযোগ দিতে থাকে। কিন্তু ধূর্ত ইহুদিরা রাজাদের যত টাকাই দিক, অন্ত সময়ের মধ্যে তারা কম শোষণ করে না। রাজাদের টাকার দরকার হলেই নতুন সুবিধালাভের জন্য ইহুদিরা আবার তাদের টাকা দিত। এভাবে রক্তচোষা জোঁকের মত একধার থেকে সকল শ্রেণীর লোককে শোষণ করত তারা।

এ বিষয়ে জার্মান রাজাদের ভূমিকা ইহুদিদের মতই ছিল সমান ঘণ্ট। তাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই এতখানি উদ্ধৃত হয়ে ওঠে ইহুদিরা এবং তাদের জন্য জার্মান জনগণ ইহুদিদের শোষণ থেকে মুক্ত করতে পারছিল না নিজেদের। পরে অবশ্য জার্মান রাজারা শয়তানদের কাছ থেকে নিজেদের বিক্রি করে বা চিনে নিয়ে তার প্রতিফল হাতে হাতে পায়। শয়তানদের প্রলোভনে তাদের দেশের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে একথা বুবত্তে পারে।

(ছ) এভাবে জার্মান রাজারা ইহুদিদের প্রলোভনে ধরা দিয়ে শুদ্ধা ও সমান হারিয়ে ফেলে। শুদ্ধা ও সমান লাভের পরিবর্তে তাদের ঘৃণা করতে থাকে দেশের জনগণ। কারণ

রাজারা তাদের প্রজাদের স্বার্থ রক্ষা করতে সমর্থ তো হয়ইনি, বরং প্রকারাত্তরে দেশের জনগণকে শোষণ করতে সাহায্য করত ইহুদিদের। এদিকে চতুর ইহুদিরা বুন্ধনে পেরেছিল জার্মান রাজাদের পতন আসন্ন। অভিব্যক্তি জার্মান রাজারা যে অর্থ অপব্যয় করে উড়িয়ে দিয়েছে, সেই অর্থ জোগাড়ের জন্য তাদের একজনকে ধরে নিজেদের উন্নতি ত্বরিত করে তুলতো তারা। টাকা দিয়ে তারা বড় বড় সম্পদও লাভ করতে থাকে। সমগ্র জার্মান সমাজ দুষ্পিত হয়ে পড়ে ঘৰে বাইরে।

(জ) এ সময় হঠাতে এক রূপাত্তর দেখা দেয় ইহুদিদের জগতে। এতদিন তারা সবদিক দিয়ে তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্রপ্রত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলেছিল। কিন্তু এবার তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। খ্রিস্টান চার্চের যাজকেরা এক নতুন মানবসত্ত্বান লাভ করে। ফ্রেডারিক দ্য প্রেট-এর আমলে কিন্তু জার্মান জনসাধারণ ইহুদি বলেই জানতো। সরকার গঠন করে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করতে না পারায় প্রতিবাদে ফেটে পড়ে প্রেট। প্রেটকে এককথায় কিছুতেই প্রতিক্রিয়াশীল বলা যেতে পারে না। রাজসভাতে ইহুদিরা যতই সম্মান পাক দেশের জনগণ কিন্তু তাদের বিদেশী বলেই মনে করত।

কিন্তু ইহুদিরা এবার জার্মান ভাষা শিক্ষা করতে শুরু করে। ব্যক্তিগত রক্তের সংমিশ্রণ না ঘটিয়েও তারা অপর জাতির ভাষা শিক্ষা করতে থাকে। কিন্তু এ ভাষা শিক্ষার ফলে তাদের অন্তরসত্ত্বার বা স্বত্বাবের কোন পরিবর্তন হয় না। তারা এ নতুন ভাষার মাধ্যমে তাদের প্রাচীন তাৎক্ষণ্য প্রকাশ করতে থাকে।

কিন্তু ইহুদিরা কেন জার্মান ভাষা শিক্ষা করতে গেল তার কারণটা খুঁজে বার করা এমন কিছু কঠিন নয়। ইহুদিরাই জার্মান রাজশক্তির পতন ঘটিয়েছিল। এখন শুধু তাদের ওপর নির্ভর করে থাকাটা উচিত হবে না। তখন তারা যদি সমাজের সর্বস্তরে তাদের অর্থনৈতিক অধিপত্যকে প্রসারিত করে দিতে চায় তাহলে দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করতে হবে। সমাজের বুকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার জন্য এক নতুন ভিত্তিভূমি খাড়া করতে হবে আর এ জন্য চাই ভাষাশিক্ষা।

তারা একই সঙ্গে তাই আত্মসংরক্ষণ এবং আন্তর্প্রসাদের নীতি অবলম্বন করতে চায়। তারা যতই ওপরে উঠতে থাকে ততই তাদের উচ্চাভিলাষের উচ্চতাটা মোহম্ময় হয়ে ওঠে তাদের চোখের সামনে। একদিন প্রাচীনকালে বিশ্বজয়ের ও বিশ্বশাসনের যে অস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া তাদের গোচর হয়েছিল, তখন সেই সুযোগের অপূর্বক্ষণ এসে গেছে বলে মনে হয় তাদের।

এভাবে রাজসভা থেকে জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে ছাড়াপত্র পায় ইহুদিরা। কিন্তু রাজসভা থেকে ইহুদিরা বিদ্যায় নিলেও সমাজের অভিজাত সম্পদায়ের লোকদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ রেখে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিক রূপাত্তরের কথাটা জনসাধারণকে জানাতে চাইল যে তারা জনসাধারণের মঙ্গল এবং উন্নতি চায়। তারা তখন সারা পৃথিবী জুড়ে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতে লাগল তারা জনগণের দুঃখ কষ্টে গভীরভাবে দুঃখিত এবং আত্মরিকতার সঙ্গে তারা এর প্রতিকার করতে ইচ্ছুক। আরো বলতে লাগল যে তাদের ওপর সকলে অবিচার করে এসেছে। অত্যাচার করে এসেছে। অনেক নির্বোধ লোক তাদের এ কথায় বিশ্বাস করে তাদের করুণার চোখে দেখতে লাগল।

ফলে অল্পদিনের মধ্যে জগতের সবাই জানল ইহুদিরা একেবারে বদলে গেছে। রূপাত্তরিত হয়ে গেছে তাদের সত্তা। এমন উৎসাহের সঙ্গে ইহুদিরা মানব জাতির উন্নতি ও

অগ্রগতির কথা বলতে লাগল যে বিময়ে অবাক হয়ে গেল জগৎবাসী। কিন্তু সেই বিশ্বাসপ্রবণ নির্বোধের বৃষ্টি না তাদের এ কপট পরদুঃখকাতরতা ও পরোপকার প্রবৃত্তিগুলো ইহুদিরা দায়ী সারের মত জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে রেখেছে এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে। এ সারের ফলস্বরূপ তারা একদিন সেই জমিতে অনেক ভাল ফসল তুলবে।

ইহুদিরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঢোকার পর থেকে নানারকমের সমস্যা দেখা দেয়। তারা বিভিন্ন দেশের স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার কেনাবেচো শুরু করে। মৌখ কারবারের অংশীদার হয়। অতি লাভের আশায় তারা জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে মালিক শুমিকের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেয়। এ বিরোধ কালক্রমে রাজনৈতিক শ্রেণী সংঘামের রূপ পরিগ্ৰহ করে।

সৰ্বশেষে ইহুদিরা স্টক এক্সচেঞ্জে তাদের প্রাধান্য থাকার জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। বিভিন্ন কাজ কারবারের মালিকানা না পেলেও বিভিন্নভাবে এবং কৌশলে শুমিকদের নিয়ন্ত্রিত করতে লাগল।

শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রেও এবার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে ইহুদিরা এবং এ উদ্দেশ্যে তারা জাতিগত ও নাগরিক বাধাগুলো দূরীকরণের কাজে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার ধর্মগত সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের দ্বারা গঠিত ভাতৃত্ব সংঘ তাদের সহায়তা করে। সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে অনেক বুর্জোয়া শিল্পত্তি ও তাদের ফাঁদে ধৰা দেয়।

ইহুদিদের এসব পাতা ফাঁদে এতদিন শুধু সমাজে উঁচু তলার লোকরাই ধৰা দিয়ে আসছিল। যে সাধারণ জনগণ নিজেদের বুৰাতে চেষ্টা করেছিল, নিজেদের স্বাধীনতা ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামশালী হয়ে উঠেছিল, সদাজগ্রান্ত এ জনগণ এতদিন দূরে ছিল তাদের পাতা ফাঁদ থেকে। কিন্তু ইহুদিরা জানত সমাজের গভীরতর স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হতে হলে এ বৃহস্তুর জনসাধারণের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে।

এ উদ্দেশ্যে তারা ভাতৃত্ব সংঘের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রগুলোও করায়ত করতে চায়। জনমত প্রচারের যন্ত্রে হাত করে কৌশলে লেখকের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে তারা। তারা কোন খ্রিস্টান মেয়েকে কিছুতেই বিয়ে করত না, অথচ খ্রিস্টানরা ইহুদি মেয়ে বিয়ে করত এবং সেক্ষেত্রে সেই বিয়ের ফলে জাত সন্তানদের ইহুদি বলে চালানো যেত। এভাবে তারা সব জাতের গর্ব খৰ্ব করতে চাইছিল। নিজেরা অন্য কোন জাতির মেয়ে ঘরে না এনে নিজেদের জাতিগত রক্তের শুচিতা রক্ষা করে যাচ্ছিল।

ইহুদিদের চাতুরী ও ধূর্তামি সন্ত্রেও সংবাদপত্রগুলো প্রচার করে বেড়াচ্ছিল যে ইহুদিরা মূলগতভাবে সৎ লোক, জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য তারা গণতন্ত্রের প্রসারের জন্য জোর প্রচার চালাতে লাগল। কারণ তারা জানত একমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্র তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সহায় হয়ে উঠবে। একমাত্র এ শাসনযন্ত্রেই ব্যক্তিগত ও গোবলীর কোন দাম দেওয়া হয় না। এবং অপদার্থ ও অযোগ্য লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

এর ফলে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে।

এক অভাবনীয় অর্থনৈতিক পরিবর্তন সমাজের কাঠামোটাকেই পান্তে দেয়। আগে যেসব কর্মী কৃটিরশিষ্ঠে কাজ করত তারা কারখানা শুমিকের কাজ করতে এসে নিজেদের স্বাধীনতা হারিয়ে সর্বহারায় পরিণত হয়। কারখানা শুমিকের জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হল এ যে ভবিষ্যত বার্ধক্য জীবনের জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারে না তারা।

শিল্প বিপ্লবের ফলে যেসব কলকারখানা গড়ে উঠতে লাগল তাতে শাম থেকে দলে দলে লোক এসে যোগদান করতে থাকে শ্রমিক হিসেবে। এরা আগে গ্রামে কুটিরশিল্পের কাজ করত। শহরের শ্রমিক জীবনের সঙ্গে অভ্যন্তর ছিল না তারা। তার ওপর কারখানার মালিকদের কাছ থেকে কোন সহানুভূতি পেত না। গ্রামের জমিতে যে সকল কৃষক মজুর কাজ করে তাদের সঙ্গে জমিতে মালিকদের সম্পর্ক ভালো; যেখানে মালিকরা ও শ্রমিকদের সঙ্গে একসঙ্গে চাষের কাজ করে। মালিক শ্রমিকের কোন ভেদাত্তে নেই। কিন্তু শহরে কায়িক শ্রমকে ঘৃণার চোখে দেখা হয় বলে সেখানে কলকারখানার মালিকেরা শ্রমিকদের ঘৃণার চোখে দেখে, তাদের মানুষ বলে মনেই করে না।

কিন্তু কায়িকশ্রমের এ ঘৃণা আর শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের মধ্যে ভেদজ্ঞানের প্রবর্তন একাত্মভাবেই ইহদিদের অবদান। এ ধরনের ভেদজ্ঞান জার্মানজাতির মধ্যে কোনদিন ছিল না।

এর ফলে যে শোষিত ও অবহেলিত শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব হল সমাজে, তারা কিন্তু মানুষ হিসেবে নিকৃষ্ট নয় মোটাই। তারাও যে বৃহত্তর সমাজের এক বিশেষ অপরিহার্য অঙ্গ একথা আমাদের অবশ্যই অচিরে একদিন বুঝতে হবে। তাদের কাছে টেনে নেব আপন করে, অথবা দূরে ঠেলে দেব, সরিয়ে রাখব অস্ত্রজশ্নেণি হিসেবে— সে প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে।

এ শ্রমিকশ্রেণীর ওপর আধুনিক সভ্যতার ঘৃণ্য কুফল এ যুগে কোন প্রতাব বিস্তার করতে পারেনি। কায়িক শ্রমের ওপর একাত্মভাবে নির্ভরশীল এসব লোক এ যুগের শাস্তিবাদীদের অপ্রকৃতিস্থ দুর্বলতার শিকার হয়ে পড়েনি। তাদের মধ্যে যথেষ্ট সংগ্রামশীল প্রবৃত্তি আছে।

আমাদের সমাজের বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এ নতুন অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকার জন্য ইহদিরা এর পূর্ণ সুযোগ নিতে ছাড়ে না। তারা পুঁজিবাদী শোষণের এমন যন্ত্র গড়ে তোলে যার ফলে শ্রমিক মালিকের সম্পর্কে আরো অবনতি ঘটে। তখন যিথ্যাবাদী ইহদিরা নির্দোষিতার নামাবলী গায়ে দিয়ে বেড়াতে থাকে।

একদিন এ ইহদিরাই সমাত্রশ্রেণীর বিরুদ্ধে পুঁজিবাদীদের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিল; সেই ইহদিরাই আজ শ্রমিক মালিকের মধ্যে ভেদজ্ঞান জাগিয়ে বুর্জোয়া মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তোলে। তাবে এর দ্বারা শ্রমিক সমাজের সমর্থন ও শ্রদ্ধা লাভ করে তাদের ওপর সর্বদা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।

অর্থ শ্রমিকেরা বুঝতে পারে না এক্ষেত্রেও তারা ধূর্ত ইহদিদের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হয়ে কাজ করেছে। স্টক এন্ড চেম্বের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে যে আন্তর্জাতিক পুঁজিকে হাত করেছে ইহদিরা; বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণী বন্দেশের জাতীয় পুঁজির গায়ে আঘাত হেনে প্রকারাত্ত্বের আন্তর্জাতিক পুঁজির পৃষ্ঠি ও সহায়তা সাধন করে চলেছে।

প্রথম প্রথম ইহদিরা এক বিশাট ভগ্নামীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর দৃঃখ্যে মায়াকান্না কেঁদে তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর ভাগ করে। যে পরদৃঃখকাতরতা ও সামাজিক মঙ্গলের জন্য ব্যাকুলতা আর্যদের জাতীয় চরিত্রের একটি মহৎ গুণ, সেইগুণের প্রমাণ দেবার চেষ্টা করে তারা। তারপর তাদের তথাকথিত সামাজিক অন্যায় অপসারণের জন্য সংগ্রামকে এক দার্শনীক রূপ দান করার মতলব নেয়। আর তার জন্যই মার্কসবাদের উদ্ভাবন।

ইহদিরা এ তত্ত্ব সমন্বয়ে বিশেষ প্রচার করে বেড়ালেও অনেক বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ব্যক্তি এ তত্ত্ব মেনে নিতে অঙ্গীকার করে। কারণ তারা বলে এ দার্শনিক তত্ত্বকথার অস্তরালে এক শয়তানসূলভ প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে। এ তত্ত্বের মধ্যে মানবিক যুক্তি, মানবিক অবাস্তবাতা ও

অযৌক্তিকতা এমনভাবে মিশে আছে যাতে অবাস্তব অযৌক্তিক দিকটির প্রকাশ দেখা যায় সর্বত্র। যে ব্যক্তিগত ও জাতিগত যোগ্যতা মানবসভ্যতার মূল ভিত্তি, সে যোগ্যতার সকল উচ্চত্বকে অঙ্গীকার করে এ তত্ত্ব সভ্যতার ভিত্তিমূলেই আঘাত হনে। এভাবে ব্যক্তিগত ও জাতিগত বক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্যের ধারণাকে নস্যাং করে দেওয়ায় ইহুদিদের সামাজিক আধিপত্যলাভের সঙ্গে বাধাগুলো অপসারিত হয়।

মার্কসবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলো অবাস্তব। এর মধ্যে যে যুক্তি আছে তা আপাত দৃষ্টিতে জোরালো মনে হলেও আসলে তার কোন ভিত্তি নেই, যদের বুদ্ধিগৃহিত কর, অর্থনীতি সরকে কোন ধারণা নেই, তারাই এ মতবাদের সমর্থক।

এ মতবাদকে অবলম্বন করে ইহুদিদের নেতৃত্বে এক শ্রেণীর শ্রমিক এক ধরনের আন্দোলন শুরু করে। ওপর ওপর এ আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চাইলেও আসলে অ-ইহুদি জাতিদের ধ্বংস করাই ছিল সেই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

একদিন ভাতৃত্ব সংঘের লোকেরা বিশ্বপ্রেম প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় আত্মরক্ষার নীতিকে বিকল করে দেয়। আজ ইহুদিদের পরিচালিত সংবাদ পত্রগুলি সেই প্রচারের ভাব নিয়েছে। এবং শ্রমিক ও বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পর্ককে দৃষ্টিত করার চেষ্টা করছে। তার ওপর মার্কসবাদী উৎপন্নীরা তাদের বিরোধী পক্ষের ওপর নির্মভাবে আঘাত চালিয়ে আসুরিক শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। মার্কসবাদী শক্তিলাভের সম্পর্কিত আক্রমণের ফলে অনেক রাষ্ট্রীয় শক্তির ভিত্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর ওপরে ইহুদিরা কৌশলে প্রত্বাব বিস্তার করে। এসব অত্যুৎসাহী উৎপন্নী মার্কসবাদী সমাজের ছেট বড় কাউকেই মানতে চায় না; কাউকেই মানুষ বলে জান করে না।

ইহুদিদের দ্বারা পরিচালিত শ্রেণী-সংগ্রামের রূপটি প্রকাশ করতে গেলে এ দাঁড়াবে; সাবা বিশ্বে অর্থনৈতিক আধিপত্য লাভ করে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হতে পারেনি ইহুদিরা। তারা রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এ উদ্দেশ্যে তারা মার্কসীয় তত্ত্বটিকে দূই ভাগে বিভক্ত করে দেখে। সেই দুটো ভাগ হল রাজনৈতিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এ দুটি আন্দোলন আলাদা হলেও আসলে কিন্তু তারা একই উদ্দেশ্যসংঘাত।

স্বার্থপর, অর্থলোভী, সংকীর্ণমনা পুঁজিপতি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রমিকদের বক্ষাক্বচ হিসেবে কাজ করে চলে। শ্রমিকদের যতদিন না মানুষের মত বাঁচার জন্য যা দরকার তা' না পায় ততদিন তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। শুধু তাই নয় শ্রমিকদের কাজের সময় কম করে দেওয়া, শিশু শ্রমিক নেওয়ায় নিয়ন্ত্রণ করে দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে আইন প্রণয়নে বাধা দেয় তারা। বুর্জোয়ারা যথন এভাবে শ্রমিকদের সংগ্রামে বাধা দিতে থাকে তখন কঠিন প্রকৃতির ইহুদিরা নিপীড়িত শুগিক-শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করে সময় ব্যাপারটা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ায় রাতারাতি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার নেতৃত্বে হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তারা জানত এভাবে তারা বিবাট শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের সমর্থক হিসেবে কাজে লাগাতে পারবে। কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু শ্রমিকদের উন্নতির বা অঞ্চলগতি ছিল না; তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক যুক্তে এক সশস্ত্র হতিয়ারুপে ব্যবহার করে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রাতন্ত্র ও উন্নতিকে ধ্বংস করে দেওয়া। তাদের এ উদ্দেশ্য সাধনের অতিথায়ে তারা শ্রমিকদের কাছে এমন সব শর্ত উৎ্থাপন করত

যে সেসব শর্ত মেনে নেওয়া কখনই কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তারা জানত এসব শর্ত কেউ পূরণ করতে পারবে না। তা করা সম্ভবও নয়। তবু শ্রমিকদের সংগ্রামকে ধৰ্ম করার জন্যই তারা এমন সব অসম্ভব দাবি তোলে। এভাবে আসলে তারা জাতীয় পর্যায়ে এক বিরাট অশান্তি জাগিয়ে বাখতে চায়।

ইহুদিরা তাই ট্রেড ইউনিয়নের অবিসম্বাদিত নেতা হয়ে যায়। যতদিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে জোর প্রচারকার্য চালানো না হয়, ততদিন তারা এভাবেই নেতা হয়ে যাবে। যতদিন না জনগণ ঠিক মত বুঝতে পারে এবং ইহুদিদের ছল চাতুরীর কথা জানতে না পারে ততদিন ইহুদিদের বড় বড় প্রতিশ্রুতির কথায় বিশ্বাস করে যাবেই।

সহজে এবং স্বাভাবিকভাবেই ইহুদিরা তাদের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দেয় এ ক্ষেত্র থেকে। কৃমে তারা তাদের স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার বশে ট্রেড-ইউনিয়ন সংস্থাগুলোকে বলপ্রয়োগের মাধ্যম হিসেবে পরিণত করে। ইহুদিদের একনায়কত্বের কাছে আসন্মর্পণ না করে যারা তাদের বাধা দেয়, এক ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয় ইহুদিরা।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন মূলত অর্থনৈতিক আন্দোলন হলেও এ আন্দোলনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে থাকে ইহুদিরা। ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার সদস্যরা রাজনৈতিক মিছিল বার করে এবং রাজনৈতিক কার্যবলীতে তৎপর হয়ে ওঠে। অবশেষে শ্রমিকরা ধর্মঘট ঘোষণা করে তাদের অর্থনৈতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করে।

এ কাজে তাদের ইহুদিদের দ্বারা প্রভাবিত সংবাদপত্রগুলি সাহায্য করে। সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের কোন চেষ্টা না করে তাদের মধ্যে কু-প্রবৃত্তি সঞ্চারিত করার চেষ্টা করে। এ সংবাদপত্রগুলোই নামারকম মিথ্যা প্রচারের দ্বারা জাতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তিক বিপর্যস্ত করে দেয়।

সূচতুর ইহুদিদের কেউ আক্রমণ করার আগেই তারা ওদের আক্রমণ করে। যারা ওদের আক্রমণ করতে আসে ওরা শুধু ওদের আক্রমণ করে না, যারা ওদের আক্রমণে বাধা দেয় আঘাতক্ষার খাতিরে ওরা তাদেরও শক্ত বলে মনে করে। ইহুদিদের আসল মনোভাব ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ জনগণের কোন জ্ঞান না থাকার ফলে তারা সহজেই ইহুদিদের কু-প্রকৃতি ও কু-অভিসর্কির শিকার হয়ে ওঠে। সরলতা ও অজ্ঞতাবশত সাধারণ মানুষ বিশ্বাসপ্রবণ হয়ে থাকে এবং তারা সহজে যে কোন প্রচারের কান দেয় ও তা বিশ্বাস করে। তারা বুঝতে পারে না ইহুদিরা মার্কিসবাদকে তাদের এক অশুভ উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।

তখন ইহুদিরা প্যালেন্টাইনে এক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করে এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে নিজেদের যে তারা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ ও তথ্য ধারাগুলো স্বাচ্ছন্দে মুক্তকষ্টে প্রচার করে চলে। আসলে তারা নিজেদের ফরাসী জার্মান প্রভৃতি ভিন্ন জাতির লোক বলে সরলমান সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করতে চাইছে। কিন্তু রাষ্ট্রের খাতিরে তারা রাষ্ট্র গঠন করতে চায় না। বস্তুত তারা রাষ্ট্রের নামের একটি বৈধ ও সার্বভৌম মংগলনের মাধ্যমে সারা বিশ্বব্যাপী প্রতারণা ও জুয়াচুরির জাল বিতার করতে চায়। জুয়াচুরি ও প্রতারণার এক বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে আগ্রহী।

তার ওপর কৃষ্ণকেশ ব্যতিচারী ইহুদী মুবকেরা পথের ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বসে থেকে বিজাতীয় মেয়েদের শালীনতা নষ্ট করতে চায়। তাদের জারজ নানা সংমিশ্রিত গরল ঢেলে সেইসব নিরীহ মেয়েদের রক্তকে কলুষিত করার চেষ্টা করে। কারণ তারা জানে যে জাতি তাদের জাতিগত রক্তের শুচিতা সম্পর্কে সচেতন তারা কখনই ইহুদীদের আদিপত্য মেনে নেবে না। অবৈধ জারজ সন্তানে পরিপূর্ণ কোন জাতি ছাড়া অন্য কোন জাতির ওপর ইহুদীরা কখনই প্রভৃতি করতে পারবে না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহুদীরা গণতন্ত্রের জায়গায় সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। কারণ তারা জানে মার্কসবাদের পতাকাতলে সাধারণ জনগণকে সংঘবদ্ধ করে একনায়কতন্ত্রের ধাঁচে তাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে আসুরিক শক্তির দ্বারা দেশ শাসন করা সহজ হবে তাদের পক্ষে। যেসব শক্তিশালী জাতি ইহুদীদের প্রভাব মানতে চায় না, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে সেইসব জাতির চারিদিকে শক্র খাড়া করে তুলেছে।

অর্থনীতি ও রাজনীতি দু'দিক থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতিগুলির বনিয়াদ ধ্রংস করতে চায় ইহুদী। ব্রাহ্মায়ত শরিকানা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষতিসাধন করে তারা যেমন জাতীয় অর্থনীতির ধ্রংস করতে চায়, তেমনি সরকার ও জনগণের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে জাতির প্রতিরক্ষাগত শক্তির ভিত্তিকে নষ্ট করে ফেলতেও সচেষ্ট থাকে।

জাতীয় সংস্কৃতির মূলেও আঘাত হানতে চায় তারা। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুন্দর ও মহত্বের ধারণাটিকে জাতিপ্রীতির নাম করে নষ্ট করে ফেলে সাধারণ মানুষের মনকে তাদের মত নিচ ও সংকীর্ণ করে তোলে।

ধর্মের ক্ষেত্রটিও তারা প্রহসনের এক রঞ্জত্বমিতে পরিণত করে। নীতিবোধ ও শালীনতাবোধ প্রভৃতিকে প্রাচীন কুসংস্কার বলে অভিহিত করে জাতির নৈতিক ধারণাকে নামিয়ে আনতে চায় তারা।

যখনি ইহুদীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে, তখনই তারা সব অবংগ্ঠন বেড়ে ফেলে স্বমূর্তিতে আত্মকাশ করে। তখন তারা জনগণের হর্তাকর্তা সেজে জনগণের ওপর অত্যাচার করতে শুরু করে। সমগ্র জাতির বৃদ্ধিমান ও প্রতিভাবন ব্যক্তিদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে।

রাশিয়া হল এ অত্যাচারের ভয়ঙ্কর লীলাভূমি। এ দেশে ইহুদীরা তিন কোটি লোককে হত্যা করে অথবা না থেকে দিয়ে শুকিয়ে মারে। এদের মধ্যে কিছু লোককে পীড়নমূলক কাজ করিয়ে মারা হয়। ওইসব কিছুর মূলে ছিল কিছু সংখ্যক ইহুদী যারা দেশের ওপর প্রভৃতি করবে।

কিন্তু এর শেষ পরিণাম বড় ভয়াবহ হয়ে উঠে। এর ফলে জনগণ অবশ্য ইহুদীদের ক্ষমতাধীনে আসে; কিন্তু পরে সেইসব অত্যাচারী ইহুদীদেরও বিদায় দেয়। শিকারের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে নেমে আসে শিকারীর মৃত্যু।

আমরা যদি আমাদের জার্মান জাতির অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করি তা'হলে দেখব সেই কারণটা হল জার্মানরা ইহুদি সমস্যাটাকে তত শুরুত্ব দেয়নি। ইহুদী সমস্যা সংজ্ঞাত যে বিপদ সমগ্র জাতির পক্ষে এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে সে বিপদের কথা তারা মোটেই ভাবেনি। তা যদি আগে থেকে ভাবত তাহলে ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসের প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করাটা খুব একটা কষ্টকর হত না। আমাদের পরাজয়ের কারণ শুধু

যুদ্ধক্ষেত্রের হার নয়, যে রাজনৈতিক প্রেরণা ও প্রবৃত্তি এবং নৈতিক শক্তি জাতির জীবন সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে, জাতির অস্তিত্বকে সমন্ব্য করে তোলে সর্বত্ত্বাবে, কয়েক দশক ধরে সুপরিকল্পিতভাবে সেই জাতীয় রাজনৈতিক প্রবৃত্তি ও নৈতিক শক্তির মূলে কুঠারাঘাত হানা হচ্ছিল।

যে শক্তি ও গুণাবলী জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি সে শক্তি ও গুণাবলীকে অবহেলা করে তাদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে জার্মানরা ভুল করেছিল। অথচ এ শক্তি ও গুণাবলী তাদের সহজাত, প্রকৃতিদণ্ড।

কিন্তু যে কোন পরাজয়ই অপূরণীয় ক্ষতির বাহক নয়। যে কোন খারাপ থেকে অনেক কিছু ভাল করা যায়। যে কোন পরাজয়কে ভিত্তি করে ভবিষ্যতে জয়ের সৌধ গড়ে তোলা যায়। যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে অনেক জাতি পরবর্তী যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। অনেক দুঃসহ অত্যাচারের ভেতর থেকে এমন এক অদম্য শক্তি জনন্মাত করে যা একদিন সমস্ত অধঃপত্তি জাতিকে মুক্তি এনে দেয়।

কিন্তু যে জাতি তাদের জাতিগত রক্তের শুচিতা হারিয়ে ফেলে, সেই জাতি একবার অধঃপত্তিত হলে আর কোনদিন উঠে দাঁড়াতে পারে না। এ রক্তের শুচিতা হানি থেকে যে ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি আর প্রৱণ হয় না কোনদিন। যে কোন জাতি বা সভ্যতার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বা অবনতির মূলে আছে এ একই কারণ। জাতিদের অন্তর্বিহীন শক্তি একেবারে ক্ষয় হয়ে গেলে সে জাতিকে তখন আর বাঁচানো যায় না।

এ কারণেই কোন রাজনৈতিক তৎপরতা, অর্থনৈতিক উন্নতি, সংস্কৃতির সংস্কার বা জানের সঞ্চয়-কোন কিছুই বাঁচাতে পারেনি জার্মান জাতিকে। কোন সুফলই দান করতে পারেনি এসব কিছু। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের কপট উজ্জ্বলতা, তার কপট দৈন্য বা দূর্বলতাকে সমস্যার মূলে সে যেতে পারেনি বা তা' নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনি।

জার্মানির যে সব রাজনৈতিক দল দেশের জাতীয় দুরবস্থার উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা করেছিল, তারা রোগের মূল ধারাটিকে ধরতে না পেরে শুধু তার উপসর্গগুলি সারাবাবর চেষ্টা করেছিল। নির্বাচনে বুর্জোয়া দলগুলি জয়লাভ করলেও মার্কিসবাদী ভোটের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকে। মার্কিসবাদের বিষ সারা দেশে সব দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

১৯১৪ সালে যে জার্মান জাতি মহাযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে, সে জাতি এক সুদৃঢ় জাতীয় প্রেরণার বশবর্তী হয়ে ছুটে যায়নি। এক নির্বাপিত-গ্রাম্য আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তির শেষ উজ্জ্বলতা ও অগ্নি-প্রেরণার বশেই সে জাতি যুদ্ধে যোগদান করে। শাস্তিবাদী ও মার্কিসবাদী নীতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জাতির গভীরে যে অবক্ষয় ও পক্ষাঘাত ঘিরে ধরেছিল তার বিরুদ্ধে জার্মান জাতি-বাইরে জেহাদ ঘোষণা করলেও ভেতরে তারা ক্রমশ ক্ষয় হয়ে আসছিল।

অবশ্যই এ যুদ্ধের বিজেতাদের দীর্ঘ বিশেষ কোন পুরকারে ভূষিত করেনি। বরং অনুশোচনার যন্ত্রণায় ভাবে উঠে তাদের মন। আর তখনই আমরা সেই আসল সত্ত্বাটি বুঝতে পেরে তাকে স্বীকার করে নেই। এবং নতুন উদ্যমে এক প্রস্তর কঠিন ভিত্তির ওপর জাতীয় উন্নতির নতুন সৌধির প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করি।

ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট লেবর পার্টির অগ্রগতির প্রথম স্তর

এ খণ্ডের শেষের দিকে আমি আমাদের আন্দোলনের প্রথম স্তরটির কথা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করব। কিন্তু যে আদর্শকে আমরা লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করি সে আদর্শের নিখুঁত বিশ্লেষণ এ খণ্ডে সম্ভব নয় বলে তা' আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে করব; যেখানে আমাদের নীতি বা কার্যপদ্ধতির বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র শব্দটির প্রকৃত চিত্রিত আমরা তুলে ধরব। এখানে 'আমরা' বলতে সেইসব লোককে বুঝি যারা একই কামনা বাসনার দ্বারা উদ্দীপিত হয় কিন্তু সকলে সেই কামনা প্রকাশ করার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পায় না। সমস্ত সংক্ষারের মূলে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমবেত একটি বাসনা, যদিও সেইসব অসংখ্য মানুষের মধ্যে থেকে প্রথমে প্রবক্তৃকামপে একজন এগিয়ে এসে সেই সংক্ষারের কাজটি শুরু করে। সমস্ত বড় বড় সংক্ষারের লক্ষ্যই হল তাই। লক্ষ লক্ষ মানুষের যেসব কামনা বাসনা যুগ যুগ ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গুরে মরে, একজন প্রতিভাষ্ট ব্যক্তি তাদের জন্য এগিয়ে এসে এক একটি সংক্ষারের মধ্যে সেই কামনা বাসনাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করে তোলে।

আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ যে এক মৌন পরিবর্তনের আশায় দিন শুনছে ব্যাকুলভাবে তা' তাদের গভীর অসন্তোষ বা বিক্ষেপ থেকেই বোঝা যায়। এ অসন্তোষ বা বিক্ষেপ বিভিন্নভাবে প্রকাশিত বা পরিত্যক্ত হচ্ছে। অনেকের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় নিবিড় হতাশা ও নিরুৎসাহের মধ্যে দিয়ে, অনেকের প্রকাশিত হয় রাগে। অনেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তাদের ক্ষেত্রে পরিচয় দেয়। আবার অনেকে কমঘেষা উৎপন্নীদের দলে যোগ দিয়ে তাদের ক্ষেত্রে প্রকাশ করে।

শেষোক ব্যক্তিদের কাছেই আমাদের নবগঠিত আন্দোলনের আবেদন ছিল সবচেয়ে বেশি। যারা বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে গভীর উদ্দেগ ও হতাশায় ভুগছে অথবা কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না, আমাদের আন্দোলন তাদের সকলকে এক সাংগঠনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছিল।

দেশ বা জাতির উপর পৃষ্ঠে শুধু আঁচড় না কেটে যে আন্দোলন জনগণের মনের গভীরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে ১৯১৮ সালে আমাদের জার্মান জাতি দু'টি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতর অংশটি ছিল বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা গঠিত। এ অংশের মধ্যে শ্রমজীবীদের কোন স্থান ছিল না। বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা গঠিত অংশটির একমাত্র কাজ ছিল রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষা করে চলা। জাতীয় স্বার্থ আর তাদের আদর্শগত ভাবধারা রক্ষা করার জন্য বুদ্ধিজীবীরা প্রতিধাতের বিরুদ্ধে কেবল বৃদ্ধিগত হাতিয়ার প্রয়োগ করে যেত। কিন্তু প্রতিধাতের প্রধান আঘাতের সামনে এ হাতিয়ার মোটেই ফলপ্রসূ হত না।

এ মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক সতত সজাগ প্রতিকূলতা কাজ করে যাচ্ছিল; মার্কসবাদে দীক্ষিত শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা সমাজের এক বৃহত্তর অংশ এ শ্রমিকশ্রেণী তাদের প্রচও দৈহিক শক্তির দ্বারা বুদ্ধিজীবীদের সকল বাধাকে খড়কুটোর মত উড়িয়ে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল। তারা কোনক্রমেই জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ এ বিরাট শ্রমিকশ্রেণী দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বিদেশী অত্যাচারী একনায়কদের স্বার্থরক্ষা করে যেত আবার এ শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্য ছাড়া জাতীয় অভ্যুত্থানও সম্ভব ছিল না।

১৯১৮ সালে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে ছিন্নভিন্ন জাতীয় শক্তি সুসংগঠিত না হওয়া পর্যন্ত জার্মান জাতির পুনরুত্থান মোটেই সম্ভব ছিল না। আবার জাতীয় পুনরুত্থান ছাড়া বহিঃশক্তির আক্রমণকে প্রতিহত করাও সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে। বস্তুত জার্মানির তখন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিল না। তার মানে এ নয় যে জার্মানির কোন অন্তর্শক্তি ছিল না; জাতীয় আঘাসংরক্ষণের জন্য যে লোহকঠিন সংকলনের দরকার, যা অন্তের থেকে অনেক বেশি, সেই সংকলনের একান্ত অভাব ছিল তখন সারা দেশে।

অথচ আমাদের দেশের বামপন্থীরা বলে দেশে অন্ত না থাকার জন্যই তারা এ বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করেছে। কিন্তু আসলে এ নীতি বিশ্বাসঘাতকতার নীতি। একথা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রাখার ছলনামাত্র।

আমাদের দেশের দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদরাও কম দায়ী নয়। তারাও একই ভর্তসনার যোগ। তাদের শোচনীয় কাপুরুষতার জন্য ১৯১৮ সালে ইহুদীরা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে। এবং ক্ষমতায় আসার পর তারা জাতিকে নিরস্ত্র করে তোলে। তাদের দোষের জন্যই জার্মানি অন্তর্হীন হয়।

সূতরাং জার্মানির জাতীয় শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে শুধু কারখানায় অন্ত নির্মাণ করলেই হবে না, জাতীয় আত্ম-সংরক্ষণ প্রযুক্তিকে নতুন করে সংজীবিত করে তুলতে হবে। কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রের কৃতিত্ব বা যোগ্যতা শুধু অন্তের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে জাতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ বাসনায় আর বীরত্বপূর্ণ সাহসের ওপর।

এদিক দিয়ে বৃটিশ জাতির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।। বৃটিশ জাতির মধ্যে একই সঙ্গে সরকারের নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা আর জনগণের শক্তি ও সাহস লক্ষ্য করার মত। সরকারের দৃঢ়তা জনগণের শক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ বাসনা অন্যান্য জাতির তুলনায় অন্তের স্বল্পতা সত্ত্বেও তাদের জাতীয় সংগ্রামকে সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায় নিয়ে যেতে পারে।

সূতরাং দেখা যাচ্ছে জার্মানির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জাতির মধ্যে রাজনৈতিক আঘাসংরক্ষণবোধকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং জাতীয় বিরোধী শক্তিগুলিকে জাতীয় আদর্শে উন্মুক্ত করে তুলতে হবে।

জার্মানিকে সার্বভৌম ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনটিকে যদি সফল করে তুলতে হয় তা'হলে দেশের সাধারণ মানুষের দেশাঞ্চলোধে উদ্বীগ্ন করে তুলতে হবে। আমাদের দেশের জাতীয় বুর্জোয়ারা এমনই অপদার্থ যে তারা কোন বলিষ্ঠ অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নীতি খাড়া করতে পারেনি। আমাদের দেশের জনগণের মতকে যুদ্ধমুখী করে তোলা যায় জোর প্রচারের মাধ্যমে, কিন্তু ইহুদী ভাইয়েরা জার্মানির পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টাকে নির্মতাবে গুড়িয়ে দেবে, যেমন তারা একদিন জার্মানির সামরিক শক্তিকে গুড়িয়ে দেয়। দেশে মার্কসবাদীরা সুসংগঠিত এবং তাদের সংখ্যা দেড়কোটি। এ মার্কসবাদীরা শুধু যে জাতীয় কোন বৈদেশিক নীতি খাড়া করতে দিচ্ছে না তা নয়, এরা কোনক্রমেই জার্মানিকে তার রাজনৈতিক শক্তি পুনরুদ্ধার করতে দিচ্ছে না। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই মার্কসবাদীরা এভাবে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোটকথা যে সব রাজনৈতিক দলের নেতো দেশ ও জাতির সঙ্গে একইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করছে তারা কোনক্রমেই জাতীয়

পুনরুজ্জীবনের কোন প্রচেষ্টাকে সহ্য করতে পারছে না। তারা জাতির ইতিহাসে এ শিক্ষা দেয়, যারা জার্মানির এ অবস্থার জন্য দায়ী তাদের ওপর চরম প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত জার্মানি তার হারানো গৌরব পুনরায় উদ্বার করতে পারবে না।

তাই জার্মানির সাবভৌমত্ব ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে শান্তিপূর্ণ ভাবে জনগণের মনের পরিবর্তন সাধন করে তাদের নিয়ে এক সংযুক্ত সংগ্রামী সংস্থা গড়ে তুলতে হবে।

বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে জনগণ স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী না হলে জার্মানিকে কিছুতেই বৈদেশিক বক্রন থেকে মুক্ত করা যাবে না। অপর দিকে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বোঝা যাবে শুধু ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের ওপর নির্ভর করে বিদেশী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না।

যেসব তরঙ্গ জার্মান বুদ্ধিজীবী প্রেছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করে ১৯১৪ সালের ক্লাইভার্সের যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেয় তাদের অভাব পরে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। অবশ্য দেশের বিরাট সংখ্যক শ্রমিকশ্রেণী যোগদান না করলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরালো হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তার জন্য অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত শ্রমিকশ্রেণীকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষাদান করা উচিত। আবার ভার্সাই শান্তিচুক্তির শর্ত অনুসারে আমাদের সমগ্র জাতিকে নিরস্ত্র অবস্থায় থাকতে হয় বলে জনগণকে সামরিক প্রশিক্ষণ দান সম্ভব নয়। দেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্বারণের জন্য ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি ও সম্ভব নয়। দেশের মধ্যে তার জন্য প্রচুর গুপ্তচর কাজ করে যাচ্ছিল। তারা আন্তর্জাতিক মার্কিসবাদের দোহাই দিয়ে জাতীয় পুনরুত্থানের পথে বাধা সৃষ্টি করছিল।

এ বাধা অপসারিত করতে হলে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণকে অবশ্যই জাতীয় স্বাধীনতার নীতিগুলোকে অন্তরের সঙ্গে এহণ করতে হবে। তারা যাতে শ্বতৎসূর্তভাবে একাজে এগিয়ে আসে তার জন্য সর্বাঙ্গে চেষ্টা করতে হবে।

জাতীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা আগে অর্জন না করে আমরা যদি নানারকম অভ্যন্তরীণ সংক্ষারে মন দেই তাহলে সেইসব সংক্ষারের সফলতা নিয়ে সেসব জাতি লাভবান হবে, যারা আমাদের দেশকে তাদের উপনিবেশ হিসাবে শোষণ করতে চায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যা-ই উদ্ভৃত হবে, যতই দেশের সম্পদ বাড়বে ততই তাদের হাত শক্ত হবে।

এক্ষেত্রে জার্মানির কোন সাংস্কৃতিক উন্নতি বা অগ্রগতি সম্ভব নয়। কারণ যে কোন দেশের সংস্কৃতির মান রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় মর্যাদার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

তাই ১৯১৯ সালের প্রথম দিকে আমরা একথা বেশ বুঝতে পারি যে দেশের জনগণকে ব্যাপক জাতীয়করণ অর্থাৎ তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোঃ জাগানোই হবে আমাদের আন্দোলনের প্রধানতম লক্ষ্য। অবশ্য এ কাজের জন্য কতগুলি দায়-দায়িত্ব আমাদের সাধন করতে হবে। যেমন :

(১) জনগণের মনকে জাতীয় ভাবাপন্ন করে তোলার জন্য যে সামাজিক তাগের প্রয়োজন তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিপতি ও মালিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে যতদূর সম্ভব সুযোগসুবিধা দিতে হবে। কারণ এসব সুযোগসুবিধা জনগণকে জাতীয় বৃত্তের গভীর তেতরে টেনে আনবে। শ্রমিকশ্রেণী তাঁহলে জাতীয় ভাবধারায় ভাবিত হয়ে উঠবে। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক স্থিরতা বা শৃঙ্খলা না

থাকলে মালিকপক্ষের আর্থিক বা ব্যবসাগত লাভের কোন অর্থ হবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি যদি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য মালিকদের বিরুদ্ধে আপোষাধীনভাবে সংগ্রাম করতে এবং মালিকপক্ষকে শ্রমিকদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য করত তাহলে যুদ্ধে আমাদের পরাজয় ঘটত না। এসব আর্থিক সুযোগ-সুবিধে দিয়ে শ্রমিকদের মনকে দেশ ও জাতির প্রতি অনুগ্রহ করে তোলা যেত। জাতীয় অর্থনৈতিক মূল কাঠামোর কোন ক্ষতি না করে যতদূর সভ্ব দেশের মালিকপক্ষকে লাভ কর করে আর্থিক ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে।

(২) জাতীয় ভাবধারার দিকে লক্ষ্য রেখে জনগণকে শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। তাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে হবে যাতে করে জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে এরা অংশগ্রহণ করতে পারে।

(৩) এ বিষয়ে কোন কুঠা বা দ্বিধা থাকলে বলবো সব দ্বিধা কুঠা যেড়ে ফেলে জনসাধারণকে প্রকৃত অর্থে মনে প্রাণে জাতীয়তাবাদী করে তুলতে হবে। এ বিষয়ে তাদের মনকে উৎ করে তুলতে হবে। তথাকথিত ক্ষতিকারক আন্তর্জাতিকতাবাদের বিষয়ক্রিয়াকে নষ্ট ও ব্যর্থ হলে জাতীয়তাবাদের পাস্টা বিষ প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

কোন জাতির বৃহত্তর জনসাধারণ শুধু অধ্যাপক ও রাজনীতিবিদদের দ্বারা গঠিত নয়। এ সাধারণ জনগণ কোন জটিল ভাবধারা বা তত্ত্বের সঙ্গে মেটেই পরিচিত নয়। তারা সাধারণত জান বা যুক্তিতে নয়, আবেগ বা অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই আবেগে অনুভূতি সদর্থক হতে পারে। জগতে আজ পর্যন্ত যত বড় বড় পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তার মূলে কোন ভঙ্গি ভালবাসা বা প্রবল ঘৃণা প্রত্ি কোন না কোন মৌল অনুভূতি বা আবেগ মূল প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। জনসাধারণের মন জয় করতে হলে তাদের অন্তরের চাবিকাঠি লাভ করতে হবে। আর সেই চাবিকাঠি হল দৃঢ় সংকল্প।

(৪) দেশের জনগণকে কোন আন্দোলনের সামিল করে তুলতে হলে তাদের মধ্যে শুধু তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য এক সংগ্রামশীল সমর্থক প্রকৃতি জাগিয়ে দিয়ে চলবে না, শক্রপক্ষকে ধ্বংস করার এক নওরথক প্রবৃত্তি জাগাতে হবে। যখন কোন পক্ষ এক আপোষাধীন প্রচণ্ডতায় প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে, ধ্বংস করে, তখন সাধারণ মানুষ ভাবে নিশ্চয় তারা ন্যায়ের খাতিরেই এ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যখন দেখে আক্রমণকারীদের মধ্যে কুঠা বা দ্বিধা রয়েছে, তখন তারা স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করে তাদের এ আক্রমণ ও সংগ্রামের পেছনে কোন ন্যায়সংস্কৃত যুক্তি নেই। সাধারণ জনগণ প্রকৃতিরই এক অংশ বিশেষ। তারা চায় বলবানেরা জয়লাভ করুক আর দুর্বলেরা মুছে যাক ধরাপৃষ্ঠ হতে। তবে জনগণের মন জয় করতে হলে যারা তাদের মনে আন্তর্জাতিকতার বিষ চুকিয়ে দিচ্ছে তাদের তাড়াতে হবে শেষে।

(৫) কোন জাতির উত্থান বা পতন নির্ভর করছে তার রক্ষণত উপাদানের শুচিতা ও অখণ্ডতার ওপর। যে জাতি তার রক্ষের এ শুচিতাকে অক্ষুণ্ণ রাখে না বা এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না সে জাতির অন্তরাজা খণ্ড বিখ্যাত হয়ে যায়, সে জাতি কখনই সংহতি লাভ করতে পারে না। কোন জাতির রক্ত দূষিত হলেই তার জাতীয় চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়।

সুতরাং জার্মান জাতিকে আজ বাঁচতে হলে তার জাতীয় দেহ থেকে বিজাতীয় ও বৈদেশিক বীজাণুগুলোকে দূর করতে হবে। তাদের রক্ষণত পরিত্রাতার সমস্যাটিকে উপর্যুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে।

(৬) দেশের জনগণের জাতীয়করণের অর্থ এ নয় যে যারা উপরতলায় রয়েছে তাদের নামিয়ে আন। কাউকে কোন শ্র হতে নামিয়ে না এনে নিচুতলার লোকদের উপরতলায় নিয়ে যেতে হবে। আমাদের যুগে যারা বুর্জোয়া বলে আখ্যাত হচ্ছে, তারা নিজেদের চেষ্টাতেই শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে হলে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে। আমাদের আন্দোলনকে সফল করে তুলতে হলে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে থেকে বেশি সদস্য সংগ্রহ করতে হবে। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে থেকে একমাত্র সেইসব লোকদের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে যারা আমাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শকে মনেপাণে গ্রহণ করতে পেরেছে।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সদস্য সংগ্রহ করার বাধা হল তাদের আন্তর্জাতিকতাবাদ। শ্রমিকশ্রেণীর লোকের মনে যে আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ চুকিয়ে দিয়েছে সেই আন্তর্জাতিকতাবাদ তাদের মন থেকে দূরীভূত করে জাতীয়তাবাদ সঞ্চারিত করতে হবে।

আমাদের আন্দোলনকে সফল করে তুলতে হলে এবং জার্মান শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয়তাবাদে উন্নুন্দ করে তুলতে হলে দেশের শিল্পপতিদের বিরুদ্ধেও এক প্রচারকার্য চলাতে হবে। তাদের কতগুলি ভুল ভাঙ্গতে হবে। শিল্পপতিদের মধ্যে সাধারণত এ ধারণা প্রচলিত আছে যে মালিকদের কাছে শ্রমিকদের সবসময় নত হয়ে চলতে হবে। শ্রমিকদের সব অর্থনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। সব সুযোগ সুবিধার দাবি ত্যাগ করতে হবে, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। শিল্পপতিদের আর একটি ভুল ধারণা হল এ যে শ্রমিকরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য যতই তৎপর ও সংগ্রামশীল হয়ে ওঠে, ততই তারা সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকে।

অবশ্য একথা ঠিক শ্রমিকেরা যদি কোন অলৌকিক দাবি উথাপন করে অথবা অসঙ্গব কিছু চেয়ে বসে তবে তারা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধাচারণ করে। তখন তারা জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিটাকেই ধ্বংস করে দিতে চায়। কিন্তু শিল্পপতি ও মালিক পক্ষকেও একথা মনে রাখতে হবে যে তারা যদি শ্রমিকদের শোষণ করার জন্য কোন অমানবিক পদ্ধতি গ্রহণ করে, যদি শ্রমিকদের ন্যায্য সুযোগ সুবিধা না দেয়, তা'হলে তারা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধাচারণ করে। সেক্ষেত্রে তাকে কোন ক্রমেই জাতীয়তাবাদী বলা যায় না, কারণ তখন কেউ জাতির দেহে অনৈক্য ও অসত্ত্বারের বীজ বপন করে।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যদি এমন কোন লোক থাকে যারা মনেপাণে জাতীয়তাবাদী এবং দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম, তাদের অবশ্যই আমাদের সংগঠনের সদস্য করে নিতে হবে। কিন্তু বুর্জোয়ারা যদি তাদের প্রথাগত শ্রেণীচারিত্ব না বদলায় তা'হলে কোন মতেই তাদের মধ্যে থেকে কোন সদস্য নেওয়া চলবে না। বুর্জোয়াদের সামাজিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই পাল্টাতে হবে।

মোট কথা আমরা কোনক্রমেই আমাদের জাতীয়তাবাদী নীতি বা কর্মপদ্ধতির কোন পরিবর্তন করব না; বরং যারা অ-জাতীয়তাবাদী বা জাতীয়তাবাদী বিবেচ্য তাদের যথাসঙ্গব দলে টানার চেষ্টা করব। অবশ্য আমাদের আন্দোলন ও মিছিল বুর্জোয়াদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটাবে।

(খ) প্রচার আন্দোলনের এক বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু প্রচারকার্যকে ফলপূর্দ করে তুলতে হলে দেখতে হবে প্রচার যেন সবসময় একমুখী হয়। যখন যেখানে কোন প্রচারমূলক বক্তৃতা

দেওয়া হবে তখন দেখতে হবে সে বক্তৃতা যেন শ্রমিকশ্রেণী অথবা বুদ্ধিজীবীকে লক্ষ্য করে দেওয়া হয়। কারণ যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে বুদ্ধিজীবীদের সামনে বক্তৃতা দেওয়া হয়, তা' শ্রমিকশ্রেণীর লোকেরা বুঝতে পারবে না। আবার যে ভাষায় শ্রমিকশ্রেণীর লোকদের সামনে বক্তৃতা দেওয়া হবে তা বুদ্ধিজীবীরা পছন্দ করবে না। দেশের মধ্যে এমন বাগী খুব কমই আছে যিনি আজ মেথর, কামার, মিস্ট্রী প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের কাছে সাফল্যের সঙ্গে বক্তৃতা দেবার পর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের সামনে অনুকূপ সাফল্যের সঙ্গে বক্তৃতা দিতে পারবেন। এখানে কোন নতুন ভাবাদর্শ সৃষ্টি বা বিশ্বেষণের কোন প্রয়োজন নেই। এখানে দরকার হল প্রকল্পিত ভাবধারাটি সাধারণ মানুষের মনে সহজভাবে তুলে ধরা।

সামাজিক গণতন্ত্র মার্কসবাদী আন্দোলন বা আদর্শ প্রভৃতি কথাগুলো শ্রমিকদের সহজেই আকর্ষণ করে। কারণ কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা সহজেই এসব কথা বুঝতে পারে। এবং যাদের কাছে এসব কথা বলা হয় তারা সবাই একই মনোভাবাপন্ন।

বক্তৃতার প্রকাশভঙ্গ এমন হতে হবে যা সহজেই সাধারণ জনগণের বুদ্ধির স্তরে পৌঁছতে পারে। যে বিরাট জনসভায় সাধারণ জনগণ সমবেত হয়, সেখানে এমন বক্তার দরকার যিনি জনগণের হৃদয় জয় করতে পারেন। সে সভায় উপস্থিত যদি কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক সে বক্তৃতা শুনে তা অপছন্দ করে তাহলে বুঝতে হবে আমাদের এ নতুন আদর্শের পক্ষে সে একেবারে অযোগ্য। যেসব শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সাধারণ জনগণের ওপর প্রভাবের পরিমাণ দেখেও অনুকূল প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এসব বক্তৃতার গুণগুণ বিচার করে, তারাই আমাদের আন্দোলনের পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি। আমাদের বক্তৃতা, উদ্দেশ্য যারা জাতীয়তাবাদী নয় তাদের জাতীয়তাবাদী করে তোলা। যারা এমনিতেই জাতীয়তাবাদী তাদের জন্য এ বক্তৃতা নয়।

'যুদ্ধপ্রচার' এ অধ্যায়ে আমি প্রচারের নীতি ও নিয়মকানুনগুলি এবং ভদ্রিমা কী হবে তা' নিয়ে আলোচনা করেছি বিশদভাবে। সেগুলির সাফল্য এ কথাই প্রমাণ করে যে সেগুলো ঠিক।

(৮) কিন্তু জনগণকে কোন বিষয়ে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করে তোলাই কোন রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য নয়। যে সব ভাবধারা জগতে পরিবর্তন আনতে চায়, সেই সব ভাবধারার বাস্তব রূপায়ণের জন্য এক সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতিরও প্রয়োজন হয়। কোন সামরিক অভ্যর্থনা বা কোনভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কখনই এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। এ আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল জনগণের স্বার্যবরক্ষা করা এবং তাদের সর্বত্বভাবে জাতীয়তাবাদী করে তোলা।

(৯) আমাদের নব আন্দোলনের অন্তর্নির্দিত গঠন প্রকৃতি হল অ-সংসদীয়। যে সব সাংগঠনিক নীতির বলে সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত এবং নেতারা সাধারণের জীবনে এটা রূপায়িত করে তোলে মাত্র, সেই সব নীতি আমাদের এখানে প্রত্যাখ্যাত। আমাদের সাংগঠনিক নীতি হল ছোটবড় যে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে মাত্র একজন পূর্ণ প্রভৃতি সহকারে সকল দায়িত্ব পালন করবে।

আমাদের এ নীতির সূফলগুলি হল নিম্নরূপ :

কোন এক দলের প্রধানই সে দলের একজন সভাপতি নিযুক্ত করে। তখন সেই সভাপতিই দলের পক্ষ থেকে সব দায়িত্ব পালন করে। তখন অন্যান্য সব কমিটিগুলোকে

সেই সভাপতির নির্দেশ মেনে চলতে হয়। কমিটিগুলির একমাত্র কাজ হল ভোট দেওয়া নয়, সভাপতির নির্দেশ মত কাজ করে যাওয়া। প্রধান প্রধান শহর বা গ্রামদেশে কমিটিগুলো একইভাবে কাজ করে যায়। শুধু এক সাধারণ নির্বাচনে সমস্ত সদস্যদের দ্বারা দলনেতা নির্বাচিত হয়। তখন তারই আদেশে ও নির্দেশে কমিটিগুলো কাজ করে। যদি কোন সময় দেখা যায় দলের সর্বপ্রধান নেতা পার্টিবি঱োধী কাজ করে চলেছে তাহলে নতুন এক সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এক নতুন দলনেতা নির্বাচন করা হয়।

এ নীতি শুধু দলের ফেন্টে নয়, সমগ্র রাষ্ট্রের ফেন্টেও প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি তার নিজের সব কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার সাহস দেখাতে পারে না, সেই ব্যক্তি নেতা হবার উপযুক্ত নয়। মানবজাতির অগ্রগতি ও সংস্কৃতি কথনে সাধারণ মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তা' হল একান্তভাবে ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার কাজ।

এ কারণেই আমাদের আন্দোলন সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। যদি কেউ সংসদীয় ব্যবস্থায় যোগদান করে তাহলে বুঝতে হবে সে আমাদের আন্দোলনকে ধ্রংস করতে চায়।

আমাদের আন্দোলন একমাত্র রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়া অন্য কোন সমস্যার হস্তক্ষেপ করে না। এ আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য দেশের রাজনৈতিক পুনর্গঠন, ধর্মসংক্ষার নয়। সুতরাং সেই সব দল এ আন্দোলনের চোখে শক্ত, যারা যে জাতীয়তাবোধ সকল ধর্ম ও নীতির ভিত্তিভূমি সেই জাতীয়তাবোধকে ধ্রংস করতে চায়।

কোন এক বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রগঠন আমাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়, যে সব মৌল নীতি রাজতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র যে কোন ধরনের রাষ্ট্র ভিত্তিস্বরূপ এবং যেগুলোকে বাদ দিলে কোন রাষ্ট্রই তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারে না, সেই সব নীতিগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করাই এ আন্দোলনের কাজ।

কোন রাষ্ট্রের চূড়ান্ত গঠন কি হবে, তার আকৃতি ও প্রকৃতি কি রকম হবে তা সমসাময়িক যুদ্ধের প্রয়োজন অনুসারে নির্ণীত হবে। যখন কোন জাতি তার অস্তিনির্বিত অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত মূল সমস্যাটিকে বুঝতে পারে, তখন বাইরের কোন সমস্যাই সে জাতির মধ্যে ভাঙ্গন ঘরাতে পারে না।

(১১) সংগঠনই আমাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। এটা এক কৌশলগত ব্যবস্থা মাত্র। সংগঠন লক্ষ্যে পৌছাবার উপায়মাত্র। যে সংগঠন দলনেতা এবং অনেক সাধারণ সদস্যদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে, সেই সংগঠন যেটোই ভাল বা আদর্শ নয়। আদর্শ সংগঠনের কাজ হল দলনেতার মনে যেসব সৃষ্টিশীল ভাবাদর্শের উত্তোলন হয় সেই সব আদর্শ শুধু দলের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে, সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

তবে দলের সদস্য ও সমর্থকের সংখ্যা যতই বাঢ়তে থাকে ততই দলনেতার মধ্যে সাধারণ সদস্যের যোগাযোগ অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন এজন্য দলনেতা ও সাধারণ সদস্যদের মাঝাখানে এক মধ্যবর্তী সংস্থা গড়ে তোলা হয় যা নেতার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেয়। দলের সদস্য সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে গেলে এক একটি স্থানে আঞ্চলিক পর্যায়ে এক একটি কমিটি গঠন করা হয়। এভাবে অঞ্চল ও জেলা কমিটির উচ্চ পর্যায়ের কর্মীদের মাধ্যমে প্রয়োজন মত কোন সাধারণ সদস্য ও দলনেতার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা করে দেয়।

এ সব কছু বিবেচনা করে দলের অন্তর্ভুক্তি সংগঠনের জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে :

(ক) দলের সমস্ত কাজকর্মের মূল কেন্দ্র হবে মিউনিক। একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ দান করতে হবে এবং এজন্য এক প্রশিক্ষণকেন্দ্র খুলতে হবে। দলের সুনাম অর্জন করতে হলে জনগণকে বোঝাতে হবে মার্কিসবাদী নীতিই সব নয়; অন্য পার্টা বিকল্প নীতিও সম্ভব।

(খ) মিউনিকে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতৃত্ব ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু কোন আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা চলবে না।

(গ) জেলা, আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক পর্যায়ে কমিটিগুলি একমাত্র তথ্য গঠন করা হবে যখন এগুলোর একান্ত প্রয়োজন দেখা দেবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

তাছাড়া স্থানীয় কমিটি গঠনের সময় দেখতে হবে সেই সব সংগঠনের পরিচালনার ভার প্রহণ করার উপযুক্ত নেতা পাওয়া যাচ্ছে কিনা। এর সমাধানের দ্রুটো পথ আছে :

(ক) অথব উপযুক্ত পরিমাণ টাকার জোগাড় করতে হবে। সেই টাকা দিয়ে যোগ্য বুদ্ধিমান লোক বেছে নিয়ে তাকে প্রশিক্ষণ দান করতে হবে। এভাবে বেতনভোগী যোগ্য লোক নিয়ুক্ত করলে সে ঠিক অবস্থা বুঝে কাজ করে যাবে।

(খ) এ কাজ সহজ হলেও বহু টাকার প্রয়োজন। প্রথম প্রথম অবৈতনিক লোকের ওপরে নির্ভর করতে হবে। আন্দোলনের নেতৃত্ব তাই এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে এমন এক উদার সদাশয় ব্যক্তির খোঁজ করবে যারা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দলকে সাহায্য করবে। দরকার হলে অর্থ সাহায্যও করবে।

উপযুক্ত নেতা যে অঞ্চলে পাওয়া যাবে না, সেখানে কোন মতেই কোন স্থানীয় বা আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা যাবে না। কোন সেবাদল যেমন উপযুক্ত অফিসার ছাড়া চলতে পারে না, তেমনি কোন রাজনৈতিক দল উপযুক্ত নেতা ছাড়া চলতে পারে না।

নেতা হবার প্রবল বাসনাই কোন নেতৃত্ব একমাত্র শুণ নয়। সঙ্গে চাই ইচ্ছাশক্তি আর উদ্যম। প্রতিভা, সংকল্প আর অধ্যবসায়, এ তিনটি শুণের সম্মত যেকোন নেতৃত্ব চরিত্রে একান্ত দরকার।

(১২) আন্দোলনের ভবিষ্যত নির্ভর করে দলের সদস্যদের আদর্শ, নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং উদ্যমের ওপর। তাদের এটা সব সময় ভাবতে হবে যে তারা ন্যায়সঙ্গত কারণেই লড়াই করছে।

অনেকে মনে করে একটি আন্দোলন অনুরূপ ধরনের আর একটি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে। কিন্তু তাতে আন্দোলনের আয়তনটা বাড়তে পারে লোকচক্ষে। গুণগত মান তাতে বাড়বে না। বরং তার সাংগঠনিক শক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কোন আন্দোলন তখনই বড় হতে পারে যখন তার অস্তিনির্দিত শক্তিটি অব্যাহতভাবে বেড়ে যায় এবং অন্যান্য প্রতিযোগীদের ছাড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

সুতরাং আমরা নিরাপদে এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কোন আন্দোলনের উন্নতির জন্য সংগ্রাম দরকার। এবং কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত শক্তিই কোন আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্য দান করতে পারে। কোন আন্দোলন কখনো ক্ষণস্থায়ী বা মোটামুটি ধরনের জ্যাএ বা সাফল্য কামনা করে না। প্রতিটি আন্দোলনের লক্ষ্য হবে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক শুধু জয়ের গৌরব লাভ করা। একটি আন্দোলনের সঙ্গে অন্য একটি আন্দোলনকে যুক্ত করা আংশিক একটি চারাগাছকে গবেষণাগারে যেখে কৃত্রিমভাবে বাড়ানো একই কথা। কৃত্রিমভাবে বাঢ়ানো

এ গাছ কখনই স্বাভাবিক গাছের মত সেই অন্তনির্হিত শক্তি অর্জন করতে পারে না, যে শক্তির জোরে কোন স্বাভাবিক গাছ যুগ যুগ ধরে সমস্ত বাড় ঝঁঝর প্রকোপকে সহ্য করতে পারে।

(১৩) আন্দোলনের কর্মকর্তারা দলের সদস্যদের এ শিক্ষাই দেবে যে যুদ্ধ মানেই অভিশাপ বা কোন অঙ্গ শক্তি নয়। তাদের অস্তিত্বে সুদূর এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে যুক্তের প্রয়োজন আছে। সুতরাং শক্তদের শক্তির ভয়ে তারা ভীত হবে না; বরং সেই শক্তিকে বরণ করে নিয়ে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তারা জয়ের পথে এগিয়ে যাবে।

আন্দোলনকারীদের সব সময় একথা মনে রাখতে হবে যে ইহুদীদের পত্রিকাগুলো তাদের বিরুদ্ধে সর্বদা মিথ্যা ও কৃৎসা রচনা করে যাবে। মিথ্যাবাদী ইহুদীদের একমাত্র অস্ত্রই হল মিথ্যা আর ছলনা।

(১৪) ব্যক্তিগত প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি যাতে উপযুক্ত শুন্দা দেখানো হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবে আমাদের আন্দোলন। মানবিক মূল্য বলতে যা বোবায় 'তা' হল ব্যক্তিগত সৃষ্টিশীল শক্তির ফল। শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সামরিক শক্তি ও নীরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যারা যশ অর্জন করেছে তাদের কোন বিকল্প নেই। কোন বিখ্যাত শিল্পী একটি ছবি আঁকতে তাঁর আরঙ্গ কাজ ফেলে রাখলে সে কাজ তাঁর কোন শিষ্য বা ছাত্র তা শেষ করতে পারে না। পৃথিবীর বড় বিপ্লব, সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক উন্নতি, রাজনীতিবিদদের শ্রেষ্ঠ কৃতি, মানুষের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব সব একক মানুষের অবদান।

ইহুদীরাও এটা ভালভাবে জানে; তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি তারাই যারা মানবজাতি ও মানব সভ্যতা ধ্রংস করতে পারদর্শী।

মানুষের অস্তরাত্মা যখন মাঝে মাঝে নিবিড়তম হতাশায় ভেঙে পড়ে, যখন মানুষের মন সামনের দিকে এগিয়ে চলার কথা ভুলে গিয়ে অতীতের ছায়ার আশ্রয় নেয়, তখন এক একজন প্রতিভাধীর পুরুষ এসে তাদের মনে অফুরন্ত উৎসাহ সঞ্চার করে তাদের পিছিয়ে যাওয়া মনকে আবার অগ্রগতির পথে ঠেলে দেয়।

আমাদের কেউ চিনত না। আমাদের এ আন্দোলনের ভবিষ্যত উজ্জ্বল এ বিশ্বাসকে আমরা ধর্মবিশ্বাসের মত আঁকড়ে ধরে থাকতাম। কিন্তু তখন আমাদের পার্টি মিটিংয়ে মোটেই লোক হত না। আমি যখন এ পার্টিতে ভর্তি হই, তখন আমাদের পার্টি মিটিংয়ে মোটে সাত আঁটজন লোক যোগদান করত।

এরপর আমরা ঠিক করি প্রতি মাসে একটা করে আমরা সাধারণ সভা করব। সেই সভার জন্য আমরা টাইপ করে ও হাতে লিখে অনেক নিম্নৈগ্রহণ ছড়ালাম। যে যার পরিচিত লোকদের সঙ্গে দেখা করে অনেক নিম্নৈগ্রহণ বিলি করা হল। কিন্তু এত কিছু করা সত্ত্বেও সেই সাতজনের বেশি একজনও এলো না।

এরপর টাইপ করে আরো নিম্নৈগ্রহণ ছড়ালাম। লোকসংখ্যা বাড়তে বাড়তে তিরিশে গিয়ে দাঁড়াল। এরপর আমরা 'মিউনিক অবজারভার' নামে এক নিরপেক্ষ পত্রিকায় আমাদের মাসিক সভার জন্য বিজ্ঞাপন দিলাম। মিউনিকের এক বড় হল ঘরে সভা হল। দেখা গেল একশো এগারো জন লোক সেই সভায় যোগদান করেছে। একজন অধ্যাপক প্রথমেই সেই সভায় বক্তৃতা করলেন। আমাকে বক্তৃতা দেবার জন্য সভাপতি মাত্র কুড়ি মিনিট সময় দিয়েছিল। আমি মোট তিরিশ মিনিট বক্তৃতা করলাম। জীবনে আমার সেই প্রথম বক্তৃতাতেই আমি অপ্রত্যাশিত ভাবে সাফল্য লাভ করেছিলাম। শ্রোতাদের মনে আমার বক্তৃতা গভীরভাবে

বেখাপাত করে। দর্শকদের কাছে চাঁদা বা অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানাতে সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনশো মার্ক লাভ করি। তাতে আমরা পার্টি ফাও গড়ে তুলি। অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে পার্টির জন্য পুষ্টিকা ছাপা ও সেগুলো বিলি করার ব্যবস্থা করি।

এ সভার সাফল্যের ফলে আমরা বেশ কিছু লোককে আমাদের দলে সদস্য হিসেবে পেয়েছিলাম। এ সময় সাধারণ মানুষকে আবেগয় ভাষায় বোঝাবার মত লোক ছিল না আমাদের পার্টিতে। আমাদের দলে যে অধ্যাপক ভদ্রলোক ছিলেন তিনি সাধারণ মানুষের সামনে ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন না। অবশেষে সে ভার আমাদের কাঁধের ওপর এসে পড়ে।

কিন্তু তখন আমাদের সভার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল কমিউনিস্টরা। প্রথম প্রথম কমিউনিস্টরা আমাদের সভাকে বৰ্জোয়াদের সভা বলে গ্রাহ্য করত না। পরে আমাদের সভার ক্রমবর্ধমান সফল্য দেখে আমাদের সভা বসতে বসতেই তা ভেঙে দেবার চেষ্টা করত।

প্রথম প্রথম তাদের দেখলেই আমাদের সভার দর্শকেরা পালিয়ে যেত। তারা কিছু না করলেও ভয় পেত। পরে দেখা গেল তারা আমাদের সভাতে কোনরকম যোগদান করতে এলেই আমাদের সভার দর্শকরাই তাদের প্রতিহত করত সঙ্গে সঙ্গে।

আমাদের সভায় যখন একশো সত্তর জন লোক যোগদান করল তখন আমি আরো বড় হলে সভা করার প্রস্তাব দিলাম। আমি এক সভায় বললাম যে শহরে সাত লক্ষ লোক বাস করে, সেখানে সঞ্চাহে একটা করে সভা করা যায়। আমাদের আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমাদের পথের সামনে পর্বতপ্রমাণ বাধা বিপন্তি সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারব।

সভার লোকসংখ্যা ক্রমশই বাড়তে লাগল। দুশো থেকে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল বারশোতে। মাত্র পনেরো দিনের ব্যবধানে এ সংখ্যা বেড়ে যায়। এ সময় আমাদের আন্দোলন তার অন্তর্নিহিত শক্তির জোরে উদ্বাম হয়ে ওঠে। তবে এ সময় কিছু লোক আমাদের আন্দোলনকে এক রাজনৈতিক দল বলে অভিহিত করতে থাকে। আমি বুবলাম একথা সেই সংকীর্ণমনা সমালোচকের দল বলছে যারা কোন আন্দোলনের বহিরঙ্গের শক্তি আর তার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারে না। এটা তাদের বোঝানো কঠিন হয়ে উঠল যে কোন আন্দোলন যতদিন না তার আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে পারে ততদিন তাঁ' পার্টি হিসেবেই কাজ করে। যখন কোন লোক জনগণের মঙ্গলের কোন মৌলিক আদর্শকে রূপায়িত করে তুলতে চায়, তখন সে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিছু সমর্থক ও ভাবশিয়ের সর্কান করে। তখন সেই আদর্শের স্তুষ্টা এবং নেতা তার সমর্থক ও শিষ্যদের কর্মপ্রচেষ্টা একটি পার্টির রূপ নেয়। কিন্তু পার্টি সংগঠন তাদের মূল লক্ষ্য নয়, তাদের মূল উদ্দেশ্য হল আদর্শের রূপায়ণ। তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত এ পার্টির উদ্দেশ্য বজায় থাকবে। কিন্তু মানুষ তাদের অতীতের সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে কার্য তৎপরতাকে পার্টির নাম দেয়।

এ সময় আমি আমার সমর্থকদের আর একটা বিষয়ে সতর্ক করে দেই। যাতে বাজে কোন লোক আমাদের দলে চুকে পড়ে আন্দোলনকে বানচাল করে দিতে না পারে তার জন্য সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমি বিলি এমন কিছু লোক আসবে যাদের আসলে কোন যোগ্যতা নেই অথচ যারা মুখে বলে বেড়াবে তারা চলিশ বছর ধরে এ একই আদর্শ রূপায়ণের জন্য চেষ্টা করে আসছে, সংগ্রাম করে আসছে। আমার বক্তব্য যদি কোন লোক

চলিশ বছরে চেষ্টা করেও কাজ সফল করে তুলতে না পারে, তা'হলে বুঝতে হবে সে লোক সেই কাজে সম্পূর্ণ অনুগ্যুক্ত। কোন লোক চলিশ বছর ধরে এক খামার বানিয়ে যদি সে খামারের উন্নতি সাধন করতে না পারে, তাল ফসল ফলাতে অক্ষম হয়, তা'হলে বুঝতে হবে সে লোক অযোগ্য। এ ধরনের লোকের কোন প্রয়োজন নেই আমাদের। তবে অবশ্য তাদের মধ্যে বুব কম লোকই নিঃস্বার্থভাবে নতুন আন্দোলনে যোগ দিয়ে কাজ করতে আসবে। তারা শুধু অতীতের অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করে বর্তমানের সব সমস্যার সমাধান করতে চায়। আসলে তারা ভীরু, মুখে বীরত্বের ভাণ করলেও কার্যক্ষেত্রে ভয়ে পালিয়ে যায়।

কিন্তু যেসব ইহুদী এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করতে চায় তাদের কাছে ঐসব হাসির নায়কদের দাম আছে। তারা কিন্তু না জেনেও সব জানার ভাণ করে। এসব তথাকথিত নায়কদের মধ্যে আবার দু'শ্রেণীর লোক আছে। একজন অলস অকর্মণ্য, তারা কিন্তুই করতে চায় না। তাদের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা আদর্শ নেই। কিন্তু আর একজনের এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তারা ধর্মসংকারের নামে রাজনৈতিক আন্দোলনের সব কর্মতৎপরতা ও সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দিতে চায়। তাদের কাছে জাতীয়তাবাদের কোন মূল্য নেই। জাতীয়তাবাদের আদর্শে প্রতাক্তলে সমবেত ও এক্রিবদ্ধ হয়ে জার্মানির জনগণ লড়াই করে যাবে একটা তারা চায় না!

আমরা এসব লোককে বলতাম জনতা। আমরা দলের মধ্যে এ জনতার অনুপ্রবেশ একেবারে বন্ধ করার জন্য আমাদের দলের নামকরণ করলাম ন্যাশনালিস্ট সোশ্যালিস্ট জার্মান লেবার পার্টি।

আমাদের দলের এ নামকরণ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাচালের দল পেছনে লাগল। কৃৎসা রঠনা করতে লাগল। কিন্তু তাদের ভয় পাবার কিন্তু নেই। কারণ তাদের যা কিন্তু লড়াই তা' শুধু কথার। আমরা আমাদের শক্তির সতর্ক করে প্রকাশ্য ঘোষণা করি আমাদের ওপরে যারা জোর করতে আসবে, আমরাও তাদের ওপর জোর করব।

আর এক ধরনের শক্তির সম্পর্কেও আমি সাবধান করে দিলাম আমাদের দলের লোকদের। একদল লোক আছে যারা নিজেদের নীরব কর্মী বলে প্রচার করার চেষ্টা করে, অর্থে আদতে তারা অলস অপদার্থ। তারা নিজেরা কাজ না করে শুধু অপরের কাজের সমালোচনা করে। যারা কাজের লোক তাদের নিরঞ্জসাহিত করার চেষ্টা করে। আমাদের জাতীয় পুনর্গঠনের কাজকে তরাখিত করতে হলে এসব স্তু তথাকথিত নীরব কর্মীদের সম্পর্কে সব সময়ে সচেতন থাকতে হবে।

১৯২০ সালের প্রথমদিকে আমি এক প্রকাশ্য বিরাট জনসভা আহ্বান করার কথা বলি। বামপন্থী সংবাদপত্রগুলো আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে লাগল আমি বলি যে এটা ভাল লক্ষণ। আমাদের বিরোধীপক্ষরা যত আমাদের সঙ্গে পারছে না, ততই আমাদের নাম প্রকারাত্মে প্রচারিত হচ্ছে। জনসাধারণ আমাদের দলের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠছে। এতে আমাদের সুবিধাই হবে।

আমি জানতাম বামপন্থী দলের লোকেরা আমাদের বাধা দেবে। আমাদের জনসভা পও করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। কিন্তু আজ হোক বা কাল হোক এটার সম্মুখীন তো হতে হবে। এডিয়ে গেলে চলবে না। সুতরাং জনসভার অনুষ্ঠান করতে হবেই। তাছাড়া যখন আমরা প্রথম আন্দোলনে নামি, তখন আমরা সংগ্রামের মধ্যে নিজেদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার

সংকল্পই করেছিলাম। আমাদের সভাপতি বীরের মত আমার প্রশ্নাবের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা না করে সভাপতি পদ ত্যাগ করে চলে যায়। পরবর্তী সভাপাঠি ডেক্সনার আমার প্রচারের কাণ্ডে কোন বাধা দেয় না। আমরা ১৯২০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি জনসভার দিন ধার্য করি।

যেহেতু আমার ওপর প্রচারের সব ভার ছিল, আমি জনসভার জন্য আনুসংক্ষিক এণ্ড আবশ্যিকীয় সব প্রস্তুতি করতে থাকি। চারিদিকে পোষ্টার দেওয়া হয়। পুস্তিকা এমনভাবে লিখি যাতে তা জনগণের মনকে সহজে আকৃষ্ট করে। এতসব করার পর আমরা এর ফল কি হয় তার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করতে থাকি।

আমরা দলের পতাকা ও কাগজপত্রে সব ব্যাপারে লাল রঙ ব্যবহার করতে লাগলাম। তখন ব্যাডেরিয়ার ন্যাশানাল পিপলস্ পার্টি সরকারে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তাদের সঙ্গে মার্কসবাদীদের আঁতাত ছিল। তাই মার্কসবাদীদের প্ররোচনায় পুলিশ রাস্তা থেকে আমাদের অনেক প্লাকার্ড বাজে অজুহাতে সরিয়ে দিল। তবু আমরা প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলাম। তবে ব্যাডেরিয়া সরকারের অধীনে কর্মরত পুলিশের কর্মকর্তা আর্নেষ্ট পয়গর ও উচ্চর ডিক মনেথাণে জাতীয়তাবাদী ছিল।

জনসভার একমাস আগেই প্রয়োজনীয় টাকাপয়সার জোগাড় হয়ে যায়। মিউনিকের এক বিরাট হলে জনসভা অনুষ্ঠিত হল। সভার কিছুক্ষণ আগে আমি গিয়ে দেখি সমস্ত হল লোকের ভিড়ে ভরে গেছে। প্রায় ছ'হাজার লোক সভায় যোগদান করেছে। সভায় প্রথম বক্তৃর পর আমি বক্তৃতা দিতে উঠতেই এক বাধার সম্মুখীন হই। সভার একদিকে একজন লোক ঝাটিতি উঠে এসে বারে বারে আমার বক্তৃতায় বাধা দিতে থাকে। কিন্তু সভার লোক তার সঙ্গে ধন্তাধন্তি করে তাকে হল থেকে বার করে দেয়। আমি বক্তৃতা দিতে থাকি আবেগের সঙ্গে। আমার আবেগময় বক্তৃতা এক উন্তুণ্ড উত্তেজনার মধ্যে শ্রোতারা শুনতে লাগল। মনে হল তারা যেন নতুন বিশ্বাস ঝুঁজে পেয়েছে। এক কঠিন সংকল্প ফুটে উঠেছে তাদের মুখে।

চার ঘণ্টা পর উল্লম্বিত জনতা যখন সভাগৃহ ছেড়ে যেতে লাগল তখন আমি বেশ বুঝতে পারলাম জার্মানিতে এক বিপ্লব সংগঠিত হতে চলেছে।

বুঝতে পারলাম বিপ্লবের আওন জলে উঠেছে। সে আওনের আঁচে সেই সংহামের অন্তর্গতো শান্তি হচ্ছে, যে সংগ্রাম নবজীবন আনবে সমস্ত জার্মান জাতির মধ্যে। বুঝলাম প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ১৯১৮ সালের বিশ্বসংঘাতকর্তার প্রতিশোধ নিতে চলেছে।

দেখতে দেখতে হলঘর শূন্য হয়ে গেল। তবু মনে হল বিপ্লবের অদৃশ্য রথ জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে।